সংখ্যা - ৪-১২
- ১২৮৪

ভারতী

ভূমিকা।

P30475

ভারতীর উদ্দেশ্য যে কি, তাহা তাঁহার নামেই স্বপ্রকাশ। ভারতীর এক অর্থ বাণী, আর এক অর্থ বিদ্যা, আর এক অর্থ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বাণীস্থলে স্বদেশীয় ভাষার আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য। বিদ্যাস্থলে বক্তব্য এই যে, বিদ্যার দুই অঙ্গ, জ্ঞানোপার্জ্জন এবং ভাবস্ফূর্ত্তি। উভয়েরই সাধ্যানুসারে সহায়তা করা আমাদের উদ্দেশ্য। স্বদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্থলে বক্তব্য এই যে, জ্ঞানালোচনার সময় আমরা স্বদেশ-বিদেশ নিরপেক্ষ হইয়া যেখান হইতে যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাহাই নত-মস্তকে গ্রহণ করিব। কিন্তু ভাবালোচনার সময় আমরা স্বদেশীয় ভাবকেই বিশেষ স্নেহ দৃষ্টিতে দেখিব। পক্ষপাত-মানসে যে আমরা এরূপ করিব, তাহা নহে। যে সকল বস্তু উপার্জ্জন করিয়া পাওয়া যাইতে পারে, বিজ্ঞান তাহার মধ্যে একটি, কিন্তু ভাব তাহার মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস এই যে, ভাবের উদয় সম্ভবে, ভাবের উদ্রেক সম্ভবে, ভাবের স্ফূর্ত্তি সম্ভবে, কিন্তু উপার্জ্জন সম্ভবে না। যাঁহারা মনে করেন যে, আমরা আর এক জাতি হইতে তাঁহাদের ভাব উপার্জ্জন করিয়া ঠিক সেই জাতির পদবীতে আরূঢ় হইয়াছি, তাঁহারদের মনে করা মাত্রই সার। পাদ্রী সাহেবেরা যদি মনে করেন যে, আমরা ঠিক বাঙ্গালীর মত বাঙ্গলা লিখি, এবং ইঙ্গরেজেরা যদি মনে করেন যে, আমরা ঠিক ইংরাজের মত ইংরাজি লিখি, তবে তাঁহারদের সে সুখস্বপ্নে আমরা ব্যাঘাত দিতে চাহি না। কালিদাস শকুন্তলার একস্থলে বলিয়াছেন "স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বং" স্ত্রীলোকদিগের অশিক্ষিত পটুত্ব; এই যে একটি কথা ইহা ভাবের পক্ষে খুব খাটে। ভাব বাহির হইতে শিক্ষা করিয়া পটুত্ব লাভ করে না, পরন্তু ভিতর হইতে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। ইংরাজী মহাকবি সেক্‌স্‌পিয়র বলিয়াছেন, "Our poesy is a gum which oozes from whence 'tis nourished" কবিত্বরূপ নির্য্যাস ভিতরে যেখানে যত্নপূর্ব্বক পোষিত হয় সেই স্থান হইতে চুঁয়াইয়া

পড়ে। আমাদের দেশের সেদিনকার উপস্থিত-ভাবী কবি হরুঠাকুর বলিয়াছেন,

"প্রেম কি যাচলে মেলে খুঁজলে মেলে?
সে আপনি উদয় হয় শুভযোগ পেলে॥

স্বদেশ হইতে যে ভাব আপনি উদয় হয়, অযাচিত ভাবে উদয় হয়, তাহাই ঠিক; যে ভাব অন্যত্র হইতে যাচিয়া আনা হয় তাহা কৃত্রিম, তাহা কোন কার্য্যেরই নহে। বীণাপাণির হস্তে বীণাই শোভা পায়; হার্প কি শোভা পায়? এই সকল কারণে ভাবের আলোচনা আমরা স্বদেশীয় ভাবেই করিতে ইচ্ছুক।

অতঃপর আমরা বলিতে চাই যে, যে কারণে ব্রিটানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রিটানিয়া নাম ধারণ করিয়াছেন, এবং তাহার বহু পূর্ব্বে এথেন্স্ নগরের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা মিনর্বা—এথেনিয়া নাম ধারণ করিয়াছিলেন, সেই কারণে ভারতের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা সরস্বতী—ভারতী নাম ধারণ করিতে পারেন। সে কারণ কি? না নামের সহিত ধামের সহিত অকাট্য সম্বন্ধ। আর্য্য-ভাষা মূলসমেত অদ্যাপি কোথায় বিরাজ করিতেছেন? ভারতে! আর্য্য ভাষার অধিদেবতাকে তাই আমরা ভারতী নামে সম্বোধন করিতে পারি। পুনশ্চ, যত প্রকার বিদ্যা আছে, ভারতভূমি তাবৎ তরই জন্মভূমি। গণিত, জ্যোতিষ, রসায়ণ, চিকিৎসা, দর্শন, সঙ্গীত, নাটক প্রভৃতি বিদ্যা-সমূহের বীজ প্রথমে ভারত ভূমিতেই অঙ্কুরিত হয়; পরে তাহার ফল দূর দূর দেশে বিকীর্ণ হইয়া, এতদিন পরে তবে তাহা সাধারণ জনগণের ভোগায়ত্ত হইয়াছে। ভারতভূমি বিদ্যার জন্মভূমি, বিদ্যার অধিদেবতাকে তাই আমরা ভারতী নামে সম্বোধন করিতে পারি। এইরূপ যে দিকে দেখা যায় সেই দিকেই ভারতী এবং ভারতের মধ্যে ভাবের প্রগাঢ় মিল দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব ইহা মুক্তকণ্ঠে উক্ত হইতে পারে যে, হংসের যেমন পদ্মবন, মহাদেবের যেমন কৈলাস-শিখর, ভারতীর তেমনি ভারতভূমি। কিম্বা পদ্মের যেমন সৌরভ, নক্ষত্রের যেমন জ্যোতি, ভারতের তেমনি ভারতী। ভারত-ভূমিতে যদি জাগ্রত দেবতা অদ্যাপি কেহ বিরাজমান থাকেন, তবে তিনি ভারতী। ভারতের প্রতি ভারতীর এমনি কৃপাদৃষ্টি যে তাঁহাকে লক্ষ্মী পরিত্যাগ করিলেও তিনি পরিত্যাগ করেন না। সেই শ্বেতবর্ণা শ্বেতাম্বরা দেবী আমাদের এই দুরবস্থার সময় যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, তবে কাহার চরণ সেবা করিয়া আমরা দুঃসহ কারাবাস-যন্ত্রণা ভুলিয়া থাকিব? তাই আমরা ভারতী দেবীকে বলি যে "হে মাতর্ভারতি! তুমিই আমাদের আঁধারের প্রদীপ, তোমার আলোকেই আমাদের আলোক, তোমার অধিষ্ঠানেই আমাদের জীবন, তোমার অন্তর্ধানেই আমাদের মৃত্যু! তোমার শুভ্র বদন-জ্যোতি কাল-যবনিকার সহস্র সহস্র ভাঁজের মধ্য দিয়া এখনো যখন আমাদের নয়ন আকর্ষণ করিতেছে, তখন ইহা নিশ্চয় যে, প্রলয়-কালেও

তাহা অন্তর্হিত হইবে না। তোমার প্রসাদাৎ আমরা দুর্ব্বল হইয়াও সবল, গতশ্রী হইয়াও নবশ্রী, নির্জ্জীব হইয়াও সজীব। আমাদের প্রতি এই যে তোমার অনিমেষ কৃপাদৃষ্টি,আমরা আমাদের নিজ দোষে যেন তাহা না হারাই, এই আমাদের প্রার্থনা।"

আমরা ভাই বন্ধু একত্র হইয়া ভারতীকে আবাহন পূর্ব্বক এই ত প্রতিজ্ঞা করিলাম। এক্ষণে ভারতীর বরপুত্রগণ অগ্রসর হইয়া তাঁহার যাহাতে রীতিমত সেবা চলে, তাহার ব্যবস্থা করুন ; ভারতীর আশীর্ব্বাদে তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।

ভারতী।

শুধাই অয়ি গো ভারতী তোমায়
তোমার ও বীণা নীরব কেন ?
কবির বিজন মরমে লুকায়ে
নীরবে কেন গো কাঁদিছ হেন ?
অযতনে আহা সাধের বীণাটি
ঘুমায়ে রয়েছে কোলের কাছে,
অযতনে আহা এলোথেলো চুল
এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে আছে।
কেন গো আজিকে এ ভাব তোমার
কমলবাসিনী ভারতী রাণী
মলিন মলিন বসন ভূষণ
মলিন বদনে নাহিক বাণী!
তবে কি জননি অমৃতভাষিণি
তোমার ও বীণা নীরব হবে ?
ভারতের এই গগন ভরিয়া
ও বীণা আর না বাজিবে তবে ?
দেখ তবে মাতা দেখ গো চাহিয়া
তোমার ভারত শ্মশান পারা!
ঘুমায়ে দেখিছে সুখের স্বপন
নরনারী সব চেতন-হারা!
যাহা কিছু ছিল সকলি গিয়াছে
সেদিনের আর কিছুই নাই,
বিশাল ভারত গভীর নীরব
গভীর আঁধার যেদিকে চাই।
তোমারো কি বীণা ভারতী জননি
তোমারো কি বীণা নীরব হবে ?
ভারতের এই গগন ভরিয়া
ও বীণা আর না বাজিবে তবে ?
না না গো ভারতী নিবেদি চরণে
কোলে তুলে-লও মোহিনী বীণা!
বিলাপের ধ্বনি উঠাও জননি,
দেখিব ভারত জাগিবে কি না ?
অযুত অযুত ভারতনিবাসী
কাঁদিয়া উঠিবে দারুণ শোকে
সেরোদনধ্বনি পূরিবী ভরিয়া
উঠিবে জননি দেবতা লোকে।
তা যদি না হয় তাহলে ভারতি
তুলিয়া লওগো বিজয়-ভেরী!
বাজাও জলদ গভীর গরজে
অসীম আকাশ ধ্বনিত করি!
গাওগো হতাশ পূরিত গান
জ্বলিয়া উঠুক অযুত প্রাণ
উথলি উঠুক ভারত-জলধি
কাঁপিয়া উঠুক অচলধরা।

দেখিব তখন প্রতিভা হীনা
এ ভারতভূমি জাগিবে কি না
ঢাকিয়া বয়ান আছে যে শ্মশান
শরমে হইয়া মরমে মরা!
এই ভারতের আসনে বসিয়া
তুমিই ভারতী গেয়েছ গান
ছেয়েছে ধরার আঁধার গগন
তোমারি বীণার মোহন তান।
আজো তুমি মাতা বীণাটি লইয়া
মরম বিঁধিয়া গাওগো গান
হীনবল সেও হইবে সবল,
মৃত দেহ সেও পাইবে প্রাণ॥

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু বিরচিত—যুক্তি।

শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ বিরচিত—সাংখ্য দর্শন।

গ্রীকদেশের প্রধানতম প্লেটো এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে বহির্জগতের রহস্য ভেদ করা মনুষ্যের ক্ষমতাতীত, কেবল তত্ত্বজ্ঞানেই মনুষ্যের অধিকার আছে এবং জ্ঞানী ব্যক্তির প্রয়োজনও তাহাই। কিন্তু এরূপ কথায় কাহার উদ্যম ভঙ্গ হয়? যাহার হয়, সে কি আর মনুষ্য? মনুষ্য কখন কথায় ভুলিবার পাত্র নহে। মনুষ্যের মন যাহা চায় মনুষ্য তাহা না পাইলেই নয়। মনুষ্যের নিকট দুর্গম পর্ব্বত তৃণতুল্য, সমুদ্র গোষ্পদতুল্য, পৃথিবী মৃৎপিণ্ডতুল্য। আর্কিমীডীস্ অকুতোভয়ে বলিলেন যে, পৃথিবীর বাহিরে যদি আমি কেবল একটু দাঁড়াইবার স্থান পাই তবে আমি পৃথিবীকে স্থানভ্রষ্ট করিতে পারি। নিউটন ক্ষুদ্র একটা ফলপতনের সঙ্গে অসীম জগতের অনন্ত গতির সঙ্গে, অনায়াসে ভ্রাতৃসম্বন্ধ বাঁধিয়াদিলেন। নিউটনের জ্ঞানে অসীম জগৎ একটা আপেল্ ফলের সহোদর! ধরাকে সরাজ্ঞান করা আর কাহাকে বলে! কিন্তু বাস্তবিক নিউটনের আর এক প্রকার জ্ঞান ছিল! তিনি জানিতেন যে বিজ্ঞান রত্নাকর বিশেষ, তিনি কেবল উপকূলের কতিপয় উপলখণ্ড মাত্র সঙ্কলন করিয়াছেন! সে যাহা হউক, প্লেটোর সময়ে বাহ্য জগতের বিজ্ঞান গোকুলে বাড়িতেছিল, প্লেটো তাহা স্বপ্নেও জানিতেন না। প্লেটোর ভুল কোন্‌খানে সেটি একবার মনঃসংযোগ করিয়া দেখা যাউক। তিনি তত্ত্বজ্ঞানেরই অনুশীলন করিয়াছেন, বিজ্ঞানের অনুশীলন করেন নাই। এ যদি হইল, তবে তত্ত্বজ্ঞানে মনুষ্যের অধিকার কি পর্য্যন্ত, ক্ষমতা কিপর্য্যন্ত, উপকার কিপর্য্যন্ত, তাহাই তিনি আমাদিগকে বলুন যে, তাঁহার কথা আমরা আগ্রহের সহিত শুনি এবং নতমস্তকে গ্রহণ করি। বহির্জগতের বিজ্ঞান

তাহার নিকট নিতান্তই অপরিচিত প্রদেশ; তাহাতে মনুষ্যের অধিকার আছে কি না, ক্ষমতা আছে কি না, উপকার আছে কি না, ইহার সিদ্ধান্ত তাঁহার নিকট প্রত্যাশা করা বিফল। হয় ত তিনি বাহ্য জগতের রহস্য ভেদ করিবার জন্য এক সময়ে বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কৃতকার্য্য না হওয়া প্রযুক্ত পরিশেষে ক্ষান্ত হইলেন। কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইলেন না, বা তাঁহার পূর্ব্বে কেহ তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই, এইমাত্র কারণে তিনি যে একেবারে এই নির্ঘাত কথাটি কহিয়া দিলেন যে, অনন্ত ভবিষ্যৎ কালেও কোন ব্যক্তি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না, ইহা তাঁহার সদৃশ ব্যক্তির মুখে কখনই শোভা পায় না।

অধুনাতন প্রামাণিক সম্প্রদায়* যদিও প্লেটোর সঙ্গে কোন বিষয়েই কোন সম্পর্ক রাখেন না, তথাপি প্লেটোর ঐ ভ্রমটিতে প্রকারান্তরে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বহির্জগতের বিজ্ঞানকে প্লেটো যে চক্ষে দেখিতেন, তত্ত্বজ্ঞানকে ইঁহারাও সেই চক্ষে দেখেন। ইঁহারা বলেন যে, তত্ত্বজ্ঞান মনুষ্যের সাধনাতীত, অতএব তাহার আলোচনা নিষ্ফল। বিজ্ঞানের প্রতি প্লেটোর ঐ যে বিরাগ এবং তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি ইহাঁদের এই যে বিরাগ, উভয়েরই প্রতি আমাদের অবিকল একই প্রকার বক্তব্য, এজন্য পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহাই এখানে পুনরুল্লেখ করি। প্রামাণিক পণ্ডিত বিজ্ঞানেরই অনুশীলন করিয়া থাকেন, তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন করেন না। এ যদি হইল তবে বিজ্ঞানে মনুষ্যের অধিকার কি পর্য্যন্ত, ক্ষমতা কিপর্য্যন্ত, উপকার কি পর্য্যন্ত তাহাই তিনি আমাদিগকে বলুন যে, তাঁহার কথা আমরা আগ্রহের সহিত শুনি এবং নতমস্তকে গ্রহণ করি। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান তাঁহার নিকটে নিতান্তই অপরিচিত প্রদেশ, তাহাতে মনুষ্যের অধিকার আছে কি না, ক্ষমতা আছে কি না, উপকার আছে কি না, তিনি তাহার কি জানিবেন? হয়ত তিনি তত্ত্বজ্ঞানের রহস্য ভেদ করিবার জন্য পূর্ব্বে এক সময়ে বহু যত্ন করিয়াছিলেন, কৃতকার্য্য না হওয়া প্রযুক্ত তাহাতে ক্ষান্ত হইলেন। কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইলেন না, বা তাঁহার পূর্ব্বে কেহ কৃতকার্য্য হন নাই, এই মাত্র কারণে তিনি যে একেবারে এই নির্ঘাত কথাটি কহিয়া দেন যে, অনন্ত ভবিষ্যৎ কালেও কেহ তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না, ইহা তাঁহার ন্যায় কৃতবিদ্য ব্যক্তির মুখে কখনই শোভা পায় না। এক বিজ্ঞান অপর বিজ্ঞানের কোথায় সাধ্যানুসারে আনুকূল্য করিবে, তাহা না করিয়া যদি প্রতিকূলতাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তবে সে ভ্রাতৃবিরোধ যেমন শীঘ্র চুকিয়া গেলেই ভাল হয়, তেমনি তত্ত্বজ্ঞানে বিজ্ঞানে বিবাদ লাগিলে, সে ঘরাও বিবাদ শীঘ্র নিষ্পত্তি হইয়া গেলেই ভাল হয়। মনুষ্য কি এমনিই কথায় তুলিবার পাত্র যে, তুমি তাহাকে বলিবে "বাহিরে যত ইচ্ছা বিচরণ

* Positive philosopher

কর, ভিতরে প্রবেশ করিতে যাইও না" অথবা আর এক জন বলিবে, "না, তুমি ভিতরে যত ইচ্ছা প্রবেশ কর, বাহিরের দিকে যাইও না" আর অমনি সে তাহাতে মাথা নোয়াইবে! এও কি কখন সম্ভবে! "ওদিকে জুজু ওদিকে যাইও না' এরূপ কথা যিনিই বলুন না কেন, প্লেটোই বলুন, আর কম্‌টিই বলুন, অজ্ঞান শিশুকেই যেন বলেন, মনুষ্যকে ওরূপ কথা যত অল্প বলেন ততই ভাল; আদবেই না বলেন সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। পুনর্ব্বার বলিতেছি যে, মনুষ্য কখন কথায় ভুলিবার পাত্র নহে। মনুষ্যের মন যাহা চায়, তাহা সে না পাইলেই নয়। যে মনুষ্যের নিকট দুর্গম পর্ব্বত তৃণ-তুল্য, সমুদ্র গোষ্পদ-তুল্য, পৃথিবী মৃৎপিণ্ড তুল্য, যে মনুষ্য আপেল্ ফলের পতনেতে অসীম জগতের গতি-বিধি প্রতিবিম্বিত দেখে, সেই মনুষ্যই আপনার ক্ষুদ্র আত্মাতে অপরিসীম মহান্ আত্মাকে প্রতিবিম্বিত দেখে। নিউটন্ যেমন অনির্দ্দেশ্য অসীম অনন্ত জগৎকে করতলন্যস্ত আপেল্ ফলের ন্যায় প্রতীতি করিয়াছিলেন, অস্মদ্দেশীয় কোন পূর্ব্বতন আচার্য্য সেইরূপ অনাদ্যন্ত পরমাত্মাকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ প্রতীতি করিয়াছিলেন—দুইই আশ্চর্য্য—একের মনে সত্যের বিস্তার, অপরের মনে সত্যের প্রগাঢ়তা যত দূর প্রকাশ পাইতে পারে তাহা পাইয়াছে। অথবা মনুষ্যের নিকটে আবার আশ্চর্য্য কি? মনুষ্য নিজেই আশ্চর্য্য।

বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে এক্ষণে এই একটি কথার সৃষ্টি হইয়াছে যে, তত্ত্বজ্ঞান বিজ্ঞানের ন্যায় প্রামাণিক নহে। ইহার তাৎপর্য্য কেবল এই কথাটি সকলকে বলা যে, তত্ত্বজ্ঞানের দিকে যাইও না, বিজ্ঞানের চর্চ্চাতে ক্রমাগত নিযুক্ত থাক। প্রকৃত বৃত্তান্তটি এই:—এক পাত্র জলে যদি অল্প পরিমাণে শর্করা মিশ্রিত থাকে, তবে তাহাতে বাস্তবিক শর্করা আছে কি না ইহা প্রমাণ করিতে হইলে বিজ্ঞানের সাহায্য আবশ্যক হয়। কিন্তু যদি সেই জলে প্রচুর পরিমাণে শর্করা মিশ্রিত থাকে, তবে তাহার স্বাদগ্রহই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ, অন্যতর প্রমাণের কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না। বহির্জগতে সত্য বহুধা বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, এ জন্য তথাকার কোন একটি সত্যের প্রমাণ দিতে হইলে অন্য আর একটি বা ততোধিক সত্যের সহায়তা আবশ্যক হয়। "পৃথিবী গোল" এই সত্যটির প্রমাণ দিতে হইলে, জাহাজের মাস্তুর দিগন্তরেখায় ক্রমে ক্রমে নিমগ্ন হইয়া যায়, এই আর একটি সত্যের সহায়তা আবশ্যক হয়। প্রত্যুত আত্মাতে সত্য এমনি প্রগাঢ় রূপে ওতপ্রোত রহিয়াছে যে, তাহা সহজ অনুভব ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা করে না। বহির্জগতে সত্য বিক্ষিপ্ত ভাবে রহিয়াছে বলিয়া তথায় একাধিক প্রমাণের প্রয়োজন হইয়া থাকে। আত্মাতে সত্য প্রগাঢ় ভাবে রহিয়াছে বলিয়া, একমাত্র স্বানুভূতি ভিন্ন তাহার দ্বিতীয় প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। এই কারণে যদি বিজ্ঞা-

নকে প্রামাণিক জ্ঞান বল তবে তাহাতে আমাদের অল্পই আপত্তি থাকে। কিন্তু যদি বল যে, তত্ত্বজ্ঞান প্রমাণের সহিত আদবেই কোন সম্পর্ক রাখে না সুতরাং তাহা খ পুষ্পবৎ অলীক, তবে তাহাতে আমরা কখনই সায় দিতে পারি না। কেন না স্বানুভূতিকে আমরা প্রমাণের পরাকাষ্ঠা বলিয়া স্বীকার করি। যেখানে স্বানুভূতি সম্ভবে না, সেই স্থানেই অন্য প্রকার প্রমাণ দর্শান আবশ্যক হয়। যেমন জ্বলন্ত প্রদীপকে দেখিবার জন্য দ্বিতীয় প্রদীপ আবশ্যক হয় না, তেমনি আত্মাকে জ্ঞানায়ত্ত করিতে হইলে দ্বিতীয় কোন বস্তুর প্রয়োজন হয় না। আত্মা আপনিই আপনার প্রমাণ। এই আত্মপ্রত্যয়টি তত্ত্বজ্ঞানের প্রথম সোপান। অতঃপর আত্মার অতলস্পর্শ গভীরতা এবং জগতের অপরিসীম বিস্তার এ দুয়ের মধ্যে অপরিমেয় ভাবের যেরূপ মিল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে দুইকে একই অসীম সত্যের এপিট ওপিট মনে না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারা যায় না। সে সত্য এমনি যে তাহাতে অতলস্পর্শ জ্ঞানের গভীরতা এবং অপরিসীম শক্তির বিস্তার উভয়ই একাধারে পাওয়া যায়। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে প্রথমে স্বানুভব, এবং তাহার পরে তাহার অসীম বিস্তার এবং প্রগাঢ়তা, এই দুই প্রকার প্রমাণের উপরে তত্ত্বজ্ঞান দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, বালুকার বাঁধের উপরে নহে। অতএব তত্ত্বজ্ঞানকে অপ্রমাণ না বলিয়া স্বপ্রমাণ বলাই যুক্তিসিদ্ধ। শুদ্ধ কেবল বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে প্রামাণিক বলিলে প্রকারান্তরে বলা হয় যে তত্ত্বজ্ঞানের পদ্ধতি প্রামাণিক নহে; এরূপ অত্যুক্তিতে না গিয়া এখন অবধি বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং তত্ত্বজ্ঞানের পদ্ধতিকে দার্শনিক পদ্ধতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। এক্ষণে সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কে কিরূপ সাক্ষ্য প্রদান করেন, একবার অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক।

ক্রমশঃ

মেঘনাদ বধ কাব্য।

(মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত।)

বঙ্গীয় পাঠকসমাজে যে কোন গ্রন্থকার অধিক প্রিয় হইয়া পড়েন তাঁহার গ্রন্থ নিরপেক্ষ ভাবে সমালোচনা করিতে কিঞ্চিৎ সাহসের প্রয়োজন হয়। তাঁহার পুস্তক হইতে এক বিন্দু দোষ বাহির করিলেই, তাহা ন্যায্য হউক বা অন্যায্যই হউক, পাঠকেরা অমনি ফণা ধরিয়া উঠেন। ভীরু সমালোচকেরা ইহাঁদের ভয়ে অনেক সময়ে

আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিতে সাহস করেন না। সাধারণ লোকদিগের প্রিয় মতের পোষকতা করিয়া লোকরঞ্জন করিতে আমাদের বড় একটা বাসনা নাই। আমাদের নিজের যাহা মত তাহা প্রকাশ্য ভাবে বলিতে আমরা কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইব না বা যদি কেহ আমাদের মতের দোষ দেখাইয়া দেন তবে তাহা প্রকাশ্য ভাবে স্বীকার করিতে আমরা কিছুমাত্র লজ্জিত হইব না। এখনকার পাঠকদের স্বভাব এই যে, তাঁহারা ঘটনাক্রমে এক এক জন লেখকের অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন, এরূপ অবস্থায় তাঁহারা সে লেখকের রচনায় কোন দোষ দেখিতে পান না, অথবা কেহ যদি তাহার কোন দোষ দেখাইয়া দেয় সে দোষ বোধগম্য ও যুক্তিযুক্ত হইলেও তাঁহারা সে গুলিকে গুণ বলিয়া বুঝাইতে ও বুঝিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন। আবার এমন অনেক ভীরুস্বভাব পাঠক আছেন, যাঁহারা খ্যাতনামা লেখকের রচনা পাঠকালে কোন দোষ দেখিলে তাহাকে দোষ বলিয়া মনে করিতে ভয় পান, তাঁহারা মনে করেন এ গুলি গুণই হইবে, আমি ইহার গভীর অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না।

আমাদের পাঠকসমাজের রুচি ইংরাজি শিক্ষার ফলে একাংশে যেমন উন্নত হইয়াছে অপরাংশে তেমনি বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ভ্রমর, কোকিল, বসন্ত লইয়া বিরহ বর্ণনা করিতে বসা তাঁহাদের ভাল না লাগুক, কবিতার অন্য সকল দোষ ইংরাজি গিল্‌টিতে আবৃত করিয়া তাহাদের চক্ষে ধর তাঁহারা অন্ধ হইয়া যাইবেন। ইঁহারা ভাব-বিহীন মিষ্ট ছন্দের মিলন সমষ্টি বা শব্দাড়ম্বরের ঘনঘটাচ্ছন্ন শ্লোককে মুখে কবিতা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জিত হন কিন্তু কার্য্যে তাহার বিপরীতাচরণ করেন। শব্দের মিষ্টতা অথবা আড়ম্বর তাঁহাদের মনকে এমন আকৃষ্ট করে যে ভাবের দোষ তাঁহাদের চক্ষে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। কুশ্রী ব্যক্তিকে মণি-মাণিক্য-জড়িত সুদৃশ্য পরিচ্ছদে আবৃত করিলে আমাদের চক্ষু পরিচ্ছদের দিকেই আকৃষ্ট হয়, ঐ পরিচ্ছদ সেই কুশ্রী ব্যক্তির কদর্য্যতা কিয়ৎ পরিমাণে প্রচ্ছন্ন করিতেও পারে কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাকে সৌন্দর্য্য অর্পণ করিতে পারে না।

আমরা এবারে যে মেঘনাদ বধের একটি রীতিমত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া অনেক পাঠক বিরক্ত হইয়া কহিবেন যে অত সূক্ষ্ম সমালোচনা করিয়া পুস্তকের দোষগুণ ধরা অনাবশ্যক, মোটের উপর পুস্তক ভাল লাগিলেই হইল। আমরা বলি এমন অনেক চিত্রকর আছেন, যাঁহারা বর্ণপ্রাচুর্য্যে তাঁহাদের চিত্র পূর্ণ করেন, সে চিত্র দূর হইতে সহসা নয়ন আকর্ষণ করিলেও প্রকৃত শিল্পরসজ্ঞ ব্যক্তি সে চিত্রকরেরও প্রশংসা করেন না, সে চিত্রেরও প্রশংসা করেন না, তাঁহারা বিশেষ বিশেষ করিয়া দেখেন যে, চিত্রে ভাব কেমন সংরক্ষিত হইয়াছে, এবং ভাবশুদ্ধ চিত্র দেখিলেই তাঁহারা তৃপ্ত হন। কাব্যসম্বন্ধেও ঐরূপ

বলিতে পারা যায়। আমরা অধিক ভূমিকা করিতে অতিশয় অনিচ্ছুক, এখন যে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছে তাহারই অবতারণা করা যাক।

লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিৎ, রাবণ, সীতা, ঊর্মীলা, ইন্দ্র, দুর্গা, মায়াদেবী, লক্ষ্মী ইঁহারাই মেঘনাদবধের প্রধান চরিত্র। ইহার মধ্যে কতকগুলি চরিত্র সুচিত্রিত হয় নাই, এবং কতকগুলি আমাদের মনের মত হয় নাই। প্রথম, পুস্তক আরম্ভ করিতেই রাবণকে পাই। প্রথমে আমরা ভাবিলাম, কি একটি ভীষণ চিত্রই পাইব, গগনস্পর্শী বিশাল দশানন গম্ভীর, ভীষণ, অন্ধকারময় মূর্ত্তিতে উচ্চ প্রকাণ্ড সভামণ্ডপে আসীন, কিন্তু তাহা নহে, তাহা খুঁজিয়া পাই না। পাঠক প্রথমে একটি স্ফটিকময় রত্নরাজিসমাকুল সভায় প্রবেশ কর; সেখানে বসন্তের বাতাস বহিতেছে, কুসুমের গন্ধ আসিতেছে, চন্দ্রাননা চারুলোচনা কিঙ্করী চামর দুলাইতেছে, মদনের প্রতিরূপ ছত্রধর ছত্র ধরিয়া আছে, যাহা এক ভীষণের মধ্যে আছে দৌবারিক, কিন্তু দৌবারিককে মনে করিতে গিয়া শিবের রুদ্রভাব কমাইতে হয়। কবি পাণ্ডবশিবির দ্বারে শূলপাণি রুদ্রেশ্বরের সহিত দ্বারবানের তুলনা দিয়াছেন। পুষ্করিণীর সহিত সমুদ্রের তুলনা দিলে সমুদ্রকেই ছোট বলিয়া মনে হয়। কেহ বলিবেন যে, রামায়ণের রাবণ রত্নরাজিসমাকুলিত সভাতেই থাকিত, সুতরাং মেঘনাদবধে অন্যরূপ কি করিয়া বর্ণিত হইবে? আমরা বলি রত্নরাজিসঙ্কুল সভায় কি গাম্ভীর্য্য অর্পণ করা যায় না? বাল্মীকি রাবণের সভা বর্ণনা করিতে বলিয়াছেন "রাবণের সভা তরঙ্গসঙ্কুল, নক্রকুম্ভীর ভীষণ সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর" (১) বাঙ্গালার একটি ক্ষুদ্র কাব্যের সহিত বাল্মীকির বিশাল কাব্যের তুলনা করিতে যাওয়া অন্যায় বটে, কিন্তু কোন কোন পাঠকের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া না দেখাইলে তাঁহারা বুঝিবেন না।

ভূতলে অতুল সভা—কটিকে গঠিত;
তাহে শোভে রত্নরাজি, মানসসরসে
সরস কমলকুল বিকশিত যথা।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণ ছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি,
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে। ঝুলিছে ঝালরে মুকুতা,
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা; যথা ঝোলে
খচিত মুকুলে ফুলে পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। ইত্যাদি,

ইহা কি রাবণের সভা? ইহাত নাট্যশালার বর্ণনা!

কতকগুলি পাঠকের আমার পাত্রাপাত্র জ্ঞান নাই, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিবেন রাবণের সভা মহান্ করিতেই হইবে তাহার অর্থ কি? না হয় সুন্দরই হইল, ইহাঁদের কথার উত্তর দিতে আমাদের অবকাশ নাই এবং ইচ্ছাও নাই। এক কথায় বলিয়া রাখি যে, কবি বর্ণনায় যথাসাধ্য কাকলী, বাঁশরী স্বরলহরী, গোকুল বিপিন প্রভৃতি ব্যবহার করিতে পারিতেন,

(১) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুবাদিত রামায়ণ। সুন্দরকাণ্ড।

কিন্তু মহাকাব্য রচনায়, বিশেষ রাবণের সভা বর্ণনায় মিষ্ট ভাবের পরিবর্ত্তে তাঁহার নিকট হইতে আমরা উচ্চ, প্রকাণ্ড, গম্ভীর ভাব প্রার্থনা করি। এই সভার বর্ণনা পাঠ করিয়া দেখি রাবণ কাঁদিতেছেন, রাবণের রোদনে পুস্তকের প্রারম্ভ ভাগ যে নষ্ট হইয়া গেল, তাহা আর সুরুচি পাঠকদের বুঝাইয়া দিতে হইবে না। আর, এ দোষ পরিহার করিয়া দেখা যাউক, রাবণ কি ভয়ানক শোকেই কাঁদিতেছেন ও সে রোদনই বা কি অসাধারণ; কিন্তু তাহার কিছুই নয়, বীরবাহুর শোকে রাবণ কাঁদিতেছেন। অনেকে কহিবেন, ইহা অপেক্ষা আর শোক কি আছে। কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, বীরবাহুর পূর্ব্বে রাবণের কত পুত্র হত হইয়াছে, সকল ক্লেশের ন্যায় শোকও অভ্যস্ত হইয়া যায়। এখন দেখা যাউক, রাবণের রোদন কি প্রকার। প্রকাণ্ড দশানন কাঁদিতেছেন কিরূপে।

"এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
বাক্যহীন পুত্রশোকে! ঝর ঝর ঝরে,
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে"
ইত্যাদি।

রাণী মন্দোদরীকে কাঁদাইতে গেলে ইহা অপেক্ষা অধিক বাক্যব্যয় করিতে হইত না। ইহা পড়িলেই আমাদের মনে হয়, গালে হাত দিয়া একটি বিধবা স্ত্রী লোক কাঁদিতেছে। একজন সাধারণ নায়ক এরূপ কাঁদিতে বসিলে আমাদের গা জ্বলিয়া যায়, তাহাতে ইনি মহাকাব্যের নায়ক, যে সে নায়ক নয়, যিনি বাহুবলে স্বর্গ পুরী কাঁপাইয়াছিলেন এবং যাঁহার এতদূর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তাঁহার চক্ষের উপরে একটি একটি করিয়া পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা নিহত হইল, ঐশ্বর্য্যশালী জনপূর্ণ কনক-লঙ্কা ক্রমে ক্রমে শ্মশানভূমি হইয়া গেল, অবশেষে যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন তথাপি রামের নিকট নত হন নাই, তাঁহাকে এইরূপ বালিকাটির ন্যায় কাঁদাইতে বসান অতি ক্ষুদ্র কবির উপযুক্ত। ভাবুক মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, মন্দোদরীই বিলাপ করিতে হইলে বলিতেন যে;

"হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীরচূড়ামণি!
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এখন তুই? হায়রে কেমনে
সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে
এ বিপুল কুলমান এ কালসমরে?"
ইত্যাদি—

রাবণের ক্রন্দন দেখিয়া "সচিবশ্রেষ্ঠ বুধঃ সারণ" সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন

"এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর সুখ দুঃখ যত।"

রাবণ কহিলেন "কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এপরাণ অবোধ" ইহার পর দূত যে বীরবাহুর যুদ্ধের বর্ণনা করিলেন তাহা মন্দ নহে, তাহাতে কবি কথা গুলি বেশ বাছিয়া বসাইয়াছেন। তাহার পরে দূত বীরবাহুর মৃত্যু স্মরণ করিয়া কাঁদিল—"কাঁদে যথা বিলাপী স্মরিয়া পূর্ব্বদুঃখ" এ যথাটি অতিশয় অযথা হইয়াছে। অমনি সভাশুদ্ধ কাঁদিল, রাবণ কাঁদিল, আমার

মনে হইল আমি একরাশি স্ত্রীলোকের মধ্যে বসিয়া পড়িলাম।

"অশ্রুময় আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ,
মন্দোদরী মনোহর,

একেত অশ্রুময় আঁখি রাবণ, তাহাতে আবার "মন্দোদরী মনোহর," আমরা বাল্মীকির রাবণকে হারাইয়া ফেলিলাম। বড় বড় কবিরা এক একটি বিশেষণে তাঁহাদের বর্ণনীয় বিষয়ের স্বপক্ষে এক এক আকাশ ভাব আনিয়া দেন। রোদনের সময় রাবণের "মন্দোদরী মনোহর" বিশেষণ দিবার প্রয়োজন কি? যখন কবি রাবণের সৌন্দর্য্য বুঝাইবার জন্য কোন বর্ণনা করিবেন তখন "মন্দোদরী মনোহর" রাবণের বিশেষণ অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। তৎপরে দূত তেজের সহিত বীরবাহুর মৃত্যু বর্ণনা করিলেন, তখন রাবণের বীরত্ব ফিরিয়া আসিল, কেন না ডমরুধ্বনি না শুনিলে কণী কখন উত্তেজিত হয় না। তাহার পরে শ্মশানে বীরবাহুর মৃতকায় দেখিয়া

"মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ।
যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার
প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এশয়নে
সদা! রিপুদল বলে দলিয়া সমরে
জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে ভীরু সে মূঢ় শত ধিক্ তারে।"

এতদূর পড়িয়া আশা হয় যে এবার বুঝি রাবণের উপযুক্ত রোদনই হইবে কিন্তু তাহার পরেই আছে।

"তবু বৎস যে হৃদয় মুগধ মোহমদে
কোমল সে ফুলসম। এ বজ্র আঘাতে
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন
অন্তর্যামী যিনি; আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী।
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কিহে তুমি
হও সুখী? পিতা সদা পুত্র দুঃখে দুঃখী
তুমি হে জগতপিতা, একি রীতি তব?
হা পুত্র! হা বীরবাহু! বীরেন্দ্রকেশরী
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে?"

সুরুচি পাঠকেরা কখনই বলিবেন না যে, ইহা রাবণের উপযুক্ত রোদন হইয়াছে।

"এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি দেখিলেন দূরে
সাগর"

ভাবিলাম মহাকবি সাগরের কি একটি মহান, গম্ভীর চিত্রই করিবেন, অন্য কোন কবি এ সুবিধা ছাড়িতেন না, সমুদ্রের গম্ভীর চিত্র দূরে থাক্, কবি কহিলেন

"বহিছে জলস্রোত কলরবে
স্রোতঃপথে জল যথা বরিষার কালে"

যাঁহাদের কবি আখ্যা দিতে পারি তাঁহাদের মধ্যে কেহই এরূপ নীচ বর্ণনা করিতে পারেন না, তাঁহাদের মধ্যে কেহই বিশাল সমুদ্রের ভাব এত ক্ষুদ্র করিয়া ভাবিতে পারেন না। এই স্থলে পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য রামায়ণ হইতে একটি উৎকৃষ্ট সমুদ্র বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

১ "বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র প্রচণ্ড বায়ুবেগে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলিত হইতেছে। উহার কোথাও

১ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুবাদিত রামায়ণ। যুদ্ধকাণ্ড, চতুর্থ সর্গ।

উদ্দেশ নাই, চতুর্দ্দিক অবাধে প্রসারিত হইয়া আছে। উহা ঘোর জলজন্তুগণে পূর্ণ; প্রদোষকালে অনবরত কেন উল্লাস পূর্ব্বক যেন হাস্য করিতেছে এবং তরঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন পূর্ব্বক যেন নৃত্য করিতেছে। তৎকালে চন্দ্র উদিত হওয়াতে মহাসমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং প্রতিবিম্বিত চন্দ্র উহার বক্ষে ক্রীড়া করিতেছে। সমুদ্র পাতালের ন্যায় ঘোর গভীরদর্শন; উহার ইতস্ততঃ তিমি তিমিঙ্গিল প্রভৃতি জলজন্তু সকল প্রচণ্ডবেগে সঞ্চরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শৈল; উহা অতলস্পর্শ; ভীম অজগরগণ গর্ভে লীন রহিয়াছে। উহাদের দেহ জ্যোতির্ম্ময়; সাগরবক্ষে যেন অগ্নিচূর্ণ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সমুদ্রের জলরাশি নিরবচ্ছিন্ন উঠিতেছে ও পড়িতেছে। সমুদ্র আকাশতুল্য এবং আকাশ সমুদ্রতুল্য; উভয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই; আকাশে তারকাবলী এবং সমুদ্রে মুক্তাস্তবক; আকাশে ঘনরাজি এবং সমুদ্রে তরঙ্গজাল; আকাশে সমুদ্র ও সমুদ্রে আকাশ মিশিয়াছে। প্রবল তরঙ্গের পরস্পর সঙ্ঘর্ষ নিবন্ধন মহাকাশে মহাভেরীর ন্যায় অনবরত ভীম রব শ্রুত হইতেছে। সমুদ্র যেন অতিমাত্র ক্রুদ্ধ, উহা রোষভরে যেন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছে এবং উহার ভীম গম্ভীর রব বায়ুতে মিশ্রিত হইতেছে।"

রাবণ সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া যাহা কহিলেন তাহা সুন্দর লাগিল। রাবণ পুনরায় সভায় আসিয়া,

"শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে
মহামতি, পাত্র মিত্র, সভাসদ্ আদি
বসিলা চৌদিকে, আহা নীরব বিষাদে!"

হেন কালে রোদনের "মৃদু নিনাদ" ও কিঙ্কিণীর "ঘোর রোল" তুলিয়া চিত্রাঙ্গদা আইলেন, কবি তখন একটি ঝড় বাধাইলেন এই ঝড়ের রূপকটি অতিশয় হাস্যজনক।

"সুরসুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু; অশ্রু বারিধারা
আসার, জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব।"

এই ঝড় উপস্থিত হইতেই অমনি নেত্রনীরসিক্তা কিঙ্করী দূরে চামর ফেলিয়া দিল এবং ছত্রধর ছত্র ফেলিয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল, আর পাত্র মিত্র সভাসদ আদি অধীর হইয়া "ঘোর কোলাহলে" কাঁদিতে লাগিল। রাবণের সভায় এত কান্না ত আর সহ্য হয় না, পাত্র মিত্র সভাসদ আদিকে এক একটি খেলেনা দিয়া থামাইতে ইচ্ছা করে। একটু শোকে কিঙ্করী চামর ছুঁড়িয়া ফেলিল, একটু শোকে ছত্রধর ছত্র ফেলিয়া কাঁদিতে বসিল, এক ত ইহাতে রাজসভার এক অপূর্ব্ব ভাব মনে আসে, দ্বিতীয়তঃ ক্রোধেই চামর আদি দূরে ফেলিয়া দিবার সম্ভাবনা, শোকে বরং হস্ত হইতে অজ্ঞাতে খসিয়া পড়িতে পারে। মহিষী রাবণকে যাহা কহিলেন তাহা ভাল লাগিল, রাবণ কহিলেন,

"বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্ন ভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর।"

এই উদাহরণটি অতিশয় সঙ্কীর্ণ হই-

যাছে; যদি সাহিত্যদর্পণকার জীবিত থাকিতেন তবে দোষপরিচ্ছেদে যেখানে সূর্য্যের সহিত কুপিত কপি কপোলের তুলনা উদ্ধৃত করিয়াছেন সেই খানে এইটি প্রযুক্ত হইতে পারিত। দূতের ঊর্দ্ধশ্বাসে, চিত্রাঙ্গদার শোকার্ত্ত ভৎর্সনায় রাবণ শোকে অভিমানে " ত্যজি সুকনকাসন উঠিল গর্জ্জিয়া " সুকনকাসন, সুসিন্ধুর, সুসমীরণ, সুআরাধনা, সুকবচ, সুউচ্চ, সুমনোহর, কথাগুলি কাব্যের স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, এগুলি তেমন ভাল শুনায় না। ইহার পরে রাবণ সৈন্যদের সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন, রণসজ্জার বর্ণনা তেমন কিছু চিত্রিতবৎ হয় নাই, নহিলে উদ্ধৃত করিতাম।

যাহা হউক প্রথম সর্গের এত খানি পড়িয়া যদি আমাদের রাবণের চরিত্র বুঝিতে হয় ত কি বুঝিব? রাবণকে কি মন্দোদরী বলিয়া আমাদের ভ্রম হইবে না? কোথায় রাবণ বীরবাহুর মৃত্যু শুনিয়া পদাহত সিংহের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিবেন, না সভাশুদ্ধ কাঁদাইয়া কাঁদিতে বসিলেন! কোথায় পুত্রশোক তাঁহার কৃপাণের শান-প্রস্তর হইবে, কোথায় প্রতিহিংসা তাঁহার শোকের ঔষধি হইবে, না তিনি স্ত্রীলোকের শোকাগ্নি নির্ব্বাণের উপায় অশ্রুজলের আশ্রয় লইয়াছেন। কোথায় যখন দূত বীরবাহুর মৃত্যু স্মরণ করিয়া কাঁদিবে তখন তিনি বলিবেন যে, আমার বীরবাহুর মৃত্যু হয় নাই ত তিনি অমর হইয়াছেন, না সারণ তাঁহাকে বুঝাইবে যে "এ ভবমণ্ডল মায়াময়" আর তিনি উত্তর দিবেন "তাহা জানি তবু শুনে শুনে কাঁদে এ পরাণ অবোধ!" যখন রাবণ বীরবাহুর মৃত কায় দেখিয়া বলিতেছেন " যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার, বীরকুলসাধ এ শয়নে সদা" তখন মনে করিলাম, বুঝি এতক্ষণে মন্দোদরীর পরিবর্ত্তে রাবণকে পাইলাম, কিন্তু তাহা নয়, আবার রাবণ কাঁদিয়া উঠিলেন। রাবণের সহিত যদি বৃত্রসংহারের বৃত্রের তুলনা করা যায় তবে স্বীকার করিতে হয় যে, রাবণের অপেক্ষা বৃত্রের মহান ভাব আছে। বৃত্র সভায় প্রবেশ করিবামাত্র কবি তাহার চিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিলেন, তাহা দেখিয়াই বৃত্রকে প্রকাণ্ড দৈত্য বলিয়া চিনিতে পারিলাম।

" নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস
পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ,
নিশান্তে গগনপথে ভানুর ছটায়
বৃত্রাসুর প্রবেশিল তেমতি সভায়
ভ্রূকুটী করিয়া দর্পে ইন্দ্রাসন পরে
বসিল, কাঁপিল গৃহ দৈত্যপদভরে।"

মেঘনাদ বধের প্রথম সর্গের উপসংহার ভাগে যখন ইন্দ্রজিৎ রাবণের নিকট যুদ্ধে যাইবার প্রার্থনা করিলেন, তখন রাবণ কহিলেন " একাল সমরে কাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা বারম্বার" কিন্তু বৃত্রপুত্র রুদ্রপীড় যখন পিতার নিকট সেনাপতি হইবার প্রার্থনা করিলেন তখন বৃত্র কহিলেন,

রুদ্রপীড়! তব চিত্তে যত অভিলাষ,
পূর্ণ কর যশোরশ্মি বাঁধিয়া কিরীটে;

বাসনা আমার নাই করিতে হরণ
তোমার সে যশঃপ্রভা পুত্র যশোধর!
ত্রিলোকে হোয়েছ ধন্য, আরো ধন্য হও
দৈত্যকুল উজ্জ্বলিয়া, দানবতিলক!
তবে যে ব্রত্রের চিত্তে সমরের সাধ
অদ্যাপি প্রজ্বল এত, হেতু সে তাহার
যশোলিপ্সা নহে, পুত্র, অনা সে লালসা
নারি ব্যক্ত করিবারে বাকো বিনাশিয়া।
অনন্ত তরঙ্গময় সাগর-গর্জ্জন,
বেলাগর্ভে দাঁড়াইলে, যথা সুখকর;
গভীর শর্ব্বরী যোগে গাঢ় ঘনঘটা
বিদ্যুতে বিদীর্ণ হয়, দেখিলে যে সুখ;
কিম্বা সে গঙ্গোত্রীপার্শ্বে একাকী দাঁড়ায়ে
নিরখি যখন অম্বুরাশি ঘোর নাদে
পড়িছে পর্ব্বতশৃঙ্গ স্রোতে বিলুণ্ঠিয়া,
ধরাধর ধরাতল করিয়া কম্পিত!
তখন অন্তরে যথা, শরীর পুলকি,
দুর্জ্জয় উৎসাহে হয় সুখ বিমিশ্রিত;
সমরতরঙ্গে পশি, পেলি যদি সদা,
সেই সুখ চিত্তে মম হয়রে উদিত॥

ইহার মধ্যে ভয়, ভাবনা কিছুই নাই, বীরোচিত তেজ। মেঘনাদবধ কাব্যে অনেক গুলি "প্রভঞ্জন" "কলম্বকুল" প্রভৃতি দীর্ঘশ্বাস কথায় সজ্জিত ছত্র সমূহ পাঠ করিয়া তোমার মন ভারাক্রান্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু এমন ভাবপ্রধান বীরোচিত বাক্য অল্পই খুঁজিয়া পাইবে। অনেক পাঠকের স্বভাব আছে যে তাঁহারা চরিত্র চিত্রে কি অভাব কি হীনতা আছে তাহা দেখিবেন না, কথার আড়ম্বরে তাঁহারা ভুলিয়া যান, 'কবিতার হৃদয় দেখেন না, কবিতার শরীর দেখেন। তাঁহারা রাবণের ক্রন্দন অশ্রু আকর্ষণ করিলেই তৃপ্ত হন, কিন্তু রাবণের ক্রন্দন করা উচিত কি না তাহা দেখিতে চান না. এই জন্যই বঙ্গদেশময় মেঘনাদবধের এত সুখ্যাতি। আমরা দেখিতেছি কোন কোন পাঠক ভাবিয়া ভাবিয়া মাথা খুরাইবেন যে, সমালোচক রাবণকে কেন তাহার কাঁদিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহেন? এক জন চিত্রকর একটি কালীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছিল, আমি সেই মূর্ত্তিটি দেখিয়াছিলাম; পাঠকেরা জানেন, পুরাণে কালীর কিরূপ ভীষণ চিত্রই অঙ্কিত আছে, অমাবস্যার অন্ধকার নিশীথে যাঁহার পূজা হয়, আলুলিত কুন্তলে বিকট হাসো যিনি শ্মশান ভূমিতে নৃত্য করেন, নরমুণ্ডমালা যাঁহার ভূষণ, ডাকিনী যোগিনীগণ যাঁহার সঙ্গিনী, এমন কালীর চিত্র আঁকিয়া চিত্রকর তাঁহাকে আপাদ মস্তক স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত করিয়াছে, অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি এই চিত্রটির বড়ই প্রশংসা করিয়াছিলেন, যাঁহারা সংহারশক্তিরূপিণী কালিকার স্বর্ণভূষণে কোন দোষ দেখিতে পান না তাঁহারা রাবণের ক্রন্দনে কি দোষ আছে ভাবিয়া পাইবেন না, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তাঁহাদের জন্য এই সমালোচনা লিখিত হইতেছে না। মূল কথা এই, বঙ্গদেশে এখন এমনি সৃষ্টিছাড়া শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে যে, তাহাতে শিক্ষিতেরা বিজ্ঞান দর্শনের কতকগুলি বুলি এবং ইতিহাসের শাল

ঘটনা ও রাজাদিগের নামাবলী মুখস্থ করিতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের রুচিরও উন্নতি করিতে পারেন নাই বা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতেও শিখেন নাই। বাল্‌মীকির রামায়ণে শোকের সময় রাবণের কিরূপ অবস্থা বর্ণিত আছে, এস্থলে তাহা অনুবাদ করিয়া পাঠকদের গোচরার্থে লিখিলাম, ইহাতে পাঠকেরা দেখিবেন বাল্‌মীকির রাবণ হইতে মেঘনাদবধের রাবণের কত বিভিন্নতা।

অনন্তর হনুমান কর্ত্তৃক অক্ষ নিহত হইলে রাক্ষসাধিপতি মনঃসমাধান পূর্ব্বক শোক সম্বরণ করিয়া ইন্দ্রজিৎকে রণে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন।[১] মনঃসমাধান পূর্ব্বক শোক সম্বরণ করার মধ্যে রাবণের যে মহান ভাব প্রকাশিত হইতেছে, তাহা যদি ইংরাজি-পুথি-সর্ব্বস্ব পাঠকেরা দেখায় কবি বাল্‌মীকি লিখিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে না পারেন, এইজন্য ইংরাজী কবি মিল্‌টন হইতে তাহার আংশিক সাদৃশ্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,

"Thrice he essay'd and thrice, in spite of scorn,
Tears, such as angels weep, burst forth:—"

ধূম্রাক্ষ নিহত হইয়াছেন শুনিয়া রাবণ ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া কৃতাঞ্জলি-বদ্ধ সৈন্যাধ্যক্ষকে কহিলেন, অকম্পনকে সেনাপতি করিয়া শীঘ্র যুদ্ধবিশারদ ঘোরদর্শন দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসগণ যুদ্ধার্থে নির্গত হউক।[২]

অতঃপর ক্রুদ্ধ রাবণ অকম্পন হত হইয়াছেন শুনিয়া কিঞ্চিৎ দীনভাবে [illegible] করিতে লাগিলেন। রাক্ষসপতি [illegible] মন্ত্রীদিগের সহিত চিন্তা করিয়া ক্রোধে উষ্ণ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন।[৩]

অতিকায় নিহত হইলে তাহাদের বচন শুনিয়া শোকবিহ্বল, বন্ধুনাশবিচেতন, আকুল রাবণ কিছুই উত্তর দিলেন না। সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে শোকাভিপ্লুত দেখিয়া কেহই কিছু কহিলেন না; সকলেই চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন।

নিকুম্ভ ও কুম্ভ হত হইয়াছেন শুনিয়া রাবণ ক্রোধে প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় হইলেন।[৪]

সবল ক্ষয় এবং বিরূপাক্ষবধ শ্রবণে রাক্ষসেশ্বর রাবণ দ্বিগুণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন।[৫]

এই সকল বর্ণনায় শোকের অপেক্ষা ক্রোধের ভাব অধিক ব্যক্ত হইয়াছে।

ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে যাইবার নিমিত্ত পাড়াপীড়ি আরম্ভ করিলে রাবণ কহিলেন,

"কুম্ভকর্ণ বলি
ভাই মম, তায় আমি জাগানু অকালে
ভয়ে; হায় দেহ তব দেখ, সিন্ধুতীরে
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু বজ্রাঘাতে"

১ ৪৩ অধ্যায় সুন্দরকাণ্ড।
২ যুদ্ধকাণ্ড ২১ অধ্যায়।
৩ যুদ্ধকাণ্ড ৩১ অধ্যায়।
৪ যুদ্ধকাণ্ড ৫৭ অধ্যায়।
৫ যুদ্ধকাণ্ড ৭৭ অধ্যায়।

বজ্রাঘাতে ভূপতিত গিরিশৃঙ্গসম, এই উদাহরণটি ত বেশ হইল, কিন্তু আবার "কিম্বা তরু" দিয়া কমাইবার কি প্রয়োজন ছিল, যেন কবি গিরিশৃঙ্গেও প্রকাণ্ড ভাব বুঝাইতে না পারিয়া "কিম্বা তরু" দিয়া আরো উচ্চ করিয়াছেন।

"তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে"

প্রভৃতি বলিয়া রাবণ ইন্দ্রজিৎকে সেনাপতিপদে বরণ করিলেন, তখন বন্দীদের একটি গানের পর প্রথম সর্গ শেষ হইল।

সপ্তম সর্গে বর্ণিত আছে, মহাদেব রাবণকে ইন্দ্রজিতের নিধনবার্ত্তা জানাইতে ও রুদ্রতেজে পূর্ণ করিতে বীরভদ্রকে রাবণসমীপে প্রেরণ করিলেন।

চলিলা আকাশপথে বীরভদ্র বলী
ভীমাকৃতি; ব্যোমচর নামিলা চৌদিকে
সভয়ে, সৌন্দর্য্য তেজে হীনতেজা রবি,
সুধাংশু নিরংশু যথা সে রবির তেজে।
ভয়ঙ্করী শূল ছায়া পড়িল ভূতলে।
গম্ভীর নিনাদে নাদি অম্বুরাশিপতি
পূজিলা ভৈরব দূতে। উত্তরিলা রথী
রক্ষঃপুরে; পদচাপে থর থর থরি
কাঁপিল কনকলঙ্কা, বৃক্ষশাখা যথা
পক্ষীন্দ্র গরুড় বৃক্ষে পড়ে উড়ি যবে।

মেঘনাদবধ কাব্যে মহান ভাবোত্তেজক যে তিন চারিটি মাত্র বর্ণনা আছে তন্মধ্যে ইহাও একটি। রাবণের সভায় গিয়া এই "সন্দেশবহ" ইন্দ্রজিতের নিধনবার্ত্তা নিবেদন করিল, অমনি রাবণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; রুদ্রতেজে বীরভদ্র বলী রাবণের মূর্চ্ছাভঙ্গ করিলেন। পরে বীরভদ্র যুদ্ধের বিবরণ বিস্তারিত রূপ বর্ণনা করিয়া কহিলেন,

"প্রফুল্ল হায়রে কিংশুক যেমনি
ভূপতিত, বন মাঝে প্রভঞ্জনবলে
মন্দিরে দেখিনু শূরে।"

বায়ুবলচ্ছিন্ন কিংশুক ফুলটির মত মৃত মহাবীর মেঘনাদ পড়িয়া আছেন, ইহা ত সমুচিত তুলনা হইল না। একটি মৃত বালিকার দেহ দেখিয়া তুমি ঐরূপ বলিতে পারিতে! নহিলে দূতের বাক্য মর্ম্মস্পৃক্ হইয়াছে। পরে দূত উপরি উক্ত কথা গুলি বলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। এইবার রাবণ গর্জ্জিয়া উঠিলেন।

"একনক-পুরে,
ধনুর্দ্ধর আছে যত সাজ শীঘ্রকরি!
চতুরঙ্গে! রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা
এ বিষম জ্বালা যদি পারিবে ভুলিতে!"

পাঠকেরা বলিবেন এই বার ত হইয়াছে; এই বার ত রাবণ প্রতিহিংসাকে শোকের ঔষধি করিয়াছেন, কিন্তু পাঠক হয়ত দেখেন নাই "তেজস্বী আজি মহারুদ্র তেজে" রাবণ স্বভাবতঃ ত এত তেজস্বী নন, তিনি মহা রুদ্রতেজ পাইয়াছেন সেই জন্য আজ উন্মত্ত। কবি বীরবাহুর শোকে রাবণকে স্ত্রী লোকের ন্যায় কাঁদাইয়াছেন, সুতরাং ভাবিলেন যে রাবণের যেরূপ স্বভাব, তিনি তাঁহার প্রিয়তম পুত্র ইন্দ্রজিতের নিধনবার্ত্তা শুনিলে বাঁচিবেন কিরূপে? এই নিমিত্তই রুদ্রতেজাদির কল্পনা করেন। ইহাতেও রাবণ যে স্ত্রীলোক সেই-

স্ত্রীলোকই রহিলেন। এই নিমিত্ত ইহার পর রাবণ যে যে স্থলে তেজস্বিতা দেখাইয়াছেন তাহা তাঁহার স্বভাব-গুণে নহে তাহা দেব-তেজের গুণে।

মেঘনাদ-বধ কাব্যে কবি যে ইচ্ছা পূর্ব্বক রাক্ষস-পতি রাবণকে ক্ষুদ্রতম মনুষ্য করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা নয়। রাবণকে তিনি মহান্ চরিত্রের আদর্শ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে স্ত্রী প্রকৃতির প্রতিমা করিয়া তুলিয়াছেন; তিনি তাহাকে কঠোর হিমাদ্রিসদৃশ করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু-"কোমল সে ফুলসম" করিয়া গড়িয়াছেন। ইহা আমরা অনুমান করিয়া বলিতেছি না, মাইকেল আমাদের কোন সম্ভ্রান্ত বন্ধুকে যে পত্র লিখেন তাহার নিম্নলিখিত অনুবাদটি পাঠ করিয়া দেখুন।

"এখানকার লোকেরা অসন্তোষের সহিত বলিয়া থাকে যে, মেঘনাদ-বধ কাব্যে কবির মনের টান্ রাক্ষসদিগের প্রতি! বাস্তবিক তাহাই বটে। আমি রাম এবং তাঁহার অনুচরদিগকে ঘৃণা করি, কিন্তু রাবণের ভাব মনে করিলে আমার কল্পনা প্রজ্জ্বলিত ও উন্নত হইয়া উঠে। রাবণ লোকটা খুব জম্‌কালো ছিল"।

মেঘনাদ-বধকাব্যে রাবণের চরিত্র যেরূপ চিত্রিত হইয়াছে তাহাই যদি কবির কল্পনার চরম উন্নতি হইয়া থাকে তবে তিনি কাব্যের প্রারম্ভ-ভাগে "মধুকরী কল্পনা দেবীর" যে এত করিয়া আরাধনা করিয়াছিলেন তাহার ফল কি হইল? এই খানে আমরা রাবণকে অবসর দিলাম।

ভ:—

ক্রমশ:

জ্ঞান, নীতি ও ইংরাজি সভ্যতা।

(বকল্ সাহেব-কৃত ইংলণ্ডীয় সভ্যতার ইতিহাস।)

ইংলণ্ডীয় সভ্যতার ইতিহাসে বকল্ সাহেব বলেন যে, ধর্ম্ম-নীতির উপর সভ্যতার উন্নতি তত নির্ভর করে না, জ্ঞানের উন্নতিতেই সভ্যতার প্রকৃত উন্নতি। তিনি স্বকীয় মত সমর্থনার্থ এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, যখন সভ্যতা ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত ও উন্নত হইতেছে তখন তাহার কারণ এরূপ কোন বস্তু হইতে পারে না যাহা পরিবর্ত্তনশীল বা উন্নতিশীল নহে। চারিদিকের আনুসঙ্গিক ঘটনাবলী যদি অপরিবর্ত্তিত ভাবে থাকে

* People here grumble and say that the heart of the poet in 'মেঘনাদ' is with the Rakshasas! And that is the real truth. I despise Ram and his rabble, but the idea of "রাবণ" elevates and kindles my imagination. He was a grand fellow."

তাহা হইলে কোন একটী অচল কারণ হইতে সচল কার্য্য কখনই প্রসূত হইতে পারে না। ধর্ম্মনীতি এইরূপ একটী অচল কারণ, ইহা হইতে সভ্যতারূপ সচল কার্য্য কখনই সমুদ্ভূত হইতে পারে না। অন্যের ভাল করিবে—পরের উপকারের জন্য স্বার্থত্যাগ করিবে—প্রতিবাসীকে আপনার মত ভাল বাসিবে—শত্রুকেও মার্জ্জনা করিবে—ইন্দ্রিয় দমন করিবে—পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে ভক্তি করিবে—এই সমস্ত উপদেশই ধর্ম্মনীতির সার উপকরণ; এই সকল উপদেশ সহস্র সহস্র বৎসর হইতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, তথাপি আর একটী নৈতিক সত্য একাল পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইল না; কিন্তু জ্ঞান সম্বন্ধে সেরূপ বলা যাইতে পারে না। জ্ঞান কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সীমায় আসিয়া বিশ্রাম করে না। উহা চির-উন্নতিশীল। অধুনাতন সভ্যতম ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ধর্ম্ম-নীতি-ঘটিত এরূপ একটী সত্যও জানা নাই যাহা পুরাকালের লোকেরা জানিতেন না; কিন্তু জ্ঞান-সম্বন্ধে এখনকার লোকেরা জ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগে নূতন নূতন সত্য কেবল আবিষ্কৃত করিয়াছেন এমত নহে, চির-প্রচলিত সত্যানুসন্ধানের প্রণালী পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছেন, এবং এরূপ নূতন নূতন বিজ্ঞান শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা পুরাকালীন্ মহা-পণ্ডিতদিগের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। বকল্ সাহেব আরও বলেন যে, নীতি জ্ঞান অপেক্ষা শুদ্ধ যে উন্নতিশীল এমত নহে, উহার ফলও অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। বুদ্ধি-দ্বারা যে সকল সত্য উপার্জ্জিত হয়, তাহা সকল দেশেই যত্নপূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করা হয়, এইজন্য তৎসমুদায় মনুষ্য-জাতির সাধারণ সম্পত্তি হইয়া পড়ে, এবং বংশ-পরম্পরা তাহার ফলভোগেও সমর্থ হয়। কিন্তু আমাদিগের নীতি হইতে যে সকল সৎকার্য্য প্রসূত হয়, তাহার ফল তত দূর-প্রবাহী নহে, বাক্তি বিশেষেই তাহা আবদ্ধ থাকে। বকল্ সাহেব আরও বলেন যে, কোন কোন স্থলে নীতি হইতে মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক্ প্রত্যুত অমঙ্গলেরই উৎপত্তি হয়। কোন একজন অনভিজ্ঞ লোকের যদি উদ্দেশ্য সৎ হয়, এবং যদি সেই উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষমতাও তাহার যথেষ্ট থাকে, তাহা হইলে প্রায়ই তাহা দ্বারা মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলই সংসাধিত হয়। কিন্তু যদি ঐ লোকের আন্তরিক অকৃত্রিম আগ্রহ কোনরূপে কমাইতে পার, তাহার নিস্বার্থ উদ্দেশ্যের সহিত কোন স্বার্থপূর্ণ হীন উদ্দেশ্য মিশাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে তৎ-কর্ত্তৃক যে অমঙ্গল সংসাধিত হয়, অনেক পরিমাণে তাহার লাঘব হইতে পারে। এক জন অনভিজ্ঞ লোক ভাল ভাবিয়া একটা অমঙ্গল কার্য্য করিতে যাইতেছে, তুমি যদি কোনরূপে তাহাকে ভয় দেখাইতে পার, তাহা হইলে হয় তো সে ভীত হইয়া সেই কার্য্য হইতে বিরত হইতে পারে। কিন্তু সে যদি কোন প্রকারে ভীত না হয়, সে যাহা ভাল মনে করিয়াছে যদি তাহা অবাধে সংসাধন করিবার অবসর ও সুবিধা

পায়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা কি অনিষ্ট না ঘটিতে পারে। বকল্ সাহেব বলেন যে, যে সকল রোমক্ সম্রাট্, ধর্ম্মের জন্য খৃষ্টীয়ানদিগের প্রতি নিদারুণ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ভাল লোক ছিলেন; অর্থাৎ তাঁহাদের উদ্দেশ্য সৎ ছিল।

নীতি ও জ্ঞান-সম্বন্ধে বকল্ সাহেবের কি মত, এবং তিনি স্বমত সমর্থনার্থ যে রূপ যুক্তি-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। এক্ষণে আলোচনা করা আবশ্যক এই মতটী কতদূর সঙ্গত। প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছেন যে, নীতিরূপ অচল কারণ হইতে সভ্যতারূপ সচল কার্য্য কখনই প্রসূত হইতে পারে না। নীতি যে অচল, অপরিবর্ত্তনীয়, ও অনুন্নতিশীল তাহার প্রমাণ কি? মানব-ইতিহাস পাঠে বরং ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, জন-সমাজে নৈতিক জ্ঞান ক্রমশই উন্নতি লাভ করিয়া আসিতেছে। এক একটী অসভ্য জাতির ইতিহাস আলোচনা কর, দেখিবে প্রতিহিংসা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি নীচ পশু-প্রবৃত্তি তাহাদের প্রধান কার্য্য-প্রবর্ত্তক। ডভ্ সাহেব টস্মানীয় বন্যজাতির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, "তাহাদিগের কোন প্রকার নীতিজ্ঞান ছিল না"। অষ্ট্রেলীয়গণ সম্বন্ধে আয়ার্ সাহেব বলেন "কোন্‌টি ন্যায় এবং কোন্‌টি বা অন্যায় এরূপ কোন নীতি-বোধ আদৌ না থাকায়, তাহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের এইমাত্র নিয়ম ছিল যে, সংখ্যা ও বলে শ্রেষ্ঠ হইলেই শত্রুদিগকে আক্রমণ করা কর্ত্তব্য, নচেৎ নয়।" বর্টন সাহেব বলেন যে "পূর্ব্ব আফ্রিকায় নীতি-জ্ঞানের অস্তিত্ব মাত্রও নাই। কোন একটি সাংঘাতিক সঙ্কল্প সাধন করিতে না পারিলেই তদ্দেশবাসী মনুষ্যদিগের অনুতাপ উপস্থিত হয়, তদ্ভিন্ন অনুতাপ যে কি পদার্থ তাহারা জানেও না। তাহাদের মধ্যে ডাকাইতি সম্মানের কার্য্য এবং হত্যাকার্য্য যতই নিষ্ঠুররূপে সাধিত হয় ততই প্রশংসনীয় এবং যে ব্যক্তি এইরূপ হত্যা করিতে পারে, সেই প্রকৃত বীরপুরুষ।" এরূপ অনেক উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, বাহুল্য-ভয়ে বিরত হইলাম। অসভ্যদিগের মধ্যে নীতিজ্ঞান যে মূলেই নাই, এবিষয়ে অনেক মতামত উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগের নীতির যে অত্যন্ত হীনাবস্থা তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। অধুনাতন অসভ্যগণের অবস্থা আলোচনা করিয়া আমরা এইরূপ ন্যায্য অনুমানে উপনীত হইতে পারি যে, অধুনাতন সভ্যজাতির পূর্ব্বপুরুষেরা যখন ঘোর অসভ্যতা-অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যেও ধর্ম্মনীতির এইরূপ হীনাবস্থা ছিল। বকল্ সাহেব কি [illegible] যে তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষেরা যৎকালে সর্ব্বাঙ্গে উল্কি পরিয়া দিগম্বর বেশে নৃত্য করিতেন তৎকালে তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মনীতির যে রূপ অবস্থা ছিল, এখনও সেইরূপ আছে, তদপেক্ষা কি কিছুমাত্র উন্নত হয় নাই?

সুপ্রসিদ্ধ সর্‌জন্‌ লেবক্‌ তাঁহার "সভ্যতার উৎপত্তি ও মানবজাতির আদিম অবস্থা" বিষয়ক গ্রন্থে, অনেক আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "জাতিমাত্রেরই সাধারণ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, নৈতিক ভাব ক্রমশঃ গভীরতা প্রাপ্ত হয়।" এই "গভীরতা" শব্দের অর্থ অতি গভীর। কোন অসভ্যতম জাতির মধ্যেও কোন না কোন এরূপ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি জন্মাইতে পারেন, যিনি তৎকালীন কিম্বা তজ্জাতীয় মনুষ্য অপেক্ষা দুই এক পদবী উন্নত এবং যাঁহার মনে দু একটী নৈতিক জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে। মনে কর, তিনি স্বীয় সমাজমধ্যে সেই সকল নূতন সত্য প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার স্বজাতীয়েরা অপেক্ষাকৃত অনেক পশ্চাদ্বর্ত্তী, সুতরাং তাঁহার উপদেশগুলি সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইল না। হয়তো তাহার দৃষ্টান্ত ও উপদেশে তাঁহার সন্তানসন্ততির মধ্যে নৈতিক জ্ঞান কথঞ্চিৎ সঞ্চারিত হইল, ক্রমে এই নৈতিক জ্ঞান তাঁহার পুত্রপৌত্র প্রভৃতি বংশপরম্পরা-ক্রমে প্রবাহিত হইল। ক্রমে এই জ্ঞান গভীরতা প্রাপ্ত হইয়া দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইল—ক্রমে এই বিশ্বাসের আদর্শে তাহাদিগের আচার [illegible] হইয়া জাতি-সাধারণের উন্নতি সাধন করিল। নৈতিক উন্নতির পদ্ধতিই এইরূপ। নীতিজ্ঞানের আবিষ্কার হইলেই হইল না—ঐ জ্ঞান যতক্ষণ না ব্যবহারে পরিণত হয়, ততক্ষণ উহা কোন উপকারে আইসে না। যতক্ষণ নীতি, জ্ঞানের সীমা-মধ্যে অবস্থিতি করে, ততক্ষণ তাহার সার্থকতা নাই—যখনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তখনই তাহার সার্থকতা। বকল্‌ সাহেব বলেন, কতকগুলি নৈতিক উপদেশ একই ভাবে সহস্র সহস্র বৎসর প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, তথাপি কোন নূতন নৈতিক তত্ত্ব এ পর্য্যন্তও আবিষ্কৃত হইল না! সুতরাং নীতির ক্রমোন্নতি হইতেই পারে না। এই যুক্তিটী কতদূর অসঙ্গত বোধ হয় পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। যখন অসভ্যজাতির ইতিহাস পাঠে প্রতিপন্ন হয় যে, নৈতিক জ্ঞান ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়াছে, তখন আমরা এই উনবিংশতি শতাব্দীতে যে নীতিজ্ঞানের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছি তাহার প্রমাণ কি? আরও নূতন নূতন নীতি-তত্ত্ব যে ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হইবে না তাহাই বা কে বলিতে পারে। আর সহস্র বৎসর পরে সভ্যতার কিরূপ উন্নতি হইবে, কল্পনা করিয়া দেখিলে এই উনবিংশতি শতাব্দীর স্পর্দ্ধিত সভ্যতা যে অসভ্যতা বলিয়া প্রতীয়মান হইবে তাহাই বা আশ্চর্য্য কি। ভাল, তর্কের অনুরোধে আপাততঃ স্বীকার করা গেল যে, নীতি-জ্ঞানের যতদূর উন্নতি হইতে পারে তাহা এক্ষণে হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, নীতি যতক্ষণ ব্যবহারে পরিণত না হয়, ততক্ষণ তাহার সার্থকতা নাই। নীতির উন্নতি ও নীতি-জ্ঞানের উন্নতি সমান কথা নহে। একজন ইংরাজ আজন্মকাল বাইবেলের এই উপদেশটী শুনিয়া আসিয়াছেন যে

"যদি কেহ তোমার বাম গণ্ডে চপেটাঘাত করে, তাহা হইলে আর এক চড় খাইবার জন্য দক্ষিণ গণ্ডটী ফিরাইয়া দিবে"—কোন ইংরাজ কি এই উপদেশের দিক্ দিয়াও যান? দক্ষিণ গণ্ড ফিরাইয়া দেওয়া দূরে থাক্, তিনি হয়তো এক চড়ের পরিবর্ত্তে দশ চড় শুধ-শুদ্ধ ফিরাইয়া দেন। সেই জন্য বলি, ইংলণ্ডে নীতি-জ্ঞানের যদিও বা উন্নতি হইয়া থাকে, প্রকৃত নীতির উন্নতি হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে নীতিজ্ঞানরূপ বীজ পতিত হইলে তাহা অঙ্কুরিত হইতে সময় লাগে—যদিও বা অঙ্কুরিত হয়, তাহা বিশ্বাস ও কার্য্যে পরিণত হইয়া সাধারণ সমাজ-মধ্যে বদ্ধমূল হইতে অনেক বিলম্ব হয়। মনুষ্যের মানসিক ভাব সকল পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত ও গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ বিশ্বাস ও কার্য্যে পরিণত হয়।

বকল সাহেব বলেন যে "নীতি অপেক্ষা জ্ঞান কেবল যে উন্নতিশীল এমত নহে, ইহার ফলও অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। বুদ্ধি দ্বারা যে সত্য উপার্জ্জিত হয় তাহা সকল দেশেই যত্ন পূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করা হয় এবং সেই জন্য তৎসমুদায় মনুষ্যজাতির সাধারণ সম্পত্তি হইয়া পড়ে ও বংশপরম্পরা তাহার ফল ভোগেও সমর্থ হয়। কিন্তু আমাদের নীতি হইতে যে সকল সৎকার্য্য প্রসূত হয় তাহা তত দূর-প্রবাহী নহে।" একথাও যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। জ্ঞান অপেক্ষা নীতির ফল কোন অংশেই স্বল্প-স্থায়ী নহে। জ্ঞানের ফল যেরূপ জাজ্বল্যমান দেখিতে পাওয়া যায়, নীতির ফল সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, যেহেতু উহা অলক্ষিত রূপে গূঢ়ভাবে মনুষ্যসমাজে কার্য্য করে। যেরূপ কোন একটি পুস্তক পাঠে জ্ঞান লাভ হয়, সেইরূপ কোন একজন সাধু লোকের দৃষ্টান্তে, শত শত লোকের জীবনে সুনীতি গূঢ়ভাবে সংক্রামিত হইয়া তাহার ফল পুরুষপরম্পরায় প্রবাহিত হয়। বরং পুস্তক-সকল রাষ্ট্র বিপ্লবে ধ্বংস হইয়া জ্ঞানের লোপ হইতে পারে, কিন্তু একটী জাতি একেবারে পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত না হইলে আর তাহাদের আচার-ব্যবহারগত সুনীতি বিলুপ্ত হয় না। আমাদের ভারতবর্ষে অনেক জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ কাল-স্রোতে বিলীন হইয়া গিয়াছে কিন্তু আমাদের কতকগুলি আচার ব্যবহারে যে সকল সুনীতি বদ্ধমূল রহিয়াছে, তাহা বিপ্লবের পর বিপ্লবেও কিছুমাত্র ধ্বংস হয় নাই।

জ্ঞান ও নীতি পরস্পর পরস্পরের উন্নতি সাপেক্ষ, কিন্তু এই উভয়ের সমগ্র উন্নতি ভিন্ন প্রকৃত সভ্যতা কখনই সমুদিত হয় না। স্বতন্ত্রভাবে এই উভয়েরই সাধনা আবশ্যক। একটীর সাধনা করিলে অপরটীর আপনা আপনি উন্নতি হইবে এরূপ মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে। যেমন কোন ব্যক্তি-বিশেষের বুদ্ধি ও হৃদয় উভয়ই সমুন্নত না হইলে কখনই তাহার প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ হয় না—সেইরূপ সমাজ মধ্যে জ্ঞান ও নীতির সমগ্র উন্নতি না হইলে, প্রকৃত সভ্যতার উদয় হয় না। জ্ঞান অর্জ্জনশীল, নীতি রক্ষণশীল। জ্ঞান

P30475

পিতার ন্যায় বাহির হইতে নানা সত্য আহরণ করিয়া সমাজের পুষ্টি সাধন করে, নীতি মাতার ন্যায় স্নেহ প্রেম ভক্তি-বন্ধনে সমস্ত সমাজকে একত্র আবদ্ধ করিয়া রাখে। একটী প্রকৃতি আর একটী পুরুষ। একটী জননী আর একটী জনক। জ্ঞানের গতি স্বাধীনতার দিকে, নীতির গতি সম্মিলনের দিকে। এক জনের কার্য্য আহরণ, আর এক জনের কার্য্য পরিবেশন। জ্ঞানের ফল নীতি দ্বারা পরিশোধিত না হইলে স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও অহঙ্কারে পরিণত হয়, এবং জ্ঞানদ্বারা নীতি নিয়মিত না হইলে নীতির উদ্দেশ্য বিফল হয়, এবং কোন কোন স্থলে দুর্নীতিতে পরিণত হয়। এই জন্য নীতি ও জ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা না করিলে সমাজ মধ্যে প্রভূত অমঙ্গলের উৎপত্তি হয়; এবং সেই জন্য প্রকৃত সভ্যতাও কখন সমুদিত হইতে পারে না। ইংরাজি সভ্যতার মধ্যে নীতি অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাধান্য নিবন্ধন স্বল্প-নীতিক জ্ঞানের যে অবশ্যম্ভাবী ফল স্বার্থ-পরতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও অহঙ্কার তাহা বিলক্ষণরূপে ইংরাজ-সমাজমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইংরাজ-সমাজ সম্বন্ধে এক জন সুপ্রসিদ্ধ ফরাসিস্ গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই প্রস্তাবের উপসংহার-ভাগে উদ্ধৃত করিবার বাসনা রহিল। পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, যাহা এস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা কতদূর সত্য।

অধুনাতন ইংরাজি সভ্যতা জ্ঞান-প্রধান, এবং ভারতবর্ষীয় সভ্যতা নীতি-প্রধান। এই জন্য উভয়ই আংশিক ও অসম্পূর্ণ। ইংরাজ-সমাজ মধ্যে জ্ঞান, নীতি দ্বারা পরিশোধিত না হওয়ায় তাহার ফল যেরূপ স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও অহঙ্কারে পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ অধুনাতন হিন্দু-সমাজে জ্ঞান দ্বারা নীতি নিয়মিত না হওয়ায় নীতির ফল নির্ব্বীর্য্যতা, অলসতা ও দাসত্বে পরিণত হইয়া অনেক স্থলে নীতির উদ্দেশ্য বিফল হইয়া গিয়াছে। "দান করিবেক" ইহা একটী নৈতিক উপদেশ; কিন্তু জ্ঞানের কথা না শুনিয়া অপাত্রে দান-প্রথা অস্মদ্দেশে প্রচলিত থাকায় কত অমঙ্গল হইতেছে, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। আমাদের দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রণালী, স্নেহ প্রেম পারিবারিক ঐক্য প্রভৃতি নীতির উপকরণে গঠিত হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞান দ্বারা নিয়মিত না হওয়াতে তাহা হইতে প্রভূত অশুভ ফল উৎপন্ন হইতেছে। হিন্দু পরিবার-মধ্যে যিনি কর্ত্তা তিনিই পরিশ্রম পূর্ব্বক উপার্জ্জন করিয়া থাকেন এবং তাঁহার সেই পরিশ্রমের ফল ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্র, অধিক কি সুদূর জ্ঞাতি পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া থাকে। এইরূপ জ্ঞান বিরহিত নীতির প্রভাবে আমাদের দেশে দারিদ্র্য, আলস্য ও নিষ্কর্ম্মণ্য প্রশ্রয় পাইতেছে মাত্র; যদি এই নীতির সহিত জ্ঞান সংযুক্ত হইত, এবং এক পরিবারের অন্তর্গত থাকিয়া সকলেই সমান পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকিত, তাহা হইলে পারিবারিক ঐক্য ও শ্রম বিভাগের ফলে পরিবারের ধন, শৃঙ্খলা ও বল বৃদ্ধি পাইয়া সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইত সন্দেহ

নাই। এবং নীতি-বিরহিত জ্ঞানে যে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হইতে পারে তাহা পাঠকেরা চুক্তি-বিবাহ, স্ত্রী-পরিত্যাগ, ও পিতৃমাতৃ-ভক্তির অভাব, পৃথকান্ন-পরিবার-প্রণালী প্রভৃতি ইংলণ্ডের কতক-গুলি সামাজিক কুনীতি ও কুপথার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, জ্ঞান ও নীতির মধ্যে যে পরিমাণে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে, সেই পরিমাণে প্রকৃত সভ্যতার উদয় হইবে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে সময় জ্যোতিষ্, গণিত, রসায়ণ, চিকিৎসা, কাব্য, সাহিত্য, ব্যাকরণ, নীতি প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের প্রভূত অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মনীতির উন্নতি হইয়াছিল, সেই পুরা-কালীন আর্য্যসভ্যতা জ্ঞান ও নীতির সামঞ্জস্য নিবন্ধন প্রকৃত সভ্যতার পথে যে অগ্রসর হইতেছিল তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এবং সেই স্রোত যদি অবাধে চলিয়া আসিত, তাহা হইলে অধুনাতন ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে পৃথিবীর আদর্শ-স্বরূপ হইত তাহা আমাদিগের বিলক্ষণ প্রতীতি হয়। জ্ঞানের হীনতা প্রযুক্ত যেরূপ অস্মদ্দেশীয় অধুনাতন সভ্যতা, সেইরূপ নীতির ন্যূনতা প্রযুক্ত ইংরাজি সভ্যতা অর্দ্ধাঙ্গ হইয়া রহিয়াছে। নীতি-শিক্ষার জন্য আমাদিগকে ইংরাজের দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইবে না। আমাদের দেশে নীতির অভাব নাই। আমরা ইংরাজদিগের নিকট যে রূপ জ্ঞান শিক্ষা করিতে পারি, তাঁহারা আমাদিগের নিকট সেইরূপ নীতি শিক্ষা করিতে পারেন। নৈতিক সভ্যতায় আমরা যে তাঁহাদের অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পণ্ডিত মনিয়ার উইলিয়াম্‌স্ সাহেব একস্থলে তাহা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"দুর্নীতি-পরায়ণ ইতর ইয়ুরোপীয়গণের পাপাচার যতদূর অনিষ্টকর, ভারতবর্ষীয়-দিগের মধ্যে যাহারা নিকৃষ্টতম প্রকৃতির লোক তাহাদিগের পাপকার্য্য ততদূর অনিষ্টকর কিনা সন্দেহস্থল। ভারতবর্ষীয় ভৃত্যেরা বিশ্বাসী, সৎ, এবং প্রভুভক্ত। প্রভুর নিকট হইতে সদ্ব্যবহার প্রাপ্ত হইলে তাহারা ইংরাজ ভৃত্যদিগের অপেক্ষা প্রভুর প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হয়। তাহারা ইয়ুরোপীয়দের অপেক্ষা ইতর প্রাণীর প্রতি অধিক যত্ন প্রদর্শন করে। ইয়ুরোপীয়দের অপেক্ষা তাহারা স্বভাবতঃ শিষ্টাচারী, অধি-কতর মিতাহারী, অধিকতর পিতৃমাতৃভক্ত, এবং উচ্চপদস্থ, বৃদ্ধ, ও বিদ্বান ব্যক্তির প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাবান। আমি একটি জাহাজের কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে তিনি ভারতবর্ষীয় ও ইংরাজদের মধ্যে কোন্ জাতীয় নাবিক পছন্দ করেন; তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন—ভারতবর্ষীয়; কারণ, তাহারা ইংরাজদিগের অপেক্ষা অধিকতর বশ্য, আজ্ঞাবহ; তাহারা ইংরাজ-দের ন্যায় পশুবৎ নিষ্ঠুর ব্যবহার করে না, এবং তাহাদের ন্যায় মাতালও হয় না।"

ফলতঃ, যাহা দ্বারা সমাজের প্রকৃত সুখ বা শুভ বর্দ্ধন এবং প্রকৃত দুঃখ বা অশুভ

নিরাকরণ হয় তাহাই যদি প্রকৃত সভ্যতা শব্দের বাচ্য হয়, তাহা হইলে জ্ঞান ও নীতির সামঞ্জস্য ব্যতীত সে সভ্যতা কখনই পৃথিবীতে সমুদিত হইতে পারে না।

স:—

ক্রমশ:

বঙ্গ সাহিত্য।

(শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি এস প্রণীত বঙ্গ সাহিত্য।)

শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম। এই বিষয়ে যত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে যে রমেশ বাবুর গ্রন্থখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। তিনি বিলাত হইতে প্রতিগমন করিয়া যে বঙ্গীয় সাহিত্যের অনুরাগী হইয়াছেন ইহা অতিশয় আহ্লাদের বিষয়। এই হেতু আমরা রমেশ বাবুর এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

গ্রন্থকার পুস্তকের ভূমিকাতেই কবিতা কাহাকে বলে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। বাস্তবিকই সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে হইলে কবিতার প্রকৃত লক্ষণগুলি হৃদয়পটে জ্বলদক্ষরে অঙ্কিত রাখা উচিত। কেন না, সাহিত্যের আদিম অবস্থাতে মানব-হৃদয় কবিতারূপেই স্ফূর্ত্তি পায়, কবিতাই সাহিত্যের জীবন, কবিতাই সাহিত্যের ভূষণ! কবিতার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্যক্ রূপে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে গেলে, হয় আমরা প্লেটোর মতন কবিমাত্রকেই দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে চাহিব, নয় আমরা এখনকার বঙ্গীয় পাঠকদের মত মুদ্রাঙ্কিত চোদ্দ অক্ষর দেখিলেই ভাবে উন্মত্ত হইয়া উঠিব। সুতরাং গ্রন্থের ভূমিকাতে কবিতার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করা গ্রন্থকারের পক্ষে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে।

তিনি বলেন যে, "যে ছন্দোময়ী রচনা পাঠ করিলে মনে কোন একটি বিশেষ প্রতিমা বিভাসিত হয় বা কতকগুলি ভাব পরম্পরার উদ্রেক হয় এবং সেই প্রতিমা বা ভাব-পরম্পরার অবির্ভাবে হৃদয়ের কোমলতর রস-গুলি উত্তেজিত হয়, সেই রচনাকেই কবিতা বলে।" কিন্তু গ্রন্থকারের এ কথায় আমরা তৃপ্ত হইতে পারিলাম না। তাঁহার এই কথার সমালোচনা করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রেই কোমলতর রস কাহাকে বলে বুঝিতে হইবে। ইহা অবশ্যই সকলে স্বীকার করিবেন যে সমগ্র রসগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়।—কতকগুলি কোমল আর কতকগুলি উগ্র বা কদর্য্য। করুণ বা শান্তি বা ভক্তি বা প্রেম —এ সকলই কোমল—আর বীভৎস বা রৌদ্র বা ভয়ানক ইত্যাদি সকল রসই কদর্য্য

বা উগ্র—সুতরাং ইংরাজি Finer Sensibilities অর্থাৎ কোমলতর রসগুলি বলিতে উপরি উক্ত দুই বিভাগের একটি মাত্র বুঝায়। গ্রন্থকারও যে, একটি বিভাগের উপর লক্ষ্য করিয়াছেন তাহার আর সন্দেহ নাই। কেন না তাহা না হইলে তিনি "finer" বা "কোমলতর" এই তরপ্রত্যয় বিশিষ্ট বিশেষণটি ব্যবহার করিবেন কেন? তিনি আপনিই বলিয়াছেন যে, করুণ ভক্তি প্রেম ইত্যাদি রসই কোমলতর রসের অন্তর্গত। কিন্তু হাস্য-রসটি উপরি উক্ত দুই শ্রেণীর কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত তাহা নির্ণয় করা কিছু সুকঠিন। হাস্য-রসটি তন্ন তন্ন পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিতে গেলে ইহাই প্রতীতি হয় যে, অবস্থা-বিশেষে ইহাতে কোমলতা বা কদর্য্যতার প্রাধান্য থাকে। যাহাই হউক, এ দুরূহ তর্কের মধ্যে আমাদের প্রবেশ করিবার আবশ্যকতা নাই, কেননা গ্রন্থকার স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে, হাস্যরস কবিতার সীমাগত নহে, ইহা হাস্যরস-প্রধান একখানি সাময়িক পত্রে শোভা পাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত কবিতার সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্কই নাই।

এই সকল কারণ বশত আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, কবিতার প্রকৃতি-নিরূপণ বিষয়ে রমেশ বাবুর সহিত আমরা কোন মতেই একমতাবলম্বী হইতে পারি না। আমরা শৈশব হইতে যে প্রতিমাগুলি হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করিয়া আসিতেছি, জগৎশুদ্ধ সকলেই যে প্রতিমাগুলিকে সাদরে পূজা করিতেও আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া আসিতেছে, যে সকল প্রতিমার ধ্যানে আমাদের সুখের সময় সুখের বৃদ্ধি এবং দুঃখের সময় দুঃখের শমতা অনুভব করি, সেই প্রতিমাকে আজ আমরা কেমন করিয়া গ্রন্থকারের কথা অনুসারে অকিঞ্চিৎকর প্রলাপ-সাগরে বিসর্জ্জন করিব? "প্রকৃতির মুখে দর্পণ ধরাই" যদি প্রকৃত কবির কার্য্য হয়, অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগৎ—এ উভয়ই যদি প্রকৃতরূপে কবিতার আয়ত্তাধীন হয়, তাহা হইলে অন্য সকল রস উপেক্ষিত হইয়া কোমলতর রসগুলির যে কিসে প্রাধান্য হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না, গ্রন্থকারও তাহা আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই। মহাকবি সেক্সপিয়ার যে ফল্‌স্টাফ্ সৃজন করিয়া জগজ্জনের সমবেত ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, আরভিং সাহেবের মতে যে ফল্‌স্টাফ্, "মনুষ্যের প্রমোদ-সীমা দীর্ঘ বিস্তৃত করিয়াছে" সেই ফলস্টাফ্‌কে কেন আজ আমরা কবিত্বের একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত না বলিয়া নিরস্ত থাকিব? মালতীমাধবে শ্মশানের বর্ণনা, বেণীসংহারে রাক্ষস রাক্ষসীর কথোপকথন, মিল্‌টনের মৃত্যু ও পাপের কল্পনা, দান্তের নরকবাসী ইউগোলাইনোর বৃত্তান্ত—এ সকল ত তীব্র-বীভৎস রসাত্মক, —কিন্তু কে আজ কোমলতর বৃত্তির অনুরোধে ঐ সকলকে কবিতার সীমা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে সাহসী হইবে? আবার সেক্সপিয়ার ম্যাক্‌বেথে যেখানে সেই কণ্টকময় বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে অন্ধ-

তাকার ডাকিনীত্রয়কে একত্রিত করিয়াছেন, যেখানে তাহারা তাহাদের অধিনায়িকা হেকেটীর সঙ্গে পৈশাচিক মহামন্ত্র সকল সমস্বরে উচ্চারণ করিতে করিতে অগ্নি জ্বালিয়া অদ্ভুত কটাহে অদ্ভুত উপাদান সকল নিক্ষেপ করিয়া অদ্ভুত-ভাবে নৃত্য করিতেছে, যেখানে শেষে উন্মত্তপ্রায় ম্যাক্‌বেথ্ আসিয়া "রে ছদ্মচারিণি অন্ধকারময়ি নিশাচরি ডাকিনিগণ" বলিয়া তাহাদের নৃত্য গীতে ব্যাঘাত দিতে চেষ্টা করিতেছেন, যেখানে সেই জ্বলন্ত কটাহ হইতে অপরূপ মস্তক সকল ক্ষণে ক্ষণে উত্থিত আবার ক্ষণে ক্ষণে অন্তর্হিত হইতেছে, সেখানে আমাদের হৃদয়ের কোন্ কোমলতর রসের উত্তেজনা হয়?—তখন কি বরং ভয়ানক, বিস্ময়, বীভৎস ইত্যাদি কতকগুলি কঠোর অকোমল রস একত্রে মিশ্রিত হইয়া অপ্রতিহত প্রতাপে আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আলোড়িত করিতে থাকে না? কিন্তু কে আজ সাহস করিয়া বলিতে পারে যে ম্যাক্‌বেথের ও-অংশ টুকু কবিতা নামের যোগ্য নয়? প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও মহাকবি একটী বিশেষ রসকেই কবিতার অদ্বিতীয় জীবন জ্ঞান করেন না। সমস্ত প্রকৃতিই তাঁহাদের প্রমোদ-ক্ষেত্র, সকল প্রকার রসই তাঁহাদের অপরিচ্ছন্ন; এমন কি, সেক্‌সপীয়রের দৈব-প্রতিভা তাহাতেও সন্তুষ্ট ছিল না, সে প্রতিভা প্রকৃতির সীমা অতিক্রম করিয়া অলৌকিক কল্পনা-ক্ষেত্রে বিহার করিতেও ত্রুটি করে নাই। ব্যাস, হোমর, দান্তে, মিলটন, ইহাঁরা সকলেই স্বর্গ, মর্ত্ত, নরক, পরিভ্রমণ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই। একেত এই পৃথিবীই ক্ষুদ্র, তাহার মধ্যে আবার কোমলতর রসের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে যদি কবিতাকে সঙ্কুচিত ভাবে আবদ্ধ রাখা যায়, তাহা হইলে কাব্যের আবশ্যকতা কি? কবির গরিমা কোথায়? কল্পনার প্রয়োজন কি? তাহা হইলে কোন্ মহাকাব্যই বা আমরা পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারি? সত্য বটে মহাকবিরা প্রায়ই মহাকাব্যে হাস্যরসের অবতারণা করেন না, কিন্তু তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। কতকগুলি রসের দ্বারা কতকগুলি রসের সামর্থ্য বর্দ্ধিত হয়, এই হেতু মহাকাব্যে নানা প্রকার রসের সন্নিবেশ থাকে। কিন্তু হাস্যরসটি সকল প্রকার গম্ভীর রসের বিঘ্নকারী। পাঠকের হৃদয় রৌদ্ররসেই উত্তেজিত হউক, আর ভয়ানক রসেই আলোড়িত হউক, করুণরসেই দ্রবীভূত হউক বা ভক্তিরসেই পুলকিত হউক, হাস্যরসের প্রকৃত অবতারণাতে হৃদয় এতদূর শিথিল হইয়া পড়ে যে ঐ সকল গভীর রসের উদ্দীপনশক্তি একেবারে ব্যর্থ হয় এবং মহাকাব্যের উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইয়া যায়। শুদ্ধ মহাকাব্য কেন,—কি নাটক, কি খণ্ডকাব্য কি গীতিকাব্য, যে কোন রচনা দ্বারা কবি পাঠক-হৃদয়ের দেব-প্রকৃতি উত্তেজিত করিতে চাহেন সেই রচনাতেই, হাস্যরসের বিশেষ অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মহাকবি সেক্‌সপিয়ার যিনি ফল্‌স্ট্যাফ্ ও ক্যালিব্যানের সৃষ্টিকর্ত্তা, যিনি

"ভ্রান্তি-বিলাসের" রচয়িতা, তিনিই আবার হ্যাম্‌লেট্ বা ম্যাক্‌বেথ্ বা ওথেলো বা লিয়ারে হাস্য-রসের অবতারণা করিতে এতদূর সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন কেন? আর ঐ সকল নাটকে আমরা যতটুকু হাস্যরস পাই—কি পলোনিয়সের মূর্খতা, কি দ্বারবানের বিরক্তিভাব, কি কেশিওর সুরামত্ততা, আর কি পাগ্‌লার বাচালতা, এ সকলই কি ঐ সকল মহানাটকের মুখ্য উদ্দেশ্যর প্রতিপোষক নহে? ঐ সকল কি ছলনাময়ী আলেয়ার আলোকের ন্যায় ভীষণ শ্মশানের ভীষণতা আরও বর্দ্ধিত করে না? কিন্তু হাস্য-রসের ঈষৎ আভাসের দ্বারা মহাকাব্য বা মহানাটকের গম্ভীর উদ্দেশ্য রক্ষা করা সেক্‌সপিয়ারের মত অসাধারণ কবি ব্যতীত আর কাহার সাধায়ত্ত? কেটো বা ভেনিস্ প্রিজর্ভড্ বা ফেয়ার পেনিটেণ্টে হাস্যরসের নাম-গন্ধও নাই কেন? কালিদাস শকুন্তলাতে প্রচলিত রীতির অনুরোধে মাধব্যের অবতারণা করিয়াছেন বটে, কিন্তু শকুন্তলা নাটকের গাম্ভীর্য্য যতই গাঢ়তর হইতে লাগিল ততই মাধব্যের বিদূষকত্ব হ্রাস হইয়া সখ্য ভাব বিকাশ পাইতে লাগিল কেন? এইরূপে বুঝিতে পারা যায় যে মহাকবিরা হাস্যরসটিকে যে, কবিতার অযোগ্য মনে করিতেন তাহা নয়, কিন্তু পাছে রচনা-বিশেষের মুখ্য উদ্দেশ্যের হানি হয়, এই হেতু তাহারা সেই সেই রচনাতে হাস্যরসের পূর্ণ প্রভাব প্রকাশ করিতেন না। সত্যবটে যে ভবভূতি বা মিল্টন প্রভৃতি কতকগুলি মহাকবির মানস-প্রকৃতি গাম্ভীর্য্য-রসে এরূপ পরিপ্লুত ছিল যে, হাস্যরস বিষয়ে তাঁহাদের সম্যক্ উপেক্ষা লক্ষিত হয়, কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের কবিত্বেরও লাঘব হয় নাই, অথবা হাস্যরসেরও অবমাননা হয় নাই। ডিমক্রিটস্ জগতে যাহা দেখিতেন তাহাতেই হাসিতেন, হিরাক্লিটস্ জগতে যাহা দেখিতেন তাহাতেই কাঁদিতেন, কিন্তু জগতের যথার্থ প্রকৃতি বুঝিতে হইলে ডিমক্রিটস্ ও হিরাক্লিটসের সম্মিলিত চক্ষু দিয়া জগতের দৃশ্য সমূহ দর্শন করা উচিত। বাস্তবিকই যখন আমরা দেখিতেছি যে, সমস্ত প্রকৃতিময় হাস্য-রস ও করুণরস অবাধে সর্ব্বত্রই তরঙ্গিত হইতেছে—যখন দেখি প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনসূত্রেই হাস্য ও রোদন ঘোর ঘনিষ্ট ভাবে গ্রথিত রহিয়াছে, তখন একটি রস যে কবিতার সীমাগত আর অন্যটি যে নয় তাহা কি নৈসর্গিক বা অনৈসর্গিক প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে? সত্যবটে যে হাস্যরসের ফলোৎপাদন-শক্তি অতি ক্ষণস্থায়ী, সত্যবটে যে, করুণরসের মত হাস্যরস মানব হৃদয়ের প্রত্যেক শিরায় ও উপশিরায় প্রবাহিত হয় না—সত্যবটে যে এই জগতে দুঃখের ভাগই অধিক, স্থূলতঃ আধ্যাত্মিক দুঃখের তীব্র মূর্ত্তি দ্বারা জগতের প্রকৃত দুঃখ বিষয়ে আমাদিগকে সর্ব্বদা জাগ্রত রাখা মহাকবিদের একটি মহান্ গরিমাস্থল, কিন্তু এই সকল কারণ হেতু যে, হাস্যরস কবিতার মোহিনী সীমার বহির্ভূত তাহা

বিশেষ যুক্তি দ্বারা সপ্রমাণ না হইলে কে তাহা শিরোধার্য্য করিবে?

এখন আমরা গ্রন্থকারের কবিতার লক্ষণ-গত দ্বিতীয় দোষটি প্রদর্শন করিব।—সকলেই বোধ হয় বঙ্কিম বাবুর কৃত করুণ-রস-প্রধান "বিষ-বৃক্ষ" নামক উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিতে করিতে মনে অনেকগুলি ভাবের উদ্রেক হয়, এবং করুণরসে পাঠকের হৃদয় পর্য্যন্ত যেন দ্রব হইয়া অশ্রুরূপে প্রবাহিত হইতে থাকে। কাদম্বরীতে যখন মহাশ্বেতা নিস্তব্ধ নিশীথে পরিচারিকা মাত্র সহায় করিয়া অভিসারিকা-বেশে পুণ্ডরীকের নিকট যাইতেছিলেন তখন বন্ধু-বিয়োগ-বিধুর কপিঞ্জলের করুণ বিলাপ হৃদয়ের প্রত্যেক তন্তুতে প্রবিষ্ট হয় এবং মন একেবারে উদাস হইয়া যায়। কিন্তু রমেশ বাবুর মতে বিষ-বৃক্ষ ও কাদম্বরী এই দুই খানি গ্রন্থ কাব্য নহে, কেন না ইহা ছন্দোবন্ধে নিবদ্ধ নয়। ছন্দোবন্ধে নিবদ্ধ হইলেই এই দুইটি উৎকৃষ্ট কাব্য হইত! আমরা আরো এক পদ অগ্রসর হইব,—প্রাত্যহিক সাপ্তাহিক মাসিক অনেক প্রকার সংবাদ-পত্রে আমরা প্রায়ই মর্ম্মভেদী হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাঠ করিয়া থাকি। অনেকগুলি পড়িতে পড়িতে, আমাদের মনে অনেক প্রকার প্রতিমা বা ভাব পরম্পরা জাগরূক হইয়া উঠে, এবং আমাদের হৃদয়েও কোমলতর রস উচ্ছ্বসিত হয়। সেই সংবাদ গুলি কবিতা নহে, কিন্তু সে গুলি যদি গদ্যরূপে আলুলায়িত না থাকিয়া পয়ারে বা ত্রিপদীতে গ্রথিত থাকিত, তাহা হইলে গ্রন্থকারের মতে সেই সংবাদ গুলিও কবিতা নামের যোগ্য হইত এবং সংবাদ-লেখকেরাও কবির প্রতিপত্তি লাভ করিত!

গ্রন্থকার কবিতার যে লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহার দুইটি মাত্র অঙ্গ। আমরা দেখিলাম সেই দুইটী অঙ্গই ভ্রমাত্মক। আমাদের বোধ হয় গ্রন্থকার কোন কোন ইংরাজ আলঙ্কারিকের প্রলাপ বাক্যে বিমুগ্ধ হইয়া ঘোর প্রমাদে পড়িয়াছেন। তাহাদের কূট তর্কের চাকচিক্যে ও প্রগল্‌ভতার আড়ম্বরে প্রতারিত না হইয়া, যদি সহজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া কবিতার লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে কেহ আর হেজ্‌লিটের মতন কবিতার শত সহস্র লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবে না, কিম্বা ইষ্টুয়ার্ট্ মিলের মতন কবিতার সংজ্ঞা-নিরূপণ অসম্ভব বলিয়া হতাশ হইবে না।

সাহিত্যদর্পণ-কার বলিয়াছেন যে রসাত্মক বাক্যই কাব্য। কিন্তু ইষ্টুয়ার্ট্ মিল কবিতার এরূপ যুক্তিসঙ্গত লক্ষণ গ্রহণ করিবেন না। তিনি বলিবেন যে, তাহা হইলে বক্তার বক্তৃতা ও কবির কবিতা একই পদার্থ। সাহিত্য-দর্পণকার উত্তর করিবেন যে যদি বক্তার বক্তৃতা রসাত্মক হয় তাহা হইলে সেই বক্তৃতাও কাব্য। মিল প্রত্যুত্তর করিবেন যে বক্তৃতাতে আর কবিতাতে এমন একটী হৃদয়গত মর্ম্মগত প্রভেদ আছে যে, সাহিত্য-

দর্পণ-কার নিতান্ত বিকৃতমনা না হইলে সেই প্রভেদটী উপলব্ধি করিতেন।

আগামী বারে আমরা মিল ও অন্যান্য ইংরাজ লেখকের মতের সহিত সাহিত্য দর্পণকারের মতের তুলনা করিয়া দেখিব।

গঞ্জিকা।

অথবা

তুরিতানন্দ বাবাজির আক্‌ড়া।

আমাদের আক্‌ড়ার বাবাজি অতি অমায়িক-স্বভাব—সাক্ষাৎ আশুতোষ। ইহাঁকে যিনি দেখিয়াছেন তিনিই মজিয়াছেন। ইহাঁর আঁখির এমনি একটু ভাব আছে যে, তাহার দৃষ্টি-কৃপায় পড়িলে লোকে কেমন এক প্রকার লাড্ডু বনিয়া যায়। "বাবাজি" এই নামটা শুনিবা মাত্র মনে হয় যে, তুলসী বনের ব্যাঘ্র-বিশেষকে অর্থাৎ কোন একজন ভয়ঙ্কর গোঁড়া বৈষ্ণবকে লক্ষ্য করা হইতেছে। কিন্তু আমাদের এ বাবাজি তেমন বাবাজি নহে। গোঁড়ামি যে কাহাকে বলে তাহা তাঁহার অভিধানে লেখে না। লোককে আনন্দ দিতে পারিলেই তিনি আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন—তা' সে যিনিই হউন্ না কেন—বাঙ্গালিই হউন্, সাহেবই হউন্, খোট্টাই হউন্, মোল্লাই হউন, বিদ্যাভূষণই হউন, আর অবিদ্যাভূষণই হউন, তাহাতে বাবাজির কিছুমাত্র বাছবিচার নাই। বাবাজি সাক্ষাৎ তুরিতানন্দ-অবতার গট্ হইয়া বসিয়া আছেন, যিনি উপস্থিত হইতেছেন তাঁহাকেই তিনি প্রসাদ বিতরণে কৃতার্থ করিতেছেন। কেহ বা হুঁকা এগিয়া ধরিতেছেন, কেহ বা আল্‌বোলা, কেহবা গুড়গুড়ি; আবার দুই এক জন পেণ্ট্‌লুন্ আঁটা টঙ্‌-মেজাজের লোক ও-সকল ধূম-যন্ত্রকে উনবিংশ-শতাব্দীর অযোগ্য বিবেচনায় পাইপ এগিয়া ধরিতেছেন; বাবাজি বিধিমত যত্নসমাদরে সমভাবে সকলকেই প্রসাদ বণ্টন করিতেছেন, কাহাকেও তিনি বঞ্চিত করিতেছেন না। সে প্রসাদ কি? যদি বলি গাঁজা, তবে তাহা শুনিবামাত্র লোকে ছি ছি ছি ছি করিয়া দুই হস্তে কর্ণ আচ্ছাদন করিবে; এ জন্য আক্‌ড়ার সভাপণ্ডিত বাচস্পতি মহাশয় ও-শব্দটার পরিবর্ত্তে গঞ্জিকা শব্দ ব্যবহারের বিধি দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, গঞ্জিকা শব্দ শুনিতে যেমন সুশ্রাব্য, তাহার অর্থও তেমনি হৃদয়-গ্রাহী; যথা, গঞ্জিকা—কিনা পৃথিবীতে যত উত্তম সামগ্রী আছে তাহার গঞ্জনা-স্বরূপা, কিনা গঞ্জিকার মত এমন উত্তম সামগ্রী ত্রিভুবনে নাই।

প্রথম যে দিন আমি আক্‌ড়ায় ভর্ত্তি

হইলাম, সে দিন দেখি যে, তুরিতানন্দ বাবাজি পাত্র মিত্র সমভিব্যাহারে টুপ্‌ভুজঙ্‌ হইয়া বসিয়া আছেন। একটা দ্বিমুখী থেলো হুঁকা তাঁহার হস্তে রাজদণ্ডরূপে শোভা পাইতেছে। টান-পরায়ণ ব্যক্তির উচ্চ নজরে আকড়া একটা সুবিস্তীর্ণ রাজ্য বা সাম্রাজ্য, এমন কি,সসাগরা পৃথিবী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, আর বাবাজি—তাহার রাজা বল, পাদ্‌সা বল, সম্রাট্‌ বল, অথবা দাসানুদাস বল, দীনাধীন বল, তৃণাধীন বল, যাহা বল—সকলই।

রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী বাবাজির দক্ষিণ পার্শ্বে বিরাজমান। ইহাঁর নাম, দিগ্বিজয়ী সর্ব্বজ্ঞান্‌তা।—

সকল শাস্ত্রেই ইহাঁর সমান অধিকার, সমান ব্যুৎপত্তি, সমান পারদর্শিতা। ইনি কেবলমাত্র আপনার এক বক্ষের সাহস-বলে মস্‌জিদের মোল্লাকে এবং টোলের মহামহোপাধ্যায়কে ধর্ম্মোপদেশ করিয়া থাকেন, মুটে মজুর ছুতার মিস্ত্রী তাঁতি কলু চাসা কিঙ্কর দৌবারিক প্রভৃতিকে কর্ম্মোপদেশ করিয়া থাকেন, এবং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতমণ্ডলীকে জ্ঞানোপদেশ করিয়া থাকেন। সর্ব্বজ্ঞান্‌তা মহাশয়ের ন্যায় এমন বিজ্ঞ লোক পৃথিবীতে অদ্যাপি কেহ জন্মেও নাই এবং ভবিষ্যতে কখন যে জন্মিবে তাহার শঙ্কা-মাত্রও নাই।

বাবাজির অপর পার্শ্বে বেয়াল্লিশ কর্ম্মা মহোদয় নামক একজন ভয়ঙ্কর কাজের লোক বসিয়া আছেন। তাঁহার নাক মুখ চোক কান হাত পা একদণ্ড স্থির দেখিলাম না। ইহাঁকে দেওয়ানজি বল, সেরেস্তাদার বল, কর্ম্মাধ্যক্ষ বল, সম্পাদক বল, একাধারে ইনি সকলই। রাজ্যের সমস্ত কার্য্যই ইনি একাকী নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে ইনি ইহাঁর পিতা বিশ্‌কর্ম্মা মহোদয়ের অধীনে কার্য্য করিতেন; এক্ষণে স্বীয় গুণ-গরিমার বেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া তাঁহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া তাঁহার স্থলে স্বয়ং অভিষিক্ত হইয়াছেন।

রাজ্যের যিনি প্রধান সেনাপতি তাঁহার নাম নিধিরাম সর্দ্দার। ইনি বিনা ঢালে বিনা তরবালে লড়াই ফতে করিয়া থাকেন। এমনি এমনি আরো অনেকে সভাস্থ আছেন; যথা,

আপনি মণ্ডল—ইনি গাঁয়ের মধ্যে একজন অতি প্রধান ব্যক্তি, তাহার আর সন্দেহ মাত্র নাই, কেবল দুঃখের বিষয় এই যে, ইহাঁকে গাঁয়ে মানে না; ইহাঁর মান সম্ভ্রম খ্যাতি প্রতিপত্তি সকলই আকড়ার অভ্যন্তরে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে; সেখানে ইনি টানোদ্দীপ্ত গঞ্জিকানলের ন্যায় উচ্চশিরে দীপ্তি পাইয়া থাকেন।

হিজ্‌ হাইনেস্‌ মহারাজাধিরাজ জল্‌ক সিংহ বাহাদুর — ইনি বনগাঁয়ের রাজা; স্বরাজ্যে ইনি সসাগরা পৃথিবীর একাধিপতি বলিয়া বিখ্যাত।

সহস্রমারী সেনগুপ্ত। ইনি প্রথমে কবিরাজ, পরে চিকিৎসক, পরে হাকিম, পরে ডাক্তার, এই চারি উপাধি পর পর আত্মসাৎ করিয়াছেন; কোথা হইতে

যে, তিনি ঐ উপাধি-গুলি সাথ করিলেন, তাহা দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। একজন চিকিৎসার্থী ব্যক্তি দুর্ভাগা ক্রমে তাঁহাকে কবিরাজ মহাশয় বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল—এই তাঁহার ক্রোধ দেখে কে! তিনি ক্রোধে কম্পমান হইয়া বলিলেন "কি-ই-ই! আমাকে কবিরাজ বল! তুমি জান না যে, আমাতে ডাক্তারের ড হাকিমের হ চিকিৎসকের চ এবং কবিরাজের ক, একাধারে বিদ্যমান! আমাকে ড-হ-চ-ক-রাজ না বলিয়া ফের যদি কবিরাজ বলিবে বা কাহাকেও বলিতে দিবে, তবে তোমার আমি মুখ দর্শন করিব না!"

আত্মারাম সরকার। ইনি এমনি একজন তুখোড় লোক যে, ইহাঁর হাড়ে ভেল্‌কি হয়। আপনার যাহাতে আরাম হয়, ইনি কেবল তাহারি দাঁও অন্বেষণ করিয়া ফিরেন। ইহাঁর একটু সময়ও বার্থে যায় না। সকলের চক্ষে ধূলা দিয়া কিরূপে আপনার অভীষ্ট সাধন করিবেন, এই চেষ্টাতেই ইনি দিন যাপন করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় এই যে লোকে অল্পবুদ্ধি হেতু যত না প্যাঁচে পড়ে, ইনি অতিবুদ্ধি হেতু তাহা অপেক্ষা শত গুণ অধিক প্রবঞ্চিত, প্রতারিত, অপদস্থ, অপমানিত হ'ন; অথচ গঞ্জিকার এমনি মোহিনী শক্তি যে, লোককে ঠকাইতে হইবে এ গো কোন ক্রমেই ছাড়েন না।

রসিকনাগর চূড়ামণি ইনি বিলাসীর মধ্যে অগ্রগণ্য। কাপড়, আতর, অঙ্গুরীয়ক, ঘড়ির চেন, পান তামাক, খাদ্যপানীয়, মহলন্দ, গদি, তাকিয়া, বয়সা, নৃত্য গীত বাদ্য, রসালাপ, বেশ-বিন্যাস, এ সকলের মর্য্যাদা, মর্ম্মরস, নিগূঢ় তত্ত্ব ইনি এত জানেন যে ইহাঁর একটি জুড়ি মিলা ভার। ইনি যে গঞ্জিকা ব্যবহার করেন তাহার ধূম-সৌরভেই দিক্‌বিদিক্ আমোদিত হইতে থাকে।

ইঙ্গচরণ বঙ্গোপাধ্যায়; ইনি ইয়ংবেঙ্গলের অবতার। কখন কখন লোকে ইহাঁকে সাহেবান্ত করিয়া থাকে—যথা বং সাহেব; ঐরূপ সাহেবান্ত শুনিলে ইনি এমনি ভাবে-গদগদ হ'ন যে, এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই বুঁদ্ অবস্থাপন্ন হইয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে থাকেন।

সেকালচরণ বাচস্পতি, ইহাঁর মুখে সে কালের প্রশংসা ভিন্ন আর কোন কথা নাই—ইনি আকড়ার সভা-পণ্ডিত। ইনি প্রবীণ ভাবে চলেন, প্রবীণ ভাবে কথা কহেন, প্রবীণ ভাবে ব্যবস্থা দেন, প্রবীণ ভাবে নস্য সেবন করেন, ইনি যাহা বলেন তাহা সকল সিদ্ধান্তের সার সিদ্ধান্ত; যাহারা তাঁহার কথায় প্রতিবাদ করে তাহারা অতি অর্ব্বাচীন, অপগণ্ড বালক, তাহারদের কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। কিন্তু প্রবীণ বলিয়া ইনি যে, অরসিক, তাহা নহে; রসিক-নাগর-চূড়ামণি উপ্‌রে উপরেই রসিক, ইনি তলে তলে রসিক, ইনি রস-প্রবীণ। এইরূপ আরো অনেক বড় বড় লোক সভাস্থ।

এই রাজসভাতে সে দিন মহা এক তর্ক উপস্থিত—তাহার বৃত্তান্ত এই;—

সেকালচরণ বাচস্পতি মহাশয় যিনি সভা-পণ্ডিত, তিনি, কোথা হইতে এক বহুকালের প্রাচীন পুঁথি অন্বেষণ করিয়া পাইয়াছেন, সেই উপলক্ষে এইরূপ বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন;—"এই পুঁথিখানি যাহা আপনারা আমার হস্তে দেখিতেছেন, ইহা আমি অনেক ধূমব্যয় এবং শ্রম স্বীকারে বাহির করিয়াছি। পোকায় কাটিয়া ইহাকে এমনি সংক্ষিপ্ত করিয়াছে যে ইহার সংক্ষিপ্ত সার লিখিতে আর কাহাকেও কষ্ট পাইতে হইবে না। এক প্রকার ভালই হইয়াছে। কেননা ইহার যে যে স্থলে প্রয়োজনীয় কথা গুলি লিখিত আছে, সেখানকার একটি বর্ণও পোকায় ছোঁয় নাই; পোকাদের যতকিছু বল-বিক্রম সকলই নিষ্প্রয়োজনীয় অংশেতেই ক্ষপিত হইয়া গিয়াছে। এই পুস্তকের নাম ধূম রহস্য। ইহা বহুপ্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। সে ভাষা অতি সরল ভাষা; এজন্য তাহার অর্থগ্রহ করিবার জন্য টীকা অথবা ভাষা প্রয়োজন করে না। এই গ্রন্থে সকল ধূম অপেক্ষা গঞ্জিকা-ধূম শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে; যথা; প্রতি অধ্যায়ের উনপঞ্চাশৎ শ্লোকে এইরূপ লিখিত আছে,

অনুষ্টুপ ছন্দ

ইষ্টিমে ইষ্ট মে নাহি গঞ্জিকা-ধূম উত্তমঃ।
একদ্বিত্রিচতুষ্টানে কে রাজা কে অকিঞ্চনঃ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইষ্টীম-কলের ধোঁয়াতে যদিও অনেক প্রকার প্রয়োজনীয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে তথাপি (গ্রন্থকার বলিতেছেন) আমার তাহাতে কোন ইষ্ট নাই, কেন? না যেহেতু গঞ্জিকা-ধূম তাহা অপেক্ষা উত্তম কিনা শ্রেষ্ঠ। কিসে তার শ্রেষ্ঠত্ব? না যেহেতু এক দুই তিন চারি টানেই কে যে রাজা আর কে যে অকিঞ্চন সাধকের সে বোধ থাকে না। এ বিষয়ে কাহারো যদি কোন মত-ভেদ থাকে তবে তিনি তাহা ব্যক্ত করুন"। বংসাহেব রাগিয়া টঙ্ হইয়া পাইপ্ সেবনানন্তর বলিলেন "সভা মহাশয়গণ, ইষ্টীম গাড়ির ল্যাণ্ঠান্ যার জ্বলন্ত চক্ষু, ইষ্টীম গাড়ির চোঙ্ যার ধূমন্ত চুরট্, ইষ্টীম গাড়ির চাকা যা'র ঘুরন্ত পা, এ সেই উনবিংশ শতাব্দী; এই জীবন্ত হাঁপন্ত শতাব্দীর উপর দাঁড়াইয়া আপনি ইষ্টীমের অপযশ ঘোষণা করিতেছেন—একি ভাল কাজ? এই পৃথিবী যদিও রসাতলে যায় (পৃথিবীকে বেগে এক পদাঘাত এবং আকাশকে প্রকম্পিত ঘুষা প্রদর্শন) তথাপি আমি বলিতে ছাড়িব না যে, দেশের যত কিছু উন্নতি হইয়াছে, হইবে, এবং হইতে পারে, সমস্তেরই মূলাধার কেবল এক ইষ্টীম, তদ্ভিন্ন আর যাহা কিছু সকলি উন্নতি-পথের কণ্টক, তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটন করাই কর্ত্তব্য; তবে, গঞ্জিকা যে পরম উৎকৃষ্ট পদার্থ, এ বিষয় এ সভায় কে অস্বীকার করিবেন?" এই বলিয়া তিনি চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া সহসা উপবিষ্ট হইলেন। বাচস্পতি মহাশয় গঞ্জিকা-মিশ্রিত একটু নস্য লইলেন এবং সুবিবেচনা পূর্ব্বক বলিলেন "ঊনবিংশ-শতাব্দী না জানি কেডা! গোড়াতেই এক ত দীর্ঘ-ঊ ল্যাজ গুটাইয়া

আছে উঃ। আবার ওই ও-মুড়ায় এক দীর্ঘ-ঈকার নিশান খাড়া করিয়া আছে ঈস্! ইহাতে আমার বোধ হয় এই যে, ঐ ল্যাজটাতে ভর করিয়া আর ঐ নিশানটা আকাশে উড়াইয়া শতাব্দী-জন্তুটা সুদীর্ঘ একটা লাফ মারিবে তাহার উদ্যোগ করিতেছে। শতাব্দী উনবিংশ বই নয় কিন্তু উহার বেগ উনপঞ্চাশকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে! সে যাহা হউক্ আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি; উনবিংশ শতাব্দী যিনি হউন না কেন তাঁহার পিতামহ প্রপিতামহ তস্য প্রপিতামহের আমলে নল নামে এক জন রাজা ছিলেন কি না? তাঁহার রথ রেল-গাড়ি অপেক্ষা শতসহস্র গুণ অধিক বেগে চলিত কি না? এখন তুমি হাঁ বলিয়াই নিশ্চিন্ত, কিন্তু প্রকৃত কথাটা শুনিলে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিবে। সে নল রাজাও নহে, পাদ্‌সাও নহে, সে নল গল্পিকার হুঁকার নল! বৃত্তান্তটা কি তবে শোনা হউক;—এই ধূমরহস্য গ্রন্থে নলোপাখ্যান নামে স্বতন্ত্র একটা অধ্যায় আছে; তাহাতে এইরূপ লিখিয়াছেন যে, মান্ধাতার আমলের কোন রাজা শনির নিকট হইতে উপদেশ পাইয়া রথ এবং গল্পিকা উভয়ই এক সঙ্গে চালাইতেন। তাঁহার হস্ত অশ্ব-চালনেই ব্যস্ত—সুতরাং হুঁকা-ধারণে অসমর্থ; একটা ত উপায় করা চাই—এজন্য তিনি রথমধ্যে বৃহৎ এক ধূমযন্ত্র স্থাপন পূর্ব্বক নলযোগে গল্পিকা টানিতেন; ইহারই জন্য তিনি নলরাজা নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন; আর তাঁহার ভার্য্যা যিনি, তিনি দম্ মারণ বিষয়ে তাঁহাকে সর্ব্বথা শাসন করিতেন বলিয়া দময়ন্তী নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। গল্পিকা-ধূম-যন্ত্র নলরাজার রথের ইঞ্জীন এঞ্জিন; তা'র প্রবল-প্রতাপে সে রথ এমনি দ্রুতবেগে চলিত যে, রেল্‌গাড়ি তাহার কাছে তৃতীয় শ্রেণীর ছক্‌ গাড়ি বলিয়াও গণ্য হইতে পারে না। উনবিংশ-শতাব্দীর যিনি প্রধান বাহন তাঁহারই যখন এই দুর্দ্দশা, তখন অন্যে পরে কা কথা। অতএব আমি গল্পিকা বিষয়ে ইতি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহা অকাট্য।

যেহেতু এমন সজ্জন-সমারোহ অতি দুর্লভ, আপনারা যদি অনুমতি করেন তবে ধূমরহস্য গ্রন্থে গল্পিকার গুণ-বর্ণনা, এবং গল্পিকার একটা ভেদ-জ্ঞাপক তালিকা যাহা লিপিবদ্ধ আছে তাহার বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়া আপনাদিগকে শুনাই।" সকলে উহাতেই সম্মত হইলেন। অতঃপর বাচস্পতি মহাশয় পুঁথি উদ্ঘাটন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"গল্পিকার কত গুণ তাহা শ্রবণ কর; যিনি গর্ব্বে স্ফীত হইয়া ফণা ধরেন, গল্পিকা তাঁহার ঈশের মূল; যিনি কাজকর্ম্মে ক্লান্ত হইয়া আরাম ইচ্ছা করেন গল্পিকা তাঁহার তাকিয়া বালিশ; যিনি চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, গল্পিকা তাঁহার অঞ্জন-শলাকা; যিনি হাস্য-রস চা'ন গল্পিকা তাঁহার কামধেনু; যিনি অল্প আয়াসে অধিক মূল্যের উপদেশ চা'ন, গল্পিকা তাঁহার কল্পতরু! যদি জিজ্ঞাসা কর যে গল্পিকা কয় প্রকার তবে তাহার উত্তর এই যে, উনপঞ্চাশ প্রকার; কিন্তু

কাল-মাহাত্ম্যে তাহার অধিকাংশই লোপ পাইয়াছে, যে গুলি অবশিষ্ট আছে সে গুলি এবং তন্মধ্যে কাহার কি গুণ, উভয়ই নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

বিলাতরঞ্জন গঞ্জিকা—

ইহার ধূমপান করিলে ইংরাজি অথবা ইঙ্গবঙ্গী বুলি, সময়-সংক্ষেপ-রকমের চাল্ চোল্; ব্যক্তিবিশেষকে চমক্ লাগাইয়া ঘড়ি-ঘড়ি ঘড়ি উদ্ঘাটন; ধূমায়মান চুরট্ কামড়াইয়া ধরিয়া এবং মধ্যে মধ্যে তর্জ্জনী ও মধ্যমা এই দুই অঙ্গুলির যোগে তাহাকে মুখ হইতে নাবাইয়া, ইংরাজি ঢঙের কথোপ-কথন দ্বারা লোক জনকে চকিতের মধ্যে আপ্যায়িত করা; এক কথায় এই যে, ধামাধরা এবং ঘড়িধরা চলা বলা খাওয়া পরা বসা দাঁড়ানো হাঁসা কাশা, এই সকল অনর্গল বাহির হইতে থাকে।

ভারতরঞ্জন গঞ্জিকা—

পান করিলে লোকের মুখে যেরূপ অসামান্য বল-বিক্রম তেজ করিয়া উঠে, তদুপলক্ষে আমার টোলের একটি রত্ন এইরূপ একপংক্তি কবিতা রচিয়াছেন।

"হাতে নাই কোন কার্য্য, মুখে ভারত আর্য্য,
বড়ই অনিবার্য্য, এ-সব লোক।
ভয়ঙ্কর হাঁক ডাক, শুনিয়া লাগে তাক্
মুখে না সরে বাক্, দেখিলে রোখ্॥
ডাগর ডাগর বুলি, বেরোয় ফুলি ফুলি;
বায়ুর গোলাগুলি, সে নহে মন্দ।
বড় জয় গরজয়, আনন্দ উপজয়;
জয় তোমারি জয়, তুরিতানন্দ॥"

রাজরঞ্জন গঞ্জিকা—

পান করিলে হা রাজা যো রাজা, যা' করেন রাজা, দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা, রাজ-পদবী পাইলেই সসাগরা পৃথিবীর রাজত্ব লাভ হয়, এই প্রকার বুলি মুখে অনর্গল বাহির হইতে থাকে। যাঁহারা ছি-এ-ছাই (C S I) অথবা অন্য কোন প্রকার রাজ মহাপ্রসাদের কাঙ্গালি, তাঁহাদের পক্ষে এ গঞ্জিকা মহোপকারী।

সভারঞ্জন গঞ্জিকা—

পান করিলে সভা-ভিন্ন আর উন্নতি-সাধনের উপায় নাই; অধিকাংশের মতই বেদবাক্য; বিধবা-বিবাহ, বাল্য-বিবাহ, বহুবিবাহ, জাতি-ভেদ, স্ত্রীর স্বাধীনতা, এই কতকগুলি বাঁধিগতের মালা জপিলেই দেশের উন্নতি সাধন হয়; এই প্রকার ভাব অন্তরে আবির্ভূত হয়; এবং ধাঁদা লাগাইয়া আঁধা করিয়া বাঁধা খদ্দের জুটাইবার চাঁদা পুস্তক বাহিরে আবির্ভূত হয়।

বিলাসরঞ্জন গঞ্জিকা—

পান করিলে ফিন্-ফিনে ধুতি, ফুর ফুরে উড়ানি, সোনার বোতাম-ওয়ালা রকম-সই পিরাহেণ, ফুল্-মোজা, এসেন্স্-চোবানো সুচারু রুমাল, ঘড়ির চেন ঝল্‌মলায়মান, চিকন-চাকন যষ্টি, বুকে চাদরের চাপরাস বাঁধিয়া খোলা ফেটিন গাড়িতে টের্‌চা ভাবে উপবেশন, ইত্যাদি বেশভূষা, ভাবভঙ্গী; এবং মুখে মধুগন্ধ, গুণ্ গুণ্ গুণ্ টপ্পার আভাস, নট-নাগরি ছন্দের কথাবার্ত্তা হাস্য-পরিহাস ইঙ্গিত-ইসারা, ইত্যাদি বিবিধ হাবভাবের আবির্ভাব হয়।

মনোরঞ্জন গঞ্জিকা।—যিনি পান করেন তিনি সর্ব্বদাই মনোরথে ভর করিয়া আকাশে উড়িতেছেন, কাহারো সাধ্য নাই যে তাহাকে মাটিতে নাবায়। তিনি যদি কবি হ'ন তবে সামান্য একটা পুষ্করিণীকে অপ্সর-কিন্নর-সেবিত মানস-সরোবর মনে করেন; সামান্য একটা উদ্যানকে কুসুম-সৌরভে আমোদিত, শাল-তাল-তমাল হিন্তাল-শোভিত, মহা এক অরণ্য-প্রদেশ মনে করেন। আপনাকে কাব্যের নায়ক বোধে মনে করেন যেন সেই বনে পথ হারাইয়াছেন—হায় কি হইবে! কোন আশ্রম-পালিতা পরমাসুন্দরী রমণী তাঁহাকে পথ বলিয়া দিবেন, শুদ্ধ-কেবল এই আশাতে ভর করিয়া অমন গহন অরণ্যে একাকী পরিভ্রমণ করিতেছেন। যদি বীর পুরুষ হ'ন তবে ঘোড়ায় চড়িয়াছেন কি আর তৎক্ষণাৎ আপনাকে হয় সেকেন্দর সা, নয় নেপোলিয়ন বোনাপার্ট মনে করিয়া ছেন—এ রোগ কিছুতেই যাইবার নহে। যদি ধর্ম্ম-সংস্কারক হ'ন তবে আপনাকে দ্বিতীয় নিতাই চৈতন্য বা নানক বা যীশু-খ্রীষ্ট মনে না করিয়া কোন মতেই ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। যদি বিলাসী হ'ন তবে আপনাকে রূপে কন্দর্প, গুণে কন্দর্প দর্পহারী মনে করিয়া সর্ব্বদাই সানন্দে থাকেন। যদি রসকস-বিহীন কঠোর বিষয়ী হ'ন তবে আর সকলকে নস্যাৎ করিয়া আপনাকে ভারি একজন কাজের লোক মনে করেন। যদি গ্রামের এক জন বর্দ্ধিষ্ণু লোক হন, তবে এবাড়ি ওবাড়ি ফিরিয়া সকল তাতেই কর্ত্তাগিরি করেন, কিছুতেই রোধ মানেন না। মনোরঞ্জন গঞ্জিকার এত ডালপালা যে তাহা আর না—বর্ণনা-তরণী একটানা কথা-স্রোতে ভাসিয়া যাইবে অতএব এইখানেই নোঙর নিক্ষেপ করা যাউক।

ভিখারিণী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কাশ্মীরের দিগন্তব্যাপী, জলদস্পর্শী শৈল-মালার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর গুলি আঁধার আঁধার ঝোপ্ ঝাপের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। এখানে সেখানে শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষচ্ছায়ার মধ্য দিয়া একটি দুইটি শীর্ণকায়, চঞ্চল, ক্রীড়াশীল নির্ঝর গ্রাম্য কুটীরের চরণ সিক্ত করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলগুলির উপর দ্রুত পদক্ষেপ করিয়া এবং বৃক্ষচ্যুত ফুল ও পত্র গুলিকে তরঙ্গে তরঙ্গে উলট্‌পালট্ করিয়া নিকটস্থ সরোবরে লুটাইয়া পড়িতেছে। দূর-ব্যাপী, নিস্তরঙ্গ সরসী, লাজুক উষার রক্তরাগে, সূর্য্যের হেমময় কিরণে, সন্ধ্যার স্তর-বিন্যস্ত মেঘ-মালার প্রতিবিম্বে, পূর্ণিমার বিগলিত জ্যোৎস্না-ধারায় বিভাসিত হইয়া শৈল-লক্ষ্মীর বিমল দর্পণের ন্যায় সমস্ত দিনরাত্রি হাসা করিতেছে। ঘন-বৃক্ষ-বেষ্টিত

অন্ধকার গ্রামটি শৈলমালার বিজন ক্রোড়ে আঁধারের অবগুণ্ঠন পরিয়া পৃথিবীর কোলাহল হইতে একাকী লুকাইয়া আছে! দূরে দূরে হরিৎ শস্যময় ক্ষেত্রে গাভী চরিতেছে, গ্রাম্য বালিকারা সুধসী হইতে জল তুলিতেছে, গ্রামের আঁধার কুঞ্জে বসিয়া অরণ্যের ম্রিয়মাণ কবি বউ-কথাকও মর্ম্মের বিষণ্ণ গান গাহিতেছে। সমস্ত গ্রামটি যেন একটি কবির স্বপ্ন।

এই গ্রামে দুইটি বালক বালিকার বড়ই প্রণয় ছিল। দুইটিতে হাত ধরাধরি করিয়া গ্রাম্যশ্রীর ক্রোড়ে খেলিয়া বেড়াইত, বকুলের কুঞ্জে কুঞ্জে দুইটি অঞ্চল ভরিয়া ফুল তুলিত, শুকতারা আকাশে ডুবিতে না ডুবিতে, উষার জলদ-মালা লোহিত না হইতে হইতেই সরসীর বক্ষে তরঙ্গ তুলিয়া ছিন্ন কমল দুটির ন্যায় পাশাপাশি সাঁতার দিয়া বেড়াইত। নীরব মধ্যাহ্নে স্নিগ্ধ তরুচ্ছায়-শৈলের সর্ব্বোচ্চ শিখরে বসিয়া ষোড়শ বর্ষীয় অমরসিংহ ধীর মৃদুল স্বরে রামায়ণ পাঠ করিত, দুর্দ্দান্ত রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ পাঠ করিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিত, দশম বর্ষীয়া কমলদেবী তাহার মুখের পানে স্থির হরিণ-নেত্র তুলিয়া নীরবে শুনিত, অশোক বনে সীতার বিলাপ-কাহিনী শুনিয়া পক্ষ্ম-রেখা-অশ্রুসলিলে সিক্ত করিত। ক্রমে গগনের বিশাল প্রাঙ্গণে তারকার দীপ জ্বলিলে, সন্ধ্যার অন্ধকার-অঞ্চলে জোনাকি ফুটিয়া উঠিলে, দুইটিতে হাত ধরাধরি করিয়া কুটীরে ফিরিয়া আসিত। কমলদেবী বড় অভিমানিনী ছিল, কেহ তাহাকে কিছু বলিলে সে অমরসিংহের বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিত, অমর তাহাকে সান্ত্বনা দিলে, তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া দিলে, আদর করিয়া তাহার অশ্রুসিক্ত কপোল চুম্বন করিলে, বালিকার সকল যন্ত্রণা নিভিয়া যাইত; পৃথিবীর মধ্যে তাহার আর কেহই ছিল না, কেবল একটি বিধবা মাতা ছিল, আর স্নেহময় অমরসিংহ ছিল, তাহারাই বালিকাটীর অভিমান, সান্ত্বনা ও ক্রীড়ার স্থল।

বালিকার পিতা গ্রামের মধ্যে সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন; রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বলিয়া সকলেই তাঁহাকে মান্য করিত। সম্পদের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া, এবং সম্ভ্রমের সুদূর চন্দ্রলোকে অবস্থান করিয়া কমল গ্রামের বালিকাদের সহিত কখনো মিশে নাই, বাল্যকাল হইতে তাহার সাধের সঙ্গী অমরসিংহের সহিত খেলিয়া বেড়াইত। অমরসিংহ সেনাপতি অজিতসিংহের পুত্র, অর্থ নাই কিন্তু উচ্চবংশজাত, এই নিমিত্ত কমল ও অমরের বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে। একবার মোহনলাল নামে একজন ধনীর পুত্রের সহিত কমলের বিবাহের প্রস্তাব হয় কিন্তু কমলের পিতা তাহার চরিত্র ভাল নয় জানিয়া তাহাতে সম্মত হন নাই।

কমলের পিতার মৃত্যু হইল, ক্রমে তাঁহার বিষয় সম্পত্তি ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া গেল, ক্রমে তাঁহার প্রস্তর-নির্ম্মিত অট্টালিকাটি আস্তে আস্তে ভাঙ্গিয়া গেল, ক্রমে তাঁহার পারিবারিক সম্ভ্রম অল্পে অল্পে বিনষ্ট হইল এবং ক্রমে তাঁহার রাশি রাশি বন্ধু একে একে সরিয়া পড়িল। অনাথা

বিধবা জীর্ণ অট্টালিকা ত্যাগ করিয়া একটি ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিলেন। সম্পদের সুখময় স্বর্গ হইতে দারুণ দারিদ্র্যে নিপতিত হইয়া বিধবা অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। সম্ভ্রম রক্ষা করিবার উপায় দূরে থাক্ জীবন রক্ষারও কোন সম্বল নাই, আদরিণী কন্যাটি কি করিয়া দারিদ্র্য-দুঃখ সহ্য করিবে? স্নেহময়ী মাতা ভিক্ষা করিয়াও কমলকে কোন মতে দারিদ্র্যের রৌদ্র ভোগ করিতে দেন নাই।

অমরের সহিত কমলের শীঘ্রই বিবাহ হইবে, বিবাহের আর দুই এক সপ্তাহ অবশিষ্ট আছে, অমর গ্রামের পথে বেড়াইতে বেড়াইতে কমলকে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের কত কি সুখের কাহিনী শুনাইত; বড় হইলে দুইজনে ঐ শৈল-শিখরে কত খেলা খেলিবে, ঐ সরসীর জলে কত সাঁতার দিবে, ঐ বকুলের কুঞ্জে কত ফুল তুলিবে, চুপি চুপি গম্ভীর-ভাবে তাহারি পরামর্শ করিত। বালিকা অমরের মুখে তাহাদের ভবিষ্যৎ ক্রীড়ার গল্প শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বিহ্বল নেত্রে অমরের মুখের পানে চাহিয়া থাকিত। এইরূপে যখন এই দুইটি বালক বালিকা কল্পনার অস্ফুট জ্যোৎস্নাময় স্বর্গে খেলা করিতেছিল তখন রাজধানী হইতে সংবাদ আসিল যে রাজ্যের সীমায় যুদ্ধ বাধিয়াছে। সেনানায়ক অজিতসিংহ যুদ্ধে যাইবেন এবং যুদ্ধশিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার পুত্র অমরসিংহকেও সঙ্গে লইবেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে, শৈল-শিখরের বৃক্ষচ্ছায়ায় অমর ও কমল দাঁড়াইয়া আছে। অমরসিংহ কহিতেছেন "কমল! আমিত চলিলাম, এখন রামায়ণ শুনিবি কার কাছে?" বালিকা ছল ছল নেত্রে মুখের পানে চাহিয়া রহিল। "দেখ্ কমল, এই অস্তমান সূর্য্য আবার কাল উঠিবে কিন্তু তোর কুটীর-দ্বারে আমি আর আঘাত দিতে যাইব না, তবে বল্ দেখি আর কাহার সহিত খেলা করিবি?" কমল কিছুই কহিল না, নীরবে চাহিয়া রহিল। অমর কহিল—"সখি! যদি তোর অমর যুদ্ধক্ষেত্রে মরিয়া যায়, তাহা হইলে"—কমল ক্ষুদ্র বাহু দুটিতে অমরের বক্ষ জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কহিল "আমি যে তোমাকে ভাল বাসি অমর, তুমি মরিবে কেন?" অশ্রুসলিলে বালকের নেত্র ভরিয়া গেল, তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া কহিল "কমল, আয়, অন্ধকার হইয়া আসিতেছে, আজ এই শেষ বার তোকে কুটীরে পৌঁছাইয়া দিই।" দুইজনে হাত-ধরাধরি করিয়া কুটীরের অভিমুখে চলিল। গ্রামের বালিকারা জল তুলিয়া গান গাইতে গাইতে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছে, বনশ্রেণীর মধ্যে অলক্ষিত ভাবে একটির পর আর একটি পাপিয়া গাহিয়া গাহিয়া সারা হইতেছে, আকাশময় তারকা ফুটিয়া উঠিল। অমর কেন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে এই অভিমানে কমল কুটীরে গিয়া মাতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অমর অশ্রুসলিলে শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিল।

অমর পিতার সহিত সেই রাত্রেই গ্রাম

ত্যাগ করিয়া চলিল, গ্রামের শেষ প্রান্তের শৈলশিখরোপরি উঠিয়া একবার ফিরিয়া চাহিল, দেখিল, শৈলগ্রাম জ্যোৎস্নালোকে ঘুমাইতেছে, চঞ্চল নির্ঝরিণী নাচিতেছে, ঘুমন্ত গ্রামের সকল কোলাহল স্তব্ধ, মাঝে মাঝে দুই একটি রাখালের গানের অস্ফুট স্বর গ্রামশৈলের শিখরে গিয়া মিশিতেছে! অমর দেখিল, কমলদেবীর লতাপাতা-বেষ্টিত ক্ষুদ্র কুটীরটি অস্ফুট জ্যোৎস্নায় ঘুমাইতেছে, ভাবিল ঐ কুটীরে হয়ত এতক্ষণে শূন্য হৃদয়া মর্ম্ম-পীড়িতা বালিকাটি উপধানে ক্ষুদ্র মুখখানি লুকাইয়া নিদ্রাশূন্য নেত্রে আমার জন্য কাঁদিতেছে। অধরের নেত্র অশ্রুতে পূরিয়া গেল। অজিতসিংহ কহিলেন "রাজপুতবালক! যুদ্ধযাত্রার সময় কাঁদিতেছিস্!" অমর অশ্রু মুছিয়া ফেলিল।

শীতকাল। দিবা অবসান হইয়া আসিতেছে, গাঢ় অন্ধকারময় মেঘরাশি উপত্যকা, শৈলশিখর, কুটীর, বন, নির্ঝর, হ্রদ, শস্যক্ষেত্র একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, অবিশ্রান্ত বরফ পড়িতেছে, তরল তুষারে সমস্ত শৈল আচ্ছন্ন হইয়াছে, পত্রহীন শীর্ণ বৃক্ষ সকল শ্বেত মস্তকে স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায়মান; দারুণ তীব্র শীতে হিমালয় গিরিও যেন অবসন্ন হইয়া গিয়াছে, এই শীত-সন্ধ্যার বিষণ্ণ অন্ধকারের মধ্য দিয়া, গাঢ় বাষ্পময় স্তম্ভিত মেঘরাশি ভেদ করিয়া একটি ম্লান-মুখশ্রী ছিন্নবসনা দরিদ্র-বালিকা অশ্রুময় নেত্রে শৈলের পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে, তুষারে পদতল প্রস্তরের ন্যায় অসাড় হইয়া গিয়াছে, শীতে সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে, মুখ নীলবর্ণ, পার্শ্ব দিয়া দুই একটি নীরব পান্থ চলিয়া যাইতেছে, হতভাগিনী কমল করুণ নেত্রে এক এক বার তাহাদের মুখের দিকে চাহিতেছে, কি বলিতে গিয়া বলিতেছে না, আবার অশ্রু-সলিলে অঞ্চল সিক্ত করিয়া তুষার-স্তরে পদচিহ্ন অঙ্কিত করিতেছে। কুটীরে রুগ্না মাতা অনাহারে শয্যাগত, সমস্ত দিন বালিকা এক-মুষ্টিও আহার করিতে পায় নাই, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে, সাহস করিয়া ভীতিবিহ্বলা বালা কাহারো কাছে ভিক্ষা চাহিতে পারে নাই, বালিকা কখন ভিক্ষা করে নাই, কি করিয়া ভিক্ষা করিতে হয় জানে না, কাহাকে কি বলিতে হয় জানে না; আলুলিত কুন্তল রাশির মধ্যে সেই ক্ষুদ্র করুণ মুখ-খানি দেখিলে, দারুণ শীতে কম্পমান তাহার সেই ক্ষুদ্র দেহ-খানি দেখিলে পাষাণও বিগলিত হইত। ক্রমে অন্ধকার ঘনীভূত হইল, নিরাশ বালিকা ভগ্ন হৃদয়ে শূন্য অঞ্চলে কুটীরে ফিরিয়া যাইতেছে; কিন্তু অসাড় পা আর উঠে না, অনাহারে দুর্ব্বল, পথশ্রমে ক্লান্ত, নিরাশায় ম্রিয়মাণ, শীতে অবসন্ন বালিকা আর চলিতে পারে না, অবশ হইয়া পথ-প্রান্তে তুষার-শয্যায় শুইয়া পড়িল, শরীর ক্রমে আরো অবসন্ন হইতে লাগিল, বালিকা বুঝিল ক্রমে সে অবসন্ন হইয়া তুষারে চাপা পড়িয়া মরিবে; মাকে স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, যোড় হস্তে কহিল "মা ভগবতি, আমাকে মারিয়া

ফেলিও না, আমাকে রক্ষা কর, আমি মরিলে যে আমার মা কাঁদিবে, আমার অমর কাঁদিবে!" ক্রমে বালিকা অচেতন হইয়া পড়িল, কমল আলুলিত কুন্তলে, শিথিল অঞ্চলে তুষারে অর্দ্ধমগ্না হইয়া বৃক্ষচ্যুত মলিন ফুলটির মত পথ-প্রান্তে পড়িয়া রহিল। তুষারের উপর তুষার পড়িতে লাগিল, বালিকার বক্ষের উপর তুষারের কণা পড়িতেছে ও গলিতেছে, এবং ক্রমে জমিয়া যাইতেছে। এই আঁধার রাত্রিতে এক জন পান্থও পথ দিয়া যাইতেছে না। বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, রাত্রি বাড়িতে লাগিল, বরফ জমিতে লাগিল, বালিকা একাকিনী শৈল-পথে পড়িয়া রহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কমলের মাতা ভগ্ন কুটীরে রোগ শয্যায় শয়ান, জীর্ণ গৃহ ভেদ করিয়া শীতের বাতাস তীব্রবেগে গৃহে প্রবেশ করিতেছে। বিধবা তৃণশয্যায় শুইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছেন; গৃহ অন্ধকার, প্রদীপ জ্বালিবার লোক নাই, কমল প্রাতে ভিক্ষা করিতে গিয়াছে এখনো ফিরিয়া আসে নাই, ব্যাকুল বিধবা প্রত্যেক পদ-শব্দে কমল আসিতেছে বলিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন। কমলকে খুঁজিবার জন্য বিধবা কতবার উঠিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু পারেন নাই, কত কি আশঙ্কায় আকুল হইয়া মাতা দেবতার নিকট কাতর ক্রন্দনে প্রার্থনা করিয়াছেন, অশ্রুজলে কতবার কহিয়াছেন "আমি হতভাগিনী, আমার মরণ হইল না কেন? কখনো ভিক্ষা করিতে জানে না যে বালিকা, তাহাকেও আজ অনাথার মত দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইতে হইল? ক্ষুদ্র-বালিকা অধিক দূর চলিতে পারে না, সে এই অন্ধকারে, তুষারে, বৃষ্টিতে কি করিয়া বাঁচিবে?" উঠিতে পারেন না অথচ কমলকে দেখিতে পাইতেছেন না, বিধবা বক্ষে করাঘাত করিয়া অধীর ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। দুই এক জন প্রতিবাসী, বিধবাকে দেখিতে আসিয়াছিল, বিধবা তাহাদের চরণ জড়াইয়া ধরিয়া সজল নয়নে কাতর ভাবে মিনতি করিলেন, "আমার পথ-হারা কমল কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এক বার তাহাকে খুঁজিতে যাও!" তাহারা কহিল, "এই তুষারে, অন্ধকারে আমরা ঘরের বাহিরে যাইতে পারি না।" বিধবা কাঁদিয়া কহিলেন, "এক বার যাও, আমি অনাথ দরিদ্র, অর্থ নাই, তোমাদের কি দিব বল। ক্ষুদ্র বালিকা, সে পথ চিনে না, সে আজ সমস্ত দিন কিছু খায় নাই, তাহাকে মাতার ক্রোড়ে আনিয়া দেও, ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করিবেন!" কেহ শুনিল না, সে বৃষ্টিবজ্রে কে বাহির হইবে? সকলেই নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেল। ক্রমে রাত্রি বাড়িতে লাগিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুর্ব্বল বিধবা ক্লান্ত হইয়া গিয়াছেন, নির্জ্জীব ভাবে শয্যায় পড়িয়া আছেন, এমন সময়ে বাহিরে পদশব্দ শুনা গেল, বিধবা চকিত নেত্রে দ্বারের দিকে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে কহিলেন "কমল, মা, আইলি?" এক জন বাহির হইতে রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "ঘরে কে আছে?"

গৃহ হইতে কমলের মাতা উত্তর দিলেন। সে শাখাদীপ* হস্তে গৃহে প্রবেশ করিল, এবং কমলের মাতাকে কি কহিল, শুনিবা মাত্র বিধবা চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এদিকে তুষার-ক্লিষ্ট কমল ক্রমে ক্রমে চেতন লাভ করিল, চক্ষু মেলিয়া চাহিল, দেখিল, একটি প্রকাণ্ড গুহা, ইতস্ততঃ বৃহৎ শিলাখণ্ড বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, গাঢ় ধূম্র মেঘে গুহা পূর্ণ; সেই মেঘের অন্ধকার ভেদ করিয়া শাখাদীপের আলোক-দীপ্ত কতক গুলি কঠোর অশ্রুপূর্ণ মুখ কমলের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। প্রাচীরে কুঠার, কৃপাণ, প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র লম্বিত আছে, কতক গুলি সামান্য গার্হস্থ্য উপকরণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। বালিকা সভয়ে চক্ষু নিমীলিত করিল। আবার চক্ষু মেলিয়া চাহিল, একজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "কে তুমি?" বালিকা উত্তর দিতে পারিল না, বালিকার বাহু ধরিয়া সবেগে নাড়াইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল "কে তুই?" কমল ভীতি-কম্পিত মৃদুস্বরে কহিল "আমি কমল!" সে মনে করিয়াছিল এই উত্তরেই তাহারা তাহার সমস্ত পরিচয় পাইবে। একজন জিজ্ঞাসা করিল 'আজ সন্ধ্যার দুর্য্যোগের সময় পথে ভ্রমণ করিতেছিলে কেন?" বালিকা আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া উঠিল, অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল "আজ আমার মা সমস্ত দিন আহার করিতে পান নাই"—সকলে হাসিয়া উঠিল, তাহাদের নিষ্ঠুর অট্টহাসে গুহা প্রতিধ্বনিত হইল, বালিকার মুখের কথা মুখে রহিয়া গেল, কমল সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিল, দস্যুদের হাসা বজ্র-ধ্বনির ন্যায় বালিকার বক্ষে গিয়া বাজিল, সে সভয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল "আমাকে আমার মায়ের কাছে লইয়া যাও!" আবার সকলে মিলিয়া হাসিয়া উঠিল। ক্রমে তাহারা কমলের নিকট হইতে তাহার বাস স্থান, পিতামাতার নাম প্রভৃতি জানিয়া লইল, অবশেষে একজন কহিল, "আমরা দস্যু, তুই আমাদের বন্দিনী, তোর মাতার নিকট বলিয়া পাঠাইতেছি সে যদি নির্দ্ধারিত অর্থ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না দেয় তবে তোকে মারিয়া ফেলিব।" কমল কাঁদিয়া কহিল "আমার মা অর্থ কোথায় পাইবেন? তিনি অতি দরিদ্র; তাঁহার আর কেহ নাই; আমাকে মারিও না, আমাকে মারিও না, আমি কাহারো কিছু করি নাই।,, আবার সকলে হাসিয়া উঠিল। কমলের মাতার নিকটে একজন দূত প্রেরিত হইল। সে গিয়া কহিল, "তোমার কন্যা বন্দিনী হইয়াছে, আজ হইতে তৃতীয় দিবসে আমি আসিব, যদি পাঁচশত মুদ্রা দিতে পার তবে মুক্ত করিয়া দিব, নচেৎ তোমার কন্যা নিশ্চিত হত হইবে।" এই সংবাদ শুনিয়াই কমলের মাতা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

দরিদ্র বিধবা অর্থ পাইবেন কোথায়?

* পার্ব্বত্য লোক চীড় বৃক্ষের শাখা জ্বালাইয়া মশালের ন্যায় ব্যবহার করে।

একে একে সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন, বিবাহ হইলে কমলকে দিবেন বলিয়া কতকগুলি অলঙ্কার রাখিয়া দিয়াছিলেন, সেগুলি বিক্রয় করিলেন, তথাপি নির্দ্দিষ্ট অর্থের চতুর্থাংশও হইল না। আর কিছুই নাই, অবশেষে বক্ষের বস্ত্র মোচন করিলেন, সেখানে তাঁহার মৃত স্বামীর একটি অঙ্গুরীয়ক রাখিয়া দিয়াছিলেন; মনে করিয়াছিলেন, সুখ হউক্, দুঃখ হউক্, দারিদ্র্যই বা হউক্, কখন সেটি ত্যাগ করিবেন না, চিরকাল বক্ষের মধ্যে লুকাইয়া রাখিবেন, মনে করিয়াছিলেন, এই অঙ্গুরীয়কটি তাঁহার চিতানলের সঙ্গী হইবে, কিন্তু অশ্রুময়-নেত্রে তাহাও বাহির করিলেন, সে অঙ্গুরীটিও যখন তিনি বিক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার বুকের এক এক খানি অস্থিও ভাঙ্গিয়া দিতে পারিতেন,কিন্তু কেহই কিনিতে চাহিল না। অবশেষে বিধবা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এক দিন গেল, দুই দিন গেল, তিন দিন যায়, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট অর্থের অর্দ্ধেকও সংগৃহীত হয় নাই। আজ সেই দস্যু আসিবে, আজ যদি তাহার হস্তে অর্থ দিতে না পারেন তবে বিধবার সংসারের যে একমাত্র বন্ধন আছে তাহাও ছিন্ন হইবে। কিন্তু অর্থ পাইলেন না, ভিক্ষা করিলেন, দ্বারে দ্বারে রোদন করিলেন, সম্পদের সময় যাহারা তাঁহার স্বামীর সামান্য অনুচর ছিল, তাহাদের নিকটও অঞ্চল পাতিলেন কিন্তু নির্দ্দিষ্ট অর্থের অর্দ্ধেকও সংগৃহীত হইল না।

ভয়বিহ্বলা কমল গুহার কারাগারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইল। সে ভাবিতেছে তাহার অমরসিংহ থাকিলে কোন দুর্ঘটনা ঘটিত না, অমরসিংহ যদিও বালক কিন্তু সে জানিত অমরসিংহ সকলই করিতে পারে। দস্যুরা তাহাকে মাঝে মাঝে ভয় দেখাইয়া যায়, দস্যুদের দেখিলেই সে ভয়ে অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া ফেলিত; এই অন্ধকার কারা-গৃহে, এই নিষ্ঠুর দস্যুদিগের মধ্যে একজন যুবা ছিল। সে কমলের প্রতি তেমন কর্কশ ভাবে ব্যবহার করিত না, সে ব্যাকুল বালিকাকে স্নেহের সহিত কত কি কথা জিজ্ঞাসা করিত, কিন্তু কমল ভয়ে কোন কথারই উত্তর দিত না, দস্যু কাছে সরিয়া বসিলে সে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যাইত। ঐ যুবাটি দস্যু-পতির পুত্র, সে একবার কমলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, দস্যুর সহিত বিবাহ করিতে কি তাহার কোন আপত্তি আছে? এবং মাঝে মাঝে প্রলোভন দেখাইত যে, যদি কমল তাহাকে বিবাহ করে তবে সে তাহাকে মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা করিবে। কিন্তু ভীরু কমল কোন কথারই উত্তর দিত না। এক দিন গেল ও দুই দিন গেল, বালিকা সভয়ে দেখিল দস্যুরা মদ্যপান করিয়া ছুরিকা শানাইতেছে।

এদিকে বিধবার গৃহে দস্যুদের দূত প্রবেশ করিল, বিধবাকে জিজ্ঞাসা করিল অর্থ কোথায়? বিধবা ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন,সকলি দস্যুর পদতলে রাখিয়া কহিলেন "আমার আর কিছুই নাই, যাহা কিছু ছিল সকলি দিলাম, এখন তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাহিতেছি

আমার কমলকে আনিয়া দেও।" দস্যু সে মুদ্রাগুলি সক্রোধে ছড়াইয়া ফেলিয়া কহিল, "মিথ্যা প্রতারণা করিয়া পার পাইবি না, নির্দ্দিষ্ট অর্থ না দিলে নিশ্চয় আজি তোর কন্যা হত হইবে, তবে চলিলাম, আমাদের দলপতিকে বলিয়া আসি যে নির্দ্দিষ্ট অর্থ পাইবে না, তবে এখন নর-শোণিতে মহাকালীর পূজা দেও।" বিধবা কত মিনতি করিলেন, কত কাঁদিলেন, কিছুতেই দস্যুর পাষাণ-হৃদয় গলাইতে পারিলেন না। দস্যু গমনোদ্যত হইলে কহিলেন "যাইও না, আর একটু অপেক্ষা কর, আমি আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।" এই বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

স্বাস্থ্য।

উপক্রমণিকা।

জন্মিলে মরিতে হয়, ইহা একটি চির-প্রসিদ্ধ কথা। তথাপি আমরা মৃত্যুর নাম শুনিবামাত্র ভীত হই। ইহার কারণ কি? অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ইহার কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথম, মৃত্যুর পর কাহার অবস্থা কি হইবে কেহ কিছুই জানে না। দ্বিতীয়, সংসারের সমস্ত প্রিয় বস্তু হইতে এক কালে বিচ্ছিন্ন হওয়া। তৃতীয়, মৃত্যু-যন্ত্রণা। চতুর্থ, ভোগ-সুখের ইচ্ছা সত্ত্বেও অকাল-মৃত্যু। এই সকল কারণের মধ্যে শেষোক্ত দুইটির জন্যই অধিকাংশ লোক ভীত ও কাতর হইয়া থাকেন। বস্তুত পৃথিবীতে যদি অকাল-মৃত্যু ও উহার আনুসঙ্গিক যন্ত্রণা না থাকিত তাহা হইলে অনেকে সুখে মরিতে পারিত।

মনুষ্য জন্ম-কালে যেরূপ অচেতনাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়, মৃত্যুকালেও সেই রূপ অচেতন ভাবে মরিবে এইটি প্রকৃতির উদ্দেশ্য ও অমোঘ নিয়ম। জন্মকালে মনুষ্য প্রসব-দ্বারে যেরূপ নিষ্পেষিত হইয়া থাকে তাহা দেখিলে ইহা কাহার না মনে হয় যে, যদি তৎকালে চৈতন্য থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্যের যন্ত্রণার অবধি থাকিত না। কিন্তু প্রকৃতি দেবীর এমনই অনুগ্রহ যে এরূপ বিষম সঙ্কটে পতিত হইয়াও মনুষ্যের কিছু মাত্র যন্ত্রণা অনুভূত হয় না। প্রত্যুত সন্তান সুষুপ্তের ন্যায় অবলীলাক্রমে ভূমিষ্ঠ হয়। এস্থলে প্রকৃতি স্বয়ং ধাত্রীর ভার গ্রহণ করেন, সুতরাং মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছার কোন সংশ্রব না থাকায় সম্যক্ প্রকারে স্বভাবেরই নিয়ম প্রতিপালিত হয়।

প্রকৃতির নিয়মানুসারে চলিলে মৃত্যুও এই রূপ যন্ত্রণাশূন্য হইত। বস্তুত জীবিত কাল পূর্ণ হইলে প্রকৃতি দেবী স্বয়ং আমাদিগের সহায়তা করেন, এই নিমিত্ত আমরা নিদ্রাভিভূতের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হই।

এই যন্ত্রণাশূন্য ব্যাপার, এই মোহ-সঙ্কুল বিলয়দশা, এই অনিত্য জীবনের স্বাভাবিক অবসানকেই পণ্ডিতেরা প্রকৃত

স্বচ্ছন্দ-মৃত্যু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যাহাতে মানবগণ সুখ স্বচ্ছন্দে জীবিত কাল অতিবাহিত করিয়া সুস্থ শরীরে পূর্ব্বোক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে তাহার উপায় বিধান করাই চিকিৎসা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। মনুষ্য মাত্রেরই এই রূপ মৃত্যুলাভে অধিকার আছে। কিন্তু যে সকল স্বাভাবিক নিয়ম প্রতিপালন করিলে ঈদৃশ মৃত্যুলাভ হয়, তাহা সকলে জানেন না। এই স্বচ্ছন্দ মৃত্যু আমাদের শারীরিক সুস্থতার চরম ফল, ইহা আমাদের অব্যাহত জীবনের একমাত্র পরিচয়-স্থল।

প্রকৃতি-নিয়মিত এই সর্ব্বলোক-হিতকর মৃত্যুলাভের উপায় কি, তাহা সুচিকিৎসকের নিকট জানিতে পারিলে এবং আপামর সাধারণ সকলেই তদনুসারে চলিলে জগতে মৃত্যুনিবন্ধন ভয়, বা দুঃখ যন্ত্রণা কিছুই থাকিবে না। তখন শ্রান্তিহর নিদ্রার ন্যায় মৃত্যু আমাদের নিকট উপস্থিত হইবে।

অতঃপর অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন যে আমাদের এরূপ আশা কখন ফলবতী হইবে কি না? সংসারে এরূপ সুখের মৃত্যু কোথায়? এতদুত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, সংসারে এরূপ মৃত্যু নিতান্ত বিরল বা দুর্ল্লভ নহে। আমাদের মধ্যে ইহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন যে, প্রকৃতি দেবী সমস্ত বিঘ্ন বিপত্তি নিরাকৃত করিয়া সময়ে সময়ে স্নেহবতী জননীর ন্যায় অতি সন্তর্পণে আমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে ইহলোক হইতে অপসারিত করেন। আর যদি আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা তাঁহার অভিপ্রায়ানুরূপ হয়, তাহা হইলে যত দিন সম্ভব তত দিন আমরা সংসারে থাকিয়া ঐশ্বর্য্য ও সুখ ভোগ করিতে পারি। অবশেষে এক একটী ইন্দ্রিয় সুখ হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া এরূপ অতর্কিত ভাবে মৃত্যুর ক্রোড়ে বিন্যস্ত করেন যে আমরা তাহার কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি না।

স্বচ্ছন্দ মৃত্যুর ঈদৃশ পূর্ব্ব-নিদর্শন অনেকেই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কতবার আমাদের চক্ষের উপরে এরূপ সুখের মৃত্যু ঘটিয়াছে। কেমন সেই মুমূর্ষু ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি সকল মৃত্যুর পূর্ব্বে ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে, অথচ তজ্জন্য উহার মনে শোক দুঃখের সঞ্চার হয় না। তৎকালে মনের দুরাকাঙ্ক্ষা-সকল নিরস্ত হওয়াতে মনুষ্যেরা কিরূপ বিশ্রাম লাভার্থ ব্যগ্র হয়, কর্ত্তব্যজ্ঞানও ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতে থাকে। নিঃস্বপ্ন নিদ্রাই তখন জীবনের একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া অনুমান হয়। "আমায় স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে দেও, আমি চিন্তাশ্রান্ত হইয়াছি, আর ভাবিতে পারি না" কেবল এই কথা গুলি তাহার মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপে মনুষ্য চরম কালে শ্রান্তিহর কোমল নিদ্রার ক্রোড়ে শয়ান থাকিয়া সমস্ত সময় অতিবাহিত করে। দিন দিন তাহার জাগ্রতাবস্থা ক্ষণস্থায়ী হইতে থাকে। আর যখন জাগিয়া উঠে, তখনও সংসারের ভাবনা চিন্তা বা দুঃখ তাহার মনে স্থান পায় না। পৃথিবীর কোলাহল, ক্রীড়াসক্ত বালকের আমোদ

প্রমোদ, বন্ধু বান্ধব বা স্ত্রী পুত্রের অনুকূল বাক্য, সামান্য বিষয়ের উপর কথোপকথন-চেষ্টা, এবং পূর্ব্বকালের স্মৃতি, সকলই তখন স্বপ্নবৎ সুখপ্রদ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সেও ক্ষণকাল মাত্র। কারণ, উহার পরক্ষণেই পুনরায় সেই সর্ব্বজয়ী নিদ্রা আসিয়া তাঁহার চেতনা হরণ করে। এই রূপে কিছুদিন গত হইলে, পরিশেষে তাহার মনোবৃত্তি সকল এককালে অসাড় ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, সুতরাং উত্তেজনা-অভাবে শরীরের অপরাপর ইন্দ্রিয়-কার্য্যও বন্ধ হয়। ইহাকেই প্রকৃতি-নিয়মিত মৃত্যু কহে। যখন মানবমণ্ডলী ইহার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে, যখন এমন সময় উপস্থিত হইবে, যে অকাল মৃত্যুর নাম পর্য্যন্তও আর শুনা যাইবে না, তখন এই যে মৃত্যু যাহা স্মরণ-মাত্র লোকের হৃদয়শোণিত শুষ্ক হয়, তাহাও যথাকালে উপস্থিত হওয়াতে, ভবিষ্যতে তজ্জন্য কাহারও মনে আর ভয় বা যন্ত্রণার উদয় হইবে না।

পৃথিবীতে এইরূপে যথাসময়ে সুখের মৃত্যু ঘটিলে, মরণ-কালে কাহাকেও আর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। এমন কি যাহারা অন্যের মরণোত্তর জীবিত থাকিবে, তাহারাও মনুষ্যের মৃত্যু হইল বলিয়া আর দুঃখিত হইবে না। স্বাভাবিক নিয়মের প্রবল ব্যতিক্রম দেখিলেই আমরা বিস্মিত হই বা রোদন করি। পুরাকালীন গ্রীস দেশীয় পণ্ডিতেরা অধিক দিন পর্য্যন্ত কাহাকে শোকাকুল থাকিতে দেখিলে উহা রোগ বলিয়া ধরিতেন এবং বিষাদের আতিশয্যকে উন্মত্ততা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন।

সম্পাদকের বৈঠক।

আফ্রিকা দেশের শৃঙ্গী মনুষ্য।—ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েসনের এক অধিবেশনে কাপ্তেন হে সাহেবের লিখিত একটি প্রস্তাব পঠিত হয়। তিনি বলেন পশ্চিম আফ্রিকার অ্যাকেম প্রদেশের অধিবাসী পুরুষদিগের হনুদেশ বর্দ্ধিত হইয়া নাসিকার উভয় পার্শ্বে শৃঙ্গাকারে সমুত্থিত হয়। এক হিসাবে ইহাদিগকে হনুমান মনুষ্য বলা যাইতে পারে।

মানব জাতির পূর্ব্বপুরুষ।—অধ্যাপক হেকেল সাহেব তাঁহার "সৃষ্টির ইতিহাস" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, যে জাতীয় বানর হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি সে জাতীয় বানর পৃথিবীতে বিলুপ্ত হইয়াছে। হক্‌স্‌লি সাহেবের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, বানরের ন্যায় মনুষ্যেরাও যে চারি হস্ত-বিশিষ্ট জন্তু তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ চীন দেশীয় নাবিকগণ,

আফ্রিকার নিগ্রোগণ এবং বাঙ্গালার মজুরেরা কোন উচ্চ স্থানে আরোহণ করিবার সময় বানরের ন্যায় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রমাণটি চমৎকার হইয়াছে! হেকেল সাহেব বলেন যে, যে জাতীয় বানর হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি তাহার লোপ হইয়াছে। আমরা বলি সে জাতীয় বানর এখনও বর্ত্তমান আছে। হেকেল সাহেবের ন্যায় আমরাও একটি অকাট্য প্রমাণ দিতে পারি। জাহাজী গোরারা লালবাজারে উঠিয়াই এক ছড়া কলা ও এক যোড়া বানর ক্রয় করে। ইহাতে তাহাদের নাড়ির টান বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। একজন ইংরাজ কবিও বলেন Fellow feeling makes us wondrous kind.

একটী চতুর বৃদ্ধ বানর।—এক জন ফরাসী পত্রলেখক লেমড্ নামক পত্রিকায় এই কৌতুকাবহ ঘটনাটী বর্ণনা করিয়াছেন। ট্রান্স্ ভাল রেপব্লিক প্রদেশে কাফি-ক্ষেত্রে বানরের বড় উৎপাৎ। কাফি-বৃক্ষের মধ্যে এক প্রকার ঝোপ্ জন্মায়, ওঁড়ি ঘেঁসিয়া তাহার ফল বাহির হয়—এক জাতীয় বোল্তা এই ঝোপ-গাছে চাক্ করিয়াছিল। ঐ ফলের উপর বানরদিগের বড় লোভ,কিন্তু বোল্তার ভয়ে তাহারা স্পর্শ করিতে পারে না। এক দিন প্রাতঃকালে ঐ কাফিক্ষেত্রের অধিকারী হঠাৎ একটা ভয়ানক চিৎকার শুনিতে পাইলেন—এবং তাঁহার দূরবীন দিয়া নিম্নলিখিত ব্যাপারটী দেখিতে লাগিলেন;—একটী দলপতি প্রবীণ বানর কতকগুলি ছোট ছোট বানরকে ধরিয়া সেই ঝোপের উপর নিক্ষেপ করিতেছে—ছোট ছোট বানরেরা চিৎকার করিতেছে, তথাপি ঐ বৃদ্ধ বানর তাহাদিগের আর্ত্তনাদে কর্ণপাত না করিয়া বারংবার তাহাদিগকে ঐ ঝোপের উপর ছুড়িয়া ফেলিতেছে—এইরূপে বোল্তার চাক্ গুলি ভাঙ্গিয়া ভূমিতে পড়িল। ঐ ছোট ছোট বানর বেচারাদিগের উপর বোল্তারা ঝাঁকে-ঝাঁকে আসিয়া পড়িল। এই অবকাশে ঐ বৃদ্ধ বানর কেমন অম্লান বদনে ফলারে বসিয়া গেলেন; মাঝে মাঝে অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার আহারাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট বানরী ও বানর-শিশুদিগের নিকট নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরের মাথায় কিরূপে কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাইতে হয় তাহা এই সুবিজ্ঞ বানরটীর নিকটে বোধ হয় ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা শিক্ষা লাভ করিয়াছেন!

লূতাতন্তু।—মাকড়শার জালকে অনেক প্রকার কাজে লাগানো হইয়াছে। দূরবীক্ষণযন্ত্রে যে সূক্ষ্ম চুল দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও লূতাতন্তু। এক শতাব্দী হইল বোয়া অফ্ লাসেডক্ নামক ব্যক্তি লূতাতন্তু দ্বারা এক জোড়া মোজা ও এক জোড়া দস্তানা প্রস্তুত করেন। সেই মোজা ও দস্তানা খুব মজবুৎ হইয়াছিল। এই রূপ চেষ্টা আরও অনেকে করিয়াছিলেন। কিন্তু রেয়োমূর সাহেব বলেন যে, কাঠিন্য ও উজ্জ্বলতা সম্বন্ধে লূতাতন্তু রেশমের সমকক্ষ হইতে পারে না। ৩টি-পোকার ৩টি ওজনে তিন কিম্বা চারি গ্রেণ হইবে। ২৩০৪ টি পোকা হইতে অর্দ্ধ সের রেশম

উৎপন্ন হয়। কিন্তু আকড়্সার থলি পরিষ্কার করিয়া ওজন করিলে এক গ্রেণের তৃতীয়াংশেরও অধিক হয় না।

কুক্কুরগণ অনেক কাজে লাগে।—বোধ হয় এ কথাটী সকলে জানেন না, যে সান ফ্রান্সিস্কোতে কতকগুলি লোক মৃত কুক্কুরের কারবার চালাইতেছেন। তাঁহারা কুক্কুরের মৃতদেহ ক্রয় করিয়া তাঁহাদের কারখানায় পাঠাইয়া দেন। সেখানে প্রথমত তাহাদের চর্ম্মে দস্তানা প্রস্তুত হইয়া বাজারে বিক্রীত হয়, তৎপরে তাহাদিগের ত্বক্-বিমুক্ত দেহ গুলিকে একটা বৃহৎ হাঁড়িতে নিক্ষেপ করিয়া জাল দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়ায় ক্রমে তাহাদের মাংস গুলি অস্থি হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। —এই অস্থিগুলি চিনি শোধকদিগের নিকট বিক্রীত হয়। চিনি-শোধকেরা অস্থি চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা চিনি পরিষ্কার করে। ঐ মৃত-দেহ গুলি জাল দিবার সময় যে তৈল উপরে ভাসিয়া উঠে, সেই তৈল তুলিয়া লইয়া তদ্দ্বারা কৃত্রিম কড্লিভর-অইল প্রস্তুত হয়; এবং অবশিষ্ট তৈল শূকরদিগকে পুষ্ট করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

চতুষ্পদ মৎস্য।—সেরমান ও কোলেরাডোর নিকট, সমুদ্র-সমতল হইতে ৮,২০০ ফিট্ উপরে এক প্রকার আশ্চর্য্যজনক চতুষ্পদ মৎস্য দেখা যায়। এই মৎস্য উভচর এবং চতুষ্পদ। স্থলে চলিবার সময় পদ ব্যবহার করে এবং জলে সাঁতার দিবার সময় পা-গুলি গুটাইয়া রাখে এবং তাহাদের গ্রীবাদেশের চতুর্দ্দিক হইতে গোলাকার পর্দ্দা পর্দ্দা ডানা নির্গত হয় এবং এই ডানার সাহায্যে তাহারা সন্তরণ করে। চতুষ্পদ মৎস্য তো আবিষ্কৃত হইল কিন্তু চতুষ্পদ মনুষ্যের কি এখনও আবিষ্কার হয় নাই?

চীনদেশীয় বহুরূপী বৃক্ষ।—প্যারিস্ নগরের জার্ডা ডে প্লাঁত্ নামক সাধারণ উদ্যানে সম্প্রতি এক প্রকার নূতন বৃক্ষ চীন দেশ হইতে আনীত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ইউরোপে তাহা কখন আইসে নাই। দিনের মধ্যে তিন বার করিয়া ইহার রং বদল হয়। প্যারিস্ নগরে প্রত্যহ বিবিধিগের পরিচ্ছদের যত প্রকার রং ও ঢং বদল হয় তাহা অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। মনুষ্য জাতির মধ্যেও একদল বহুরূপী আছেন, তাঁহারাও সময় বুঝিয়া এত প্রকার রং বদ্লাইতে পারেন যে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

বৃহৎ পদ্ম-পর্ণ।—গার্ডনার্স্ ম্যাগাজিন বলেন গেণ্ট নগরীয় বোটানিক্যাল গার্ডেনের তত্ত্বাবধায়ক ভন্ হুল সাহেব দেখিয়াছেন যে তথাকার একটী ভিক্টোরিয়া পদ্ম-পত্র সাড়ে নয় মন ভার বহন করিতে পারে—মনে করুন—প্রায় পাঁচ জন মনুষ্য তাহার উপর অনায়াসে দাঁড়াইতে পারে।

সাবান তৃণ।—নূতন মেক্সিকোয় এক প্রকার তৃণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেখানকার অধিবাসিরা তাহার মূল সাবানের

পরিবর্তে ব্যবহার করে। তাহারা বলে যে পশমের জিনিস পরিষ্কারের পক্ষে সাধারণ সাবান অপেক্ষা ইহা অনেক উৎকৃষ্ট। কারণ যেমন ইহা দ্বারা পশমের ময়লা পরিষ্কৃত হয়, সেই রূপ ইহার স্বাভাবিক চাকচিক্যও সংরক্ষিত হয়।

কৃষ্ণ-গোলাপ।—এক জন ক্যালিফর্ণিয়ানিবাসী অনেক পরীক্ষার পর মসিবৎ কৃষ্ণবর্ণ গোলাপ উৎপাদনে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি নিম্নলিখিত প্রণালীটী অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি একটী ঘোর রক্ত বর্ণ গোলাপের চারা কলম করিয়া ওক্ গাছের সহিত যুড়িয়া দিয়াছিলেন। ক্রমে উহা পরিবর্দ্ধিত ও পুষ্পিত হইল। ওক গাছের ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ রস গোলাপে সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণে পরিণত করিল। ইহাতে আর কিছু উপকার না হউক্, আমাদের দেশে একটী উপকার হইল। ইংরাজী কবিদিগের অনুচিকীর্ষু বঙ্গীয় কবিগণ গোলাপের সহিত শ্যামাঙ্গিনী মহিলাদিগের কপোলের তুলনা করিতে না পারিয়া মাথা খুঁড়িতেছিলেন। এবার তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। এবার তাঁহারা উপমাস্থলে অনায়াসে বলিতে পারিবেন যে—

আহা কিবা মুখ-খানি কুচ্‌কুচে কালো।
কালীপর্ণী-গোলাপটী করি আছে আলো॥

রামকান্তের সন্তান লাভ।—অনেক বয়স পর্য্যন্ত রামকান্তের সন্তানাদি হয় নাই। সন্তান লাভের জন্য কার্ত্তিকের অনেক আরাধনা করিয়াছেন। এমন গাছ ছিল না যাহার শিকড় তাঁহার পত্নীকে খাওয়ান নাই এবং পাড়ায় এমন লোক ছিল না যাহার পরামর্শ মতে কাজ করেন নাই। ঘৃত বিক্রয় করিয়া বৈদ্য বড় মানুষ হইয়া গেল এবং স্বস্ত্যয়ন করিয়া দৈবজ্ঞ প্রশস্ত দালান নির্ম্মাণ করিয়া লইল।

এক বার কোন কর্ম্মোপলক্ষে রামকান্তকে বিদেশে যাইতে হইল; সেখানে এক দিন রাত্রে সাপ স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন! সাপ স্বপ্নে দেখিলে সন্তান হয়, ব্রাহ্মণ নিদ্রাভঙ্গে মহা দাপাদাপি করিতে আরম্ভ করিলেন। এত দিনে তাঁহার কার্ত্তিকের আরাধনা সফল হইল মনে করিলেন। ক্রমে এক মাস দুই মাস তিন মাস করিয়া দশ মাস হইয়া গেল; আজ তাঁহার পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে তাঁহার স্থির বিশ্বাস হইল, ক্রমে তাঁহার পুত্রের অন্নপ্রাশন; বাড়িতে বলিয়া আসিয়াছেন, কার্ত্তিকের প্রসাদে যদি তাঁহার পুত্রসন্তান হয় তবে তাহার নাম রাখিও রামজয়। "আমার রামজয় চিরজীবি হোয়ে থাক্" বোলে তাহার গহনা পত্রের ফর্দ্দ করিতে বসিলেন।

ছয় বৎসরের পরে রামকান্ত দেশে ফিরিয়া আসিলেন। অন্তঃপুরে গিয়া দেখিলেন তাঁহার পত্নী, শাশুড়ি প্রভৃতি গুরু জনদের মধ্যে বসিয়া আছেন। উর্দ্ধশ্বাসে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার রামজয় কোথায়?" তাঁহার পত্নী ত অবাক, দুই তিন বার জিজ্ঞাসিত হইলে আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, গুরুজনদের সম্মুখে হাসিতে

না পারিয়া মুখে কাপড় দিয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন; এইত রামকান্ত মহাব্যাকুল; তিনি স্থির করিলেন যে তাঁর স্ত্রী বুঝি কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন, স্থির করিলেন তবে রামজয়ের মৃত্যু হইয়াছে, এইত বুক চাপ্‌ড়াইয়া চুল ছিঁড়িয়া "রামজয় হা রামজয়" করিয়া মহা কান্না কাটি দাপা দাপি আরম্ভ করিলেন; তাঁহার ভগিনী, মাতা, প্রতিবাসীগণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, কিন্তু রামকান্তের পুত্রশোক কিছুতেই থামিবার নহে, আত্ম-হত্যার মানসে ছুটিয়া বাড়ির পুষ্করিণীতে গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, পাড়ার লোকেরা সকলে মিলিয়া অচেতনাবস্থায় তাঁহাকে জল হইতে তুলিল। অনেক কষ্টে তাঁহার চেতনা সম্পাদিত হইল। তখন তিনি শুনিলেন তাঁহার পুত্র সন্তানের নাম গন্ধও নাই।

সে দিন কান্‌ভোকেশনে লার্ড লিটনের বক্তৃতা শুনিয়া এইরূপ অনেক রামকান্তের চটক্ ভাঙ্গিয়াছে। তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে মহা রাণীর ঘোষণা-পত্র শুনিয়া অবধি ইংরাজ-দিগের সহিত সমান অধিকার পাইয়াছি মনে করিয়া দিব্য আরামে নাসারন্ধ্রে তৈল দিতেছিলেন!

দেবতার মানত্।—এক জনের একটি গোরু হারাইয়া যায়, কোন মতে খুঁজিয়া না পাইয়া কালীঘাটে গিয়া কালীকে কহিল "মা, যদি গোরু খুঁজিয়া পাই তবে তোমার পূজায় একটা মহিষ বলি দিব।" কিছু দিনের পর গোরু খুঁজিয়া পাইল কিন্তু তখন মহিষ বলির কথা সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু কালীর পাওনা, তিনি ভুলিবেন কেন? তাঁহার সম্মুখে অনটন পড়িতেই তিনি আসিয়া কহিলেন, "কই আমার মহিষ দিলি না?" মানুষ কহিল "মা আমার হাতে এখন টাকা নাই, মহিষ দিতে পারিব না, তবে যদি ভেড়া পাইলে সন্তুষ্ট হও তবে দিই।" কালী তাহাতেই সম্মত হইলেন, কিন্তু তাহাও পাইলেন না। দেবী আসিয়া কহিলেন "কই ভেড়া দিলি না?" সে কহিল "মা আমি গরিব মানুষ, ভেড়া কোথায় পাইব? বলেন তো একটা ছাগলের চেষ্টা দেখা যায়।" তিনি তাহাতেই সম্মত হইলেন, তাহাও পাইলেন না, জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, "ছাগল ত পাইলাম না, তবে একটি হাঁস দিতে পারি" মা তাহাতেই সম্মত, তাহাও দিল না, সে কহিল "হাঁস নাই মা ফড়িঙ্ চাওত দিই" কালী তাহাতেও রাজী হইলেন। তখন সে যোড়হস্তে কহিল "দোহাই মা, যদি মোষ থেকে ফড়িঙ্গে এসে নাম্‌তে পার তবে নিজেই বাদায় গিয়ে ধরে নিয়ে এস না, আমাকে কেন কষ্ট দেওয়া?"

ইংরাজগণ এইরূপ বঙ্গদেবীর কাছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অর্ঘ্য মানিয়া ছিলেন, কিন্তু দেবী যখন রোড্‌সেস্, পব্লিক্ ওয়ার্কস্, ইরিগেষন্ সেস্, প্রভৃতি সকলই ঘাড় পাতিয়া লইলেন, তখন ইংরাজেরা তাঁহাকেও এইরূপ বলিতে পারেন যে, "মা, যদি তুমি এতদূর ত্যাগস্বীকার করিতে পার, তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আশাটিও কেন পরিত্যাগ কর না!"

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

(১) শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু বিরচিত—সৃষ্টি।

শ্রীযুক্ত কাশীবর বেদান্তবাগীশ বিরচিত—সাংখ্য দর্শন।

প্রথম প্রস্তাব।

সৃষ্টি-বিষয়ে বিজ্ঞান কি বলেন প্রথমে শুনা যাউক; পশ্চাতে তত্ত্বজ্ঞানের সিদ্ধান্ত কিরূপ তাহা দেখা যাইবে। বিজ্ঞান বলেন যে, আদিতে জগৎ এখনকার মত এরূপ স্থূল ছিল না—অতি সূক্ষ্মভাবাপন্ন ছিল; এবং তাহার সর্ব্বত্র সমভাব ছিল; প্রথমে এক মাত্র সূর্য্য একাকী সর্ব্বে-সর্ব্বা ছিল, গ্রহ উপগ্রহ কিছুই ছিল না; সেই এক সূর্য্য হইতে গ্রহাদি ক্রমে ক্রমে প্রসূত হইল। এখন যেখানে গ্রহ উপগ্রহ বিদ্যমান আছে, পূর্ব্বে সেখানে সূর্য্যের প্রান্তভাগ তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া ছিল; সূর্য্যের প্রান্ত-ভাগ বার বার বিচ্ছিন্ন হইয়া গ্রহের পর গ্রহ সম্ভূত হওয়াতে এক্ষণে সূর্য্যের কলেবর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। সম্প্রতি জেকব্ এনিস্ নামক এক জন জ্যোতির্ব্বেত্তা তারকাগণের আদি বৃত্তান্ত (The origin of the stars) নামক এক খানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এই পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডের প্রথমেই তিনি এইরূপ বলিতেছেন;—

বর্ত্তুলাকার সুন্দর জলবিন্দু সকল যাহা ইন্দ্রধনুতে বিভাসিত হয়, তাহারা যেমন জলীয় বাষ্পের সংঘাত হইতে উৎপত্তি লাভ করে, সেই রূপ বর্ত্তুলাকার সুন্দর তারকা-রাজি যাহা আকাশে দীপ্তি পায় তাহারা, সমস্ত আকাশময় ব্যাপিয়া ছিল যে আদিম ভৌতিক পদার্থ, সেই সূক্ষ্ম ভৌতিক পদার্থের সংঘাত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহার কিয়ৎপরে গ্রন্থকর্ত্তা বলিতেছেন;—

কি শক্তির বলে সেই সূক্ষ্ম ভৌতিক পদার্থ সমস্ত-আকাশময় ব্যাপিয়া ছিল?—পরমাণু-গত বিক্ষেপ-শক্তির বলে; সেই বিক্ষেপ-শক্তি, যাহার প্রভাবে আধ্ ছটাক্ জল জনন বাষ্প, আধ্ ছটাক্ প্লাটিনম্ অপেক্ষা, সার্দ্ধ দুই লক্ষ গুণ অধিক পরিমাণ স্থান ব্যাপিয়া থাকে! গ্রন্থকার ইহার কিয়ৎপরে বলিতেছেন;—

এই বিক্ষেপ-শক্তিকে দমন করা যায় কি প্রকারে?—রাসায়নিক শক্তি দ্বারা;—সেই রাসায়নিক শক্তি, যাহার প্রভাবে অম্ল জনন এবং জলজনন বাষ্প একত্র সংহত হইয়া জলাকারে পরিণত হয়। জগতের আদিম উপাদান যে কত সূক্ষ্ম, তদুপলক্ষে গ্রন্থকার এইরূপ বলেন;—

বহু পূর্ব্বে সূর্য্য যখন নেপ্চুন গ্রহের গতিচক্র পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল, তখন তাহা জল-জনন বাষ্প অপেক্ষা চতুর্দ্দশ কোটি গুণ সূক্ষ্ম ছিল। * * * * * * * * *

আলোকের কম্পন এক পলকে ৪৫৮০০০-০০০০০০ এত গুলি; এবং তাহা ঐ কাল মধ্যে এক লক্ষ ক্রোশ পথ অতিবাহন করে। অতএব আলোক কি অচিন্তনীয় সূক্ষ্ম পদার্থ একবার মনন করিয়া দেখ! কিন্তু এ মনে করিও না যে, সূর্য্য নেপ্‌চুন গ্রহের গতিচক্র পর্য্যন্ত যখন প্রসারিত ছিল তখন তাহা আলোক পদার্থ অপেক্ষা অল্প সূক্ষ্ম ছিল। এই ত বিজ্ঞানের মত।

এ সূর্য্যের এই—আবার সূর্য্যেরও সূর্য্য আছে; তাহা যে সময়ে এই সূর্য্যের চরম-প্রান্তবর্ত্তী গ্রহের গতি-চক্র পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল, তখন তাহার উপদান আরো যে কত সূক্ষ্ম ছিল তাহা ভাবিতে গেলে জগতের কিছুই আর থাকে না, সকলই লোপাপত্তি হইয়া যায়। অতএব আমাদের দেশের তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই যে বলিয়াছেন যে, সর্ব্ব-প্রথমে আকাশ সৃষ্ট হইয়াছিল—কি মন্দ বলিয়াছেন? উক্ত গ্রন্থকার পুনশ্চ বলেন;—

ইহা আমরা বলিতে পারি না যে, সেই আদিম কালের সূক্ষ্ম ভূত জ্বলন্ত অবস্থায় ছিল। আমাদের এই যে সূর্য্য, ইহাও বুধ গ্রহের পরিধি পর্য্যন্ত প্রসারিত থাকা কালীন জল-জনন বাষ্প অপেক্ষা বিশ গুণ সূক্ষ্ম ছিল। সূক্ষ্ম বাষ্প-সকল রাসায়নিক যোগে প্রবৃত্ত হইবার সময় আলোক উদ্গীরণ করে না, যদি করে সে অতি যৎসামান্য অপরিস্ফুট আলোক।

উক্ত গ্রন্থকার ইহাও বলেন যে, পূর্ব্বে যেমন আলোক ছিল না, তেমনি উত্তাপও ছিল না*; পরমাণুসকলের পরস্পর ঘষাঘষি এবং রাসায়নিক যোগাযোগ দ্বারা উত্তাপের আবির্ভাব পরে হইয়াছে। ইহাতে করিয়া প্রমাণ হইতেছে যে, ব্রহ্মাণ্ড অগ্নি-আকার ধারণ করিবার পূর্ব্বে সূক্ষ্ম-তম বায়ু-আকারে বিদ্যমান ছিল। দেখ, আমাদের দেশের তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের এই যে পুরাতন উক্তি যে, আকাশের পরে বায়ু, বায়ুর পরে অগ্নি সৃষ্ট হইয়াছে—ইহা আলিও টলিতেছে না। নিত্য নূতন পরিবর্ত্তনের আবর্ত্ত মুখে না টলিয়া, যে অকুতোভয়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, সে কেবল এক আমাদের দেশের পুরাতন বচন। তত্ত্বজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, অগ্নির পরে জলের উৎপত্তি এবং জলের পরে কঠিন মৃত্তিকার উৎপত্তি;—বিজ্ঞানও অবিকল তাহাই বলেন; যথা, পৃথিবী প্রথমে ধূমকেতুর

* "We cannot suppose that matter was originally diffused through space by the repulsion of heat; because heat is a well known effect produced by some action. We can conceive of no action to produce such an enormous amount of heat. And if all space were pervaded by such heat, it must have remained. It could not have radiated away; for where could it go?"—Ennis' Origin of the stars.

লাজ্‌লের ন্যায় জ্বলন্ত বাষ্পাকারে ছিল, পরে উত্তপ্ত দ্রব ধাতুপিণ্ডের রূপ ধারণ করে, তাহার পরে জলের অভ্যন্তরে নানা প্রকার স্তর নির্ম্মিত হইয়া সময়ে সময়ে তাহাদের কোন কোন অংশ তথা হইতে মস্তকোত্তোলন করাতে পৃথিবী জল স্থল দুই অংশে বিভক্ত হয়। এই রূপ, প্রথমে আকাশ, পরে বায়ু, পরে অগ্নি, পরে জল, পরে স্থল, সৃষ্টির এই যে একটি ধারাবাহিক ক্রম, ইহা তত্ত্বজ্ঞান বহু পূর্ব্বে স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন—এক্ষণে বিজ্ঞান নানা প্রকার প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা তাহার দৃঢ়তা সাধন করিতেছেন—ইহা অতি সুখের বিষয় তাহার আর সন্দেহ নাই। তত্ত্বজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের মধ্যে বিবাদ লাগিলে যাহারা কৌতুক দর্শন করিয়া আমোদ পান, তাঁহাদের সুখের কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হইল—কি করা যায়! বলিলাম কি—তাঁহাদের সুখের ব্যাঘাত? তাঁহাদের জন্য মিল্ কম্‌টি ডার্বিন্ এই সকল পর্ব্বত-প্রমাণ গ্রন্থকর্ত্তারা দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন,—তাঁহাদের আবার সুখের ব্যাঘাত! রসনাকে ধিক্! তাঁহাদের অনেকেরই এই রূপ মনোগত ভাব যে, মনুষ্য পৃথিবীর জীব, পৃথিবীতেই আপনার জীবিকা-সংস্থান করিয়া সুখে বিচরণ করুক—আকাশে হাত বাড়াইলে কি হইবে? ইঁহাদিগকে বুঝাইতে হইলে হয় বিস্তর শ্রম নয় বিস্তর ত্যাগ দুয়ের একটি না একটি স্বীকার করিতে হয়। আমাদের এই উষ্ণপ্রধান দেশে শ্রম স্বীকার যত কষ্টকর, ত্যাগ স্বীকার তত নহে; এজন্য আমাদের দেশের পুরাতন তত্ত্ববিৎগণ ত্যাগ স্বীকারকেই শ্রেয় করিয়াছিলেন। তাঁহারা আপনাদের জ্ঞানের অধিকাংশ জলাঞ্জলি দিয়া লোককে জ্ঞানোপদেশ করিতেন,—অজ্ঞান হইয়া অজ্ঞানদিগকে বুঝাইতেন। ব্রহ্মা এই বলিয়াছেন, শিব এই বলিয়াছেন, বশিষ্ঠ এই বলিয়াছেন, ব্যাস এই বলিয়াছেন, অতএব অত্র নাস্তি বিচারণা, নির্ব্বিচারে সমস্তই মানিয়া যাও, এই তাঁহাদের শিক্ষাপ্রণালী। তাঁহারা ব্রহ্মা, শিব, বশিষ্ঠ, ব্যাস এইরূপ এক একটি নাম যখনি উচ্চারণ করিয়াছেন, তখনি সহস্র সহস্র বিচার বিতর্ক বাদানুবাদ প্রথম উদ্যমেই হতবীর্য্য হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়াছে। রোমক ইতিহাসে আছে যে, পুরাকালে ইতালীয়েরা হস্তী কিরূপ তাহা চক্ষে দেখে নাই; হানিবাল নামক সুবিখ্যাত কার্থেজীয় সেনাপতি হস্তিদল সমভিব্যাহারে প্রথমে যখন সে দেশে যুদ্ধার্থে প্রবেশ করিলেন, তখন হস্তীর আকার-প্রকার বল-বিক্রম দেখিয়াই ইতালীয় সৈন্যেরা সর্ব্বত্র রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে যখন ইতালীয় সৈন্যগণের চক্ষু ফুটিল তখন তাহারা আগ্নেয় গোলা দ্বারা হস্তিদিগকে তাড়না করিতে লাগিল। তাহাতেই জয়-স্রোত একেবারে উলটিয়া গেল; হস্তিগণ কোথায় বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিবে, তাহা না করিয়া পলায়নের বেগাতিশয্যে স্বপক্ষীয় দল-বলেরই সমূহ অনিষ্ট সাধন করিতে লাগিল।

আমাদের দেশে ইহারই ন্যায় অনিষ্ট-

সাধন হইতেছে। পূর্ব্বে অজ্ঞান-বিনাশের জন্য যে সকল বিভীষিকা দলবদ্ধ করা হইয়াছিল, তাহারা এক্ষণকার আলোর শকট এবং তাড়িত বার্ত্তাবহ দ্বারা তাড়িত হইয়া, অস্মদ্দেশীয় তত্ত্বজ্ঞান পক্ষে প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিতেছে। অতএব ব্যাস, বশিষ্ঠ, ব্রহ্মা, শিব এসকল কল্পিত নামের সাহায্যে তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করা এক্ষণে যুক্তি সিদ্ধ নহে। এক্ষণে ভ্রম স্বীকার পূর্ব্বক যুক্তি এবং বিচারের সাহায্যে আমাদের দেশের পুরাতন তত্ত্বজ্ঞানকে স্ব-পদে উত্থাপন করাই এক মাত্র প্রয়োজন। পূর্ব্বকার পুরাণ-কর্ত্তারা মিথ্যার সাহায্যে অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট সত্য প্রচার করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, ইহাতেই আমাদের দেশ বিদ্যার জন্মভূমি হইয়াও অবিদ্যাতে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। মিথ্যার সাহায্যে সত্য প্রচার করা, এবং অন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা পরোপকার করা, উভয়ই আপাততঃ মধু কিন্তু পরিণামে বিষ। আমাদের দেশে পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে সত্য জানা ছিল সত্য-প্রণালী দ্বারা সত্যের শিক্ষা দান হইত না বলিয়াই কাল-ক্রমে সত্য নির্জ্জীব ভাবে পরিণত হইল। অতএব যেন তেন প্রকারেণ সত্য শিক্ষা দেওয়া এখন আর চলে না। সত্য-প্রণালী অবলম্বন করিয়াই সত্য শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। সত্যের কথ হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে শিক্ষা দেওয়া অতীব কষ্টকর ব্যাপার তাহার আর ভুল নাই, কিন্তু কষ্টকর বলিয়া কি তাহা ছাড়িয়া দেওয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য। গ্রীক-দেশে দুই একটি কষ্টকর ব্যাপারের সূত্রপাত হওয়াতেই তাহার প্রসাদাৎ ইউরোপের অজ্ঞানান্ধকার কাল-ক্রমে বিনষ্ট হইয়াছে। জ্যামিতি বিদ্যা আমাদের দেশে না ছিল এমন নয়, দোষের মধ্যে কেবল সত্য-প্রণালী অনুসারে তাহার শিক্ষা প্রদান হইত না। গ্রীক দেশে যে অবধি জ্যামিতি বিদ্যা সত্য-প্রণালী অনুসারে প্রচারিত হয়, সেই অবধি করিয়া ইউরোপে বিজ্ঞান-শাস্ত্র ক্রমশই উচ্চ উচ্চ সোপানে পদনিক্ষেপ করিতেছে। আমাদের দেশে পৌরাণিক মিথ্যা-প্রণালী অনুসারে যে অবধি সত্যের প্রচার আরম্ভ হইয়াছে, সেই অবধিই বিদ্যা অবিদ্যা-দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ক্রমশই হ্রাস পাইয়া আসিয়াছে। ইহা দেখিয়া শুনিয়া মিথ্যার পথ দিয়া সত্য প্রচার করিতে কাহার আর প্রবৃত্তি জন্মিবে? অতীব সুখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের দর্শন শাস্ত্র-সমূহে সত্য-প্রণালীর প্রথম সূত্র-পাত হয়।

পুরাণের মধ্যে অনেক সত্য আছে, কিন্তু সত্য-প্রণালী একটুও নাই। দর্শনকারেরা সাধ্যানুসারে সত্য-প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক সৃষ্টি তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহাদের মূল সিদ্ধান্ত-গুলি এমনি পাকা হইয়াছে যে, কিছুতেই তাহার আর মার নাই। পুরাণ-কর্ত্তারা অন্য দিকে গিয়াছেন—তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যের নিকট হইতে সত্য উপার্জ্জন করিয়া মিথ্যার সাহায্যে সেই গুলি প্রচার করিতে

সচেষ্ট হইয়াছেন। এই জন্য সৃষ্টি সম্বন্ধে পৌরাণিক সত্য অপেক্ষা দার্শনিক সত্য আমাদের পুজ্যই। দর্শন-শাস্ত্রে অল্প সত্য থাকিলেও প্রণালী-গুণে তাহা জিজ্ঞাসু ব্যক্তির নিকট বহুমানাস্পদ হইয়া থাকে পুরাণ শাস্ত্রে বহুবিধ সত্য থাকিলেও প্রণালী-দোষে তাহা প্রকৃত জিজ্ঞাসু ব্যক্তির হাস্য উদ্দীপন করে। অতএব অস্মদ্দেশীয় তত্ত্ব বিদ্‌গণ সৃষ্টি-সম্বন্ধে যেরূপ যেরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সংগ্রহ করিয়া মাত্র ক্ষান্ত থাকিলে এক্ষণে আর চলিবে না, কোন্ শাস্ত্র কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া কিরূপ ফল লাভ করিয়াছেন, ইহা না অবগত হইতে পারিলে শাস্ত্রালোচনার প্রকৃত ফল আমাদের হস্তগত হইবে না। শুদ্ধ যদি জানা থাকে যে, দশ ত্রুটিতে কুড়ি হয়, তবে এক শ ত্রুটিতে কি হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না। কিন্তু কি প্রণালী অনুসারে দশ ত্রুটিতে কুড়ি হয়, ইহা জানা থাকিলে একশ ত্রুটিতে কি হয়, দশ-শ ত্রুটিতে কি হয়, ইত্যাদি সমস্তই অবলীলা-ক্রমে বলিতে পারা যায়। প্রকৃত জ্ঞান-প্রণালী-অনুসারে সামান্য একটি অঙ্কের প্রকরণ জানিতে পারিলে, সেই সোপান অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের প্রকরণ জানা যাইতে পারে।

সৃষ্টি-সম্বন্ধে অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্র সকলের প্রধান প্রধান মত গুলি একত্র সংগ্রহ করাই যদি শিরোনামিত বসুজ মহাশয়ের উদ্দেশ্য হয়, তবে তাঁহার পরিশ্রম সফল হইয়াছে ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। তাঁহার সাধু ইচ্ছা এবং অধ্যবসায় উভয়ই ধন্যবাদের যোগ্য, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। ইতিপূর্ব্বে আমরা যখন তাঁহার বেদান্ত-প্রবেশ সমালোচনা করি তখন ভাবিয়াছিলাম যে, গ্রন্থকার যদি সাঙ্খ্য এবং বেদান্তের মধ্যে সন্ধিস্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেন তবে ভাল হইত। বর্ত্তমান গ্রন্থে দেখিতেছি যে, প্রধানত তিনি সাংখ্যের মত অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। বেদান্ত-দর্শন এবং সাংখ্য-দর্শন উভয়ের মধ্যে যে মত-ভেদ দেখা যায়, পৌরাণিক এবং অন্যান্য-শাস্ত্রকারেরা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া উভয়কেই অভেদ ভাবে দৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা বেদান্তের মায়া এবং সাংখ্যের প্রকৃতি উভয়কেই সমদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। অথবা কি বেদান্ত কি সাংখ্য কাহারো দিকে ঝোঁক না দিয়া উপনিষদ্ হইতেই রসাকর্ষণ করত স্ব স্ব পুরাণের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। তাঁহারা মায়া শব্দ ভূয়োভূয় ব্যবহার করিয়াছেন, অথচ মায়াবাদে লিপ্ত হন নাই; "প্রধান" শব্দ ভূয়োভূয় ব্যবহার করিয়াছেন অথচ নিরীশ্বর মত অনুমোদন করেন নাই।

তবে কি দর্শন অপেক্ষা পুরাণ শ্রেষ্ঠ? বেদান্তও এক দিক্‌দর্শী, সাংখ্যও এক দিক্‌দর্শী, ইহা যেন আমি মানিলাম। কিন্তু যে দিকে যিনি চলুন না কেন, তিনি যদি সত্য-প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলেন, তবে ক্রমশঃ সত্যের দিকে অগ্রসর হইবেন ইহাতে আর সন্দেহ নাই। বেদান্ত এবং সাংখ্য উভয়ই সত্য-প্রণালীর পক্ষপাতী একথা

উভয়ই সত্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। পুরাণ, সত্য বিষয়-সকলকে, মিথ্যা-প্রণালী অনুসারে প্রচার করিতে গিয়াছেন, এই অপরাধে তিনি উত্তরোত্তর মিথ্যার দিকেই পদনিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং ক্রমে ক্রমে তন্ত্রশাস্ত্রের অন্ধ-তমিস্রাতে পরিণত হইয়া চরম বৈয়র্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুরাণ এবং তন্ত্রশাস্ত্রের তুলনায় নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শনও জ্যোতির্ম্ময় ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। পুরাণাদিতে অনেক উচ্চ মূল্যের সত্য আছে, ইহা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় যে, সে-সকল সত্য মিথ্যারাশির মধ্যে ভস্মাবচ্ছিন্ন বাস করিতেছে। আলোক যে কি তাহা তাহারা জানিল না, এবং জানিবেও না, তবে তাহাদের জন্মিবার প্রয়োজন কি? তথাপি পুরাণ যে একদর্শিতা-দোষ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, সে কি রূপে? তিনি সকল পক্ষেরই কথা বলিয়াছেন; কথা-গুলি পরস্পর সঙ্গত হইল কি না, ইহাতে কিছুমাত্র দৃকপাত করেন নাই। এই রূপ বহু-পক্ষীয় কথা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করাতেই তিনি বহুদর্শী হইয়াছেন। কিন্তু এরূপ বহুদর্শিতা শ্লাঘার বিষয় নহে, ইহা বলা বাহুল্য। দর্শন-শাস্ত্রসকল যেমন বিচার পূর্ব্বক স্ব স্ব পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, অন্য কোন শাস্ত্র যদি সেই রূপ বিচার পূর্ব্বক সর্ব্বপক্ষের মধ্য হইতে উচ্চতর এবং ব্যাপক-তর সত্য উদ্ধার করিতে পারিতেন, তবেই তাঁহাকে প্রকৃতরূপে বহুদর্শী বলা যাইতে পারিত। অতএব দর্শন-শাস্ত্র একদিক্‌দর্শী হইলেও, তাহা পুরাণ অপেক্ষা শ্রেয়, এবং পুরাণ বহুদর্শী হইলেও তাহা দর্শন অপেক্ষা হেয়। সৃষ্টিতত্ত্বের গ্রন্থকার পুরাণ এবং দর্শন উভয়কেই নির্ব্বিশেষে সাক্ষী মানিয়াছেন। গ্রন্থকারের যেরূপ উদ্দেশ্য তাহাতে ওরূপ নির্ব্বিশেষ দৃষ্টি দোষের হয় নাই। গ্রন্থকার সম্মুখ কার্য্যেরই ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাহাতে তিনি সুসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু পুরাণাদি যেমন নির্ব্বিচারে সাংখ্য-বেদান্ত উভয়েরই মত অনুমোদন করিয়াছেন, তিনি যদি তাহা না করিয়া বিচার পূর্ব্বক উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিতেন, তবে একটি প্রকৃত কাজ করিতেন। যাহা করিয়াছেন তাহাতে শেষোক্ত গুরুতর কার্য্যের একটি উত্তম সোপান নির্ম্মিত হইয়া রহিল—ইহা অল্প সুবিধার বিষয় নহে। বলিতে কি, আমাদের দেশের একটি বড় দোষ—জ্ঞানের প্রণালী এবং সেই প্রণালীর উপযুক্ত প্রয়োগ, এ দুই বিষয়ে আমরা আদবেই মনোযোগ করি না। গোরার দোকানের ভাল ভাল দ্রব্য ক্রয় করিয়াই আমরা সন্তুষ্ট; কি প্রণালীতে যে কোন্‌টি নির্ম্মিত হয়, তাহার প্রতি আমরা কিছুমাত্র মনোযোগ করি না; এক দিকে এই; আর এক দিকে,—পূর্ব্বতন জ্ঞানী-ব্যক্তিরা যে-সকল সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতেই আমরা সন্তুষ্ট; কি প্রণালীতে আবিষ্কার করিয়াছেন, আমরা তাহা আদবেই দেখি না। কপিল মুনি বলিয়াছেন প্রকৃতি সত্ত্ব রজ তমোগুণের সাম্যাবস্থা;

তৎপরে বলিয়াছেন প্রকৃতি-হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহংকার, অহংকার হইতে পঞ্চতন্মাত্র এবং একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চভূত, এই যে তিনি বলিয়াছেন—কি প্রণালীতে? সৃষ্টির গ্রন্থকার এ প্রশ্নের প্রতি সমুচিত আদর প্রকাশ করেন নাই। তিনি এ শাস্ত্র এই বলিয়াছেন, ও শাস্ত্র ঐ বলিয়াছেন, এই করিয়া পুস্তকের অনেক স্থান ভার-গ্রস্ত করিয়াছেন; যদি ঐ সকল নানা শাস্ত্রোক্ত বচনের মধ্যে একটা যুক্তির বাঁধুনি আঁটিয়া দিতে পারিতেন, তাহা হইলে এখন যাহা দোষ বলিয়া জ্ঞান হইতেছে, তাহা উল্টা আরো গুণ বলিয়াই প্রকাশ পাইত। আদ্যোপান্ত প্রণালী-শুদ্ধ হওয়াতেই বিজ্ঞানের এত মূল্য; তত্ত্বজ্ঞান যদি সেরূপ প্রণালী-সঙ্গত না হয়, তবে সে দোষ কি তত্ত্বজ্ঞানের? পূর্ব্বে বিজ্ঞান ছিল, কিন্তু তাহা প্রণালীবদ্ধ ছিল না, সে কি বিজ্ঞানের দোষ? তত্ত্বজ্ঞানেরও নয়, বিজ্ঞানেরও নয়, দোষ গ্রন্থকারের, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

তত্ত্বজ্ঞান-সম্বন্ধীয় সত্য আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণেই আছে,—এক্ষণে আবশ্যক তাহার আদ্যোপান্ত একটা প্রণালী বাঁধিয়া দেওয়া। তত্ত্বজ্ঞানের বচন আমাদের দেশের আপামর সকলেরই কর্ণগোচর হইয়া থাকে—তত্ত্বজ্ঞানের প্রণালী টোলের অধ্যাপক-গণেরও ধ্যানের অগোচর। আমাদের মতে প্রণালী এবং প্রয়োগ এই দুইটিই মূল কথা—আর সকলই তাহার নীচে।

বিজ্ঞানেরই বা কি প্রণালী, এবং তত্ত্বজ্ঞানেরই বা কি প্রণালী, তাহার ইংরাজী নাম সকলেই জানেন, তাহার দেশী নাম কি দেওয়া যাইবে তাহাই এক্ষণে ভাবনার বিষয়। সংকীর্ণ দৃষ্টান্ত অবলম্বন পূর্ব্বক ব্যাপক সিদ্ধান্ত অন্বেষণ করা বিজ্ঞানের প্রণালী; অখণ্ড সত্য অবলম্বন পূর্ব্বক খণ্ড সত্য সমর্থন করা, তত্ত্বজ্ঞানের প্রণালী। সংকলন (তেরিজ) এবং ব্যবকলন (জমা-খরচ) গুণন এবং হরণ, ইত্যাদি প্রণালী-যুগল যেমন গণিত শাস্ত্রে সমাদৃত হইয়া থাকে, ও-প্রণালী-যুগল তেমনি সাধারণতঃ সমুদায় বিজ্ঞান-শাস্ত্রেই সম্মানিত হইয়া থাকে। এখানে এইটি বিশেষ করিয়া মনে রাখা উচিত যে, শরীরের যেমন দক্ষিণ এবং বাম এইরূপ যুগলাঙ্গ, গণিত শাস্ত্রের যেমন সংকলন ব্যবকলনাদি যুগলাঙ্গ, জ্ঞানের তেমনি, বিজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞান, যুগলাঙ্গ। বিজ্ঞানের প্রণালী নীচে হইতে উপরে ওঠা (স্থূল বিষয় হইতে সূক্ষ্ম তত্ত্বে ওঠা), তত্ত্বজ্ঞানের প্রণালী উপর হইতে নীচে নাবা। এই দুই প্রণালীর মিলন ব্যতিরেকে উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা কখনই সুসিদ্ধ হইতে পারে না। উচ্চ অঙ্গের গণিত বিদ্যার প্রাণ নামের যোগ্য যদি কিছু থাকে তবে তাহা সমীকরণ, এবং সেই সমীকরণের প্রাণ নামের যোগ্য যদি কিছু থাকে, তবে তাহা গণিত-প্রকরণের যুগলাঙ্গতা; এক পক্ষে সংকলন, গুণন, বর্গ ইত্যাদি; অপর পক্ষে ব্যবকলন, হরণ বর্গমূল, ইত্যাদি; এই দুই পক্ষে ভর

করিয়া গণিত বিদ্যা যে কত উচ্চে উঠিয়াছে, তাহা কৃতবিদ্য ব্যক্তি মাত্রেই জানিতেছেন। কেবল গণিত বিদ্যা বলিয়া নহে, সাধারণতঃ সকল বিদ্যাই ঐরূপ যুগলাঙ্গে ভর করিয়া উচ্চ উচ্চ সোপানে পদনিক্ষেপ করিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিলে সৃষ্টির যে একটি ধারাবাহিক ক্রম পাওয়া যায়, দার্শনিক প্রণালীতে আলোচনা করিলেও ঠিক তাহাই পাওয়া যায়, ইহা ইতিপূর্ব্বে এক প্রকার প্রদর্শন করিয়াছি। মূল কথা এই ;—সৃষ্টির অথবা প্রকৃতির দুই প্রান্ত ; একটি সূক্ষ্ম, আর একটি স্থূল। আদি-প্রান্ত সূক্ষ্ম, চরম-প্রান্ত স্থূল। দুই প্রান্তের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ, এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পৌঁছিতে হইলে মধ্যে কোন একটা সেতু বা সোপান-পঙ্‌ক্তির আশ্রয় মিলে কি না, যদি মিলে তবে তাহা কিরূপ, ইহাই জিজ্ঞাস্য বিষয়। এই জিজ্ঞাস্য বিষয়টি মীমাংসা করিতে হইলে, চাই সূক্ষ্ম প্রান্ত হইতে স্থূল প্রান্তে নামি, চাই স্থূল প্রান্ত হইতে সূক্ষ্ম প্রান্তে উঠি, তাহাতে আইসে যায় না, যে দিক্ দিয়াই হউক্ উভয় প্রান্তের মধ্যে সোপান-প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই ইষ্টসিদ্ধি হয়। সঙ্গীত শাস্ত্র হইতে আরোহ এবং অবরোহ এই দুই পারিভাষিক বচন তুলিয়া লইয়া উক্ত প্রণালী-দ্বয়ের নামকরণ সমাধা করা যাইতে পারে। সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে নাবাকে অবরোহ-প্রণালী এবং স্থূল হইতে সূক্ষ্মে ওঠাকে আরোহ-প্রণালী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এক্ষণে উভয় প্রণালীর সমবেত সাহায্যে সৃষ্টিতত্ত্ব আমরা কতদূর জ্ঞানায়ত্ত করিতে পারি,তাহা এক বার অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক।

ক্রমশঃ

হিমালয়।

সেখানে জ্বলিছে সূর্য্য, উঠিছে সহস্র তারা,
প্রজ্জ্বলিত ধূমকেতু বেড়াইছে ছুটিয়া।
অসংখ্য জগৎ-যন্ত্র, ঘুরিছে নিয়ম-চক্রে
অসংখ্য উজ্জ্বল-গ্রহ রহিয়াছে ফুটিয়া॥
গম্ভীর অচল তুমি, দাঁড়ায়ে দিগন্ত ব্যাপি,
সেই আকাশের মাঝে শুভ্র শির তুলিয়া।
নির্ঝর ছুটিছে বক্ষে, জলদ ভ্রমিছে শৃঙ্গে,
চরণে লুটিছে নদী শিলা-রাশি ঠেলিয়া॥
তোমার বিশাল ক্রোড়ে লভিতে বিশ্রাম-সুখ
ক্ষুদ্র নর আমি এই আসিয়াছি ছুটিয়া।
পৃথিবীর কোলাহল, পারি না সহিতে আর,
পৃথিবীর সুখ দুখ গেছে সব মিটিয়া॥
সারাদিন, সারারাত, সমুচ্চ শিখরে বসি,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহময় শূন্য পানে চাহিয়া।
জীবনের সন্ধ্যাকাল কাটাইব ধীরে ধীরে,
নিরালায় মরমের গান গুলি গাহিয়া॥
গভীর নীরব গিরি, ছোঁবনা ঢালিবে চন্দ্র,
দূরশৈলমালা গুলি চিত্র-সম শোভিবে।
ধীরে ধীরে ঝুরু ঝুরু, কাঁপিবেক গাছ পালা
একে একে ছোট ছোট তারা গুলি নিভিবে॥

তখন বিজনে বসি, নীরবে নয়ন মুদি,
স্মৃতির বিষণ্ণ ছবি আঁকিব এ মানসে।
শুনিব সুদূর শৈলে, এক তানে নিঝরিণী,
ঝর ঝর ঝর ঝর মৃদুধ্বনি বরষে॥
ক্রমে ক্রমে আসিবেক, জীবনের শেষ-দিন,
তুষার শয্যার পরে রহিব গো শুইয়া।
মর মর মর মর, দুলিবে গাছের পাতা
মাথার উপরে হুহু—বায়ু যাবে বহিয়া॥
চখের সামনে ক্রমে, নিভিবে রবির আলো
বনগিরি নিঝরিণী অন্ধকারে মিশিবে।
তটিনীর মৃদুধ্বনি, নিঝরের ঝর ঝর
ক্রমে মৃদুতর হ'য়ে কাণে গিয়া পশিবে॥
এত কাল যার বুকে, কাটিয়া গিয়াছে দিন,
দেখিতে সে ধরাতল শেষ বার চাহিব।
সারাদিন কেঁদেকেঁদে-ক্লান্ত শিশুটির মত
অনন্তের কোলে গিয়া ঘুমাইয়া পড়িব॥
সে ঘুম ভাঙ্গিবে যবে, নূতন জীবন ল'য়ে,
নূতন প্রেমের রাজ্যে পুন আঁখি মেলিব।
যত কিছু পৃথিবীর দুখ, জ্বালা, কোলাহল,
ডুবায়ে বিস্মৃতি-জলে মুছে সব ফেলিব
ওই যে অসংখ্য তারা, ব্যাপিয়া অনন্ত শূন্য
নীরবে পৃথিবী পানে রহিয়াছে চাহিয়া।
ওই জগতের মাঝে, দাঁড়াইব এক দিন,
হৃদয় বিস্ময়-গান উঠিবেক গাহিয়া॥
রবি শশি গ্রহ তারা, ধূমকেতু শত শত
আঁধার আকাশ ঘেরি নিঃশব্দে ছুটিছে।
বিস্ময়ে শুনিব ধীরে, মহাস্তব্ধ প্রকৃতির
অভ্যন্তর হ'তে এক গীতধ্বনি উঠিছে॥
গভীর আনন্দ-ভরে, বিস্ফারিত হবে মন
হৃদয়ের ক্ষুদ্র ভাব যাবে সব ছিঁড়িয়া।
তখন অনন্ত কাল, অনন্ত জগত মাঝে
ভুঞ্জিব অনন্ত প্রেম মনঃ প্রাণ ভরিয়া॥

জ্ঞান, নীতি ও ইংরাজী সভ্যতা।

(বকল্ সাহেব-কৃত ইংলণ্ডীয় সভ্যতার ইতিহাস।)

প্রকৃত সভ্যতা কি তাহা আমরা পূর্ব্ব-সংখ্যায় এক প্রকার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে ইংরাজী সভ্যতা কি উপকরণে গঠিত তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। ইংরাজী সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্য দেখিয়া আমরা একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাই, কিন্তু আমাদের জানা উচিত যে, উহা "বিষকুম্ভং পয়োমুখং"। ইংরাজী সভ্যতা-প্রভাবে বাহ্য সুখসমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু মনুষ্যের আভ্যন্তরিক প্রকৃতির উন্নতি হওয়া দূরে থাক্, বরং ক্রমশই অবনতি হইতেছে।

ইংরাজী সভ্যতা-প্রভাবে ইংরাজ-সমাজের উন্নতি কি অধোগতি হইতেছে তাহা ইংরাজদিগের মুখেই শুনা যাউক। ওয়ার্লড্ নামক ইংলণ্ডের একটী প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র বলেন;—"সমাজে সম্ভ্রান্ত-শ্রেণীর মধ্যে

সে সকল ভয়ানক প্রবঞ্চনা ক্রমাগত অনুষ্ঠিত হয়, তাহার ইতিহাস একবার পাঠ করিয়া দেখ—যে সকল জলবিম্ববৎ অস্থায়ী প্রবঞ্চক ব্যবসায়ী-দল বিশ্বাস-প্রবণ লোকদিগের চক্ষে ধূলি দিয়া তাহাদিগের সর্ব্বনাশ ও আপনাদিগের স্বার্থসাধন করে, তাহাদিগের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া দেখ। আমাদের কারাগারের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর—দেখিবে তাহা জ্ঞানশূন্য নীচ পশুবৎ নিষ্ঠুর আচরণে দণ্ডিত বন্দীদিগের দ্বারা পূর্ণ। আমাদের বিক্রেতাগণ খাদ্য দ্রব্যের সহিত অস্বাস্থ্যকর-দ্রব্য-মিশ্রণ-প্রণালীর কত দূর উন্নতি সাধন করিয়াছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখ এবং সমৃদ্ধ লণ্ডন নগরের অধিকাংশ স্থান যে সকল জঘন্য কুটীরে পূর্ণ, সেই সকল কুটীর-নিবাসীদিগের হীন নীতির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর এবং তাহার পর বল দেখি আমাদের ধর্ম্মের ফল কি হইয়াছে? আমাদের চা-পানের সভার অভাব নাই—ধর্ম্মপ্রচারক সভার অভাব নাই—আমাদের Soup Kitchen আছে—আমাদের বাইবেল-বিতরণের সভা আছে—রহদায়তন স্থাপত্যবিশিষ্ট সুদৃশ্য অনেক গির্জ্জা আছে, এবং সেই সকল গির্জ্জার ঘণ্টা সমস্ত দিনই টুং টাং ঢং ঢং করিয়া উপাসকদিগকে ডাকাডাকি করিতেছে সত্য, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, লোকের মনের ভাব কি খৃষ্টধর্ম্মানুগত? অতি বিষাদের সহিত বলিতে হইবে—না।

উচ্ছৃঙ্খলতা এখনকার কালের প্রাণ বলিলেও হয়। কেবল তাহার উপরিভাগে ধর্ম্ম এবং শিষ্টাচারের একটী দুর্ভেদ্য আবরণ আছে মাত্র। আমরা যুদ্ধপ্রিয় মৃত্যু-ভয়-শূন্য উদার-প্রকৃতি বীর পুরুষ নহি—আমরা নীচ ক্ষুদ্র হিসাবী লোক—পয়সা কুড়ানই আমাদিগের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। আমাদের একালে ধর্ম্মোপদেশ অপেক্ষা বিদ্রূপ অধিক কার্য্যকরী এবং ভর্ৎসনা অপেক্ষা ব্যঙ্গ অধিক প্রয়োজনীয়—আমাদের একালে সুইন্‌বর্ণের কবিতাই প্রণয়-কথার চূড়ান্ত আদর্শ এবং বর্লেস্‌ক্‌ নাটাই প্রকৃত দৃশ্য কাব্যরূপে পরিগৃহীত হয়। আমাদের একাল অস্বাভাবিকতার কাল, অসারতার কাল ও সন্দিগ্ধতার কাল। এই সন্দিগ্ধতা অকপট আগ্রহের মৃত্যুস্বরূপ—এই অসারতা ফলবত্তার বিঘ্নস্বরূপ এবং এই অস্বাভাবিকতা সত্যের শত্রুস্বরূপ। অতএব এই কালের নিকট হইতে পয়সা কুড়ান ভিন্ন আর কি আশা করা যাইতে পারে? এখন পয়সারই রাজত্ব, পয়সারই একাধিপত্য। সভ্যতা জিনিস্‌টি মন্দ নয়, উন্নতিও নিতান্ত প্রয়োজনীয় বটে—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি—জন-সাধারণের ভাব-গতির অবনতি হইয়াছে—যে সকল গুণ না থাকিলে মনুষ্যের মহত্ব হয় না, সেই অকপট মনের আগ্রহ, সরলতা এবং জ্বলন্ত উৎসাহ আমরা হারাইয়াছি। আমাদের একালে কোন চাঁদার খাতা খুলিতে গেলে তাহার প্রথমেই বড় বড় নাম থাকা চাই—সাধারণ হিতের জন্য কোন গৃহ-প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে তাহার ভিত্তি-সংস্থাপনের জন্য বড় লোক আবশ্যক,

ধর্ম্মোপদেষ্টা খুব নামজাদা না হইলে তাঁহার বক্তৃতা শোনা হয় না—দান যতই সামান্য হউক না, তাহার বিজ্ঞাপন মহা আড়ম্বরে চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হয়।" ঐ পত্র আর এক স্থলে বলেন যে "আমাদের বৃহৎ বৃহৎ নীতি-গ্রন্থ আছে সত্য, কিন্তু এই সকল নীতি-উপদেশ কার্য্যে কতদূর পরিণত করা হয়? নীতি ও ধর্ম্ম যতক্ষণ না জীবনের কার্য্য সকল নিয়মিত করে, ততক্ষণ তাহাদের কোন মূল্যই নাই। আমাদের কি বিশ্বাস ও আচরণে কোন মিল আছে?—পার্লিয়ামেণ্টের কার্য্য-প্রণালীর সংস্কার লইয়া এত বৎসর ধরিয়া যে বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছে তাহার কারণ কি?—অন্যের ধন চুরি করা পাপ এই উপদেশটী এখানকার লোকে বাল্য কাল হইতে শিক্ষা করিয়া আসিতেছেন—কিন্তু অন্যের নিকট আপনাদের স্বাধীন মত বিক্রয় করা তাঁহারা দূষ্য বলিয়া মনে করেন না। এবং এই জন্য পার্লিয়ামেণ্টে সংস্কার আবশ্যক হইয়াছে। উৎকোচ গ্রহণ হইতে ইংরাজ-জাতিকে বিরত করিবার চেষ্টায় কত পার্লিয়ামেণ্ট সভার অধিবেশন স্থগিত হইয়া গেল—কত মন্ত্রিদলের পতন হইল—কত প্রতিভাশালী ব্যক্তি বৃথা মাথা খুঁড়িয়া মরিলেন। এদেশের অপরিমিত পান-দোষ দেশ বিদেশে রাষ্ট্র হইয়াছে এবং এখানকার বিচারপতিগণ স্ত্রী-নির্য্যাতক স্বামীদিগকে এরূপ দয়ার চক্ষে দেখেন যে, তাঁহারা মনে করেন যে দুই এক মাসের কারাদণ্ড দিলেই স্ত্রীর মাথা গুঁড়া করিবার জন্য স্বামীর যে দোষ তাহা সম্পূর্ণ রূপে ক্ষালিত হয়।"

স্যাটর্‌ডে রিভিউ নামক ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ সমালোচনী পত্রিকা এক স্থলে বলেন—"এই সভ্য-কালে আমরা জাজ্বল্যমান দেখিতে পাইতেছি যে, নর্ত্তকী ও বেশ্যাদলের সংখ্যা ক্রমশই দ্রুতগতি বৃদ্ধি পাইতেছে, স্ত্রীলোকের অনুপযোগিত আধিপত্য এবং বিবাহ নিয়মের অবাধ্যতা ক্রমশই বাড়িতেছে—বিলাস ও কোমলতা এত দূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, জগতের ইতিহাসে তাহার আর সাদৃশ্য নাই, বোধ হয় রোমীয় অবনতির শেষ অবস্থায় যেরূপ ঘটিয়াছিল কেবল তাহারই সহিত তুলনা হইতে পারে। এখনকার কালে যে উপায়েই হউক ধনোপার্জ্জন করিতেই হইবে, এবং লোকের এতদূর অধীরতা বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, তাড়িত বার্ত্তাবহও তাহা নিবৃত্তি করিতে পারে না। এখনকার সাহিত্য অপদার্থ পুনরুক্তি ও বিলাস-ভাবে আকীর্ণ এবং বাণিজ্য-ব্যবসায় নিরঙ্কুশ নিষ্ঠুর প্রতারণায় পরিপূর্ণ।"

নিকল্‌স্ সাহেব তাঁহার মানব-শরীরতত্ত্ব গ্রন্থের ৪২ পৃষ্ঠায় বলেন—"প্রতি বৎসর লণ্ডন নগরের রাজপথে তিন শতেরও অধিক ভ্রূণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেবল অবিবাহিতা স্ত্রীলোকেরাই যে গর্ভ নষ্ট করে তাহা নহে—বিবাহিতা স্ত্রীলোকদিগকেও এই ভয়ানক নিষ্ঠুর কার্য্যে লিপ্ত দেখা যায়।" তিনি ঐ গ্রন্থের ৬৩ পৃষ্ঠায় আরও বলেন যে "ইংলণ্ডে জঘন্য লাম্পট্য

এবং অপবিত্রতার গভীর কলঙ্ক সমাজের কোন শ্রেণীবিশেষ, পদ-বিশেষ, বা বয়ঃক্রম বিশেষে বদ্ধ নাই। তবে বিলাস-পরায়ণ মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ শ্রেণীর ভদ্র লোকের মধ্যে সুনীতির যেরূপ স্পষ্ট ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায় সেরূপ অন্য শ্রেণীর মধ্যে দৃষ্ট হয় না।" ঐ গ্রন্থের ৬৯ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন যে "লণ্ডন নগরে ১৮০০০, এবং সমস্ত ইংলণ্ডে ৫০০০০ বেশ্যার বাস।" ৩৮ পৃষ্ঠায় বলেন "লণ্ডনের প্রধান প্রধান রাজপথ সকল বেশ্যালয়ে পূর্ণ—উহার পূর্ব্ব দিকস্থ সেণ্ট্ জর্জ্ অঞ্চলে ২৩০ বাটীর মধ্যে ১৫০ বাটী বেশ্যালয়।" ৬৯ পৃষ্ঠায় বলেন "প্রত্যেক দুর্গের চতুর্দ্দিকে বেশ্যাগণের উপনিবেশ, প্রত্যেক সৈন্য-নিবাস বেশ্যালয়ের মধ্যে সংস্থাপিত।"

সুবিখ্যাত লেখক হ্যাজ্‌লিট্ "জন্ বুলের চরিত্র" নামক প্রবন্ধে এই রূপ বলেন —"সংক্ষেপে বলিতে গেলে, জন্ বুল * একটা নিরেট্ মূর্খ, দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য প্রকাণ্ড গোঁয়ার—শত বৎসরের দাসত্ব ভোগ না করিলে তাহার আর চৈতন্য হইবে না। তিনি চান যে লোকে তাঁহাকে স্বদেশানুরাগী বলিবেক, কেন না তিনি আর সকল দেশকেই ঘৃণা করেন—তাঁহাকে বিজ্ঞ বলিবেক, কেন না তিনি আর সকল লোককেই নির্বোধ মনে করেন—তাঁহাকে সৎ বলিবেক, কারণ তিনি আর সকল লোককেই জুয়াচোর মনে করেন। যদি সমস্ত জীবন খুঁৎ খুঁৎ করিয়া কাটাইয়া দেওয়াই মানব-চরিত্র-গত উন্নতির পরাকাষ্ঠা হয়, তবে জন-বুলের তাহার খুব নিকটে পৌঁছিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে প্রহার করেন, তাঁহার প্রতিবাসীর সহিত বিবাদ করেন, তাঁহার ভৃত্যগণকে অযথা গালাগালি দেন, এবং সময় কাটাইতে ও মনকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতে মাতাল হয়েন—অথচ তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে তাঁহার ন্যায় নির্দ্দোষ সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন, ধর্ম্মশীল ও নীতিপরায়ণ ব্যক্তি সমস্ত খৃষ্টীয়মণ্ডলীর মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া ভার। তাঁহার আইনের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে তিনি অত্যন্ত গর্ব্ব করেন, অথচ সমস্ত ইউ-রোপ অপেক্ষা ইংলণ্ডেই অধিক লোক ফাঁসি-কাষ্ঠে আরোহণ করে। তিনি স্বদেশীয় মহিলাগণের সতীত্ব লইয়া বড়ই অহঙ্কার করেন, অথচ সমস্ত ইউরোপের রাজধানী একত্র করিলেও যত না হয়, শুদ্ধ লণ্ডনের রাজপথে তাহা অপেক্ষা অধিক বেশ্যার নিবাস। তাঁহার অনেক সুখের দ্রব্য আছে বলিয়া তিনি গর্ব্ব করেন, কেন না পৃথিবীর মধ্যে এমন অসুখী মনুষ্য আর দ্বিতীয় নাই। জনসমাজে তাঁহার কোন আমোদ হয় না, এই নিমিত্ত তিনি নিজ বাটীর বিজন অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বেই আমোদ খোঁজেন—আর সেখানে যে তিনি হতবুদ্ধি হইয়া থাকিবেন সে তো কথাই আছে, সেখানে যে তিনি মুখ ভার করিয়া থাকিবেন তাতে তো তাঁর অধিকারই আছে, এবং সেখানে তিনি যত ইচ্ছা হাস্যাস্পদ হইতে পারেন, কারণ সেখানে কেহ হাসিবার লোক নাই।—বৃষ-

* ইংরাজ জাতি জন বুল অর্থাৎ বৃষ নামে আখ্যাত হয়।

মহাশয় অষ্টপ্রহর এরূপ জঘন্য শপথ করেন যে ফরাসিস্‌রা তাঁহাকে "Monsieur God damn me" উপাধি দিয়াছেন। বুষ মহাশয়ের এক দলের উপর আড়ি থাকিলে, তিনি তাঁহার বিরুদ্ধ দলের সহিত মতের মিল না হইলেও সম্পূর্ণরূপে যোগ দেন—তাঁহার শত্রুতা যেমন অমূলক কারণের উপর স্থাপিত, তাঁহার অন্ধ উৎসাহও তেমনি প্রচণ্ড। ইংলণ্ডের ইতর লোকের ন্যায় অদ্ভুত হাস্যাস্পদ পদার্থ আর জগতে নাই এবং উহারা যেরূপ নিজ উদ্দেশ্য না জানিয়া কাজ করে এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।" বকল সাহেব যিনি ইংরাজী সভ্যতার বিষম পক্ষপাতী তিনিও বলেন যে "ইংরাজ সমাজ যাহারা উত্তম রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, সেই সকল পর্য্যবেক্ষক যাহাদিগের চরিত্র ও মত সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, তাঁহারা সকলই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, মিথ্যা-শপথ যাহা ইংলণ্ডে সচরাচর উচ্চরিত হইয়া থাকে এবং তত্রত্য শাসন-প্রণালী যাহার অব্যবহিত স্রষ্টা, তাহা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এত দূর প্রচলিত যে উহা জাতীয় ভ্রষ্টাচারের আকর হইয়াছে, মানব-সাক্ষ্যের মূল্য হ্রাস করিয়াছে এবং মনুষ্যগণ পরস্পরের উপর স্বভাবতঃ যে বিশ্বাস স্থাপন করে তাহাও বিচলিত করিয়াছে।" বিষপ্ বর্কলি গ্রেট্ ব্রিটেনের ধ্বংশ-নিবারণ নামক প্রবন্ধে, মিথ্যা শপথ-প্রথা ইংরাজ জাতির অবনতির একটী প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন—"এই দোষটী আমাদের জাতির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আছে; পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নাই যাহার মধ্যে মিথ্যা-শপথ-প্রথা এত দূর প্রচলিত; এখানে লোকেরা যেমন সহজে আহার বিহার করে তেমনি সহজে শপথ-ভঙ্গ করে—গভর্ণমেণ্ট যতই কেন উপায় উদ্ভাবন করুন না, যতক্ষণ এই মিথ্যা-শপথ ও উৎকোচ-গ্রহণ রূপ মহাপাপের ভার আমাদের স্কন্ধে থাকিবে ততদিন আমাদের কখনই মঙ্গল হইবে না।" সর্ উইলিয়ম হ্যামিল্টন্ তাঁহার দর্শন শাস্ত্রের বাদানুবাদ নামক গ্রন্থের ৫৫৩ পৃষ্ঠায় বলেন—"কিন্তু যদি মিথ্যা-শপথ বিষয়ে ইংলণ্ড পৃথিবীর মধ্যে অগ্রগণ্য হয়, তাহা হইলে ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, বিশেষতঃ অক্সফোর্ডের* বিশ্ববিদ্যালয়টি যে আবার ইংলণ্ডের মধ্যে

* অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে লেনপার্কের উক্তি হ্যামিল্টনের মতের পোষকতা করিতেছে।—

In the university of Oxford among whose members, the greater number of ecclesiastical benefices are bestowed and which even for laymen is the most fashionable place of education,—when a young man presents himself for admission, his tutor who is generally a clergyman, and the vice-chancellor who is also a clergyman, put into his hands a book of statutes, of which they cause him to swear to observe every one.

অগ্রগণ্য তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। ০০০০ অক্‌স্‌ফোর্ড্‌কে এক্ষণে মিথ্যা-শপথের জাতীয় শিক্ষালয় বলিলেও হয়।"

থ্যাকরে তাঁহার ভ্যানিটি-ফেয়ার অর্থাৎ "ফক্কিকারির হাট বাজার" নামক উপন্যাসের ৩০৬ পৃষ্ঠায় বিদেশে ইংরাজদিগের ব্যবহার সম্বন্ধে বলেন—"ফ্রান্স্ কিম্বা ইটালি দেশের প্রত্যেক নগরে দেখিতে পাইবে যে, আমাদের দেশের সম্ভ্রান্ত লোকেরা আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ সেই ইতর ধরণের দাম্ভিকতা-পূর্ণ নবাবি চাল চোল ও ভড়ং ভাড়ং দেখাইয়া তত্রস্থ নিরীহ সরাইওয়ালা-দিগকে জুয়াচুরি করিয়া ফাঁকি দিতেছে—বিশ্বাস-প্রবণ ব্যাঙ্ক-অধ্যক্ষদিগের নিকট জাল চেক্ চালাইতেছে—গাড়ি ওয়ালাদিগের গাড়ি, সাক্‌রাদিগের গয়না-পত্র, গোবেচারা পান্থদিগের সহিত তাস খেলিয়া তাহাদি-গের পয়সা কড়ি—এমন কি সাধারণ পুস্ত-কালয়ের পুস্তকগুলি আত্মসাৎ করিতেছে।" এই সকল বিখ্যাত ইংরাজ লেখকদিগের মুখেই ইংরাজ-সমাজের পরিচয় পাওয়া গেল—ইংরাজ-সমাজের বিষয় ইংরাজেরা যেরূপ ভাল করিয়া বলিতে পারেন সেরূপ আমরা কখনই পারিব না—অতএব ইহার পর ইংরাজ-সমাজ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলা ধৃষ্টতা মাত্র। সুঃ—

বড়ার কথা।*

এই অশীতি বৎসরে আমি যাহা দেখি-য়াছি এবং স্বর্গীয় অতি-বৃদ্ধদের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই বলিতে আরম্ভ করিলাম। ইতিহাসের কার্য্য কারণের বাঁধাবাঁধি, কালের আঁটা-আঁটি ও তর্কের খুটিনাটি ইহাতে কিছু থাকিবে না, শুষ্কপ্রায় স্মৃতি-নদীর ক্ষীণ জোয়ারে ধীরে ধীরে যাহা ভাসিয়া আসিবে তাহাই তুলিয়া দিব, ভরসা করি এ পরিশ্রম বিফল হইবে না।

গাড়ি, পাল্কি ও নৌকা।—পাশ্চাত্য সভ্যতার আবির্ভাবে এদেশীয়দিগের বাবু গিরির যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। দুই পদ অগ্রসর হইতে হইলে এক্ষণে যান-বাহন আ-বশ্যক। পূর্ব্বে যান-বাহনেরও অসদ্ভাব ছিল ও লোকেরাও বলিষ্ঠ ছিল। সুতরাং পদব্রজে

At the same time, it is perfectly well known to this vice-chancellor and to this tutor, that there never has been any person who was able to observe all these statutes. It is thus that the first lesson this young man learns, and the only lesson he is sure to learn is a lesson of perjury.

Bentham Vol II Page 210

* কাঁচড়াপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত উমানাথ রায় প্রণীত। ইঁহার বয়ঃক্রম অশীতি বৎসর।

সকলে যাতায়াত করিত। বোঁচা ও মেয়ানা পাল্‌কী, বজরা, তানজান্ ইত্যাদিতে বড় লোকেই চড়িতেন, বিবাহের সময় কেবল মধ্যবিত্ত লোকে পাল্‌কী চড়িত, বড়মানুষের ছেলে বিবাহ করিতে গেলে তানজানে যাইত। রথ, হস্তী ও ঘোটকে চড়িয়া বিবাহ করিতে যাওয়া রাজা ও হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে চলিত ছিল। বাঙ্গালির মধ্যে চুঁচুড়া-নিবাসী মৃত নীলমণি হালদার প্রথমে গাড়ি চড়েন, তাঁহার সাহেব কোচম্যান ছিল, তাঁহার দেখাদেখি কলিকাতার বড় মানুষেরা গাড়ি ধরিলেন। পূর্ব্বে এ প্রকার ছেক্‌ড়া গাড়ি ছিল না, দড়িতে ঝুলান নৌকা-আকারের গাড়ি কয়েক খানা মাত্র ছিল। জলপথে বধূ বা কন্যা আনিতে হইলে, জেলেডিঙ্গির উপর টাপর করিয়া সতরঞ্চ মুড়িয়া আনা হইত। যদি কেহ কখন পীড়া বশতঃ বা বড়মানষী করিয়া এক খানা ডিঙ্গী ভাড়া করিতেন. তাহা হইলে আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সকলকেই সংবাদ দেওয়া হইত, সকলে একত্রিত হইয়া ডিঙ্গিচড়ার আয়েস উপভোগ করিতেন। তৎকালে লোকে ডুলিও সর্ব্বদা ব্যবহার করিত। ডুলি তিন কর্ম্মে প্রায় ব্যবহৃত হইত।

১। স্ত্রীলোক আনয়ন বা প্রেরণ।

২। পীড়িতকে গঙ্গাতীরস্থ করা।

৩। অথর্ব্ব যাত্রীর শ্রীক্ষেত্রে গমন।

কালের গতিতে কি না হয়। পূর্ব্বে এক মাসে কাশীধামে পৌঁছিলে মনুষ্যের তৃপ্তি হইত, এক্ষণে ঐ সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া সন্তোষ হয় না, মনুষ্য অল্পায়ুঃ হইয়াছে, কার্য্যও গণেষ্ট বাড়িয়াছে, সুতরাং অল্প সময়ে অধিক কার্য্য করা আবশ্যক। সময়ের অভাব মোচন করিতে রেলগাড়ি কলের জাহাজ, টেলিগ্রাফ ইত্যাদির সৃষ্টি হইয়াছে, হয় ত শত বৎসর পরে দ্রুত গমন করিবার আরও কিছু নূতন উপায়ের আবিষ্ক্রিয়া হইবেক।

বুড়ার সম্মান।—এখনকার নব্য সম্প্রদায় "বুড়া" মাত্রকেই "ওল্ড ফুল" বলিয়া থাকেন, কিন্তু পূর্ব্বে বুড়াদের অত্যন্ত সম্মান ছিল। গ্রামের বুড়া কলহ ভঞ্জন করিবেন, দলাদলি নিবারণ করিবেন, পঞ্জিকা দেখিয়া দিনস্থির করিবেন, বিবাহ শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য কর্ম্মোপলক্ষে আয়োজনাদির ব্যবস্থা দিবেন, এমন কি, তিনি গ্রামের শিরোমণি, যাহা বলিবেন তাহাই হইবে। গ্রামের জামাতারা আসিয়া অগ্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, নূতন লোক আসিয়া প্রথম তাঁহার সহিত আলাপ করিবেন, গ্রামস্থ নব্য দল তাঁহার নিকটে উচ্চ কথা কহিবে না, শীষ দিবে না, বা গান করিবে না, বৌ ঝিরা সে পথে যাইলে মলির বাদ্য করিবে না, এমন কি, মাথায় ফেরতা দিয়া সেখান দিয়া কেহ যাইবে না। ইংরাজদের টুপিখোলা প্রথা যেমন সম্মান-সূচক, মাথায় ফেরতা না দিয়া যাওয়াও তদ্রূপ ছিল।

বয়স্থের শৈশব-সরলতা—মৃত মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুর বড় চোর ডাকাইতের গল্প শুনিতে ভাল বাসিতেন। চোর ডাকাইতেরা গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করিয়া

গেল শুনিলে তিনি মহা কাতর হইতেন, আর যদি গৃহস্থেরা চোর ডাকাইত ধরিয়াছে বা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে বা বিলক্ষণ প্রহার করিয়াছে এমত শুনিতেন, তাহা হইলে আর তাঁহার আনন্দের ইয়ত্তা থাকিত না। আর ঐ প্রকার তাড়নার গল্পই শুনিতে চাহিতেন।

কলিকাতার কোন বড় মানুষ প্রত্যহ বৈকালে গল্প শুনিতেন। গল্প করিবার জন্য মাহিনা করা চাকর নিযুক্ত ছিল। গল্পের নায়ক নায়িকা বা অপর কেহ যদি অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইত, বা তাহাদিগের কোন বিপদ উপস্থিত হইত, তাহা হইলে তিনি এত উত্তেজিত হইতেন যে তৎক্ষণাৎ বলিতেন "মেরোনা মেরোনা, ওকে বাচাও আমি দশ টাকা দিব" অথবা "ঐ বাঘটাকে তাড়াইয়া দেও, ঘুমন্ত কোটালের পুত্রের অনিষ্ট না হয়, আমি ৫ টাকা দিব।" কথকেরা ইচ্ছা করিয়া বাবুকে উত্তেজিত করিত ও নায়ক নায়িকাদিগকে কষ্টে ফেলিয়া টাকা সংগ্রহ করিত।

সেকেলে বড়মানুষী—কোন হিন্দু-রাজা মন্ত্রী ও অপর পারিষদ্‌বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া একদা পৌষ মাসের রাত্রে স্বীয় বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। রাত্রি এক প্রহর হইতেই শিবাদল কোলাহল করিয়া উঠিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন হে মন্ত্রী শেয়াল গুলা ডাকিতেছে?" মন্ত্রী উত্তর করিলেন, "মহারাজ! ওরা শীতে কষ্ট পাইতেছে বলিয়া আপনাকে জানাইতেছে" রাজা ইহা শুনিয়া বলিলেন "আচ্ছা ওদের কম্বল দাও" পর দিন প্রাতঃকালে মন্ত্রী কোষাগার হইতে কম্বলের জন্য ৫০০০ টাকা বাহির করিয়া লইলেন। দিন কয়েক পরে রাজা পুনরায় পারিষদ-বর্গ লইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় শিবাদল অভ্যাস মত আবার ডাকিয়া উঠিল। রাজা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন "কেমন হে মন্ত্রী কম্বল ত দেওয়া হইয়াছে, তবে আবার তাকে কেন?" মন্ত্রী কহিলেন "মহারাজ আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে" রাজা কিছু না বলিয়া নিরুত্তর হইলেন। কিছুকাল পরে রাজা নিতান্ত পীড়িত হইলেন। এবং বাঁচিবার প্রত্যাশা নাই বুঝিয়া মন্ত্রী ও রাজকুমারকে আহ্বান করিলেন। উহারা দুইজনে উপস্থিত হইলে পর রাজা মৃদুস্বরে বলিলেন "মন্ত্রী আমি ত চলিলাম, রাজকুমার ছেলে মানুষ, যাহাতে সমস্ত বজায় থাকে দেখিবে, অর্থ-নাশ কোন প্রকারে না হয়।" মন্ত্রী ক্রন্দনের ভাণ করিয়া কহিলেন, "মহারাজের ধন আমার শরীরের রক্ত, কোন মতে তার অপব্যয় হইবে না, আমি পাইটি পর্য্যন্ত কোষাগারে জমা দিব।" রাজা কহিলেন "তবে সেই ৫০০০ টাকা সুদ সমেত জমা দিও।" মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন ৫০০০?" রাজা উত্তর করিলেন "যে ৫০০০ টাকায় শিয়ালদের কম্বল দিয়াছিলে।" মন্ত্রী লজ্জায় অধোবদন হইলেন। রাজা আর কিছু না বলিয়া উত্তর করিলেন "তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য আমি ঐ প্রকার করিয়াছিলাম। তুমি খাঁটি নহ তাহা আমি জানিতাম, যাহা

হউক শেয়ালদের কম্বল দেওয়া আর কখন না হয়, ও প্রকার করিলে আপনার মান হারাইবে, ঐ প্রকার আচরণ করিলে উষ্ণ-শোণিত রাজকুমার কদাচ তোমার মান রাখিবেন না।"

গল্পটির সার এই—প্রতারিত হইতেছি জানিয়াও অনুগতকে অকাতরে ও সাহ্লাদে দান করা, এবং শেষে টাকার উল্লেখ করিয়া মন্ত্রীকে সতর্ক করা মাত্র।

গণিকা।—এসম্প্রদায় যদিও কুলটা তত্রাপি একেবারে ধর্ম্ম-কর্ম্ম বা দয়া দাক্ষিণে বর্জ্জিতা ছিল না। অনেকেই গৃহস্থের ন্যায় আচরণ করিত ও হিন্দুয়ানীতে বিশেষ আস্থা রাখিত; অনেকের বাটীতে নিত্য সেবা ও পূজাদি হইত। তখনকার অধিকাংশ লোকেই বেশ্যালয়ে গমন করিতেন। যাইবার কোন কদর্য্য অভিপ্রায় ছিল না। কেবল দশ-জন ভদ্রলোকে একত্রিত হইয়া গান বাদন, ক্রীড়া বা সদালাপ করাঁমাত্র। এ বিষয়ে পূর্ব্বকার গ্রীকদিগের সহিত বাঙ্গালিদের অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীকদিগের (Hetairae) হিটেরি বেশ্যা-লয়ে, যত গণ্য মান্য ও সম্ভ্রান্ত একত্রিত হইয়া সমালোচনা ও তর্কাদি করিতেন। সক্রেটিসের রক্ষিত আস্‌পেসিয়ার ভবনেও এই প্রকার বহুতর ভদ্র লোকের সমাগম হইত। ফ্রান্স্ দেশে (Ninon Declos) নিনো ডেক্লোর ভবনেও ঐরূপ হইত। কুটী য়ালেরা আপিস হইতে আসিয়া, হস্তপদাদি ধৌত করিয়া, বৃদ্ধ ও আধ বৃদ্ধেরা হরি নামের ঝুলি লইয়া, বেশ্যালয়ে উপস্থিত হই-তেন; বয়সের তারতম্য ছিল না, সকল বয়-সের লোকই সমবেত হইতেন। অনেকে ঐ সমস্ত স্থানে "সহবৎ" শিক্ষা করিতে আসি-তেন। পান তমাকু সেবন, কখন কখন গাঁজা ও চরসের ধূম-পান ব্যতীত মদ্যের সহিত কোন সংশ্রব ছিল না। দুই এক ঘণ্টা আমোদ করিয়া সকলে চলিয়া যাইতেন। তখনকার বড় মানুষেরা এই প্রকার সবান্ধবে আমোদ করিবার নিমিত্ত বেশ্যা রাখিতেন। বেশ্যার সংখ্যা তখন অত্যন্ত অল্প ছিল।

মেঘনাদ-বধ কাব্য।

(মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত।)

আমরা গত বারে যখন রাবণের চরিত্র সমালোচনা করিয়াছিলাম, তখন মনে করিলাম যে, রাবণের ক্রন্দন করা যে অস্বা-ভাবিক, ইহা বুঝাইতে বড় একটা অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না; কিন্তু এখন দেখিলাম বড় গোল বাধিয়াছে; কেহ কেহ বলিতেছেন "রাবণ পুত্র শোকে কাঁদি-য়াছে, তবেইত তাহার বড় অপরাধ!" পুত্র-শোকে বীরের কিরূপ অবস্থা হয়, তাঁহারা আপনা-আপনাকেই তাহার আদর্শ-

স্বরূপ করিয়াছেন। ইহাঁদের একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ করিতেছি। পাঠকদের কেহ বা ইচ্ছা করিয়া বুঝিবেন না, তাঁহাদের সঙ্গে যুঝা-যুঝি করা আমাদের কর্ম্ম নহে, তবে যাঁহারা সত্য অপ্রিয় হইলেও গ্রহণের জন্য উন্মুখ আছেন তাঁহারা আর একটু চিন্তা করিয়া দেখুন।

সেনাপতি সিউয়ার্ডের পুত্র যুদ্ধে হত হইলে রস্ আসিয়া তাঁহাকে নিধন সংবাদ দেন। সিউয়ার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "সম্মুখ ভাগেইত তিনি আহত হইয়াছিলেন?"

রস।—"হাঁ, সম্মুখেই আহত হইয়াছিলেন।"

সিউয়ার্ড।—"তবে আর কি! আমার যত গুলি কেশ আছে তত গুলি যদি পুত্র থাকিত, তবে তাহাদের জন্য ইহা অপেক্ষা উত্তম মৃত্যু প্রার্থনা করিতাম না।"

ম্যাল্‌কম্।—"তাঁহার জন্য আরো অধিক শোক করা উচিত।"

সিউয়ার্ড।—"না, তাঁহার জন্য আর অধিক শোক উপযুক্ত নহে। শুনিতেছি তিনি বীরের মত মরিয়াছেন, ভালই, তিনি তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন, ঈশ্বর তাঁহার ভাল করুন।"—ম্যাক্‌বেথ।

আমরা দেখিতেছি, মাইকেলের হস্তে যদি লেখনী থাকিত তবে এই স্থলে তিনি বলিতেন যে,

"হা পুত্র, হা সিউয়ার্ড, বীর-চূড়ামণি
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে!"

অ্যাডিসন তাঁহার নাটকে পুত্র-শোকে কেটোকে ত ক্ষুদ্র মনুষ্যের ন্যায় রোদন করান নাই!

স্পার্টার বীর-মাতারা পুত্রকে যুদ্ধে বিদায় দিবার সময় বলিতেন না, যে,

"একাল সমরে,
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে
তোমা বারংবার!"

তাঁহারা বলিতেন "হয় জয় নয় মৃত্যু তোমাকে আলিঙ্গন করুক!"

রাণা লক্ষ্মণ সিংহ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, দ্বাদশ রাজপুত্র যুদ্ধে মরিলে জয় লাভ হইবে; তিনি তাঁহার দ্বাদশ পুত্রকেই যুদ্ধে মরিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তিনি ত তখন রুদ্যমান পারিষদগণের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সভার মধ্যে

"ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রু-ধারা তিতিয়া বসনে,"

কাঁদিতে বসেন নাই।

রাজস্থানের বীরদিগের সহিত, স্পার্টার বীর-মাতাদের সহিত তুলনা করিলে কল্পনা-চিত্রিত রাবণকেত স্ত্রীলোকের অধম বলিয়া মনে হয়!

কেহ কেহ বলেন, "অন্য কবি যাহা লিখিয়াছেন তাহাই যে মাইকেলকে লিখিতে হইবে এমন কি কিছু লেখাপড়া আছে?" আমরা তাহার উত্তর দিতে চাহি না, কেবল এই কথা বলিতে চাহি যে, সকল বিষয়েরইত একটি উচ্চ আদর্শ আছে, কবির চিত্র সেই আদর্শের কত নিকটে পৌঁছিয়াছে এই দেখিয়াই ত আমাদের কাব্য আলোচনা করিতে হইবে।

স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক এই দুইটি কথা লইয়া কতকগুলি পাঠক অতিশয় গণ্ডগোল করিতেছেন। তাঁহারা বলেন যাহা স্বাভাবিক তাহাই সুন্দর, তাহাই কবিতা; পুত্র-শোকে রাবণকে না কাঁদাইলে অস্বাভাবিক হইত, সুতরাং কবিতার হানি হইত। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা জানেন না যে, এক জনের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, আর এক জনের পক্ষে তাহাই অস্বাভাবিক। যদি ম্যাক্‌বেথের ডাকিনীরা কাহারো কষ্ট দেখিয়া মমতা প্রকাশ করিত তবে তাহাই অস্বাভাবিক হইত, যদিও সাধারণ মনুষ্যদের পক্ষে তাহা স্বাভাবিক। আমি ত বলিতেছি না যে, বীর কষ্ট পাইবেন না, দুঃখ পাইবেন না; সাধারণ লোক যত খানি দুঃখ কষ্ট পায় বীর তেমনি পাইবেন অথবা তদপেক্ষা অধিক পাইতেও পারেন, কিন্তু তাঁহার এতখানি মনের বল থাকা আবশ্যক যে, পুরুষের মত, বীরের মত, তাহা সহ্য করিতে পারেন; শরীরের বল লইয়াইত বীরত্ব নহে। যে ঝড়ে বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া ফেলে সেই ঝড়ই হিমালয়ের শৃঙ্গে আঘাত করে, অথচ তাহা তিল-মাত্র বিচলিত করিতে পারে না। কেহ কেহ বলেন "ঐ প্রকার মত পূর্ব্বকার ষ্টোয়িকদিগেরই সাজিত, এখন উনবিংশ শতাব্দীতে ও কথা শোভা পায় না; ষ্টোয়িক দার্শনিক যে, অগ্নিতে হাত রাখিয়া স্থির ভাবে দহন-জ্বালা সহ্য করিয়াছেন সে তাঁহাদের সময়েরই উপযুক্ত।" শিক্ষিত লোকেরা এরূপ অর্থহীন কথা যে, কি করিয়া বলিতে পারেন তাহা আমরা অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিলাম না। তাঁহারা কি বলিতে চাহেন যে, অগ্নিতে হাত রাখিয়া ক্রন্দন করাই বীর পুরুষের উপযুক্ত! তাঁহাদের যদি এরূপ মত হয় যে, উনবিংশ শতাব্দীতে এরূপ বীরত্বের প্রয়োজন নাই, তবে তাঁহাদের সহিত তর্ক করা এ প্রস্তাবে অপ্রাসঙ্গিক, কেবল তাঁহাদিগকে একটি সংবাদ দিতে ইচ্ছা করি যে, বাল্মীকির রামায়ণ পড়িয়া ও অন্যান্য নানাবিধ প্রমাণ পাইয়া আমরা ত এই রূপ ঠিক করিয়াছি যে রাবণ উনবিংশ শতাব্দীর লোক নহেন! ষ্টোয়িকদের ন্যায় সমস্ত মনোবৃত্তিকে নষ্ট করিয়া ফেলা যে বীরত্ব নয় তাহা কে অস্বীকার করিবে? যেমন বিশেষ বিশেষ রাগ রাগিণীর বিশেষ বিশেষ বিসম্বাদী সুর আছে, সেই সেই সুর-সংযোগে সেই সেই রাগিণী নষ্ট হয়, সেইরূপ এক একটি স্বভাবের কতকগুলি বিরোধী গুণ আছে, সেই সকল গুণ বিশেষ বিশেষ চরিত্র নষ্ট করে। বীরের পক্ষে শোকে আকুল হইয়া কাঁদিয়া গড়াগড়ি দেওয়াও সেই প্রকার বিরোধী গুণ। যাক—এসকল কথা লইয়া অধিক আন্দোলন সময় নষ্ট করা মাত্র। এখন লক্ষ্মীর চরিত্র সমালোচনা করা যাউক।*

* আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় দেখাইয়াছি যে মৃত মেঘনাদের সহিত বায়ু বল ছিন্ন কিংশুক ফুলের তুলনা অনুচিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাকে একটু মোচড়াইয়া "কিংশুক" শব্দে কিংশুক-বৃক্ষ অর্থ করিলে সে দোষ কাটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় কিংশুক বলিতে বৃক্ষ না বুঝাইয়া পুষ্পই বুঝায়, যেমন আম্র বলিলে ফলই বুঝায়, গোলাপ বলিলে ফুলই বুঝায়, ইত্যাদি।

প্রথম সর্গের মধ্যভাগে লক্ষ্মী-দেবীর অবতারণা করা হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মেঘনাদ-বধে কতকগুলি চরিত্র সুচিত্রিত হয় নাই এবং কতকগুলি আমাদের মনের মত হয় নাই। রাবণের চরিত্র যেমন আমাদের মনের মত হয় নাই তেমনি লক্ষ্মীর চরিত্র সুচিত্রিত হয় নাই। লক্ষ্মীর চরিত্র-চিত্রের দোষ এই যে, তাঁহার চরিত্র কি রূপ আমরা বলিতে পারি না। আমরা যেমন বলিতে পারি যে, মেঘনাদ-বধের রাবণ স্ত্রীলোকের ন্যায় কোমল-হৃদয়, অসাধারণ পুত্রবৎসল, তেমন কি লক্ষ্মীকে কিছু বিশেষণ দিতে পারি? সে বিষয় সমালোচনা করিয়াই দেখা যাউক।

মুরলা আসিয়া লক্ষ্মীকে যুদ্ধের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে, লক্ষ্মী কহিলেন,

"———চায়লো স্বজনি!
দিন দিন হীন-বীর্য্য রাবণ দুর্ম্মতি,
যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে!"

শেষ ছত্রটিতে ভাবের অনুযায়ী কথা বসিয়াছে, ঠিক বোধ হইতেছে যেন তরঙ্গ বার বার আসিয়া তটভাগে আঘাত করিতেছে। মুরলা জিজ্ঞাসা করিলেন "ইন্দ্রজিৎ কোথায়?" লক্ষ্মীর তখন মনে পড়িল যে, ইন্দ্রজিৎ প্রমোদ উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন, এবং মুরলাকে বিদায় করিয়া ইন্দ্রজিতের ধাত্রীবেশ ধরিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে ইন্দ্রজিৎকে ভ্রাতার মৃত্যু-সংবাদ দিয়া যুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিলেন। এত দূর পড়িয়া আমরা দেবীকে ভক্তবৎসলা বলিতে পারি। কিন্তু আবার পরক্ষণেই ইন্দ্রের নিকট গিয়া বলিতেছেন,

"———বহু কালাবধি
আছি আমি সুরনিধি স্বর্ণ লঙ্কা ধামে,
বহুবিধ রত্নদানে বহু যত্ন করি,
পূজে মোরে রক্ষোরাজ। হায় এত দিনে
বাম তার প্রতি বিধি! নিজ কর্ম্ম-দোষে
মজিছে সবংশে পাপী; তবুও তাহারে
না পারি ছাড়িতে, দেব। বন্দী যে, দেবেন্দ্র,
কারাগার দ্বার নাহি খুলিলে কি কভু
পারে সে বাহির হোতে? যতদিন বাঁচে
রাবণ, থাকিব আমি বাঁধা তার ঘরে।"

আর এক স্থলে—"না হইলে নির্ম্মূল সমূলে রক্ষঃপতি, ভবতল রসাতলে যাবে!"

অর্থাৎ তুমি কারাগারের দ্বার খুলিবার উপায় দেখ, রাবণকে বিনাশ কর, তাহা হইলেই আমি আস্তে আস্তে বাহির হইয়া আসিব। রাবণ পূজা করে বলিয়া মেঘনাদ-বধের লক্ষ্মীর তাহার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ জন্মিয়াছে, এ নিমিত্ত সহজে তাহাকে ছাড়িয়া আসিতে পারেন না, ভাবিয়া ভাবিয়া একটি সহজ উপায় ঠাওরাইলেন, অর্থাৎ রাবণ সবংশে নিহত হইলেই তিনি মুক্তিলাভ করিবেন। আমাদের সহজ বুদ্ধিতে এইরূপ বোধ হয় যে, রাবণ যদি লক্ষ্মীর স্বভাবটা ভাল করিয়া বুঝিতেন ও ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিতেন যে লক্ষ্মী অবশেষে এইরূপ নিমখারামী করিবেন, তবে নিতান্ত নির্ব্বোধ না হইলে কখনই তাঁহাকে

"বহুকালাবধি

বহুবিধ রত্নদানে বহু যত্ন করি"
পূজা করিতেন না।

লক্ষ্মী ইন্দ্রকে কহিতেছেন,

"মেঘনাদ নামে পুত্র, হে বৃত্রবিজয়ী,
রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে।"

ইহার মধ্যে যে একটু তীব্র উপহাস আছে; দেবী হইয়া লক্ষ্মী ইন্দ্রকে যে এরূপ সম্বোধন করেন, ইহা আমাদের কাণে ভাল শুনায় না। ঐ ছত্র দুটি পড়িলেই আমরা লক্ষ্মীর যে মৃদু হাস্য-বিষ-মাখা একটি মর্ম্মভেদী কটাক্ষ দেখিতে পাই, তাহাতে দেব ভাবের মাহাত্ম্য অনেকটা হ্রাস হইয়া যায়। লক্ষ্মী ঐরূপ আর এক স্থলে ইন্দ্রের কৈলাসে যাইবার সময় তাঁহাকে কহিয়াছিলেন,

"বড় ভাল বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে।
কহিও বৈকুণ্ঠ পুরী বহুদিন ছাড়ি
আছয়ে সে লঙ্কা পুরে! কত যে বিরলে
ভাবয়ে সে অবিরল, একবার তিনি,
কি দোষ দেখিয়া, তারে না ভাবেন মনে?
কোন্ পিতা দুহিতারে পতিগৃহ হোতে
রাখে দূরে—জিজ্ঞাসিও, বিজ্ঞ জটাধরে।"

এখানে "বিজ্ঞ জটাধর" কথাটি পিতার প্রতি কন্যার প্রয়োগ অসহনীয়। ইহার পর ষষ্ঠ সর্গে আর এক স্থলে লক্ষ্মীকে আনা হইয়াছে। এখানে মায়া আসিয়া লক্ষ্মীকে তেজ সম্বরণ করিতে বলিলেন। লক্ষ্মী কহিলেন

"কার সাধ্য, বিশ্বধাত্রী অবহেলে তব
আজ্ঞা? কিন্তু প্রাণ মম কাঁদেগো স্মরিলে
এ সকল কথা! হায় কত যে আদরে
পূজে মোরে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, রাণী মন্দোদরী,
কি আর কহিব তার?"

ইহাতে লক্ষ্মীকে অত্যন্ত ভক্ত-বৎসলা বলিয়া মনে হয়, তবে যেন মায়ার আজ্ঞায় ভক্ত-গৃহ ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছেন। আবার সপ্তম সর্গে তিনিই রাবণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। লক্ষ্মী যে কিরূপ দেবতা তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না এবং কখনো যে তাঁহাকে পূজা করিতে আমাদের সাহস হইবে, তাহারো কোন সম্ভাবনা দেখিলাম না। মেঘনাদ-বধে দেবতা ও সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে কিছুমাত্র বিভিন্নতা রক্ষিত হয় নাই; ইন্দ্রাদির চরিত্র-সমালোচনা-কালে পাঠকেরা তাহার প্রমাণ পাইবেন।

ভঃ

গঞ্জিকা।

অথবা,

তুরিতানন্দ বাবাজির আক্‌ড়া।

বাচস্পতি-মহাশয় এক দিন বলিলেন "অহে বংসাহেব, তোমরা যে কালেজ কালেজ কর, ও-শব্দটার অর্থ কি আমাকে বলিতে পার? আমি উহার এইরূপ ভাষা করি—কালেজ কি না কা-য়ের পশ্চাদ্ভাগে লেজ যাঁর ইত্যর্থে কালেজঃ। নামেও গা' কাজেও

তাই—আমাদের সেকালের টোলের যত বড় বিদ্যাসাগরই হউন না, তাঁহাকে লঙ্ঘন করা কালেজ-বীরেরই কার্য্য!" এইরূপে যখন বাচস্পতি-মহাশয় নস্যের বারুদে হাস্যের অগ্নি সংযোগ করিয়া ভাষ্যের গোলা নিক্ষেপ করিলেন, বংসাহেব কি করিলেন? তিনি পাইপ মুখে করিয়া, ফড়াৎ করিয়া ম্যাচ্ বক্সে দিয়াসলাই টানিয়া, বাম হস্তের অবধানতা এবং দক্ষিণ হস্তের দক্ষতার গুণে নল ভাণ্ডে অগ্নিকাণ্ড করিয়া, গল্পিকাধূমে মুখাভ্যন্তর পরিপূর্ণ করিয়া, এতগুলি কার্য্য চকিতের মধ্যে সামাধা করিয়া বাচস্পতি মহাশয়ের দিকে ধূম ফুৎকার করত বলিলেন "উনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানের উজ্জ্বলতা, উদারতা এবং উন্নতি-শীলতার প্রতি উপহাস কি উচিত?" এইরূপ গোটা পাঁচ ছয় উয়ের গুঁয়ে বাচস্পতি মহাশয়ের কথাটা একেবারেই উড়াইয়া দিলেন। সর্ব্বজ্ঞতা মহাশয় বলিলেন "ইঙ্গ-বঙ্গ তুমিও একদিক্ দেখিতেছ, বাচস্পতি-মহাশয় কিছু মনে করিবেন না, আপনিও কেবল একদিক্ দেখিতেছেন। তুমি ইঙ্গ বঙ্গ বিলাত রঙ্গক টানিয়া থাক, বাচস্পতি-মহাশয় আপনি ভারতরঞ্জন টানিয়া থাকেন—কিন্তু আমি পাঁচ মিসল করিয়া পঞ্চরঞ্জন টানিয়া থাকি। আমার কিছুতেই দ্বিধা নাই—আমার কাছে টিকি পড়মও যা, হ্যাট্ বুট্ও তা, সবই সমান। আমার যে কেবল পুঁথিগত বিদ্যা তাহা নহে, আমি অনেক ভ্রমণ করিয়াছি, অনেক দেখিয়াছি, অনেক শুনিয়াছি; এমনি সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়াছি যাহা তোমাদের স্বপ্নের অগোচর; উক্ততরণের ভট্ট সাহেবকে পট্টবস্ত্র পরিয়া হবিষ্য করিতেও দেখিয়াছি; আর বুড়া বাল্মীকি মুনিকে হ্যাট্ কোট্ পরিয়া খানা খাইতেও দেখিয়াছি; দেখিবার আর কিছু বাকি রাখি নাই।

বাল্মীকির নাম শুনিয়া হাস্য করিতেছেন? করিবেন না। আপনারা জানেন যে, বাসদেবই অমর, কিন্তু আমি বহুশাস্ত্র অন্বেষণ করিয়া সন্ধান পাইয়াছি যে, বাল্মীকি মুনিও অমর। তিনি এখন ডাক্তার বাল্মীকি মুনি হইয়া অধুনাতন কালের তমসা নদীর (টেম্‌স্ নদীর) তীরে নন্দন পুরীতে (লণ্ডন নগরে) বাস করিতেছেন। তাঁহার রচিত উনবিংশ শতাব্দীয় রামায়ণের প্রথম কাণ্ডটী আমার কণ্ঠস্থ আছে; তাহা শুনিলে আপনারা বিস্মিত হইবেন যে, এমন যে, সেকেলে মুনিগোসাঁই বাল্মীকি তিনিও কালেজী পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহা আমি পাঠ করিতেছি আপনারা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। এই বলিয়া পাঠারম্ভ করিলেন।

রামিয়াড্

অথবা

ডাক্তার বাল্মীকি এল্ এল্ ডি, এফ্ আর্ সি এস্ কৃত

ঊনবিংশ শতাব্দীয় রামায়ণ

পুণ্যতীর্থ তমসা-নদীর তীরে ডাক্তার বাল্মীকির তপোবন। তার-কণ্ঠী কুক্কুট

কুকুটী বিহঙ্গমা মনের উল্লাসে গান করিতেছে; কোথাও বা আশ্রম-মৃগ কুক্কুরগণ সুখে অস্থি চর্ব্বণ রোমন্থ করিতেছে। ডাক্তার বাল্মীকি আশ্রম-কুটীরে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ফায়ের-সাইড্-অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে ঈজিচেয়ার-বেদীতে হেলান দিয়া ম্যানিলা পত্রের ধূমপান করিতেছেন; চুরট-প্রান্ত হইতে ঘন ধূমরাশি কুণ্ডলী পাকাইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে, সেই ধূপধূনার পুণ্য গন্ধে আশ্রম কুটীর আমোদিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে মুনিবর পার্শ্বস্থিত বোতল-কমণ্ডলু হইতে শ্যামপেনের সোম-পান করিতেছেন; এমন সময়ে কুটীর-দ্বারে ঘা পড়িল। মুনিকুমার মাষ্টর ভরদ্বাজ, ডাক্তার বাল্মীকির নিকটে আসিয়া সমাচার দিল—"রেবেরেণ্ড মিষ্টর নারদ আসিয়াছেন।" ধ্যানমগ্ন বাল্মীকির চটক্ ভাঙ্গিয়া গেল, অমনি তিনি শশব্যস্তে উঠিয়া দ্বার-দেশে উপস্থিত হইলেন এবং হাইচর্চ মিসনরি সোসাইটির পরিব্রাজক মিসনরি, সঙ্গীতের অধ্যাপক, সহস্র চুরট-ভস্মকারী গোথাদকদিগের অগ্রগণ্য রেবেরেণ্ড নারদের সহিত চটুল-ভাবে হস্তালোড়ন পূর্ব্বক "কেমন করিতেছ" বলিয়া কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ উত্তর করিলেন "সম্পূর্ণ ভাল—ধন্যবাদ তোমাকে।" অতঃপর বাল্মীকি নারদকে আহ্বান পূর্ব্বক কুটীরের মধ্যে লইয়া গিয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন। মহামুনি, ধুচুনি উষ্ণীষ মস্তক হইতে অবতারণ পূর্ব্বক চেয়ারে উপবেশন করিলেন, পরে চেয়ারের নিম্নে উষ্ণীষ স্থাপন করিয়া বলিলেন "বাল্মীকি! তোমায় আজ এত ভাবিত দেখিতেছি কেন?" বাল্মীকি উত্তর করিলেন "প্রিয় খুড়া, সত্য বলিয়াছ, আমি কিছু ভাবিত আছি; অনেক দিন হইতে আমি মনে করিতেছি একটি মহাকাব্য লিখিব—কে নায়ক হইবার উপযুক্ত তাহাই এতক্ষণ আমি এই অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া ধ্যান করিতেছিলাম। বুদ্ধিকে সতেজ করিবার জন্য গ্যালন্ গ্যালন্ সোমপান করিয়াছি তথাপি তাহার কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই। এক্ষণে, খুড়া, তুমি কি এত দয়ালু হইবে যে, ইহার একটা সৎপরামর্শ দিয়া আমাকে বাধিত করিবে?" সুবিজ্ঞ নারদ আজানুলম্বিত পাকা দাড়ি বুলাইতে বুলাইতে উত্তর করিলেন—"দেখ বাপু বাল্মীকি! মহাকাব্য, ভাষায় যাহাকে এপিক্ পোয়েম বলে, তাহা অতি দুরূহ ব্যাপার, তাহা লেখা তোমার আমার কর্ম্ম নহে। এক যা' লিখিয়াছিলেন মহর্ষি হোমর—তেমন এপর্য্যন্ত পৃথিবীতে কেহ লিখিতে পারে নাই—পারিবেও না; তুমি সে দুরাশা পরিত্যাগ কর।" বাল্মীকি বলিলেন "খুড়ো অমন আশীর্ব্বাদ করিও না—মনুষ্য যাহা করিয়াছে মনুষ্য তাহা করিতে পারে। হোমর ইলিয়াড লিখিয়াছেন—আমি কি কিছুই লিখিতে পারি না? হোমর ইলিয়াড্ লিখিয়াছিলেন, আমি রামিয়াড্ লিখিব! আমার ইন্‌স্‌পিরেষণ আসিয়াছে, তোমার হার্প্‌টা আমাকে দেও, আমি রামিয়াড্ গান করি।" এই কথা বলিয়া বাল্মীকি হার্প্ বাদন পূর্ব্বক গর্দ্দভ-বিনিন্দিত সুমধুর স্বরে ঊনবিংশ

শতাব্দীয় রামায়ণ গান আরম্ভ করিলেন। বাল্মীকির স্বহস্ত-পালিত আশ্রম মৃগ কুক্কুরগণ প্রভু প্রসাদ গো-অস্থি রোমন্থ করিতেছিল—গীত-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া নিকটে আগমন পূর্ব্বক ভেউ ভেউ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। উভয় স্বর মিলিয়া একটি মধুর সঙ্গীত-লহরী গগনতলে সমুত্থিত হইল।

রাম নামে এক জন দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ নরপতি ছিলেন। তাঁহার দেহ মধ্যমাকার, হর্কুলিসের ন্যায় দৃঢ়-গঠন, নাসিকা রোমীয় ছাঁদের, ওষ্ঠাধর কিঞ্চিৎ চাপা, ইহাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সূচিত হইতেছে। তাঁহার কুঞ্চিত কুন্তল আবলুষ-কাষ্ঠ-বিনিন্দিত-মসৃণ-ললাটে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বোধ হইতেছে যেন বিশাল ওকগাছে আইবি-লতা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সেই লোকপূজিত রাম গাম্ভীর্য্যে নেস্টরের ন্যায়, ধৈর্য্যে আল্প গিরির ন্যায়, বীর্য্যে এখিলিসের ন্যায়, সৌন্দর্য্যে ক্যুপিডের ন্যায়, ক্ষমায় যীশু খ্রীষ্টের ন্যায়, ধনে রথচাইল্‌ডের ন্যায়, শাস্ত্রজ্ঞানে মোক্ষমূলারের ন্যায় অসাধারণ ছিলেন। তিনি রাজা দশরথের প্রিন্স অফ্ ওয়েল্‌স্। এক দিন রাম মৃগয়ার্থ মিথিলা-সন্নিহিত কোন অরণ্যে খ্যাকশেয়ালী শীকার করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদ অতি পরিপাটী। নীলাভ উৎকৃষ্ট বনাতের কোট্ ও নব্যতম ঢপের চোস্ত পেন্‌ট্‌লুন পরিধান, মস্তকোপরি সোলার হ্যাট্, পদদ্বয়ে শীকারোপযোগী ওয়েলিঙ্‌টন বুট্ আজানু-সমুত্থিত, এবং উইস্কির বোতল ও কাট্‌লেট্-সম্বলিত চর্ম্মঝুলি চর্ম্মোপবীতে আলম্বিত রহিয়াছে। শিঙ্গার নিনাদে, কুক্কুরের চীৎকারে, শিকারীগণের হর্‌রে রবে, অশ্বের হ্রেষা-ধ্বনিতে কানন-প্রদেশ ধ্বনিত হইতে লাগিল। রামচন্দ্র বর্ষা উদ্যত করিয়া শৃগালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া একেবারে কাননের প্রান্তদেশে উপস্থিত হইলেন। শৃগাল দৃষ্টিবহির্ভূত হইল। রাম নিরাশ হইয়া একটা বৃক্ষে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইলেন এবং পাকেট্ হইতে রুমাল বাহির করিয়া ঘন ঘন মুখ পুঁছিতে লাগিলেন। সহসা রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত কাতর চীৎকার ধ্বনি তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইল। রাম এক জন গ্যালাণ্ট্ লোক। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ধ্বনির অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলেন একটি চত্বারিংশৎ বর্ষীয়া বালিকা মূর্চ্ছিতা। রাম অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন—তাঁহার ব্যাগের মধ্যে আঘ্রাণ-লবণ খুঁজিলেন কিন্তু পাইলেন না। পরে উইস্কির বোতলে যে মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ ছিল তাহার এক ডোজ্ বালিকাটির মুখে ঢালিয়া দিলেন—দিবা মাত্রই সমস্ত শরীর নড়িয়া উঠিল—ক্রমে ক্রমে চক্ষু উন্মীলিত হইল, চক্ষু মেলিতেই সম্মুখে রামকে দেখিতে পাইলেন—অমনি "O my!" বলিয়া দুই হাতে পুনর্ব্বার চক্ষু আচ্ছাদন করিলেন। রাম বলিলেন "ভয় নাই—আমি আপনার রক্ষা হেতু আসিয়াছি। কি জন্য আপনি ভয় পাইয়াছিলেন জিজ্ঞাসা করিতে পারি?" চত্বারিংশ বর্ষীয়া

বালিকা উত্তর করিলেন "আমি আরণ্যক দৃশ্যের স্কেচ্ তুলিতেছিলাম আর আমার গাউনের আঁচল ঘেঁসিয়া কেমন একটা জন্তু—বোধ হয় শৃগাল—দৌড়িয়া চলিয়া গেল, তাহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত ভয় পাইয়াছি।

রাম।—হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া আছেন কেন?

বালিকা।—আমার ভয় হইতেছে পাছে আবার শৃগালটা আসে—আমাকে যদি কেউ, এই অরণ্য-পথের রক্ষক হইয়া, আমার বাড়ি পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দেন, তবে আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই।

রাম।—তার জন্য চিন্তা কি?

এই বলিয়া বালিকাকে উঠাইয়া তাঁহাকে বলিলেন "আমি কি আপনাকে বাহুদান করিতে পারি?" সীতা বলিলেন "ধন্যবাদ আপনাকে।" রাম হস্ত বাড়াইয়া দিলেন; বালিকা ঈষৎ ব্রস্ করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন "আপনি যে আমাকে এই মহা বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিলেন তাহার ঋণ আমি কিরূপে পরিশোধ করিব?"

রাম।—আমি যে উপকার করিলাম তাহা অতি সামান্য।

বালিকা। ও-কথা বলিবেন না—আপনার ন্যায় বীর পুরুষ উপস্থিত না থাকিলে নিশ্চয়ই আজ শৃগালের হস্তে প্রাণ হারাইতাম।

রাম।—আমি থাকিতে আপনার কোন ভয় নাই। এক্ষণে পরস্পরের নিকট আর অপরিচিত থাকা কর্ত্তব্য নয়। আমার নাম রাম—আপনার নাম জিজ্ঞাসার স্পর্দ্ধা কি মার্জ্জনা করিবেন?

বালিকা।—আমার নাম মিস্ সীতা জনক।

রাম। ও! আপনি হিজ্ ম্যাজেস্টী জনকের কন্যা? তিনি খুব এক জন এন্লাইটেণ্ড্ লোক। আমার বলিতে সাহস হইতেছে না—প্রথম দৃষ্টিতেই আপনাকে আমি ভাল বাসিয়াছি। এ ভক্ত কিঙ্কর কি আপনার পাণি গ্রহণের আশা করিতে পারে?

সীতা।—(সলজ্জ ভাবে) সে পিতা জানেন।

রাম।—তাঁর কাছে কি আমি প্রস্তাব করিতে পারি? তিনি সম্মত হইলে আপনার কোন আপত্তি থাকিবে না?

সীতা ব্রস্ করিয়া নিরুত্তর হইলেন।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ে জনক রাজার প্রাসাদে পৌছিলেন।

রাম জনক রাজার নিকটে গমন পূর্ব্বক আপনার কুলের পরিচয় দিয়া বলিলেন "আপনার কন্যার হস্তের নিমিত্ত আমি উমেদার।" জনক রাজা বলিলেন "অতি উত্তম! কিন্তু আমার একটি বন্দুক-ভঙ্গ পণ আছে, তাহার আমি অন্যথা করিতে পারি না। আমি টাইম্স্-সংবাদ পত্রে দেখিয়াছিলাম যে, কোন পর্য্যটক আফ্রিকাবাসী গরিল্লা নামক বীর-চূড়ামণিকে বন্দুক মারিতে যাওয়াতে তিনি তাঁহার বন্দুক কাড়িয়া লইয়া এক মোচড়ে দ্বিখণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এইরূপ অসাধারণ বীরত্বের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আমি

আর নীরব থাকিতে পারিলাম না। আমি দেশ বিদেশে প্রচার করিলাম যে, গরিল্লা-বীরকে আদর্শ মানিয়া, তাঁহার ন্যায় যিনি বন্দুক ভঙ্গ করিতে পারিবেন তাঁহাকে আমি কন্যা-সম্প্রদান করিব।" রাম বলিলেন "আচ্ছা আমি প্রস্তুত আছি।" অমনি একজন তৈয়ার ভৃত্য দ্রুতগতি একটা মার্টিনি-রাইফেল্ আনিয়া রামের সম্মুখে ধরিয়া দিল। রাম তাহা দুই হস্তে ধরিয়া একটি মোচড়েই কর্ম্ম নিকাশ করিয়া সাতহাত হইয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইলেন। জনক রাজা এবং তাঁহার পারিষদ্‌গণের তাক্ লাগিয়া গেল। জনক রাজা আনন্দে পুলকিত হইয়া বলিলেন "তুমি যেরূপ অসামান্য বলবীর্য্য দেখাইলে, কন্যা সম্প্রদানের অগ্রে, তাহার উপযুক্ত এ-কটি উপাধি তোমাকে আমি প্রদান করিতে অভিলাষ করি। অনেকের অনেক প্রকার উপাধি আছে, যথা নর-ব্যাঘ্র, নর-পুঙ্গব, নর-ঋষভ, কিন্তু সে সমস্তই পুরাতন হইয়া গিয়াছে, তুমি আজ হইতে লোকে নর-গরিল্লা নামে খ্যাত হইবে। এক্ষণে মিস্ জনকের সম্মতির কেবল অপেক্ষা, অতএব যাও তাঁহাকে রাজি কর গিয়া। রাম সদ্য সদ্যই কোর্ট্‌সিপ্ সুরু করিলেন। সীতা যদিও চত্বারিংশ বর্ষীয়া বালিকা বই নয়, কিন্তু তিনি সকল গুণেই গুণবতী ছিলেন। জনক রাজা একজন এন্‌লাইটেণ্ড্ লোক ছিলেন—তিনি বালবিবাহ, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক অনেক সভায় বক্তৃতা দিতেন। তিনি আপন কন্যাকে বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। সীতা তাঁহার যত্নে সর্ব্বগুণে বিভূষিতা হইয়াছিলেন। তিনি কার্পেট-বুনানি কার্য্যে অতিশয় নিপুণা ছিলেন। ফরাশীশ্ ভাষায় নবেল্ পাঠ করিতেন। পল্কা এবং ওয়াল্‌ট্‌স্ নাচিতেন। প্যারিস নগরের নব্যতম ফেসিয়ানের গাউন পরিতেন—সহজে ব্লুষ্ করিতে পারিতেন এবং ইচ্ছা করিলেই মূর্চ্ছা যাইতে পারিতেন। এমন রূপ-গুণে বিভূষিতা চত্বারিংশ বর্ষীয়া বালিকাকে দেখিয়া রাম যে মুগ্ধ হইবেন ইহাতে আর বিচিত্র কি! তিনি শীঘ্রই কোর্ট্‌সিপ্ শেষ করিয়া ফেলিলেন, এবং বিবাহের পর এক্ষণে তিনি মনের সুখে মধু চন্দ্র ভোগ করিতেছেন। ইতি সাত ক্যাণ্টো রামিয়াডের হনি-মূন নামকোহয়ং প্রথমঃ ক্যাণ্টো সমাপ্তঃ।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু।

দৈবায়ত্ত কারণে সংসারে যত প্রকার মৃত্যু সংঘটিত হয়, তন্মধ্যে বজ্রাঘাতের ন্যায় ত্বরিত মৃত্যু আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহাতেও কিঞ্চিৎ সময়ের প্রয়োজন হয়। অনেকে মনে করেন যে, শরীরের কোন স্থানে আঘাত লাগিবামাত্র বা সূচী বিদ্ধ হইলে তদ্দণ্ডেই আমরা উহা বুঝিতে পারি। বস্তুতঃ তাহা নহে। মস্তিষ্কই আমাদের অনুভব শক্তি বা জ্ঞানের মূলস্থান। কোথাও আঘাত লাগিলে

ঐ সংবাদ যতক্ষণ মস্তিষ্কে না আইসে ততক্ষণ উহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। এজন্য মস্তিষ্কের নিকটস্থ স্থান অপেক্ষা দূরবর্ত্তী স্থানে আঘাত লাগিলে কিঞ্চিৎ বিলম্বে উহা আমরা বুঝিতে পারি। অনন্তর কিরূপ বেগে এই আঘাতের সংবাদ স্নায়ুকর্ত্তৃক জ্ঞানের মূলস্থানে আনীত হয় তাহাও সুবিজ্ঞ হেল্‌হল্‌জ্‌ সাহেব আপনার বিচিত্র বুদ্ধি-বলে বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা এক রূপ স্থির করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ঐ সংবাদ এক সেকেণ্ডের মধ্যে ৬৬ হাত (১০০ ফিট) পর্য্যন্ত যাইতে পারে। অর্থাৎ বায়ুমধ্যে শব্দ যেরূপ বেগে চালিত হয়, আঘাত সংবাদের গতি তদপেক্ষা অনেক কম। এমন কি, উহার দশমাংশের একাংশও নহে। এতদ্বিবন্ধন দৈর্ঘ্যে ৩৩ হাত (৫০ ফিট) প্রমাণ একটি তিমি মৎস্যের পুচ্ছদেশে আঘাত করিলে, অর্দ্ধ সেকেণ্ড পরে সে উহা বুঝিতে পারে। কিন্তু এক স্থান হইতে অন্য স্থানে আঘাতের সংবাদ বহনের জন্যই যে কেবল কাল বিলম্ব হয় এরূপও নহে। কাল বিলম্বের আরও কারণ আছে। শারীর বিধানবিৎ পণ্ডিত মাত্রেই ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন যে অনুভব-ক্রিয়ার সময় মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণুগুলি স্পন্দিত ও পুনরায় যথানিয়মে সংরক্ষিত হয়। ফলতঃ মস্তিষ্কের এরূপ অবস্থা প্রত্যেক চিন্তা বা অনুভূতির আনুসঙ্গিক বলিলেও বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ যখনই আমরা কোন বিষয় চিন্তা বা অনুভব করি, তখনই আমাদিগের মস্তিষ্কের পরমাণু-মধ্যে কোন না কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে এবং এই রূপ পরিবর্ত্তন যে, কাল-সাপেক্ষ ইহা সকলে স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং আঘাতের সংবাদ বহনোপযোগী কাল ব্যতীত, অনুভূতির জন্য মস্তিষ্কে যে সকল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহাতেও সময় আবশ্যক। কিন্তু সেও এক সেকেণ্ডের দশমাংশের অধিক নহে। অতঃপর ইহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, তিমি মৎস্যের পুচ্ছে আঘাত লাগিবার পর ঐ সংবাদ মস্তিষ্কে যাইতে অর্দ্ধ সেকেণ্ড লাগে, এবং তথায় উহা অনুভূত হইতে এক সেকেণ্ডের দশমাংশ কাল অতিবাহিত হয়। আবার যদি আঘাত প্রতীকারের জন্য মস্তিষ্ক হইতে পুচ্ছদেশে অন্য কোন সংবাদ আসিতে আর অর্দ্ধ সেকেণ্ড লাগে, তাহা হইলে ঐ মৎস্যের আঘাত বুঝিতে ও তৎপ্রতীকারার্থ পুচ্ছদেশ নাড়িতে সমুদায়ে এক সেকেণ্ড ও উহার দশমাংশের একাংশ সময় লাগিবার সম্ভাবনা। ইহাও অনেকে দেখিয়াছেন যে, আঘাত গুরুতর হইলে পূর্ব্বোক্ত সংবাদবাহক স্নায়ুগুলি কখন কখন অসাড় হইয়া পড়ে। সুতরাং তদ্দ্বারা সংবাদ-বহনকার্য্য আর সাধিত হয় না। প্রত্যুত আঘাত গুরুতর হইলে উহা মস্তিষ্কে না পাওয়াতে উহার বিষয় আমরা কিছুই জানিতে পারি না। অথবা জ্ঞানের মূলস্থানে, আঘাত উপলব্ধির প্রাক্‌কালীন কোন প্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটন হইতে না হইতেই আমাদের মস্তিষ্কের কার্য্য একবারে বন্ধ হইয়া যায়। এমন কি, ঐরূপ আঘাতে

কাহার মৃত্যু ঘটিলেও তজ্জন্য আমাদিগকে কোন প্রকারে বেদনানুভব করিতে হয় না। বস্তুতঃ তৎকালে জীবনের পরিবর্ত্তে সহসা মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে আমরা অচেতন অবস্থাতেই এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হই।

অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে সংসারে এরূপ ত্বরিত মৃত্যু অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। বন্দুকের গুলি মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া চলিয়া গেলে সহসা আমাদিগের ঐ দশা ঘটিয়া থাকে। এই প্রকারে মৃত্যু ঘটিলে মনুষ্যের মুখে কিছুমাত্র যন্ত্রণার চিহ্ন থাকে না। প্রত্যুত মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার মুখ যেরূপ সৌম্য-ভাব-বিশিষ্ট ছিল তখনও উহাতে সেই ভাব লক্ষিত হয়। এতদ্দ্বারা পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ হেম্‌হলজের ত্বরিত মৃত্যুতে বেদনার অভাব বিষয়ক অনুমান আরও সপ্রমাণ হইতেছে। এমনও শুনা গিয়াছে যে, যে ব্যক্তি কোন প্রকার আঘাত পাইয়া সহসা অচেতন হয় ও মৃতবৎ পড়িয়া থাকে, সে সংজ্ঞা লাভ করিলে এই কথা বলিয়া থাকে যে, হতচেতন হইবার পূর্ব্বে তাহার কোন প্রকার বেদনানুভব হয় নাই। গুরুতর আঘাতজনিত, স্নায়ু বা মস্তিষ্কের অসাড়তাই ইহার মূল কারণ। প্রকৃতি এ সম্বন্ধে আমাদের উপর কতদূর অনুকূল তাহা বলা যায় না। মনুষ্যের মস্তক ভেদ করিয়া একটি বন্দুকের গুলি বাহির হইতে সচরাচর প্রায় এক সেকেণ্ডের সহস্রাংশের একাংশ মাত্র সময় লাগিয়া থাকে। সুতরাং এই অত্যল্প সময় মধ্যে কার্য্য সমাধা হওয়াতে, আমরা তৎকালে কোন প্রকার বেদনানুভব করিতে পারি না। এ জন্য তাদৃশ মৃত্যুতে আমাদের কিছুমাত্র যন্ত্রণানুভব হয় না। কিন্তু পৃথিবীতে এমন অনেক ব্যাপার আছে যাহার বেগ, বন্দুকের গুলি অপেক্ষা লক্ষগুণ অধিক। মেঘমালা বিদীর্ণ করিয়া তাড়িতালোক আকাশ-পথ যেরূপ ভয়ানক বেগে বিচরণ করে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু ঐ আলোক আমাদের চক্ষে পড়িয়া পুনরায় অদৃশ্য হইতে যে সময় লাগে তাহা অনেকেই জানেন না। পাঠকগণ শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন যে উহা এক সেকেণ্ডের লক্ষাংশেরও কম। ফলতঃ বিদ্যুতের গতি এতই প্রবল যে, পৃথিবী হইতে চন্দ্রলোক যদিও অনেক দূরবর্ত্তী, তথাপি বিদ্যুৎপদার্থ এক সেকেণ্ডের মধ্যে তথায় উপস্থিত হইতে পারে। ইহাও অনেকে অবগত আছেন যে, চক্ষের উপর একটি আলোক পড়িবামাত্র উহা তদ্দণ্ডান্তরে এরূপ প্রতিভাত হয়, যে ঐ আলোক অন্তর্হিত হইলেও উহা আমরা এক সেকেণ্ডের ষষ্ঠাংশ কাল পর্য্যন্ত মনশ্চক্ষে দেখিতে পাই। এই জন্যই একখানি প্রজ্বলিত অঙ্গার এক দিক হইতে আর এক দিকে সবেগে চালনা করিলে দর্শকের চক্ষে উহা ক্ষণকালের জন্য একটি আলোকময় ফিতার মত দেখায়।

অতঃপর ইহা কাহার না মনে হইবে যে, বন্দুকের গুলি লাগিলে যদি মনুষ্য মুহূর্ত্তের মধ্যেও অক্লেশে মরিতে পারে, তাহা হইলে বজ্রাঘাতে ইহা অপেক্ষা আরও কম সময়ের মধ্যে ও অজ্ঞাত ভাবে আমা-

দের মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। পৃথিবীতে এ সম্বন্ধে প্রমাণেরও অসদ্ভাব নাই। কারণ অনেক বজ্রাহত ব্যক্তি বজ্রাঘাতের পর চৈতন্য লাভ করিয়া এই কথা প্রকাশ করিয়াছেন যে, বজ্রাঘাতের সময় শরীরে কিছুমাত্র ক্লেশানুভব হয় না। প্রাচীন হেমার সাহেবের গ্রন্থে এই সম্বন্ধে যে একটি প্রস্তাব লিখিত আছে তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।

কোন সময়ে এক জন সৈনিক পুরুষ দুর্গের কিয়দ্দূরে পাদচারণা করিতেছিলেন। এমন সময় সহসা বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইলে তিনি নিকটস্থ একটি বৃক্ষের তলে গিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন যে তাহার পূর্ব্বে তথায় একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। অনন্তর বৃক্ষের আশ্রয়ে থাকিলে বৃষ্টি নিবারণ হইবে কিনা জানিবার জন্য তিনি ঊর্দ্ধমুখে উহার শাখা প্রশাখার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার উপর বজ্রাঘাত হওয়াতে তিনি সহসা ভূতলে পড়িয়া গেলেন। স্ত্রীলোকটির পদমূলে সামান্য আঘাত মাত্র লাগিল, সুতরাং তজ্জন্য উহার কিছুমাত্র চৈতন্যের হানি হয় নাই। কয়েক ঘণ্টা পরে সৈনিকের চেতনা লাভ হইলে তিনি ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কেবল এই মাত্র মনে হইতে লাগিল যে, তিনি ইতিপূর্ব্বে ঊর্দ্ধমুখে বৃক্ষশাখা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, ইহাই তাঁহার চেতনার শেষ কার্য্য। তাহার পর কি হইল, তাহা তাঁহার স্মরণ হয় না। বস্তুতঃ তিনি ঐ সময়ে বজ্রাঘাত-জন্য হঠাৎ অচেতন হইয়া পড়েন। অথচ ঐ সময় কিছুমাত্র যন্ত্রণানুভব হয় নাই।

কয়েক বৎসর অতীত হইল ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ পদার্থবিৎ পণ্ডিত টিণ্ডাল সাহেব কতকগুলি বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র একত্র করত, তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, সভামধ্যে বিদ্যুৎ বিষয়ক ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। অনবধানতা বশতঃ হঠাৎ তাঁহার হস্ত ঐ যন্ত্রোত্থিত তারের উপর সংস্পৃষ্ট হওয়াতে উহার সমুদায় তেজ তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইল। তিনিও অমনি হতচেতন হইয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। এক সেকেণ্ডের পর তাঁহার চেতনা হইলে দেখিলেন যে, তিনি সেই সকল সমুৎসুক শ্রোতৃবর্গ ও বিদ্যুৎজনন যন্ত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, অথচ কথা কহিতে পারিতেছেন না। শরীরের এই রূপ অবস্থা ও চতুর্দ্দিকস্থ দৃশ্য দেখিয়া তিনি এই স্থির করিলেন যে, কোন কারণে ঐ সকল যন্ত্রের তেজ তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই রূপ ভাবিতেছেন এমন সময়, তাঁহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল এবং শ্রোতৃগণের ভয় ও বিস্ময় দূর করিবার জন্য বলিলেন যে, অনেক দিন হইতে আমি আশা করিয়াছিলাম, বিদ্যুতের সমবেত তেজ গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ শরীরে পরীক্ষা করিয়া দেখিব। আজ আমার সেই আশা পূর্ণ হইল। এই সময় তাঁহার সম্পূর্ণ চৈতন্যোদয় হইলেও, তিনি আপন শরীর বিকৃত চক্ষে দেখিতেছিলেন। এমন কি তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যেন তাঁহার

দেহ খানি নানাখণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু হস্ত ও পদ যেন শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শূন্যে লম্বিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ স্মরণ ও বিচার শক্তি পুনরায় আবির্ভূত হইবার অনেকক্ষণ পরে তাঁহার দর্শনেন্দ্রিয় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এইস্থলে টিওয়ালের এই দৈবায়ত্ত ঘটনা উল্লেখ করিবার বিশেষ কারণ এই যে, এই রূপ গুরুতর বিদ্যুতাঘাত পাইয়াও তিনি কিছুমাত্র যন্ত্রণা অনুভব করেন নাই। অথচ তৎকালে তাঁহাকে ঐ জন্য এক কালে জ্ঞানশূন্য হইতে হয়। এতদ্দ্বারা বজ্রাঘাত-জনিত মৃত্যু যে যন্ত্রণাশূন্য তাহা আরও প্রতিপন্ন হইতেছে। বস্তুতঃ জীবমাত্রই এতদ্দ্বারা আহত হইবা মাত্র সহসা হতচেতন হইয়া পড়ে ও তদবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করে। সুতরাং দৈব মৃত্যুর মধ্যে ইহা অপেক্ষা যন্ত্রণাশূন্য বা সুখের মৃত্যু আর কিছুই নাই।

বজ্রাঘাত নিবন্ধন শরীরে অতি যৎসামান্য বাহ্য চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে। কাহারও কেশ গুলি পুড়িয়া যায়। কাহারও অঙ্গে একটি সামান্য ক্ষত চিহ্ন মাত্র দৃষ্ট হয়। এবং কাহারও বা ত্বকের উপর একটি লাল বর্ণের রেখা দেখা যায়।

অধুনা ইংলণ্ডে, প্রাণদণ্ডের নৃশংসতা সম্বন্ধে যেরূপ তর্কের ঢেউ উঠিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় হত্যাকারীর উপর এইরূপ দণ্ডবিধান ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডেশ্বরীর অপরাপর রাজ্য হইতে এক কালে উঠিয়া যাইবে। যদি তাহাও না যায় তথাপি উহার পরিবর্ত্তে এরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইবে যাহাতে তাদৃশ গুরুতর অপরাধী ব্যক্তিকে আর কখনই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে না। ইহা যত শীঘ্র এদেশ হইতে উঠিয়া যায় ততই ভাল। প্রত্যুত যদি শাসনকর্ত্তারা দুষ্ট লোককে ভয় দেখাইবার জন্য এখন প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা রাজ্যমধ্যে প্রচলিত রাখিতে চাহেন, তাহা হইলে যাহাতে ঐ সকল লোক অক্লেশে মরিতে পারে তাহার উপায় বিধান করা উচিত। পূর্ব্বোক্ত তাড়িতাবহ যন্ত্র ইহার প্রধান উপায়। এতদ্দ্বারা মৃত্যু হইলে অপরাধী ব্যক্তি অম্লান মুখে সংসার হইতে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিতে পারে। এক জন অপরকে নৃশংসের ন্যায় খুন করিয়াছে বলিয়া, তৎপ্রতিশোধার্থ প্রথম ব্যক্তির উপর নৃশংসাচরণ করা কখনই মনুষ্যোচিত কার্য্য নহে। অতএব প্রাণদণ্ডের ঐরূপ সহজ ও যন্ত্রণা শূন্য উপায় থাকিতে, অপরাধীকে ফাঁসিকাষ্ঠে তুলিয়া অত দীর্ঘকাল কষ্ট দেওয়া আমাদের কোন ক্রমে যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। পরিশেষে এদেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগের নিকট আমাদের সবিনয় প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অপরাধী ব্যক্তির মৃত্যুকালীন যন্ত্রণাভার লাঘব করেন। ইহাতে দণ্ডবিধি ও ধর্ম্মশাস্ত্র উভয়েরই উদ্দেশ্য সমভাবে সিদ্ধ হইতে পারে। যং—

ভিখারিণী।

মোহন লালের সহিত কমলের বিবাহের প্রস্তাব হয়, কিন্তু তাহা সম্পন্ন না হওয়াতে মোহন মনে মনে কিছু ক্রুদ্ধ হইয়া আছে। কমলের সমুদয় বৃত্তান্ত মোহন লাল প্রাতেই শুনিতে পাইয়াছিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ কুল-পুরোহিতকে ডাকাইয়া শীঘ্র বিবাহের উত্তম দিন আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন।

গ্রামের মধ্যে মোহনের ন্যায় ধনী আর কেহ ছিল না; আকুল বিধবা অবশেষে তাঁহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মোহন উপহাসের স্বরে হাসিয়া কহিলেন "একি অপূর্ব্ব ব্যাপার! এত দিনের পর দরিদ্রের কুটীরে যে পদার্পণ হইল?"

বিধবা।—"উপহাস করিও না, আমি দরিদ্র, তোমার কাছে ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছি।"

মোহন।—"কি হইয়াছে?" বিধবা আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। মোহন জিজ্ঞাসা করিলেন "তা আমাকে কি করিতে হইবে?"

বিধবা—"কমলের প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে।"

মোহন—"কেন, অমর সিংহ এখানে নাই?" বিধবা উপহাস বুঝিতে পারিলেন, কহিলেন, "মোহন, যদি বাসস্থান অভাবে আমাকে বনে বনে ভ্রমণ করিতে হইত, অনাহারে ক্ষুধার জ্বালায় যদি পাগল হইয়া মরিতাম, তথাপি তোমার কাছে একটি তৃণও প্রার্থনা করিতাম না। কিন্তু আজ যদি বিধবার একমাত্র ভিক্ষা পূর্ণ না কর, তবে তোমার নিষ্ঠুরতা চিরকাল মনে থাকিবে।"

মোহন—"আইস, তবে তোমাকে একটী কথা বলি! কমল দেখিতে কিছু মন্দ নহে, আর তাহাকে যে আমার পছন্দ হয় নাই এমনও নহে, তবে তাহার সহিত আমার বিবাহের আর ত কোন আপত্তি দেখিতেছি না। তোমার কাছে ঢাকিয়া কি করিব, বিনা কারণে ভিক্ষা দিবার মত আমার অবস্থা নহে।

বিধবা—"অগ্রেই যে অমরের সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছে।" মোহন কিছু উত্তর না দিয়া হিসাবের খাতা খুলিয়া লিখিতে বসিলেন, যেন কেহই ঘরে নাই, যেন কাহারো সহিত কিছু কথা হয় নাই। এদিকে সময় বহিয়া যায়, দস্যু আছে কি গিয়াছে তাহার ঠিক্ নাই। বিধবা কাঁদিয়া কহিলেন "মোহন, আর আমাকে যন্ত্রণা দিও না, সময় অতীত হইতেছে।"

মোহন—"রোস, কাজ সারিয়া ফেলি।" অবশেষে যদি বিধবা, বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত না হইতেন, তাহা হইলে সমস্ত দিনে কাজ সারা হইত কিনা সন্দেহ স্থল। বিধবা মোহন লালের নিকট অর্থ লইয়া দস্যুকে দিলেন, সে চলিয়া গেল। সেই দিনই ভয়ে আশঙ্কায় ত্রস্তা হরিণীটির ন্যায় বিহ্বলা বালিকা মাতার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিল, এবং তাঁহার

দেখিলেন কমল। ৭ মুহূর্ত্তের মধ্যে নিকটে আসিয়া বাহুপাশে তাঁহার গলদেশ বেষ্টন [illegible] স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া কহিল "ভাই অমর"—অচল-হৃদয় অমরও অন্ধকারে অশ্রু-বিন্দু বিসর্জ্জন করিলেন, আবার সহসা চকিতের ন্যায় দূরে সরিয়া গেলেন। কমল অমরকে কত কি কথা বলিল, অমর কমলকে দুই একটি উত্তর দিলেন। সরলা আসিবার সময়ে যেরূপ উৎফুল্ল-হৃদয়ে হাসিতে হাসিতে আসিয়াছিল, যাইবার সময় সেইরূপ ম্রিয়মাণ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। কমল ভাবিয়াছিল, সেই ছেলেবেলাকার অমর ফিরিয়া আসিয়াছে, আর আমি সেই ছেলেবেলাকার কমল, কাল হইতে আবার খেলা করিতে আরম্ভ করিব। যদিও অমর মর্ম্মের গভীর তলে সাংঘাতিক আহত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি কমলের উপর কিছুই ক্রুদ্ধ হন নাই বা অভিমান করেন নাই। তাঁহার জন্য বিবাহিতা বালিকার কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধা না পড়ে এই নিমিত্ত তিনি তাহার পর দিন কোথায় যে চলিয়া গেলেন তাহা কেহই স্থির করিতে পারিল না।

বালিকার সুকুমার হৃদয়ে দারুণ বজ্র পড়িল; অভিমানিনী কতদিন ধরিয়া ভাবিয়াছে যে, এতদিনের পর সে বাল্য-সখা অমরের কাছে ছুটিয়া গেল, অমর কেন তাহাকে উপেক্ষা করিল? কিছুই ভাবিয়া পায় নাই। একদিন তাহার মাতাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মাতা তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, কিছুকাল রাজ-সভার আড়ম্বর-রাশির মধ্যে থাকিয়া সেনাপতি অমরসিংহ পর্ণ-কুটীর-বাসিনী ভিখারিণী ক্ষুদ্র বালিকাটিকে ভুলিয়া যাইবেন তাহাতে অসম্ভব কি আছে? এই কথায় দরিদ্র বালিকার অন্তরতম দেশে শেল বিঁধিয়াছিল। অমরসিংহ তাহার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিল মনে করিয়া কমল কষ্ট পায় নাই। হতভাগিনী ভাবিত, আমি দরিদ্র, আমার কিছুই নাই, আমার কেহই নাই, আমি বুদ্ধিহীনা ক্ষুদ্র বালিকা, তাঁহার চরণ-রেণুরও যোগ্য নহি, তবে তাঁহাকে ভাই বলিব কোন্ অধিকারে, তাঁহাকে ভাল বাসিব কোন্ অধিকারে, আমি দরিদ্র কমল, আমি কে যে তাঁহার স্নেহ প্রার্থনা করিব? সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাটিয়া যায়, প্রভাত হইলেই সেই শৈল-শিখরে উঠিয়া ম্রিয়মাণ বালিকা কত কি ভাবিতে থাকে, তাহার মর্ম্মের নিভৃত তলে যে বাণ বিদ্ধ হইয়াছিল তাহা যদিও সে মর্ম্মেই লুকাইয়া রাখিয়াছিল, পৃথিবীর কাহাকেও দেখায় নাই, তথাপি ঐ মর্ম্মে লুকায়িত বাণ ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়ের শোণিত ক্ষয় করিতে লাগিল। বালিকা আর কাহারো সহিত কথা কহিত না, মৌন হইয়া সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি ভাবিত, কাহারো সহিত মিশিত না, হাসিত না, কাঁদিত না; এক এক দিন সন্ধ্যা হইলেও দেখা যাইত, পথ-প্রান্তের বৃক্ষতলে মলিন ছিন্ন অঞ্চলে মুখ ঝাঁপিয়া দীন-হীন কমল বসিয়া আছে। বালিকা ক্রমে দুর্ব্বল ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল, আর উঠিতে পারে না; বাতায়নে একাকিনী বসিয়া থাকিত,

দেখিত, দূর শৈল-শিখরের উপর বকুল-পত্র বায়ুভরে কাঁপিতেছে। দেখিত, রাখালেরা সন্ধ্যার সময় উদাস-ভাবোদ্দীপক সুরে মৃদু মৃদু গান করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছে।

বিধবা অনেক চেষ্টা করিয়াও বালিকার কষ্টের কারণ বুঝিতে পারেন নাই এবং তাহার রোগের প্রতিকার করিতেও পারেন নাই। কমল নিজেই বুঝিতে পারিত যে, সে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহার আর কোন বাসনা ছিল না, কেবল দেবতার কাছে প্রার্থনা করিত যে, মরিবার সময় যেন অমরকে দেখিতে পাই।

কমলের পীড়া গুরুতর হইল। মূর্চ্ছার পর মূর্চ্ছা হইতে লাগিল, শিয়রে বিধবা নীরব, কমলের গ্রাম্য-সঙ্গিনী বালিকারা চারি ধার ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দরিদ্র বিধবার অর্থ নাই যে, চিকিৎসার ব্যয়-ভার বহন করিতে পারেন। মোহন দেশে নাই, এবং দেশে থাকিলেও তাহার নিকট হইতে কিছু আশা করিতে পারিতেন না। তিনি দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া কমলের পথ্যাদি যোগাইতেন। চিকিৎসকদের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষা চাহিতেন যে, তাহারা কমলকে এক বার দেখিতে আসুক। অনেক মিনতিতে চিকিৎসক কমলকে আজ রাত্রে দেখিতে আসিবে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

অন্ধকার রাত্রের তারাগুলি ঘোর নিবিড় মেঘে ডুবিয়া গিয়াছে, বজ্রের ঘোরতর গর্জ্জন শৈলের প্রত্যেক গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে, এবং অবিরল বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ-চকিতচ্ছটা শৈলের প্রত্যেক শৃঙ্গে শৃঙ্গে আঘাত করিতেছে, মুষল ধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে, প্রচণ্ড বেগে ঝটিকা বহিতেছে, শৈল-বাসীরা অনেক দিন এরূপ ঝড় দেখেন নাই। দরিদ্র বিধবার ক্ষুদ্র কুটীর টলমল করিতেছে, জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া বৃষ্টিধারা গৃহে প্রবাহিত হইতেছে, এবং গৃহপার্শ্বে নিষ্প্রভ প্রদীপশিখা ইতস্ততঃ কাঁপিতেছে। বিধবা এই ঝড়ে চিকিৎসকের আসিবার আশা পরিত্যাগ করিয়াছেন। হতভাগিনী নিরাশ হৃদয়ে নিরাশা-ব্যঞ্জক স্থির দৃষ্টিতে কমলের মুখের পানে চাহিয়া আছেন ও প্রত্যেক শব্দে চিকিৎসকের আশায় চকিত হইয়া দ্বারের দিকে চাহিতেছেন। একবার কমলের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল, মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া মাতার মুখের দিকে চাহিল, অনেক দিনের পর কমলের চক্ষে জল দেখা দিল, বিধবা কাঁদিতে লাগিলেন, বালিকারা কাঁদিয়া উঠিল। সহসা অশ্বের পদধ্বনি শুনাগেল, বিধবা শশব্যস্তে উঠিয়া কহিলেন চিকিৎসক আসিয়াছেন। দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে চিকিৎসক গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আপাদ মস্তক বসনে আবৃত, বৃষ্টি-ধারায় সিক্ত বসন হইতে বারি-বিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে। চিকিৎসক বালিকার তৃণ-শয্যার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। অবশ বিষাদময় নেত্র চিকিৎসকের মুখের পানে তুলিয়া কমল দেখিল সে চিকিৎসক নয়, সে সেই সৌম্য গম্ভীর-মূর্ত্তি অমর সিংহ! বিহ্বলা বালিকা

প্রেমপূর্ণ স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, বিশাল নেত্র ভরিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল এবং প্রশান্ত হাস্যে কমলের বিবর্ণ মুখশ্রী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু এই রুগ্ন শরীরে অত আহ্লাদ সহিল না। ধীরে ধীরে অশ্রুসিক্ত নেত্র নিমীলিত হইয়া গেল, ধীরে ধীরে বক্ষের কম্পন থামিয়া গেল, ধীরে ধীরে প্রদীপ নিভিয়া গেল। শোক-বিহ্বলা সঙ্গিনীরা বসনের উপর ফুল ছড়াইয়া দিল। অশ্রুহীন নেত্রে, দীর্ঘশ্বাস-শূন্য-বক্ষে, অন্ধকারময় হৃদয়ে, অমরসিংহ ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন। শোক-বিহ্বলা বিধবা সেই দিন অবধি পাগলিনী হইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন এবং সন্ধ্যা হইলে প্রত্যহ সেই ভগ্নাবশিষ্ট কুটীরে একাকিনী বসিয়া কাঁদিতেন।

কড়ুয়া কণবী।

গুজরাটে কৃষিদলের সাধারণ নাম কণবী। কণবীগণ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—লেওয়া কণবী ও কড়ুয়া কণবী। কড়ুয়া ও লেওয়া কণবী একত্রে পান ভোজন করিতে পারে, কিন্তু উহাদের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান নাই।

কড়ুয়া কণবীদের মধ্যে দ্বাদশ বৎসর অন্তর বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হয়। এই দ্বাদশ বৎসরের নিয়ম সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, এক দিন হরপার্ব্বতী বনের মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে এক স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করিলেন। মহাদেব উমাকে কহিলেন, প্রিয়ে, তুমি এই স্থানে কিছুকাল অবস্থিতি কর, আমি বিরলে তপস্যা করিতে চলিলাম, দ্বাদশ বৎসর পরে আসিব। এই বলিয়া মহাদেব প্রস্থান করিলেন। বিরহ-বিধুরা উমা কথঞ্চিৎ কাল হরণ করিবার জন্য মৃত্তিকার পুত্তলী গড়াইয়া ক্রীড়া করিতেন। বার বৎসর পরে মহাদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও উমার অনুরোধে সেই সকল পুত্তলীকে জীবন দান করত সচেতন করিলেন। তাহা হইতেই কণবী জাতির উৎপত্তি হইল। এই হেতু কণবী-জাতি উমার বিশেষ ভক্ত।—যে স্থানে মহাদেব বার বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন তাহা গাইকবাড় পরগণার উমা নামক গ্রাম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। সেখানে একটি দুর্গা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এই দেবীর আদেশক্রমে কড়ুয়া কণবীর মধ্যে বিবাহ লগ্ন স্থিরীকৃত হয়। প্রতি দশ কিম্বা বার বৎসর অন্তর সিংহরাশির সহিত বৃহস্পতির সমাগম হইলে তাহাদের বিবাহের সময় উপস্থিত হয়। উমা সম্মতি দান করিলে পূজারীগণ বিবাহের লগ্ন প্রকাশ করে ও তাহা গ্রামে গ্রামে সমস্ত কণবী জাতির মধ্যে দূত কর্ত্তৃক ঘোষিত হইয়া থাকে।

এই বিবাহের দিবস উপস্থিত হইলে কণবী জাতির মধ্যে যত অবিবাহিতা কন্যা থাকে তাহাদের উদ্বাহ-ক্রিয়া সেই এক দিবসেই সম্পন্ন হয়। মাসেকের দুগ্ধপোষ্য হইতে যোগ্য-বয়স্কা কন্যা পর্য্যন্ত সকলেই এক একটি বরের সহিত পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ

হয়। এই অবসর চলিয়া গেলে আবার বার বৎসর কাল অপেক্ষা করিতে হয়; সুতরাং পারত-পক্ষে এ সময় কেহ অবহেলা করে না। যদি কারণ বশত কোন কন্যার উপযুক্ত বর না পাওয়া যায় তো পুষ্পরাশির সঙ্গে তাহার নাম-মাত্র বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। পর দিবস সেই সকল ফুল কূপে নিক্ষিপ্ত হয়। এইরূপ ক্রিয়া বরের মৃত্যু-সমান পরিগণিত হয়, ও তৎপরে সেই কন্যার 'নাত্রা' অর্থাৎ পুনর্বিবাহ হইবার কোন বাধা থাকে না। ঈদৃশ আর একটি প্রথার নাম 'বাহবর' বিবাহ। অর্থাৎ স্বজাতীয় কোন পুরুষ যদি পূর্ব্ব হইতে এই রূপ অঙ্গীকার করে যে, আমি এত টাকা পাইলে আমার বিবাহে কোন দাবী থাকিবে না এবং এই বলিয়া যদি অর্থ গ্রহণ করে তাহা হইলে সে কন্যার উপর তাহার কোন অধিকার থাকে না। কন্যা দানের অব্যবহিত পরেই সেই বিবাহ-বন্ধন হইতে বর ও কন্যা উভয়েই নিষ্কৃতি পায়। যে স্ত্রী এইরূপে অব্যাহতি পায় তাহার 'নাত্রা' অর্থাৎ পুনর্বিবাহ করিবার বাধা নাই। অবিবাহিতা স্ত্রীর নাত্রা হইবার বিধি নাই, সুতরাং বিবাহের নির্দ্দিষ্ট কাল ভিন্ন তাহার বিবাহ হইতে পারে না। কিন্তু একবার নাম-মাত্র বিবাহ দিতে পারিলে পুনর্বিবাহ সম্ভবে ও এই রূপ বিবাহের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, যখন ইচ্ছা দেওয়া যাইতে পারে। বাহু-বর বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া পরক্ষণেই বর স্বকীয় আলয়ে গমন করে। কন্যা পিতৃ-গৃহে আসিয়া হস্তের চুড়ি ফেলিয়া স্নান করে, যেন তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। পরে সুবিধা হইলে পিতামাতা তাহার নাত্রা দেয়।

মুসলমানদের যেমন নিকা, খ্রীষ্টবর্ণ হিন্দুগণের সেই রূপ 'নাত্রা'। নাত্রাতে বিবাহের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি কিছুই আবশ্যক হয় না, বিবাহের ন্যায় তাহাতে ব্যয়-বাহুল্যও নাই। বয়স্কা বিধবার ত কথাই নাই—অল্প বয়সে পতিগৃহে গমন করিবার পূর্ব্বে যে স্ত্রীর বৈধব্য-দশা উপস্থিত হয়, অথবা পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকারে নামমাত্র বিবাহ হইবার পর যে স্ত্রীর পুনর্বিবাহ হয়, তাহার নাত্রা অপেক্ষাকৃত আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। বরের ধুতির অঞ্চল ও কন্যার শাড়ীর অঞ্চলে গাঁঠ দেওয়া হয়, ও এইরূপ গ্রন্থিবদ্ধ দম্পতী অশ্বারূঢ় হইয়া জনতার মধ্য-দিয়া গীতবাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করে। তথায় পুরোহিত তাহারদিগকে গণপতির পূজা করাইয়া বিবাহের কার্য্য সম্পন্ন করেন। ইহার নাম নাত্রা।

এইরূপ শুনা যায় যে, কণবী জাতির মধ্যে অজাত সন্তানদিগেরও বিবাহের সম্বন্ধ কখন কখন স্থির হইয়া থাকে। দুই প্রতিবাসীর নিজ নিজ স্ত্রী গর্ভবতী হইলে তাহারা এইরূপ চুক্তি করে যে তোমার পুত্র আমার কন্যা, কিম্বা আমার পুত্র তোমার কন্যা হইলে তাহাদের পরস্পর বিবাহ হইবে। এইরূপ ধার্য্য হইলে সত্য সত্যই যদি এক স্ত্রীর কন্যা ও অপরের পুত্র প্রসূত হয় ত অঙ্গীকার মত তাহাদের বিবাহ দেওয়া হয়।

সকলের কুল সমান নহে। কোন কুল উচ্চ, কোন কুল নীচ রূপে পরিগণিত।

পূর্ব্ব পুরুষের কৃতি ও সুখ্যাতি বশত কোন কোন বংশ বিশেষ গৌরবের পাত্র হইয়াছে। এক্ষণে অনেকটা জন্ম ভূমির উপর বংশ-মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। অহমদাবাদের আদিম-বাসী কণবীগণ কুল-শীলে শ্রেষ্ঠরূপে প্রখ্যাত। কুলীনের সঙ্গে কিসে কন্যার বিবাহ হয় ইহারই উপর পিতা মাতার বিশেষ লক্ষ্য। নীচ কুলের বরের সঙ্গে কন্যার বিবাহ হওয়া মহা অপমানের বিষয়, কুলীন যদি হতশ্রী বা বিগত-যৌবন হয় তথাপি সে প্রার্থনীয়। ৫০ বৎসর বয়স্ক কুলীনের সঙ্গে মাতা তাঁহার দশম বর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দিতে কুণ্ঠিত হন না। উচ্চ কুলের বর পাইতে হইলে অনেক অর্থের প্রয়োজন ও বিবাহের অনুষ্ঠানেও বিস্তর ব্যয়। এই হেতু কুলাভিমানী নির্ধন কণবী এবং রাজপুতদের মধ্যে কন্যা হত্যা এত প্রচলিত ছিল। কন্যা-সন্তানের প্রতি বিরাগের আর এক কারন এই যে, পিতা মনে করেন কন্যার বিবাহ হইলেই অপর ব্যক্তি আমাকে শালা শ্বশুর বলিয়া সম্বোধন করিবে, এ অপমান কিরূপে সহ্য হয়? কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহাকে এক দুগ্ধ পূর্ণ পাত্রে ফেলিয়া দিয়া পিতা মাতা কন্যা-দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন; এই প্রথার নাম 'দুধ পীতী'। ইহা বলা বাহুল্য যে ইংরাজ-রাজ্যে এ নিয়ম এক্ষণে সতীদাহ ও অন্যান্য নিষ্ঠুর প্রথার ন্যায় রাজ-শাসনে বিলুপ্ত হইয়াছে।

বর নীচ-বংশজ হইলে তাহাকে টাকা দিয়া কন্যা ক্রয় করিতে হয়। অর্থের অভাবে আপন পরিবারস্থ কোন কন্যার বিনিময়েও কন্যা পাওয়া যায়। মনে কর, রণছোড়ের এক ভগিনী ও দাজীর একটী কন্যা আছে। রণছোড় দাজীর ভ্রাতার সঙ্গে আপনার ভগিনীর বিবাহ দিয়া দাজীর কন্যাকে বিনিময়ে পাইতে পারেন। এইরূপ তিন ভ্রাতার তিন ভগিনী থাকিলে তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন ভগিনীর বিনিময়ে এক এক স্ত্রী পরিগ্রহে সমর্থ হয়। এইরূপ বিবাহকে 'সট্টা' বিবাহ বলে।

কণবীদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই পরস্পরের সম্মতিক্রমে বিবাহ-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। স্বামীকে অর্থ-লালসার বশ করিতে পারিলে স্ত্রী আপনার অভিলষিত নায়কের নিকট গমন করিতে সমর্থ হয়। স্বামীর অভিমতি ভিন্ন পর পুরুষের সহিত সহবাস করিলে অনেক সময় স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া মাজিস্ট্রেটের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করে; কিন্তু আইন-অনুসারে স্ত্রী দণ্ডনীয় নহে, তাহার নায়ককেই দণ্ড ভোগ করিতে হয়। কিন্তু এই সকল মকদ্দমা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই প্রায় পঞ্চায়াত-কর্ত্তৃক নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। এই সকল বিবাহ সম্বন্ধীয় বিবাদে জাতীয় শাসন বিশেষ রূপে লক্ষিত হয়। জাতির পাঁচ জন মিলিয়া যে বিধান করেন তাহা উভয় পক্ষের শিরোধার্য্য। স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া যদি আর এক জনের সংসর্গে বাস করে—স্বামী স্বজাতীয় লোকদিগকে একত্র করিয়া তাহাদের নিকট আপন কাহিনী ব্যক্ত করেন। জাতির

মত হইলে স্ত্রীকে স্বামীর নিকট প্রতার্পণ করিতে হইবে। এই আদেশ লঙ্ঘন করিলে তৎক্ষণাৎ সেই অপরাধী পুরুষকে জাতি হইতে বহিষ্কৃত করা হয়, ইহা হইতে গুরুতর দণ্ড আছে কি না সন্দেহ। জাতির অভিপ্রায়ে যদি স্থির হইল যে, পরস্ত্রী-গ্রহণের দণ্ড-স্বরূপ ৫০০ টাকা দিয়া স্বামীর সম্মতি ক্রয় করিতে হইবে তো অগত্যা তাহাতেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে হয়। জাতির বিচারে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলে উপায়াভাবে আদালতের শরণাপন্ন হইতে হয়।

যে সকল কণবীর মধ্যে স্ত্রীজাতির সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা অল্প, তাহাদের পুরুষদের বিবাহ লইয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়। এক একটি কন্যারত্ন পাইবার জন্য তাহাদের প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হয়, ও অনেক বৎসর পর্য্যন্ত কাজে কাজেই অবিবাহিত থাকিতে হয়। এই সকল লোককে মিথ্যা প্রলোভন দেখাইয়া ফাঁদে ফেলিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিবার আশয়ে কোন কোন প্রবঞ্চক এক এক কন্যা লইয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হয়। কন্যা হয়ত অন্য জাতীয়া—অথবা বিবাহিতা ও তাহার স্বামী জীবিত। বর ত কন্যার জন্য বুভুক্ষিত মৎস্যের ন্যায় তাকাইয়া আছেন—টোপ্ টপ্ করিয়া পড়িল কি অমনি তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া আট্‌কাইয়া পড়িলেন। ভবিষ্যতে কোন গোলযোগ না হয় তজ্জন্য গ্রামের দুই এক জন ভদ্র লোক হয় ত জামীন হইল—তাহাদের চক্ষে ধূলি দিয়া ছল-বল কৌশলে তাহারদিগকেও বশ করিতে হয়। বর কন্যাকর্ত্তার হাতে টাকা গণিয়া দিয়া মহা উল্লাসে বিবাহ করিলেন, পর দিন প্রাতে উঠিয়া দেখেন সে কন্যা নাই—কন্যাকর্ত্তাও অন্তর্হিত হইয়াছে। খোঁজ্ খোঁজ্ খোঁজ্—পরে সন্ধান পাইলে হয় ত আদালতে এক মহা-মকদ্দমা আসিয়া উপস্থিত হয়। ইনি ত চক্ষু মস্তিত করিয়া পরস্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিলেন—এদিকে সে স্ত্রীর যে যথার্থ স্বামী তাহার বাটীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। তাহার স্ত্রী কোথায় পলায়ন করিল, এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তর অন্বেষণ করিয়া প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইলে তিনিও বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া কন্যাকর্ত্তার নামে অভিযোগ উপস্থিত করেন। সত্য নিরূপণ করিতে বিচার-পতির মাথা ঘুরিয়া যায়। স্বামী চান তাঁহার স্ত্রী, উপস্বামী, প্রতারক দল, সকলেরই সমুচিত শাস্তি হয়। স্ত্রী বলিতেছেন—আমার স্বামী আমাকে মা বোন্ বলিয়া সম্বোধন করত গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন—আমার দোষ কি? উপস্বামী বলিতেছেন—এই স্ত্রীর স্বামী বর্ত্তমান ইহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর, জানিতে পারিলে কি এত টাকা দিয়া কন্যা ক্রয় করিতাম। প্রতারক দল বলিতেছে, আমরা ইহার কিছুই জানি না, আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছে—বর কন্যা আমরা কাহাকেও জানি না—আমরা আমাদের গ্রামে বাস করিতেছিলাম, তথা

হইতে পুলিষের লোকে আমাদিগকে ধরিয়া আনিয়াছে। প্রত্যেক পক্ষ আপন আপন সাক্ষীর সহিত দণ্ডায়মান। পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই মিথ্যা জালের মধ্য হইতে সত্য নির্ণয় করা কি সহজ ব্যাপার?

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দুর্ভিক্ষ।

এবৎসর বোম্বাই-অঞ্চলে অনাবৃষ্টির হাহা-রব চতুর্দ্দিক হইতে উঠিতেছে। গতবর্ষ হইতে মহারাষ্ট্র, দক্ষিণ মহারাষ্ট্র, সোলাপুর, খান্দেশ প্রভৃতি স্থানে দুর্ভিক্ষ-পিশাচ নর-শীকার অন্বেষণে ফিরিতেছে। আমাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা অধ্যবসায়-সহকারে এই সর্ব্ব-সংহারক ভয়ঙ্কর শত্রুকে দমন করিবার চেষ্টায় আছেন। দুই দিক রক্ষা করা চাই, সরকারী টাকার অতিব্যয়ও না হয়, লোকেরাও অনাহারে না মরে। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনগণের মধ্যে প্রতিজনে কতটুকু অন্ন আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে এই বিষয় লইয়া মহা বাদ-বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ও বোম্বাই ডাক্তারের মত যে, অর্দ্ধ সের পরিমাণ শস্য একজন বলিষ্ঠ শ্রমজীবির পক্ষে যথেষ্ট। মান্দ্রাজের স্বাস্থ্য বিভাগের কমিসনর ডাক্তার কক্রনিষ্ তীক্ষ্ণ লেখনী চালনা করিয়া এই মতের প্রতিবাদ করেন। সে যাহা হউক দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত প্রদেশের প্রজাগণের যে শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে তাহা আর বলিবার নহে। অন্নাভাবে মাতা শিশুসন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, মানুষে হলাকর্ষক ও শকট-পরিচালক হইয়া বলদের ন্যায় কার্য্য করিতেছে। গরীব লোকেরা বাঁসের বীজ, তেঁতুলের বীচি, ভুসি, বৃক্ষপত্র, আহার করিয়া কথঞ্চিৎ জীবন যাপন করিতেছে; এমন কি কাকের ন্যায় পরিত্যক্ত আহারাবশিষ্ট নর্দ্দামা হইতে কুড়াইয়া খাইতেছে। এই সময় যদি কোন কুকুর উপস্থিত থাকে, ত তাহার নিজ স্বত্বের উপর এই রূপ অযথাবিধ আক্রমণ দেখিয়া আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হয় এবং এই নর-কুকুরের যুদ্ধে মনুষ্য-জন্তু জয়ী হইয়া কুকুরের খাদ্য কাড়িয়া লইয়া উদরস্থ করে। এ শুষ্ক লেখকের কল্পনা নহে—ইহা প্রতি দিনের বাস্তবিক ঘটনা। এ সকল কি প্রাণে সয়?

এবৎসর গুজরাটেও এই রূপ অনাবৃষ্টির লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে।—আবার কতক দিন এই রূপে গত হইলে বোম্বাই-অঞ্চলে শনির রাজ্য দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রজাগণ অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্য নানাবিধ উপায় করিতেছে। বোম্বাই নগরীর প্রধানেরা হোম-যাগ দ্বারা ইন্দ্রদেবের তুষ্টি সাধনে তৎপর রহিয়াছেন—হোমের ধূমে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু কৈ, ইন্দ্রদেব ত বারিবর্ষণ করেন না। পারসীরা তাহাদের আতস বেহরামে—মুসলমানেরা মুসজিদে খৃষ্টীয়েরা তাহাদের চর্চে গিয়া বৃষ্টির জন্য সেই সর্ব্বনিয়ন্তার নিকটে প্রার্থনা করি-

তেছে। শৈব পল্লীবেরা বৃষ্টির উদ্দেশে শিবলিঙ্গ দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টাই জলমগ্ন করিয়া রাখিতেছে।—ইহাতে তাহাদের মনস্কামনা কিরূপে সিদ্ধ হইবে বুঝা দুষ্কর। কেন না মহাদেব জলমধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া মনে করিতে পারেন, এ কি মহাপ্রলয় উপস্থিত—এই ভাবিয়া জলদের মুখ বন্ধ করিবারই বিধান করিবেন—অতএব এ উপায়ে হিতে বিপরীত ঘটিবার সম্ভাবনা। এদেশে বর্ষা আনিবার আর এক প্রথা আছে—সে কি না উজানী যাওয়া, অর্থাৎ এক দিবস নগর-বাসীগণ একত্র হইয়া নগরের বাহিরে গিয়া আহারাদি করিয়া থাকে। সে দিন কাহারো ঘরে উনান জ্বলে না। অল্প দিন হইল,অহমদাবাদের কলেক্টর সাহেবের অনুমতিক্রমে সহরশুদ্ধ লোক সহরের বাহিরে উজানী করিতে গিয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদিগকে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। সেই অবধি বর্ষার নাম গন্ধও নাই। আকাশ যে নিরভ্র সেই নিরভ্র, ধরণী যে শুষ্ক সেই শুষ্কই রহিয়াছে। কয়েক দিবস হইল ইন্দোরে এই উজানী, মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মহারাজ হোল্‌কার সপরিবারে নগরবাসী জনগণ সমভিব্যাহারে ইন্দোর হইতে এক ক্রোশ দূর বানগঙ্গা নামক গ্রামে গমন করিলেন। রাজাজ্ঞা এই যে, সেখানে সমস্ত দিবস যাপন করিতে হইবে—কেহ ঘরে চুলা জ্বালাইতে পারিবে না—সকলে আপন আপন পাথেয় লইয়া নগরের প্রান্তে গিয়া আহারাদি করিবেন। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে মিলিয়া প্রায় ১৫০০০ লোক একত্র হইয়াছিল। বৃষ্টি আহ্বানোচিত পূজাদি কার্য্য সমাপন হইলে, মহারাজ নিজ হস্তে হল ধারণ করিয়া এক খণ্ড ভূমি কর্ষণ করিলেন। মহারাণী কৃষক পত্নীবেশে তাঁহার স্বামীর প্রদত্ত খাদ্য সামগ্রী স্বীয় বস্ত্রের অঞ্চলে বাধিয়া আনিয়া দিলেন। এক ক্ষেত্রে বসিয়া ভোজনাদি হইল। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া ইন্দ্রদেব আর উদাসীন থাকিতে পারিলেন না।—অল্পক্ষণ পরেই মুষল-ধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল ও রাজা প্রজা উল্লসিত চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

বোম্বাই ও মান্দ্রাজ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তাহাতে কি বঙ্গদেশ উদাসীন হইয়া তাঁহার চিরস্থায়ী বন্দবস্তের ছায়ায় বসিয়া আরাম করিবেন?—এই কি উচিত? ঘোর দুর্দ্দশাপন্ন ভ্রাতৃ-ভগিনীগণের সাহায্যে কি একটুকু অগ্রসর হইবেন না? বর্দ্ধমানাধিরাজের ন্যায় লক্ষ-পতিগণ এ বিষয়ে একটুকু মনোযোগ করিলে অনেক লোকের প্রাণরক্ষা হয়। ইংলণ্ডে যে কয়েকটি বীরপুরুষ আপনাদের প্রাণ-সঙ্কটেও খনি-নিবদ্ধ মুমূর্ষু লোকদিগকে খনি-মধ্যস্থিত প্রাচীর বিদারণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পুরস্কার স্বরূপ অর্থ প্রেরণ করা উদারতার কার্য্য বটে, কিন্তু যিনি প্রকৃত দাতা, তিনি প্রথমে ঘরের লোকদিগের কষ্ট-নিবারণে যত্নশীল হইবেন। আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে,—

শত্রুঃ পরজনে দাতা স্বজনে দুঃখজীবিনি।
মধ্বাপাতো বিষাস্বাদঃ স ধর্ম্মপ্রতিরূপকঃ॥

অনতিদূরে "জননীর ক্রোড়-নীড়ে শিশু শুতাইছে" এই দৃশ্যটি কল্পনা নেত্রে দর্শন করিয়া, যদি বঙ্গীয় ধনাঢ্যগণ তাঁহাদের প্রভূত অর্থের স্বল্পাংশও অকাল-রাহুগ্রস্ত জনপদের কল্যাণার্থে ব্যয় করেন, তাহা হইলে তাঁহারা অনেক পুণ্য সঞ্চয় করিবেন।

শ্রীস—

সম্পাদকের বৈঠক।

বৃষ্টি।

রক্ত বৃষ্টি।—মহাভারত রামায়ণে অনেক স্থলে রক্ত বৃষ্টির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, এবং ভারতবর্ষে সম্প্রতিও অনেক বার রক্ত-বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। সংবাদ-পত্রে দৃষ্ট হইল—সে দিন হায়দ্রাবাদে রক্ত-বৃষ্টি হইয়াছে এবং যশোহরেও দুই এক বার হইয়াছিল। হোমরেও রক্ত-বৃষ্টির কথা লিখিত আছে, এবং ফ্রান্স ইটালী ও ইয়ুরোপের অন্যান্য অনেক স্থলে রক্ত-বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা এই ঘটনার নিম্ন-লিখিত কারণ নির্দ্দেশ করেন।

নিকটবর্ত্তী প্রদেশের লোহিত মৃত্তিকা ঝড়ে উড়িয়া বৃষ্টির সহিত মিশ্রিত হয়; ইহাতেই বৃষ্টি লোহিত বর্ণ ধারণ করে এবং ইহাকেই অজ্ঞ লোকেরা ঈশ্বরের ক্রোধ-সূচক রক্ত-বৃষ্টি মনে করে। এ (Aix) নামক প্রদেশে একবার এইরূপ লোহিত-বর্ণ বৃষ্টি পড়ে; ধর্ম্ম-যাজকেরা তাহার অলৌকিক কারণ নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু মশিও ডিপেরেক্ বিশেষ যত্নে বৃষ্টি-বিন্দু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। তিনি কহেন, সেখানে জুলাই মাসে অতিরিক্ত প্রজাপতির আবির্ভাব হইয়াছিল এবং তাহাদেরই পক্ষ-রেণু বৃষ্টিতে মিশ্রিত হওয়াতে বৃষ্টির জল লোহিত-বর্ণ হইয়া যায়। ধূলিজাল কখন কখন এতদূর হইতে উড়িয়া আসে যে তাহা বিস্ময়-জনক। ড্রোম অঞ্চলে যে রক্তবৃষ্টি হয়, তাহা দ্বারা যে মৃত্তিকা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা ওজনে ১৯৯০০ মন। এই ধূলিজাল ১৩ই অক্টোবরে আমেরিকা হইতে রক্তানি হয় এবং ১৭ই অক্টোবরে ফ্রান্সে আসিয়া পৌঁছায়! এইরূপ রক্তিম বরফ-বৃষ্টিও ইয়ুরোপে মাঝে মাঝে হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টির সহিত মৃত্তিকা মিশ্রিত হইয়া অনেক সময়ে ভূমিতে সারের কাজ করে।

দুগ্ধবৃষ্টি।—ইয়ুরোপের প্রাচীন লেখকেরা অনেক স্থলে দুগ্ধবৃষ্টির কথা বলিয়া গিয়াছেন। এখনকার বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, হয় ত খড়ি-মিশ্রিত মৃত্তিকা দ্বারা বৃষ্টি এইরূপ শ্বেত হইয়া গিয়াছিল। ডায়ন ক্যাসিয়স্ একরূপ বৃষ্টির কথা বলেন, তাহা দেখিতে দুগ্ধের মত শ্বেত-বর্ণ। এই বৃষ্টি যে সকল তাম্র পাত্রে ও তাম্র-মুদ্রায় পড়িয়াছিল,

তিন দিন ধরিয়া তাহাদের বর্ণ রৌপ্যের মত ছিল। ফ্লামারিয়ঁ বলেন, যদি তাহা সত্য হয় তবে নিশ্চয় পারদ বৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু কি করিয়া এইরূপ ঘটনা হইল তাহার কোন বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না।

পুষ্টিকর খাদ্য-বৃষ্টি।—১৮২৪ এবং ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে পারস্যের কোন বিশেষ প্রদেশে লিচেন জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিজ্জ-বৃষ্টি হইয়াছিল, তদ্দ্বারা ভূমির পাঁচ ছয় ইঞ্চি আচ্ছন্ন হইয়া যায়; গো মেষাদি জন্তুরা তাহা অতিশয় তৃপ্তি-পূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়াছিল, এমন কি, সেখানকার অধিবাসীরা তাহা দ্বারা রুটি প্রস্তুত করিয়াছিল। মুবেনব্রোয়েক্ বলেন, ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে আর্মেনিয়াতেও একবার বসা-বৃষ্টি হইয়াছিল।

গন্ধক-বৃষ্টি।—সাধারণ লোকে বৃক্ষ বিশেষের, বিশেষতঃ কেলু ও নট্ বৃক্ষের পুষ্পরেণু-বৃষ্টিকেই গন্ধক বৃষ্টি বলিয়া মনে করে। এই রেণু-সকল বায়ু দ্বারা বহু দূর হইতে আনীত হয়। সময়ে সময়ে আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে গন্ধকীয় পদার্থ চালিত হইয়া প্রকৃত গন্ধক-বৃষ্টিও হইয়াছে। নরওয়েতে দুই একবার যে গন্ধক-বৃষ্টি হইয়াছিল তাহার কারণ নিকটবর্ত্তী আইস্‌ল্যাণ্ডস্থিত আগ্নেয় পর্ব্বত এবং নেপল্‌সের গন্ধক-বৃষ্টির কারণ ভিসুভিয়স্ আগ্নেয় পর্ব্বত।

শুষ্ক পত্র-বৃষ্টি।—১৮৬৯ খৃঃ অব্দে এপ্রিল মাসে ১২টা বাজিয়া দশ মিনিটের সময় ফ্রান্সের অট্রেস প্রদেশে মশিও জ্যালোয়া শুষ্ক ওক-পত্র-বৃষ্টি দেখিয়াছেন। ইহার কারণ—৩রা আপ্রিলে একটি প্রচণ্ড ঝড়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন শুষ্কপত্র-গুলি বায়ু-বলে আকাশের উচ্চ প্রদেশে নীত হয়, এবং বায়ুর পরাক্রমে ৩ দিন ক্রমান্বয়ে সেখানে ছিল, বায়ু শান্ত হইলেই আবার ভূমিতে পতিত হয়।

কমলা লেবু বৃষ্টি।—১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে নেপল্‌সের সমীপস্থ পসিলিপাসে এক জলস্তম্ভ উঠিয়া তীরস্থ দুইটি বৃহৎ কমলা লেবুর চাঙ্গারী লুঠ করে, অবশেষে পুনরায় কিছু দূরে তাহা বর্ষণ করে।

জীবন্ত প্রাণী-বৃষ্টি।—জল স্তম্ভ পুষ্করিণী হইতে মৎস্য ধরিয়া কখন কখন তাহা বর্ষণ করে। পেল্‌টিয়ে বলেন, একটি জল-স্তম্ভ তাঁহার মস্তকের উপর ভেক নিক্ষেপ করিয়াছিল।

স্যাভয়ের অন্তর্ভূত আরাচিতে ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে ৩রা জানুয়ারিতে সার্দ্ধ চারি ঘণ্টার সময় বরফ পড়িতে আরম্ভ হয়, সেই বরফের সঙ্গে অসংখ্য কীট-ডিম্ব ও গুটিপোকা পাওয়া গিয়াছিল।

তিসো বলেন ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে টুরিনের শস্য-ক্ষেত্রে প্রচণ্ড ঝটিকায় সহস্র সহস্র জীবিত কীট আসিয়া পড়িয়াছিল। এই জাতীয় কীট সার্ডিনিয়া ভিন্ন অন্য কোন স্থানে জন্মে না।

পঙ্গপাল-বৃষ্টি।—এই পঙ্গপাল-দল শস্যের দারুণ অনিষ্ট করে। বায়ুবলে আনীত হইয়া যে দেশে একবার পদার্পণ করে, সেখানকার উর্ব্বর ক্ষেত্র একেবারে মরুভূমি হইয়া যায়। সূর্য্য মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া যখন পঙ্গপাল-দল উড়িতে থাকে

তখন দূর হইতে তাহাদিগকে ঘোর মেঘের মত দেখায়। যত দূর দৃষ্টি যায় তত দূর আকাশ অন্ধকার এবং ভূমি আচ্ছন্ন। তাহাদিগের অযুত পক্ষের শব্দ, নির্ঝরের প্রচণ্ড ধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইতে থাকে। পৃথিবীতে নামিলাই তাহারা বৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিয়া ফেলে, মুহূর্ত্তের মধ্যে কতক্ষেত্র ব্যাপিয়া শস্যের চিহ্ন মাত্র রাখে না। যবের বৃক্ষ-মূল পর্য্যন্ত চিবাইয়া খাইয়া ফেলে, এবং বড় বড় বৃক্ষের একটি পত্রও অবশিষ্ট রাখে না। পতঙ্গ সকল দ্রব্য নষ্ট, চর্ণ, খণ্ড খণ্ডে বিভক্ত ও অঙ্কিত হয়। আর যখন কিছু অবশিষ্ট থাকে না, তখন এই ভয়ানক পতঙ্গদল তর্ভিক্ষ ও মহামারিকে তাহাদের স্থলে অভিষিক্ত করিয়া যেন কি একটি সঙ্কেত-বাক্যে সকলে মিলিয়া উঠিয়া পড়ে। কখন কখন ইহারা সমুদয় দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া অবশেষে অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। তাহাদের লক্ষ লক্ষ মৃতদেহ সূর্য্যোত্তাপে তপ্ত হইয়া অসহ্যকর বাষ্পত্যাগ করে। এইরূপে দারুণ মড়ক সমস্ত জিলায় ব্যাপ্ত হয়।

নেপোলিয়ানের উক্তি।

ইংরাজ সৈন্য।—সৈন্য-বলে সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতে যাওয়াই ইংরাজ জাতির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গর্হিত কার্য্য হইয়াছে, কারণ তাহা হইলে তাহাকে রুসিয়া, প্রসিয়া অথবা অষ্ট্রিয়ার ইচ্ছাধীন হইয়া থাকিতে হইবে; কেন না তাহাদের এত লোক নাই যে, ফ্রান্স বা ইউরোপের অন্য কোন জাতির সহিত যুদ্ধ করিয়া উঠিতে পারে, সুতরাং উক্ত জাতির মধ্যে কাহারো না কাহারো নিকট হইতে সৈন্য ধার করিতে হইবে। কিন্তু সমুদ্র-যুদ্ধে তাহাদের নাবিকেরা আমাদের অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট স্বীকার করি। তাহাদের সৈনিকদিগের উৎকৃষ্ট যোদ্ধা হইবারও কোন গুণ নাই। তৎপরতা চতুরতা অথবা বুদ্ধিতে তাহারা ফরাসিস্-দিগের সমতুল্য নহে। বিপদে পড়িলে তাহারা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া যায়। আমি নিজে মূরের পলায়ন দেখিয়াছি। আমার জীবনে এরূপ বিশৃঙ্খলা কখনও দেখি নাই। সেই পলায়ন-পর সৈনাদিগকে একত্র করা বা তাহাদের দ্বারা আর কোন কাজ করান একেবারে অসম্ভব হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই মদ খাইয়া মাতাল হইয়াছিল।

ইয়ুরোপ।—ইয়ুরোপ ত একটি ক্ষুদ্র উদ্ভের টিপি; এখানে কখন মহৎ সাম্রাজ্য স্থাপনও হয় নাই, ঘোরতর বিপ্লবও ঘটে নাই, কিন্তু ষাট্ কোটী লোকের নিবাস-স্থান এসিয়া পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্মের শৈশব-দোলা এবং সমুদয় দর্শন-শাস্ত্রের জন্ম-ভূমি।

ইংরাজি আচার ব্যবহার।—ইংরাজেরা স্ত্রী-সমাজ অপেক্ষা বোতলকে অধিক ভাল বাসে। কারণ, মদ খাইবার জন্য ও মাতাল হইবার জন্য তাঁহারা মহিলা-দিগকে আহার-স্থান হইতে বিদায় করিয়া দেন। আমি যদি ইংলণ্ডে থাকিতাম, তবে নিশ্চয়ই স্ত্রীলোকদিগের সহিত টেবিল ত্যাগ

করিয়া চলিয়া যাইতাম। যদি মাতাল না হইয়া শুদ্ধ কথোপকথন করাই উদ্দেশ্য হয়, তবে কেন তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া দেওয়া হয়? মহিলারা না থাকিলে কখনই কথোপকথন তেমন সজীব বা সরস হয় না। আমি যদি ইংরাজ-মহিলা হইতাম ও পুরুষেরা ২। ৩ ঘণ্টা ধরিয়া মদ খাইবার জন্য আমাকে তাড়াইয়া দিত তবে কখনই আমি সন্তুষ্ট হইতাম না। ফ্রান্সে স্ত্রীলোক না থাকিলে ত সে সভা মজ্জুই হয় না।

নিজের স্ত্রী।—আমি দেশ অধিকার করি কিন্তু জোজেফীন্ হৃদয় অধিকার করেন।

সত্বরতা।—সত্বরতা শিক্ষা কর। মনে রাখিও যে পৃথিবী সৃষ্টি করিতে কেবল ছয় দিন মাত্র লাগিয়াছিল। সময়টি ছাড়া আর আমার কাছে যাহা চাও তাহাই দিতে পারি। ঐ একটি দ্রব্য আছে যাহা দেওয়া আমার ক্ষমতার অতীত।

সেণ্ট্ হেলেনা।—যদি সেণ্ট্ হেলেনা ফ্রান্স্ হইত, তবে এমন যে ভীষণ মরুভূমি-তুল্য দ্বীপ, ইহাকেও আমি ভাল বাসিতাম।

তাঁহার ধর্ম্ম।—আমার ধর্ম্ম অতি সহজ। আমি যখন এই বিশাল জটিল মহান্ জগতের দিকে চাহিয়া দেখি, তখন আপনা আপনি বলিতে থাকি ইহা কখনো আকস্মিক ঘটনার ফল হইতে পারে না, কিন্তু যে উদ্দেশ্যেই হউক, ইহা কোন অপরিজ্ঞাত সর্ব্বশক্তিমান পুরুষ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। মনুষ্য-উদ্ভাবিত উৎকৃষ্টতম যন্ত্র হইতে এই জগৎ যেমন উৎকৃষ্টতর, মনুষ্য অপেক্ষা তিনিও তেমনি শ্রেষ্ঠতর।

সুমাত্রা।—ফ্রান্সকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য সুমাত্রার যেমন প্রয়োজন এমন আর কিছুরই নয়।

সৈন্য।—সৈনিকেরা আজ্ঞাবহন করিবার যন্ত্র মাত্র।

বলসংখ্যা।—নেপোলিয়ন—"অধিকতর বল-সংখ্যা সর্ব্বদাই অল্পতর বল সংখ্যাকে পরাভূত করে।"

গোহিয়ে—"কিন্তু আপনি ত অনেকবার অল্প সংখ্যক সৈন্যের দ্বারা অধিক সংখ্যক সৈন্যকে পরাস্ত করিয়াছেন।" নেপোলিয়ন—"সে স্থলেও অল্প বল অধিক বলের দ্বারা পরাজিত হইয়াছে। যখনি আমি অল্প সংখ্যক লোক-সমভিব্যাহারে অধিক সংখ্যক লোকের সম্মুখে উপস্থিত হই, তখনি আমার সেই অল্প সংখ্যক সৈন্যদিগকে একত্র জড় করিয়া বিপক্ষ-সৈন্যদের এক ভাগে বিদ্যুতের ন্যায় গিয়া পড়ি, তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া আবার আর এক দিকে আক্রমণ করি, এইরূপ অল্পে অল্পে, একে একে, সমগ্র বিপক্ষ সৈন্য পরাস্ত হয়। ইহাতেও প্রমাণ হইতেছে যে, অধিক বল অল্প বলকে পরাজিত করে।

ব্রিটন দ্বীপস্থ পাথুরিয়া কয়লার খনি।—প্রক্টর বলেন, ব্রিটনের যত কিছু মহত্ত্ব, সমস্তই তাহার পাথুরিয়া কয়লার খনির উপর নির্ভর করিতেছে; যদি কখনো এই পাথুরিয়া কয়লা নিঃশেষিত হইয়া যায়

তাহা হইলেই ব্রিটনের সভ্যতাও ক্রমে ক্রমে নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। ইংলণ্ডের খনি-শাস্ত্রবিৎগণ অনেকে গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, কয়লার ব্যয় যেরূপ ক্রমশই বাড়িতেছে তাহাতে আর দুই তিন শতাব্দীর মধ্যে ব্রিটনস্থ কয়লার ভাণ্ডার শূন্য হইয়া যাইবে। তাহা হইলে ব্রিটনে বড়ই গোল বাধিবে, সমুদয় কারখানা একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে, এবং ব্রিটিশেরা তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদের ন্যায় মৎস্য ধরিয়া ও শীকার করিয়া খাইবে।

সমুদ্রের ধ্বংস কার্য্য।—সেটলাণ্ড দ্বীপ গ্রানিট্ প্রভৃতি দৃঢ়তম শিলায় নির্ম্মিত অথচ সমুদ্র অল্প কালের মধ্যেই এই দ্বীপকে এমন ক্ষয় করিয়াছে যে তাহা বিস্ময়-জনক। আটলাণ্টিকের তীব্র বেগে তাহার শৈল সকলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গহ্বর খোদিত হইয়াছে। স্টেনেস দ্বীপও ক্রমশঃ সমুদ্রের আঘাতে এইরূপে ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। সেট্‌লাণ্ড প্রভৃতি দ্বীপের ন্যায় গ্রেট ব্রিটনের তীরভাগ শৈল-মালার দ্বারা রক্ষিত নহে, এবং সেখানে আটলাণ্টিকের বেগও অল্প। তথাপি ইয়র্কশিয়রের তীরভাগ ক্রমাগত নষ্ট হইয়া যাইতেছে, অনেক স্থলে, এখন যেখানে কেবল বালীর চিহ্নমাত্র বিদ্যমান আছে, পূর্ব্বে সেখানে প্রাচীন নগর ও গ্রাম স্থাপিত ছিল। অবরণ্, হার্টবরণ্, কিল্‌নসি প্রভৃতি অনেক স্থান ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে। "ইয়র্কশিয়রের ভূতত্ত্ব" নামক গ্রন্থে ফিলিপ্স্ লিখেন যে, ভবিষ্যতে স্পারণ-পইণ্ট নামক স্থান ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া দ্বীপের আকার ধারণ করিতেও পারে, তাহা হইলে মহা-সমুদ্র তাহার নদীমুখে প্রবেশ করিয়া দারুণ ধ্বংশ সাধন করিবে। নর্ফক্ এবং সাফোকের তীরদেশও এইরূপ দ্রুতবেগে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। লায়েল বলেন, এখন যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ ভাসিতে পারে ৫০ বৎসর পূর্ব্বে সেই খানে গ্রাম-সমেত ৫০ ফিট উচ্চ শৈল দণ্ডায়মান ছিল। ইংলণ্ডের ক্ষুদ্র দ্বীপ এইরূপ ধ্বংসের মুখে পড়িয়াছে।

সূর্য্য-মণ্ডলে গোল বাধিয়াছে।—প্রক্টর বলেন অল্প দিনের মধ্যেই সূর্য্য-মণ্ডলে এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে যে, জ্যোতির্ব্বিদেরা ভয় করিতেছেন যে, হয় সূর্য্যের তেজ অধিকতর বর্দ্ধিত হইতেছে, নয় ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। যদি এই সৌরজগতের বিশাল প্রদীপ ক্রমে নিভিয়া যায় বা অধিকতর জ্বলিয়া উঠে, উভয়ই আমাদের পক্ষে অনিষ্টজনক। জ্যোতির্ব্বিদেরা দেখিয়াছেন, কত নক্ষত্র দীপ্তিহীন হইয়া ক্রমে নিভিয়া গিয়াছে এবং কোন কোনটা বা অধিকতর দীপ্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের সূর্য্যও এই নক্ষত্র জগতের মধ্যে একটি, উহারও কোন দিন এইরূপ দশা ঘটিতে পারে।

প্রকাণ্ড সমুদ্র-তরঙ্গ।—আরিকায় ভূমিকম্প হইবার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে সমুদ্র পিছনে হঠিতে লাগিল, কিয়দ্দূর গিয়া পরক্ষণেই আবার প্রবল-বেগে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। অপরিমেয় প্রকাণ্ড তরঙ্গ ৫০ ফিট উচ্চ হইয়া অন্ধকার দেয়ালের ন্যায়

নগরের দিকে অগ্রসর হইল এবং নগরের অধিকাংশই নষ্ট করিয়া ফেলিল। এক দিন ইকিক-নিবাসী লোকেরা দেখিল, দূর হইতে গভীর নীলবর্ণ প্রকাণ্ড জলরাশি সমুদ্রতল হইতে কর্দ্দম ও পঙ্ক লইয়া নগর-গ্রাম গ্রাস করিতে করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। বন্দরে যে দ্বীপ ছিল তাহা এই তরঙ্গ-তলে মগ্ন হইয়া যায়। কতগৃহ ভগ্ন করিয়া, গ্রাম নষ্ট করিয়া, মনুষ্য নিহত করিয়া এই প্রকাণ্ড তরঙ্গ আবার সমুদ্রের ক্রোড়ে ফিরিয়া গেল। এই প্রকার তরঙ্গ প্রায় ১০০ ক্রোশ হইতে ৫০০ ক্রোশ পর্য্যন্ত প্রশস্ত এবং ৪০০০ ক্রোশ দীর্ঘ হয়।

ঘড়ি।—শার্লমেনের বিশ্বাসী কর্ম্মচারী লিখিয়াছেন যে, ৮০৭ খৃষ্টাব্দে পারস্য-রাজ আবদুল্লা শার্লমেন্‌কে একটি ঘড়ি উপহার দেন। তাহারো এক প্রকার চক্র-সম্বলিত যন্ত্র ছিল, কিন্তু তাহা জল-পতনে ঘুরিত; এই ঘড়ি দেখিয়া ফরাসী-রাজসভা অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। সময়-চিহ্নাঙ্কিত ঘটিকা-ফলকের উপর ১২টি সময়-জ্ঞাপক ক্ষুদ্র দ্বার ছিল, বিশেষ বিশেষ ঘণ্টায় বিশেষ বিশেষ দ্বার উন্মুক্ত হইত এবং ক্ষুদ্র তাম্র-গোলা বাহির হইয়া একটি ঘণ্টায় আঘাত করিত। বারটা বাজিয়া গেলে ১২টি অশ্বারোহী মূর্ত্তি ফলকের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইত।

অদ্ভুত উৎস।—ইয়র্কশিয়রে ন্যারেসবরা দুর্গের ধ্বংশাবশেষের বিপরীত দিকে নিড নদীর দক্ষিণ পশ্চিমতীরে একটি উৎস আছে। সেখানে দরিদ্র লোকেরা আসিয়া ফল ফুল বৃক্ষপত্র জলে ফেলিয়া দেয়। ঐ জলে সেই সকল দ্রব্য প্রস্তর হইয়া যায়। পরে তাহারা উহা লইয়া বিক্রয় করে। এমন কি, ডিম্ব-সমেত পক্ষীর নীড়ের প্রত্যেক সূক্ষ্ম অংশও প্রস্তর হইতে দেখা গিয়াছে।

নস্য গ্রহণে সময় ও অর্থের অপব্যয়।—লর্ড্ ষ্টানাপ্ বলেন, প্রত্যেক অচিকিৎস্য, পাকা নস্য-সেবক দশ মিনিটে একটিপ্ করিয়া নস্য লন। নাক ঝাড়িতে, মুছিতে এবং নস্য গ্রহণের অন্যান্য নানা বিধ আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠান করিতে করিতে দেড় মিনিট ব্যয়িত হইয়া যায়। এইরূপে ষোল ঘণ্টার মধ্যে দশ মিনিট অন্তর নস্য লইলে প্রতিদিনে ২ঘণ্টা ২৪ মিনিট নষ্ট হয়, সুতরাং প্রত্যেক বৎসরে সার্দ্ধ ছত্রিশ দিন অতিবাহিত হয়। এইরূপে সমস্ত চল্লিশ বৎসরে চারি বৎসর নষ্ট হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত নস্য, নস্যের বাক্স, রুমাল কিনিতে সাধারণ নস্য-সেবকদিগের যে অর্থ ব্যয় হয় তাহাতে আমাদের জাতীয় ঋণ পরিশোধ হইয়া যাইতে পারে।

মঙ্গল ও অমঙ্গল সমাচার।—দুই বন্ধু পরস্পর সাক্ষাৎকারে এক জন আর এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কেমন আছেন? তিনি বলিলেন "ভাল নাই, অল্পদিন হইল আমি বিবাহ করিয়াছি।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি।—ইহা সুসমাচার বলিতে হইবে।

প্রথম ব্যক্তি।—বড় সুসমাচার নয়, যে

হেতু, যে স্ত্রীকে আমি বিবাহ করিয়াছি, সে বড় কুঁদুলে।

দ্বিতীয়।—ইহা অমঙ্গল সমাচার বলিতে হইবে।

প্রথম।—বড় অমঙ্গল সমাচার নয়; কারণ বিবাহের সময় আমার শ্বশুর বিশ হাজার টাকা যৌতুক দিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়।—ইহা সুসমাচার বটে।

প্রথম।—বড় সুসমাচার নয়, কারণ আমি ঐ টাকা দিয়া মেষ ক্রয় করিয়াছিলাম, সে সকল মেষ মড়কে মরিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয়। বড় দুঃখের বিষয়।

প্রথম। বড় দুঃখের বিষয় নয়, কারণ ঐ মেষের মূল্য যত ছিল, তাহা অপেক্ষা তাহাদের চর্ম্ম বিক্রয় করিয়া অধিক টাকা পাইয়াছি।

দ্বিতীয়। তবে ইহাতে তোমার ক্ষতি পূরণ হইয়াছে।

প্রথম। বড় ক্ষতিপূরণ নয়, কারণ ঐ টাকায় আমি এক বাড়ি নির্ম্মাণ করি, তাহা পুড়িয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয়। বিলক্ষণ ক্ষতি বলিতে হইবে।

প্রথম। বড় ক্ষতি বলা যায় না, যে হেতু বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীও পুড়িয়া মরিয়াছে।

সংক্ষিপ্ততা।—চতুর্থ হেনরির অধীন এক ফরাসিস্ কর্ম্মচারী বহুদিন কর্ম্ম করিয়া বেতন না পাওয়াতে রাজার নিকট গমন করিলেন এবং অসঙ্কুচিত ভাবে কহিলেন "প্রভু, আপনাকে আমার এই তিনটি মাত্র কথা বলিবার আছে—টাকা, অথবা, জবাব।" রাজা কহিলেন "তোমাকে আমার চারিটি কথা বলিবার আছে—এটিও নয়, উটিও নয়।"

শত্রুর প্রতি প্রীতি।—চার্ল্‌স্ বে-নিটর নামে এক জন প্রসিদ্ধ মাতালকে মদ খাইতে দেখিয়া এক জন চিকিৎসক বলিয়াছিলেন "উহা পান করিও না, ব্রাণ্ডির ন্যায় জগতে আর শত্রু নাই।" চার্ল্‌স্ উত্তর করেন যে "আমি তাহা বিলক্ষণ জানি, কিন্তু বাইবেলে উপদেশ আছে যে শত্রুর প্রতি প্রীতি করা কর্ত্তব্য।"

চীন-বাসীদের খাদ্য।—চীনেরা জীবন্ত প্রাণী যাহা দেখে তাহাই প্রায় খাইয়া ফেলে। কুকুর, বিড়াল, পেঁচা, ঈগল্, বাজ, সারস, ইহারাত বাজারে সচরাচর খাদ্য দ্রব্য রূপে বিক্রীত হইয়া থাকে। ইহা না পাইলে দুই একটা নেংটে ইঁদুর, গেছো ইঁদুর, ও সাপের বাচ্চাও খাদ্য। আরসুলা ও অন্যান্য কীট তাহাদের খাদ্য ও ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কুকুরের মাংসের মত তাহারা আর কিছুই ভাল বাসে না। মোটা সোটা নরম কুকুরের মাংস বাজারে বড়ই মহার্ঘ। ভাল রাঁধুনী যদি কুকুর ছানার মাংস রন্ধন করে, তবে তাহা অমৃত বলিয়া গণ্য হয়। তত্রস্থ ইউরোপীয়েরাও কুকুর মাংসের অতিশয় প্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা স্বীকার করিয়া থাকেন যে, চীনদিগের ন্যায় রাঁধিলে হৃষ্ট পুষ্ট কুকুর-শাবক অতিশয় মিষ্ট লাগে।

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

(১) শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু বিরচিত—সৃষ্টি।

(২) শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ বিরচিত—সাংখ্য দর্শন।

দ্বিতীয় সংখ্যা পত্রিকার ৭৩ পৃষ্ঠার পর।

প্রথমে আরোহ-প্রণালী দ্বারা সৃষ্টি-তত্ত্বের কত দূর নিরাকরণ হইতে পারে তাহা দেখা যাউক, তাহার পরে অবরোহ-প্রণালী ধরা যাইবে। বিশেষ বিশেষ কার্য্যের অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা হইতে কোন সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারিলেই আরোহ-প্রণালীর কার্য্য-সিদ্ধি হয়। কোন কার্য্যের অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিবামাত্র আমাদের মনে হয় যে, ইহা অবশ্য কোন না কোন নিয়মের অধীন। এখানে এইটি জানা আবশ্যক যে, কোন একটি বিশেষ অভিব্যক্তি সমর্থন করিতে পারিলেই যে নিয়মের নিয়মত্ব হয়, তাহা নহে; ঐ জাতীয় অভিব্যক্তি যেখানে যত আছে সর্ব্বত্রই তাহার বল পৌঁছান চাই তবেই তাহা নিয়ম নামের যোগ্য হয়। একটি ফল-পতনের নিয়ম শুদ্ধ কেবল সেই ফল-পতনেতেই বদ্ধ নহে, পরন্তু অসীম জগতের গতিবিধি সেই একই নিয়মে নিয়মিত হইতেছে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, নিয়মিত ঘটনা অপেক্ষা নিয়ম ব্যাপক। এই জন্য নিয়মিত ঘটনা হইতে নিয়মে উত্থান করা আর সংকীর্ণ দৃষ্টান্ত হইতে ব্যাপক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একই কথা।

বিশেষ বিশেষ সৃষ্টির নিয়ম, সাধারণ হইতে সাধারণ সৃষ্টিতে, কিরূপে ব্যাপ্তি লাভ করে, ইহা দেখিয়া সর্ব্ব-সাধারণ সৃষ্টির নিয়ম নির্দ্ধারণ করা আরোহ-প্রণালীর কার্য্য। মনুষ্য-সৃষ্টির নিয়ম দেখিয়া পশ্বাদি সৃষ্টির নিয়ম নির্ণয় কর; পশ্বাদি সৃষ্টির নিয়ম দেখিয়া জীব-সৃষ্টির নিয়ম নিরূপণ কর; উদ্ভিদ্‌গণের জীবন আছে, এজন্য তাহাদিগকেও জীব-শ্রেণীর মধ্যে ধরা হইল। জীব-সৃষ্টির নিয়ম দেখিয়া, পৃথিবী-সৃষ্টির নিয়ম নির্দ্ধারণ কর, পৃথিবী-সৃষ্টির নিয়ম দেখিয়া সূর্য্য-সৃষ্টির নিয়ম নির্দ্ধারণ কর, সর্ব্বশেষে সাধারণতঃ সমুদায় সৃষ্টির নিয়ম কি তাহা অবধারণ কর, তাহা হইলে বলিব যে, তুমি আরোহ-প্রণালী অনুসারে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিতেছ।

মনুষ্য জরায়ুর অভ্যন্তরে জন্মে, এই একটি নিয়ম পরীক্ষা দ্বারা পাওয়া গেল; ইহা দেখিয়া পশুরাজ্যে সে নিয়মের ব্যাপ্তি আছে কি না, এই জিজ্ঞাসা উদয় হইল; তাহার পর পরীক্ষা দ্বারা পশুরাজ্যেও উক্ত নিয়মের ব্যাপ্তি নির্দ্ধারিত হইল। কিন্তু পক্ষীরা অণ্ডজ। তবে ত উক্ত নিয়মের ব্যাপ্তি পক্ষীতে সম্ভব হইতেছে না। প্রকারান্তরে হইতেছে জরায়ু এবং অণ্ড একই,

প্রভেদ কেবল এই মাত্র যে জরায়ু শরীরের অভ্যন্তরে থাকিয়া জীব প্রসব করে; অণ্ড শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীব প্রসব করে। এই রূপ জানা গেল যে জরায়ুও অণ্ড-বিশেষ। সুতরাং মনুষ্য পশু পক্ষী সকলেই অণ্ডজ। এইরূপে ঐ বিশেষ নিয়মটিকে সাধারণ করিয়া গড়িয়া তোলা হইল। পক্ষী সরীসৃপ প্রভৃতি জন্তুরা যেন অণ্ডজ হইল। কিন্তু সমুদ্রতলে যে সকল আদিম জীব আছে, যাহারা জড় হইতে কেবল এক ধাপ উচ্চ বই নয়, তাহারা স্বেদজ। তবে কি এই খানে পূর্ব্বোক্ত নিয়মের ব্যভিচার হইল! না তাহা নহে। অণ্ডের অভ্যন্তরে প্রথমে কেবল স্বেদই বর্ত্তমান থাকে। পরে তাহা দ্বিভাগ, চতুর্ভাগ, ষোড়শ ভাগ, এইরূপ অনেক ভাগে বিভক্ত হইয়া ক্রমশই সংহত হইতে সংহত ভাবে পরিণত হইয়া থাকে। অণ্ডগর্ভস্থ স্বেদের রাসায়নিক উপকরণ আর সমুদ্রতলস্থিত জীবোৎপাদক স্বেদের রাসায়নিক উপকরণ, উভয়ের মধ্যে জাতিগত কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। আরো আশ্চর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত স্বেদও যেমন খণ্ড খণ্ড হইয়া এক হইতে অনেক অঙ্গে পরিণত হয় সেই রূপ শেষোক্ত স্বেদও খণ্ড খণ্ড হইয়া এক জীব হইতে অনেক জীবে পরিণত হয়। এক স্বেদজ জীব দ্বিখণ্ড হইয়া দুই জীবে পরিণত হয়, তাহার প্রত্যেকে দ্বিখণ্ড হইয়া চারি জীবে পরিণত হয়, তাহার প্রত্যেকে দ্বিখণ্ড হইয়া ষোলো জীবে পরিণত হয়,এমনি করিয়া এক একটি স্বেদজ জীব অণ্ডগর্ভস্থ স্বেদের ন্যায় অনেক সংখ্যায় পরিণত হয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, জরায়ু যেমন অণ্ড-বিশেষ, অণ্ড তেমনি স্বেদ-বিশেষ। অতএব মনুষ্য-হইতে ক্ষুদ্রতম কীট পর্য্যন্ত সকলই স্বেদজ; এই রূপ পূর্ব্বোক্ত নিয়মের ব্যাপ্তি আর এক গ্রাম উচ্চে উঠিল। অতীব নিকৃষ্ট জীব এবং অতীব নিকৃষ্ট উদ্ভিদ্ উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এত অল্প যে, অনেক সময়ে জীবকে উদ্ভিদ্ এবং উদ্ভিদ্‌কে জীব বলিয়া ভ্রম হয়, এবং অনেক স্থলে কোন্‌টি জীব কোন্‌টি উদ্ভিদ্ উভয়ই বা জীব, উভয়ই বা উদ্ভিদ্, ইহার কিছুই মীমাংসা হইতে পারে না। অতীব নিকৃষ্ট জীবের ন্যায় অতীব নিকৃষ্ট উদ্ভিদ্‌ও স্বেদজ, এবং উৎকৃষ্ট জীবের ন্যায় উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ্‌কে এক প্রকার অণ্ডজ বলিলেও বলা যায়। কেন না বিজ্ঞানের চক্ষে বীজ এবং অণ্ডের মধ্যে জাতি-সাদৃশ্য স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। বীজের আদিম উপকরণ অণ্ডের আদিম উপকরণ, এবং জীবোৎপাদক স্বেদের উপকরণ সকলই একজাতীয়। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, জীব-রাজ্য এবং উদ্ভিদ্-রাজ্য সমস্ত ব্যাপিয়া এই এক নিয়ম বর্ত্তমান আছে যে, এক স্বেদ-পদার্থ বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়া হয় অনেক জীব অথবা অনেক উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হয়, নয় উহা ঐরূপ বিভক্ত হইয়া এক-একটি জীব কিংবা উদ্ভিদের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পরিণত হয়; আর অমনি সেই জীবস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমষ্টি-রূপে জীব-একটি বা উদ্ভিদ্-একটি উৎপন্ন হয়। মনে করিও না যে উদ্ভিদ্ পর্য্যন্ত

ঐ নিয়মের ব্যাপ্তি হইলেই যথেষ্ট হইল; সমস্ত জীবজন্তুর আধার যে পৃথিবী তাহার উৎপত্তিও ঐ নিয়মের বশবর্ত্তী। প্রথমে এক সূর্য্য ছিল, তাহা হইতে তাহার কতক অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথিবী-রূপে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবী দ্রবীভূত অবস্থায় সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, ইহা একটি বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত। যেমন অণ্ডগর্ভস্থ স্বেদ বিভক্ত হইয়া-হইয়া জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পরিণত হয়, সেইরূপ সূর্য্য এবং তাহার ছিন্নাংশ-সকল বিভক্ত হইয়া-হইয়া সৌর জগতের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পরিণত হইয়াছে। এই সমস্ত ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এই একটি ব্যাপক মূল নিয়ম পাওয়া যায় যে,এক হইতে অনেকে পরিণতি, একাকার হইতে বিভিন্নাকারে পরিণতি, এইরূপ নিয়মে সৃষ্টির মূল হইতে তাহার শাখা প্রশাখা উদ্ভূত হইয়া থাকে।

উপরে পাওয়া গেল, এই যে, মনুষ্য-সৃষ্টির নিয়ম মনুষ্যেতেই বদ্ধ নহে, পরন্তু যখন মনুষ্য আদৌ জন্মে নাই সে সময়ে তাহা অপরাপর জীবজন্তু এবং উদ্ভিদ্‌রাজ্যে প্রকারান্তরে বলবৎ ছিল। এবং তাহারাও যখন জন্মে নাই তখন তাহা প্রকারান্তরে সৌর জগতে বলবৎ ছিল। যখন সৌর জগৎও জন্মে নাই, যখন সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম আদি-ভূত সমস্ত-আকাশময় ব্যাপিয়া ছিল, তখনও উক্ত নিয়ম প্রকারান্তরে বলবৎ ছিল। উপরে যেমন দেখা গেল যে, কোন বিশেষ-সৃষ্টির নিয়ম সেই বিশেষ সৃষ্টি অপেক্ষা ব্যাপক, সেই রূপ নির্ব্বিশেষে বলা যাইতে পারে যে, সৃষ্টির নিয়ম সৃষ্টি অপেক্ষা ব্যাপক। প্রামাণিক পণ্ডিত বলেন যে, তুমি কেবল জগতের নিয়ম আবিষ্কার করিতে যত্নশীল হও। জগতের কারণ-অন্বেষণ করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিও না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, জগতের নিয়ম যাহা তুমি মান তাহা তোমার মনোরাজ্যে, না তোমার মনের বাহিরে কোথায় অবস্থিতি করিতেছে? যখন দেখা যাইতেছে যে, জগতের নিয়ম তোমার থাকা-না-থাকার উপর নির্ভর করে না, তুমি না থাকিলেও জগতের নিয়ম যেমন তেমনি থাকিবে; এবং যখন বাহ্যবস্তু সকলের পরীক্ষা হইতেই সে নিয়ম আবিষ্কার করিয়া পাওয়া যাইতে পারে তাহাকে মন হইতে উদ্ভাবন করিয়া পাওয়া যায় না, তখন সে নিয়ম আমাদের মনের বাহিরে অবস্থিতি করিতেছে তাহাতে আর সংশয় নাই। অতঃপর জিজ্ঞাস্য এই যে, কার্য্যের অভিব্যক্তি অগ্রে না তাহার নিয়ম অগ্রে? যখন কোন কার্য্য অভিব্যক্ত হয়, তখন তাহা কোন না কোন নিয়মানুসারেই অভিব্যক্ত হয়; সুতরাং কার্য্য অভিব্যক্তির পূর্ব্বে তাহার নিয়ম সুস্থির থাকা চাই। অতএব দুইটী কথা সুনিশ্চিত—প্রথম জগতের নিয়ম আমাদের মনের বাহিরে; দ্বিতীয়, অগ্রে নিয়ম পরে কার্য্যের অভিব্যক্তি। নিয়ম-সম্বন্ধে আর একটি কথা জিজ্ঞাস্য এই যে, নিয়মের কোন বল আছে কি না? যদি বল, বল নাই, তবে তাহার আছে কি? নিয়ম-দ্বারা কার্য্য হয় অথচ তাহার বল নাই, এ কথাই বা

কিরূপ। যে রাজার কোন বল নাই, সে রাজার নিয়মে কি কোন কার্য্য হয়? অতএব নিয়মের সঙ্গে বলেরও যোগ আছে। নিয়মের সঙ্গে যদি বলের যোগ করিয়া দেওয়া যায়, তবে কারণ শব্দের অর্থ, এবং নিয়ম-শব্দের অর্থ একই হইয়া দাঁড়ায়। যদি বল যে, নিয়মের বল আছে ইহাই আমি নিশ্চিত বলিয়া মানি, কিন্তু কারণের অস্তিত্বের কিছুই নিশ্চয়তা নাই; তবে তুমি একটা আতা ফল হস্তে করিয়া ইহাও বলিতে পার যে, দেখ আমি একটা আম্র ফল পাইয়াছি; ইহার গা দাগ্‌ড়া দাগ্‌ড়া; ইহার সাদা শাঁস এবং অনেক গুলি কালো কালো বীজ, ইত্যাদি। এরূপ আম্রফলকে আতা ফল বলিলেই ত ভাল হয়।

জগতের নিয়ম আমাদের মনের বাহিরে; তাহা আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর নহে; তাহা সাক্ষী-গোপালের ন্যায় নিষ্কর্ম্মাও নহে তাহার বলে জগৎকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে; এই রূপ, কারণের যত গুলি উপাধি আছে, সকল-গুলিই নিয়মেতে আরোপিত হইল, আতা ফলের যত-গুলি উপাধি আছে সকল-গুলিই আম্রফলে আরোপিত হইল, অথচ আমি এই একটি কোট ধরিয়া বসিলাম যে, আমি নিয়মই বলিব, কারণ শব্দ মুখে উচ্চারণ করিব না; আম্র ফলই বলিব আতাফল কোন মতেই বলিব না; এরূপ করিলে কারণেরও গৌরব-হানি হইবে না, নিয়মেরও গৌরব-বৃদ্ধি হইবে না; আতাফলেরও গৌরব-হানি হইবে না, আম্রফলেরও গৌরব-বৃদ্ধি হইবে না; হইবে কেবল একটা শব্দের পরিবর্ত্তন, আর কিছুই নহে। এরূপ শব্দ-পরিবর্ত্তনের না আছে অর্থ, না আছে হেতু, না আছে ফল, কেবল অনর্থক একটা গণ্ডগোল মাত্রই সার। অতএব "কারণ মানিব না" এ প্রতিজ্ঞা কোন কার্য্যের নহে। যদি তুমি নিয়মের বল মানিলে তবে আর কারণ মানিবার বাকি কি রহিল? যাহার বলে কার্য্য হয় তাহার নামই কারণ। "কারণ মানিব না" তোমার এ প্রতিজ্ঞা একত রক্ষা পাইল না, তাহাতে আবার নিয়মকে বল-বিশিষ্ট একটা বস্তুর ন্যায় করিয়া গড়িয়া তোলা হইল; একি সৃষ্টিছাড়া অসঙ্গত ব্যাপার! নিয়ম শূন্যে আছে এবং তাহার বল আছে এই রূপ একটা অদ্ভুত প্রকারের কারণ খাড়া করিতেছ, অথচ শক্তি-বিশিষ্ট বস্তু যাহা সম্ভবপর কারণ, তাহা মানিতে ভার বোধ করিতেছ। শূন্যের উপরে গন্ধর্ব্ব-নগর স্থাপন করিতেছ, অথচ পৃথিবীর কোন প্রদেশে যে নগর স্থাপন হইতে পারে ইহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছ না।

সে যাহা হউক্ আমরা নিয়মকে কারণ বলিতেও প্রস্তুত নহি, আর নিয়ম কোন বস্তুর অবলম্বন ছাড়িয়া শূন্যে শূন্যে ফিরে, ইহা বলিতেও প্রস্তুত নহি; শক্তিমান বস্তুকেই আমরা কারণ বলিয়া অবধারণ করিয়া থাকি। এরূপ মূলতত্ত্ব-সকল সহজে বুঝিলে অতি সহজ, নচেৎ কেবল শব্দের দ্বন্দ্ব কোলাহলই যথাসর্ব্বস্ব।

অগ্রে নিয়ম পরে কার্য্য-অভিব্যক্তি ইহা, বুঝিলে সহজেই বুঝা যায়, কিন্তু

না বুঝিলে বুঝান সহজ নহে। মনে কর আমি কোন চিকিৎসকের নিকট শুনিলাম যে, প্রত্যূষে পদচারণা করিয়া বেড়াইলে শরীর খুব ভাল থাকে। তদবধি এই রূপ নিয়ম করিলাম যে, কল্য হইতে প্রত্যহ প্রাতঃকালে বেড়াইতে বাহির হইব। তাহার পর নিয়মিত রূপে সেই রূপ কার্য্য করিতে লাগিলাম। সহস্র প্রামাণিক পণ্ডিত হইলেও এখানে কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, অগ্রে নিয়ম পরে কার্য্য-অভিব্যক্তি। এক জন ফরাসিস্ তত্ত্বজ্ঞানী নিজের সম্বন্ধে ইহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে যদি নিয়ম করা যায় যে, আমি অমুক সময়ে গাত্রোত্থান করিব তাহা হইলে ঠিক সেই সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইবে। এইরূপ স্থলবিশেষে আমাদের অজ্ঞাত-সারেও আমাদের কৃত নিয়ম-সকল কার্য্যকারী হয়। পুনশ্চ "প্রত্যহ অমুক সময়ে গাত্রোত্থান করিব" এই নিয়মটি যদি কিছুদিন পালন করি, তাহা হইলে ইচ্ছা-পূর্ব্বক সে নিয়ম পুনর্ব্বার স্থিরী-কৃত না হইলেও অভ্যাস বশতঃ তাহা আমাদের অজ্ঞাতসারে কার্য্য করিবে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, মানসিক নিয়ম অগ্রে, এবং সে নিয়মানুযায়ী যে কার্য্য হয় তাহা তাহার পরে। সে কার্য্য ঘটিবার পূর্ব্ব হইতেই সে নিয়ম বর্ত্তমান; কোথায় বর্ত্তমান? না সে কার্য্যের কারণ যে আমাদের মন সেই মনেতে। প্রামাণিক পণ্ডিত এখন বলিবেন যে, মানসিক নিয়ম ঐ রূপ বটে কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম আর প্রাকৃতিক ঘটনা এ দুয়ের মধ্যে ওরূপ অগ্র-পশ্চাদ্ভাব না থাকিতে পারে। তাঁহার এ কথা তাঁহার আর আর অনেক কথার ন্যায় কেবল একটা বল-প্রকাশ মাত্র, যুক্তির সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। এই একটি প্রাকৃতিক নিয়ম যে, জলজনন বাষ্প এবং অম্লজনন বাষ্প দুয়ের বিধিমত যোগ হইলে জল উৎপন্ন হয়। জলোৎপত্তি-রূপ যে একটি কার্য্য তাহা ঐ নিয়ম সাপেক্ষ। জল যখন উৎপন্ন হয় নাই তখন সে নিয়ম ছিল, জল যখন উৎপন্ন হয় তখন সেই নিয়মানুসারেই উৎপন্ন হয়। জলজনন বাষ্প এবং অম্লজনন বাষ্প, দুয়ের সংযোগে একটা হাতিও হইতে পারিত, ঘোড়াও হইতে পারিত, তাহা না হইয়া কেবল যে, জলই উৎপন্ন হইবে, এ নিয়ম কোথা হইতে আইল? অবশ্য জলজনন বাষ্প এবং অম্লজনন বাষ্প, উভয়ের প্রকৃতি হইতে। জলের কারণ যে অম্লজনন এবং জল-জনন বাষ্প, উভয়ের প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া ঐ নিয়ম বর্ত্তিতেছে। ইহা যদি না মানো তবে ও নিয়ম কোথায় বর্ত্তিতেছে? শূন্য আকাশে? জড়-বুদ্বুদের ন্যায় আকাশ ব্যাপিয়া স্থিতি করে, নিয়মও কি সেইরূপ? নিয়ম কি জড় পিণ্ডবৎ একটা সামগ্রী? অতএব জলোৎপত্তি বা অন্য কোন প্রকার প্রাকৃতিক কার্য্য-অভিব্যক্তির পূর্ব্বে তদীয় নিয়ম তাহার কারণাভ্যন্তরে বর্ত্তমান থাকে ইহাতে আর সন্দেহ-মাত্র নাই।

সহজে এটি সকলেরই বোধ-গম্য হইতে পারে যে, যে কোন কার্য্য হউক না, তাহার

অভিব্যক্তির নিয়ম তাহা অপেক্ষা ব্যাপক; এই হেতু কোন কার্য্য-বিশেষ অবলম্বন করিয়া নিয়ম বর্ত্তিতে পারে না, কার্য্যের যে কারণ তাহাকে অবলম্বন করিয়াই নিয়ম স্থিতি করে। মনুষ্য সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে মনুষ্য সৃষ্টির নিয়ম বর্ত্তমান ছিল। কোথায় বর্ত্তমান ছিল? কারণেতে। যখন মনুষ্য সৃষ্ট হইল, তখন সে নিয়ম কার্য্যেতে প্রতিভাত হইল। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, নিয়ম কেবল যে কার্য্য-পরিসরের মধ্যেই বদ্ধ থাকে এমন নহে, কারণ পর্য্যন্ত তাহার ব্যাপ্তি। কার্য্য কারণ উভয় ব্যাপিয়া নিয়ম অবস্থিতি করে। কারণেরও কারণ আছে; যে যুক্তিতে কার্য্য হইতে কারণে নিয়মের ব্যাপ্তি মানিতে হইতেছে সেই যুক্তিতে কারণ হইতে তাহারও কারণে নিয়মের ব্যাপ্তি মানিতে হইবে। সুতরাং কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলার আদ্যন্ত সর্ব্বত্রই নিয়মের ব্যাপ্তি মানিতে হইবে। অতএব সেই সূক্ষ্ম'সূক্ষ্ম আদিভূত,সাংখ্যদর্শন যাহাকে ভূতাদি বলিয়াছেন, ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা যাহাকে ঈথর্ বলিয়াছেন, বেদান্ত যাহাকে আকাশ বলিয়াছেন, সৃষ্টির নিয়ম সেই আদিভূত হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। মনুষ্য-সৃষ্টির পূর্ব্বে, জীবজন্তু উদ্ভিদ্ সৃষ্টির পূর্ব্বে, পৃথিবী-সৃষ্টির পূর্ব্বে, সূর্য্য-সৃষ্টির পূর্ব্বে অসীম আকাশ-ব্যাপী যে ভূতাদি তাহার সহিত সৃষ্টির নিয়ম বর্ত্তমান ছিল। এই খানে আরোহ-প্রণালী চরম-সীমায় উপনীত হইল, আরোহ-প্রণালী ইহা অপেক্ষা আর উচ্চে উঠিতে পারে না। যেমন চক্রের অন্তর্ভূত ত্রিকোণ চতুষ্কোণাদি ফলকের কোণ-সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয় ততই তাহা চক্রের নিকটবর্ত্তী হয়, কিন্তু উক্তরূপ কোণ বৃদ্ধি প্রণালীদ্বারা উহা কোন কালেই চক্রের সহিত একীভূত হইতে পারে না; সেই রূপ আরোহ-প্রণালীদ্বারা স্থূল সৃষ্টি হইতে সূক্ষ্ম সৃষ্টিতে যতই আরোহণ করা যায়, ততই সৃষ্টির আদি-কারণের নিকটবর্ত্তী হওয়া যায় বটে কিন্তু সে প্রণালীতে কোন কালেই সেখানে পৌঁছিতে পারা যায় না এই জন্যই অবরোহ প্রণালীর প্রয়োজন। আদিভূত যতই কেন সূক্ষ্ম হউক না, কিন্তু আত্মা তাহা অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। যদি বল যে তাহার প্রমাণ কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আত্মা আপনি আপনার প্রমাণ। বলিয়াছি এই যে, বহির্জগতে সত্য বহুধা-বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে এজন্য তথাকার কোন একটি সত্যের প্রমাণ দিতে হইলে অন্য আর একটি বা ততোধিক সত্যের সহায়তা আবশ্যক হয়। পৃথিবী গোল এই সত্যটির প্রমাণ দিতে হইলে জাহাজের মাস্তুর দিগন্ত রেখায় ক্রমে ক্রমে নিমগ্ন হইয়া যায়, এই আর একটি সত্যের সহায়তা আবশ্যক হয়। প্রত্যুত আত্মাতে সত্য এমনি প্রগাঢ়রূপে ওতপ্রোত রহিয়াছে যে, তাহা সহজ অনুভব ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা করে না। বহির্জগতে সত্য বিক্ষিপ্ত ভাবে রহিয়াছে বলিয়া তথায় একাধিক প্রমাণের প্রয়োজন হইয়া থাকে। আত্মাতে সত্য প্রগাঢ় ভাবে রহিয়াছে বলিয়া, একমাত্র

স্বানুভূতি ভিন্ন তাহার দ্বিতীয় প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ স্বানুভূতিকে আমরা প্রমাণের পরাকাষ্ঠা বলিয়া স্বীকার করি। যেখানে স্বানুভূতি সম্ভবে না, সেই খানেই অন্য প্রকার প্রমাণ দর্শান আবশ্যক হয়। যেমন জ্বলন্ত প্রদীপকে দেখিবার জন্য দ্বিতীয় প্রদীপ আবশ্যক হয় না, তেমনি আত্মাকে জ্ঞানায়ত্ত করিতে হইলে দ্বিতীয় কোন বস্তুর প্রয়োজন হয় না; আত্মা আপনিই আপনার প্রমাণ।

ক্রমশঃ।

মেঘনাদ-বধ কাব্য।

(মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত।)

গত সংখ্যার সমালোচনা পড়িয়া কেহ কেহ কহিতেছেন, পুরাণে লক্ষ্মী চপলা বলিয়াই বর্ণিত আছেন। কবি যদি পুরাণেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন তাহাতে হানি কি হইয়াছে? তাঁহাদের সহিত একবাক্য হইয়া আমরাও স্বীকার করি যে, লক্ষ্মী পুরাণে চপলারূপেই বর্ণিত হইয়াছেন; কিন্তু চপলা অর্থে কি বুঝায়? আজ আছেন, কাল নাই। পুরাণ লক্ষ্মীকে চপলা অর্থে এরূপ মনে করেন নাই, যে আমারই পূজা গ্রহণ করিবেন অপচ আমার বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র করিবেন। এ লুকাচুরি, কেবল দেবতা নহে মানব চরিত্রের পক্ষেও কত খানি অসম্মান-জনক তাহা কি পাঠকেরা বুঝিতে পারিতেছেন না? কপটতা ও চপলতা দুইটি কথার মধ্যে যে অর্থগত প্রভেদ আছে ইহা বোধ হয় আমাদের নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে না। মেঘনাদবধের লক্ষ্মীর চরিত্র মধ্যে দুইটি দোষ আছে, প্রথম কপটতা, দ্বিতীয় পরস্পর বিরোধী ভাব। গুপ্ত ভাবে রাবণের শত্রুতা সাধন করাতে কপটতা এবং কখন ভক্ত বৎসলতা দেখান ও কখন তাহার বিপরীতাচরণ করাতে পরস্পর-বিরোধী ভাব প্রকাশ পাইতেছে। পাঠকেরা কেহ যদি লক্ষ্মীর পূর্ব্বোক্তরূপ হীন চরিত্র পুরাণ হইতে বাহির করিতে পারেন তবে আমরা আমাদের ভ্রম স্বীকার করিব। কিন্তু যদিওবা পুরাণে ঐরূপ থাকে তথাপি কি রুচিবান কবির নিকট হইতে তাহা অপেক্ষা পরিমার্জ্জিত চিত্র আশা করি না?

প্রথম সর্গে যখন ইন্দিরা ইন্দ্রজিতকে তাঁহার ভ্রাতার নিধন সংবাদ শুনাইলেন তখন

"ছিঁড়িলা কুসুম দাম রোষে মহাবলী
মেঘনাদ, ফেলাইলা কনক বলয়
দূরে, পদতলে পড়ি শোভিলা কুণ্ডল,
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে
আভাময়! "ধিক্ মোরে" কহিলা গম্ভীরে
কুমার, "হা ধিক্ মোরে! বৈরিদল বেড়ে

স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি রামাদল মাঝে ?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ ; আন রথ ত্বরা করি ;
ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে।"

ইন্দ্রজিতের তেজস্বিতা উত্তম বর্ণিত হইয়াছে। রাবণ যখন ইন্দ্রজিতকে রণে পাঠাইতে কাতর হইতেছেন তখনই

উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি রিপু ;—
"কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র ? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, একলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।
হাসিবে মেঘ বাহন, রুষিবেন দেব অগ্নি।"

ইহাতেও ইন্দ্রজিতের তেজ প্রকাশিত হইতেছে, এই রূপে কবি ইন্দ্রজিতের বর্ণনা যেরূপ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা ভাল লাগিল।

"সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ বীর আভরণে,
* * * *
মেঘবর্ণ রথ, চক্র বিজলীর ছটা ;
ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী; তুরঙ্গম বেগে
আশুগতি।"

পূর্ব্বে কবি রোদনের সহিত ঝড়ের যে-রূপ অদ্ভুত তুলনা ঘটাইয়াছিলেন এখানে সেই রূপ রথের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত মেঘ বিদ্যুত ইন্দ্রধনু বায়ুর তুলনা করিয়াছেন, কাব্যের মধ্যে এরূপ তুলনার অভাব নাই কিন্তু একটিও আমাদের ভাল লাগে না। বর্ণনীয় বিষয়কে অধিকতর পরিস্ফুট করাই ত তুলনার উদ্দেশ্য কিন্তু এই মেঘ বিজলী ইন্দ্রচাপে আমাদের রথের যে কি বিশেষ ভাবোদয় হইল বলিতে পারি না। মেঘনাদ-বধের অধিকাংশ রচনাই কৌশলময়, কিন্তু কবিতা যতই সরল হয় ততই উৎকৃষ্ট। রামায়ণ হোমার প্রভৃতি মহাকাব্যের অন্যান্য গুণের সহিত সমালোচকেরা তাহাদিগের সরলতারও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

"মানস সকাশে শোভে কৈলাস-শিখরী
আভাময়, তার শিরে ভবের ভবন,
শিখি-পুচ্ছ চূড়া যেন মাধবের শিরে !
সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর, স্বর্ণফুল শ্রেণী
শোভে তাহে, আহা মরি পীতধড়া যেন !
নির্ঝর-ঝরিত-বারি-রাশি স্থানে স্থানে—
বিশদ চন্দনে যেন চর্চ্চিত সে বপুঃ !"

যে কৈলাস-শিখরী চূড়ায় বসিয়া মহাদেব ধ্যান করিতেছেন কোথায় তাহা উচ্চ হইতেও উচ্চ হইবে, কোথায় তাহার বর্ণনা শুনিলে আমাদের গাত্র লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে, নেত্র বিস্ফারিত হইবে, না "শিখি-পুচ্ছ চূড়া যথা মাধবের শিরে।" মাইকেল ভাল এক মাধব শিখিয়াছেন, এক শিখি-পুচ্ছ, পীতধড়া, বংশীধ্বনি আর রাধাকৃষ্ণ কাব্যময় ছড়াইয়াছেন। কৈলাস-শিখরের ইহা অপেক্ষা আর নীচ বর্ণনা হইতে পারে না। কোন কবি ইহা অপেক্ষা কৈলাস-শিখরের নীচ বর্ণনা করিতে পারেন না।

"শরদিন্দু পুত্র, বধূ শারদ কৌমুদী ;
তারা কিরীটিনী নিশি সদৃশী আপনি
রাক্ষস-কুল-ঈশ্বরী ! অশ্রুবারি ধারা
শিশির, কপোল পর্ণে পড়িয়া শোভিল।"

এই সকল টানিয়া বুনিয়া বর্ণনা আমাদের কর্ণে অসম-ভূমি-পথে বাধা-প্রাপ্ত রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দের ন্যায় কর্কশ লাগে।

"গজরাজ তেজঃ ভুজে ; অশ্বগতি পদে ;
স্বর্ণরথ শিরঃ চূড়া ; অঙ্গল পতাকা
রত্নময় ; ভেরী তূরী, দুন্দুভি, দামামা
আদি বাদ্য সিংহনাদ ! শেল, শক্তি, জাটি,
তোমর, ভোমর, শূল, মুষল, মুদ্গর,
পরিঘ, নারাচ কৌন্ত—শোভে দন্তরূপে !
জনমিলা নয়নাগ্নি সাজোয়ার তেজে।"

পাঠকেরা বলুন্ দেখি এরূপ বর্ণনা সময়ে সময়ে হাস্য-জনক হইয়া পড়ে কি না !

যখন মেঘনাদ রথে উঠিতেছেন তখন প্রমীলা আসিয়া কাঁদিয়া কহিলেন,

"কোথায় প্রাণ সখে,
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি ?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী ? হায়, নাথ, গহন কাননে,
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ, যদি
তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রমে
যূথনাথ। তবে কেন তুমি, গুণনিধি
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি ?"

হৃদয় হইতে যে ভাব সহজে উৎসারিত উৎস-ধারার ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তাহার মধ্যে কৃত্রিমতা বাক্য কৌশল প্রভৃতি থাকে না। প্রমীলার এই "রঙ্গ রসের" কথার মধ্যে গুণপনা আছে, বাক্য-চাতুরীও আছে বটে, কিন্তু হৃদয়ের উচ্ছ্বাস নাই।

ইহার সহিত একটি স্বভাব-কবি-রচিত সহজ হৃদয়-ভাবের কবিতার তুলনা করিয়া দেখ, যখন অক্রূর কৃষ্ণকে রথে লইতেছেন, তখন রাধা বলিতেছেন,

"রাধারে চরণে ত্যজিলে রাধানাথ,
কি দোষ রাধার পাইলে ?
শ্যাম, ভেবে দেখ মনে, তোমারি কারণে
ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী।
নাহি অন্য ভাব, কহ হে মাধব
তোমারি প্রেমের প্রয়াসী।
ঘোরতর নিশি, যথা বাজে বাঁশি,
তথা আসি গোপী সকলে,
দিয়ে বিসর্জ্জন কুল শীলে।
এতেই হলাম দোষী, তাই তোমায় জিজ্ঞাসি
এই দোষে কিহে ত্যজিলে ?
শ্যাম, যাও মধুপুরী, নিষেধ না করি,
থাক হরি যথা সুখ পাও।
এক বার, সহাস্য বদনে, বঙ্কিম নয়নে
ব্রজগোপীর পানে ফিরে চাও।
জনমের মত, শ্রীচরণ দুটি,
হেরিছে নয়নে শ্রীহরি,
আর হেরিব আশা না করি।
হৃদয়ের ধন তুমি গোপিকার
হৃদে বজ্র হানি চলিলে ?" হরঠাকুর

ইহার মধ্যে বাক্‌চাতুরী নাই, কৃত্রিমতা নাই, ভাবিয়া চিন্তিয়া গড়িয়া পিটিয়া ঘর হইতে নারী উপমা ভাবিয়া আইসেন নাই, সরল হৃদয়ের কথা নয়নের অশ্রুজলের ন্যায় এমন সহজে বাহির হইতেছে যে, কৃষ্ণকে তাহার অর্থ বুঝিতে কষ্ট পাইতে হয় নাই, আর মাতঙ্গ, ব্রততী, পদাশ্রম, রঙ্গরস প্রভৃতি কথা ও উপমার জড়ামড়িতে প্রমীলা হয়ত ক্ষণেকের জন্য ইন্দ্রজিৎকে ভাবাইয়া তুলিয়াছিলেন।

ইন্দ্রজিতের উত্তর সেই রূপ কৃত্রিমতা-

ময়, কৌশলময়, ঠিক যেন প্রমীলা খুব এক কথা বলিয়া লইয়াছেন, তাহার ত একটা উপযুক্ত উত্তর দিতে হইবে, এই জন্য কহিতেছেন,

"ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে
সে বাঁধে" ইত্যাদি।

সমস্ত মেঘনাদবধ কাব্যে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসময় কথা অতি অল্পই আছে, প্রায় সকলগুলিই কৌশলময়। ৩য় সর্গে যখন প্রমীলা রামচন্দ্রের কটক ভেদ করিয়া ইন্দ্রজিতের নিকট আইলেন তখন ইন্দ্রজিৎ কহিলেন

"রক্তবীজে বধি তুমি এবে বিধুমুখী,
আইলা কৈলাস ধামে" ইত্যাদি

প্রমীলা কহিলেন

"ও পদ-প্রসাদে, নাথ, ভববিজয়িনী
দাসী, কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে।
অবহেলি শরানলে, বিরহ অনলে
(দুরূহ) ডরাই সদা ;" ইত্যাদি—

যেন স্ত্রীপুরুষে ছড়া-কাটাকাটি চলিতেছে। পঞ্চম সর্গের শেষ ভাগে পুনরায় ইন্দ্রজিতের অবতারণা করা হইয়াছে।

"কুসুম শয়নে যথা সুবর্ণ মন্দিরে
বিরাজে রাজেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিৎ, তথা
পশিল কূজন ধ্বনি সে সুখ সদনে।
জাগিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জরম গীতে।
প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায়রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি) "ডাকিছে কুজনে,
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখীকুল! মিল প্রিয়ে, কমল-লোচন।
উঠ, চিরানন্দ মোর, সূর্য্যকান্ত মণি-
সম এ পরাণ কান্তা, তুমি রবিচ্ছবি ;—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্যবৃক্ষে ফলোত্তম তুমিহে জগতে
আমার! নয়ন তারা! মহার্হ রতন।
উঠি দেখ শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম!" ইত্যাদি

এই দৃশ্যে মেঘনাদের কোমলতা সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে। প্রমীলার নিকট হইতে ইন্দ্রজিতের বিদায়টি সুন্দর হইয়াছে, তাহার মধ্যে বাক্‌চাতুরী কিছুমাত্র নাই। কিন্তু আবার একটি যথা আসিয়াছে

"যথা যবে কুসুমেষু ইন্দ্রের আদেশে
রতিরে ছাড়িয়া শূর, চলিলা কুক্ষণে,
ভাস্বিতে শিবের ধ্যান ; হায়রে, তেমতি
চলিলা কন্দর্প রূপী ইন্দ্রজিৎ বলী,
ছাড়িয়া রতি-প্রতিমা প্রমীলা সতীরে।
কুলগ্নে করিলা যাত্রা মদন ; কুলগ্নে
করি যাত্রা গেলা চলি মেঘনাদ বলী—
বিলাপিলা যথা রতি প্রমীলা যুবতী।"
ইত্যাদি।

বলপূর্ব্বক ইন্দ্রজিৎকে মদন ও প্রমীলাকে রতি করিতেই হইবে। রতির ন্যায় প্রমীলাকে ছাড়িয়া মদনের ন্যায় ইন্দ্রজিৎ চলিলেন, মদন কুলগ্নে যাত্রা করিয়াছিলেন, ইন্দ্রজিৎও তাহাই করিলেন তখন মদন ও ইন্দ্রজিৎ একই মিলিয়া গেল, আর রতিও কাঁদিয়াছিলেন, রতিরূপিনী

প্রমীলাও কাঁদিলেন, তবেত রতি আর প্রমীলায় কিছুমাত্র ভিন্নতা রহিল না।

আবার আর একটি কৃত্রিমতাময় রোদন আসিয়াছে, যখন ইন্দ্রজিৎ গজেন্দ্র-গমনে যুদ্ধে যাইতেছেন তখন প্রমীলা তাঁহাকে দেখিতেছেন আর কহিতেছেন,—

"জানি আমি কেন তুই গহন কাননে
ভ্রমিস্‌রে গজরাজ! দেখিয়া ও গতি
কি লজ্জায় আর তুই মুখ দেখাইবি,
অভিমানী? সরু মাঝা তোররে কে বলে,
রাক্ষস-কুল-হর্গ্যক্ষে হেরে যার আঁখি,
কেশরি? তুইও তেঁই সদা বনবাসী।
নাশিস্ বারণে তুই; এ বীর-কেশরী
ভীম প্রহরণে রণে বিমুখে বাসবে," ইত্যাদি

এই কি হৃদয়ের ভাষা? হৃদয়ের অশ্রুজল? হেমবাবু কহিয়াছেন "বিদ্যাসুন্দর এবং অন্নদামঙ্গল ভারতচন্দ্র-রচিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য, কিন্তু যাহাতে অন্তর্দাহ হয়, হৃৎকম্প হয়, তাদৃশ ভাব তাহাতে কই?" সত্য ভারতচন্দ্রের ভাষা কৌশলময়, ভাবময় নহে, কিন্তু "জানি আমি কেন তুই" ইত্যাদি পড়িয়া আমরা ভারতচন্দ্রকে মাইকেলের নিমিত্ত সিংহাসনচ্যুত করিতে পারি না। তাহার পরে প্রমীলা যে ভগবতীর কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা সুন্দর হইয়াছে। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুবর্ণনা, লক্ষ্মণের চরিত্র-সমালোচনা স্থলে আলোচিত হইবে।

মেঘনাদ বধ কাব্যের মধ্যে এই ইন্দ্রজিতের চরিত্রই সর্ব্বাপেক্ষা সুচিত্রিত হইয়াছে। তাঁহাতে একাধারে কোমলতা বীরত্ব উভয় মিশ্রিত হইয়াছে।

ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ যাত্রার সময় আমরা প্রথমে প্রমীলার দেখা পাই, কিন্তু তখন আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই, তৃতীয় সর্গে আমরা প্রমীলার সহিত বিশেষ রূপে পরিচিত হই। প্রমীলা পতি-বিরহে রোদন করিতেছেন।

"উতরিলা নিশাদেবী প্রমোদ উদ্যানে।
সিহরি প্রমীলা সতী, মৃদুকল স্বরে,
বাসন্তী নামেতে সখি বসন্ত সৌরভা
তার গলা ধরি কাঁদি কহিতে লাগিলা;
"ওই দেখ আইল লো তিমির যামিনী,
কাল ভুজঙ্গিনীরূপে দংশিতে আমারে,
বাসন্তি! কোথায় সখি, রক্ষঃকুলপতি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপত্তিকালে?"

ইত্যাদি

পূর্ব্বে কি বলি নাই মেঘনাদবধে হৃদয়ের কবিতা নাই, ইহার বর্ণনা সুন্দর হইতে পারে, ইহার দুই একটি ভাব নূতন হইতে পারে, কিন্তু কবিতার মধ্যে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অতি অল্প। আমরা অনেক সময়ে অনেক প্রকার ভাব অনুভব করি, কিন্তু তাহার ক্রমানুযায়ী শৃঙ্খলা খুঁজিয়া পাই না, অনুভব করি অথচ কেন হইল কি হইল কিছুই ভাবিয়া পাই না, কবির অণুবীক্ষণী কল্পনা তাহা আবিষ্কার করিয়া আমাদের দেখাইয়া দেয়। হৃদয়ের প্রত্যেক তরঙ্গ প্রতিতরঙ্গ যাঁহার কল্পনার নেত্র এড়াইতে পারে না তাঁহাকেই কবি বলি। তাঁহার রচিত হৃদয়ের গীতি আমাদের হৃদয়ে চিরপরিচিত সঙ্গীতের ন্যায় প্রবেশ করে। প্রমীলার বিরহ উচ্ছ্বাস আমাদের হৃদয়ের দুয়ারে তেমন আঘাত

করে না ত, কাল ভুজঙ্গিনী-স্বরূপ তিমির-যামিনীর কাল, চন্দ্রমার অগ্নি-কিরণ ও মলয়ের বিষজ্বালাময় কবিতার সহিত অন্তর্নিহিত হইয়াছে।

প্রমীলা বাসন্তীকে কহিলেন—

"চল, সখি, লঙ্কা পুরে যাই মোরা সবে।"

বাসন্তী কহিল——"কেমনে পশিবে
লঙ্কাপুরে আজি তুমি? অনন্তবা সাগর
সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহায়?"

"কহিলা দানব বালা প্রমীলা রূপসী!

"কি কহিলি, বাসন্তি? পর্ব্বত গহ্বর ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
দানবনন্দিনী আমি, রক্ষঃ কুলবধূ,
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ বলে,
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি?"

এখানটি অতি সুন্দর হইয়াছে, তেজস্বিনী প্রমীলা আমাদের চক্ষে অনলের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন।

তৎপরে প্রমীলার যুদ্ধযাত্রার উপকরণ সজ্জিত হইল। মেঘনাদবধের যুদ্ধসজ্জা বর্ণনা, সকলগুলিই প্রায় একই প্রকার। বর্ণনাগুলিতে বাক্যের ঘনঘটা আছে, কিন্তু "বিদ্যুচ্ছটাকৃতি বিশ্বোজ্জ্বল" ভাব ছটা কই? সকল গুলিতেই "মন্দুরায় হ্রেসে অশ্ব" "নাদে গজ বারী মাঝে" "কাঞ্চন কঞ্চুক বিভা" ভিন্ন আর কিছুই নাই।

"চড়িল ঘোড়া একশত চেড়ি
* * * * *
* * হেষিল অশ্ব মগন হরষে
দানব দলনী পদ্ম পদযুগ ধরি
বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি!"

শেষ দুই পংক্তিটি আমাদের বড় ভাল লাগিল না; একত কালিকার পদযুগ বক্ষে ধরিয়া বিরূপাক্ষ নাদেন একথা কোন শাস্ত্রে পড়ি নাই। দ্বিতীয়তঃ কালিকার পদযুগ বক্ষে ধরিয়া মহাদেব চীৎকার করিতে থাকেন এ ভাবটি অতিশয় হাস্যজনক। তৃতীয়তঃ "নাদেন" শব্দটি আমাদের কাণে ভাল লাগে না। প্রমীলা সখীবৃন্দকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছেন—

"—লঙ্কা পুরে, শুন লো দানবী
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দীসম এবে।
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা
প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে?
যাইব তাঁহার পাশে, পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠে;—এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম,
নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে!
দানব কুল সম্ভবা আমরা, দানবী;—
দানব কুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষত শোণিত নদে নতুবা ডুবিতে!
অধরে ধরিলো মধু গরল লোচনে
আমরা, নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে?
চল সবে রাঘবের হেরি বীর-পনা।
দেখিব যে রূপ দেখি সূর্পনখা পিসী
মাতিল মদন মদে পঞ্চবটী বনে;" ইত্যাদি

প্রমীলা লঙ্কায় যাউন্ না কেন, বিকট কটক কাটিয়া রঘুশ্রেষ্ঠকে পরাজিত করুন্ না কেন, তাহাতে ত আমাদের কোন আ-

পত্তি নাই, কিন্তু সূর্পনখা পিসির মদন-মদের কথা, নয়নের গরল, অধরের মধু লইয়া সখীদের সহিত ইয়ার্‌কি দেওয়াটা কেন ? যখন কবি বলিয়াছেন

"কি কহিলি বাসন্তি ? পর্ব্বত গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?"

যখন কবি বলিয়াছেন—"রোষে লাজ ভয় তাজি, সাজে তেজস্বিনী প্রমীলা ।"

তখন আমরা যে প্রমীলার জ্বলন্ত অনলের ন্যায় তেজোময় গর্ব্বিত উগ্র মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, এই হাস্য পরিহাসের স্রোতে তাহা আমাদের মন হইতে অপসৃত হইয়া যায় । প্রমীলা এই যে চোক্ ঠারিয়া মুচকি হাসিয়া ঢল ঢল ভাবে রসিকতা করিতেছেন, আমাদের চক্ষে ইহা কোন মতে ভাল লাগে না !

একে বারে শত শঙ্খ ধরি
ধ্বনিলা, টঙ্কারি রোষে শত ভীম ধনু
ত্রীবৃন্দ, কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে ; কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী ; রথে রথী ; তুরঙ্গমে
সাদীবর ; সিংহাসনে রাজা ; অবরোধে
কুলবধূ ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে ;
পর্ব্বত গহ্বরে সিংহ ; বন হস্তী বনে ;
ডুবিল অতল জলে জলচর যত ।

সুন্দর হইয়াছে । পশ্চিম দুয়ারে যাইতেই হনু গর্জ্জিয়া উঠিল । অমনি "নৃমুণ্ড মালিনী সখি (উগ্রচণ্ডা ধনী)" রোষে হুঙ্কারিয়া সীতানাথকে সংবাদ দিতে কহিলেন । হনুমান অগ্রসর হইয়া সভয়ে প্রমীলাকে দেখিল, এবং মনে মনে কহিল

"অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, উত্তরিনু যবে
লঙ্কাপুরে, ভয়ঙ্করী হেরিনু ভীমারে,
প্রচণ্ডা খর্পর খণ্ডা হাতে মুণ্ডমালী ।
দানব নন্দিনী যত মন্দোদরী আদি
রাবণের প্রণয়িনী, দেখিনু তা সবে ।
রক্ষঃ-কুল-বালা-দলে, রক্ষঃ কুল-বধূ
(শশিকলা সম রূপে) ঘোর নিশাকালে,
দেখিনু সকলে একা ফিরি ঘরে ঘরে ।
দেখিনু অশোক বনে (হায় শোকাকুলা)
রঘুকুল কমলেরে,—কিন্তু নাহি হেরি
এ হেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে ।

ভয়ঙ্করী ভীমা প্রচণ্ডা খর্পর খণ্ডা হাতে মুণ্ডমালী এবং রক্ষঃকুলবালাদল শশিকলা সমরূপে, অশোক বনে শোকাকুল রঘুকুল-কমল, পাশাপাশি বসিতে পারে না, কবির যদি প্রমীলাকে ভয়ঙ্করী করিবার অভিপ্রায় ছিল, তবে শশিকলাসম রূপবতী রক্ষঃ-কুলবালা এবং রঘুকুলকমলকে ত্যাগ করিলেই ভাল হইত । কিম্বা যদি তাঁহাকে রূপমাধুরী-সম্পন্না করিবার ইচ্ছা ছিল তবে খর্পর খণ্ডা হস্তে মুণ্ডমালীকে পরিত্যাগ করাই উচিত ছিল ।

প্রমীলা রামের নিকট নৃমুণ্ডমালিনী-আকৃতি নৃমুণ্ডমালিনীকে দূতী স্বরূপে প্রেরণ করিলেন,

"চমকিলা বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে,
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশাকালে
হেরি অগ্নি শিখা ঘরে ! হাসিলা ভামিনী
মনে মনে । এক দৃষ্টে চাহে বীর যত
দড়ে রড়ে জড় সবে হয়ে স্থানে স্থানে ।
বাজিল নূপুর পায়ে কাঞ্চি কটি দেশে ।

ভীমাকার শূল করে, চলে নিতম্বিনী
জর জরি সর্ব্ব জনে কটাক্ষের শরে
তীক্ষ্ণতর।"

আমরা ভয়ে জড় সড় হইব, না কটাক্ষে জর জর হইব এই এক সমস্যায় পড়িলাম।

"নব মাতঙ্গিনী গতি চলিলা রঙ্গিনী,
আলো করি দশ দিশ, কৌমুদী যেমতি,
কুমুদিনী সখী, ঝলে বিমল সলিলে,
কিম্বা উষা অংশুময়ী গিরি শৃঙ্গ মাঝে।"

নৃমুণ্ডমালিনী আকৃতি উগ্রচণ্ডাধনীও বিমল-কৌমুদী ও অংশুময়ী উষা হইয়া দাঁড়াইল! এবং এই অংশুময়ী উষা ও বিমল কৌমুদীকেই দেখিয়া প্রফুল্ল না হইয়া রামের বীর সকল দড়ে রড়ে জড় সড় হইয়া গিয়াছিল।

"হেন কালে হনু সহ উত্তরিলা দূতী
শিবিরে। প্রণমি বামা কৃতাঞ্জলি পুটে,
(ছত্রিশ রাগিণী যেন মিলি এক তানে)
কহিলা——

উগ্রচণ্ডাধনী কথা কহিলে ছত্রিশ রাগিণী বাজে, মন্দ নহে!

"উত্তরিলা ভীমা-রূপী; বীরশ্রেষ্ঠ তুমি,
০ ০ • • ——
রক্ষোবধূ মাগে রণ, দেহ রণ তারে,
বীরেন্দ্র। রমণী শত মোরা যাহে চাহ,
যুঝিবে সে একাকিনী। ধনুর্ব্বাণ ধর,
ইচ্ছা যদি, নরবর, নহে চর্ম্ম অসি,
কিম্বা গদা, মল্লযুদ্ধে সদা মোরা রত।"

এখানে মল্লযুদ্ধের প্রস্তাবটা আমাদের ভাল লাগিল না। রাম যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিলে প্রমীলা লঙ্কায় গিয়া ইন্দ্রজিতের সহিত মিলিত হইলেন ও তৃতীয় সর্গ শেষ হইল। এখন আর একটি কথা আসিতেছে, মহা-কাব্যে যে সকল উপাখ্যান লিখিত হইবে, মূল আখ্যানের ন্যায় তাহার প্রাধান্য দেওয়া উচিত নহে, এবং উপাখ্যান গুলি মূল আখ্যানের সহিত অসংলগ্ন না হয়। একটি সমগ্র সর্গ লইয়া প্রমীলার প্রমোদ উদ্যান হইতে নগর প্রবেশ করার বর্ণনা লিখিত হইয়াছে তাহার অর্থ কি? এই উপাখ্যানের সহিত মূল আখ্যানের কোন সম্পর্ক নাই, অথচ একখানা শরতের মেঘের মত যে অমনি ভাসিয়া গেল তাহার তাৎপর্য্য কি? এক সর্গ ব্যাপিয়া এমন আড়ম্বর করা হইয়াছে যে আমাদের মনে হইয়াছিল যে প্রমীলা না জানি কি একটা কারখানা বাধাইবেন, অনেক হাঙ্গাম হইল,

কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে; কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী, রথে রথী, তুরঙ্গমে
সাদীবর; সিংহাসনে রাজা; অবরোধে
কুলবধূ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে
পর্ব্বত গহ্বরে সিংহ; বন হস্তী বনে;

নৃমুণ্ডমালিনী সখি (উগ্রচণ্ডাধনী) আইলেন, বীর সকল দড়ে রড়ে জড় হইয়া গেল; কোদণ্ড-টঙ্কার, ঘোড়া দড়বড়ি, অসির ঝনঝনি, ক্ষিতি টলমলি ইত্যাদি অনেক গোলযোগের পর হইল কি? না প্রমীলা প্রমোদ-উদ্যান হইতে নগরে প্রবেশ করিলেন, একটা সমগ্র সর্গ ফুরাইয়া গেল, সে রাত্রে আবার ভয়ে রামের ঘুম হইল না। আচ্ছা, পাঠক বলুন দেখি আমাদের স্বভাবতঃ মনে হয় কি না, যে, ইন্দ্র-

জিতের সহিত সাক্ষাৎ ব্যতীতও আরো কিছু প্রধান ঘটনা ঘটবে। ইন্দ্রজিৎবধ নামক ঘটনার সহিত উপরি-উক্ত উপাখ্যানের কোন সম্পর্ক নাই, অথচ মধ্য হইতে একটা বিষম গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। তঃ—

আগমনী।

সুধীরে নিশার আঁধার ভেদিয়া
ফুটিল প্রভাত-তারা।
হেথা হোথা হতে পাখীরা গাহিল
ঢালিয়া সুধার ধারা।
মৃদুল প্রভাত-সমীর পরশে
কমল নয়ন খুলিল হরষে,
হিমালয় শিরে অমল আভায়
শোভিল ধবল তুষার জটা।
খুলি গেল ধীরে পুরব দ্বার
ঝরিল কনক কিরণ ধার
শিখরে শিখরে জ্বলিয়া উঠিল,
রবির বিমল কিরণ-ছটা।
গিরি-গ্রাম আজি কিসের তরে,
উঠেছে নাচিয়া হরষ ভরে,
অচল গিরিও হয়েছে যেমন
অধীর পাগল পারা।
তটিনী চলেছে নাচিয়া ছুটিয়া,
কলরব উঠে আকাশে ফুটিয়া
ঝর ঝর ঝর করিয়া ধ্বনি
ঝরিছে নিঝর ধারা।
তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া মালা,
চলিয়াছে গিরি-বাসিনী-বালা,
অধর ভরিয়া সুখের হাসিতে
মাতিয়া সুখের গানে।

মুখে একটিও নাহিক বাণী
শবদ-চকিতা মেনকা রাণী
তৃষিত-নয়নে আকুল হৃদয়ে,
চাহিয়া পথের পানে।
আজ মেনকার আদরিণী উমা
আসিবে বরষ পরে।
তাইতে আজিকে হরষের ধ্বনি
উঠিয়াছে ঘরে ঘরে।
অধীর হৃদয়ে রাণী আসে যায়,
কভুবা প্রাসাদ শিখরে দাঁড়ায়,
কভু বসে ওঠে, বাহিরেতে ছোটে
এখনো উমা মা এলোনা কেন?
হাসি হাসি মুখে পুরবাসী গণে
অধীরে আসিয়া ভূধর ভবনে,
কই উমা কই বলে উমা কই,
ত্রিলোক বেয়াজ সহেনা যেন!
বরষের পরে আসিবেন উমা
রাণীর নয়ন তারা।
ছেলেবেলাকার সহচরী যত
হরষে পাগল পারা।
ভাবিছে সকলে আজিকে উমায়
দেখিব নয়ন ভোরে।
আজিকে আবার সাজাব তাহায়
বালিকা উমাটি কোরে।

তেমনি মৃণাল বলয় যুগলে
তেমনি চিকন চিকন বাকলে
তেমনি করিয়া পরাব গলায়
বনফুল তুলি গাঁথিয়া মালা
তেমনি করিয়া পরায়ে কেশ,
তেমনি করিয়া এলায়ে কেশ,
জননীর কাছে বলিব গিয়ে
এই নে মা তোর তাপসী বালা।
লাজ-হাসি-মাখা মেয়ের মুখ
হেরি উথলিবে মায়ের সুখ
হরষে জননী নয়নের জলে
চুমিবে উমার সে মুখ খানি।
হরষে ভূধর অধীর পারা
হরষে ছুটিবে তটিনী ধারা,
হরষে নিঝর উঠিবে উছসি,
উঠিবে উছসি মেনকা রাণী।
কোথা তবে তোরা পুরবাসী মেয়ে
যেথা যে আছিস্ আয় তোরা ধেয়ে
বনে বনে বনে ফিরিবি বালা,
তুলিবি কুসুম গাঁথিবি মালা,
পরাবি উমার বিনোদ-গলে।
তারকা খচিত গগন মাঝে
শারদ চাঁদিমা যেমন সাজে
তেমনি শারদা অবনী শশি
শোভিবে কেমন অবনী তলে?

* * * *

ওই বুঝি উমা, ওই বুঝি আসে,
দেখ চেয়ে গিরি রাণী!
আলুলিত কেশ, এলোথেলো বেশ
হাসি হাসি মুখ খানি।
বালিকারা সব আসিল ছুটিয়া
দাঁড়াল উমারে ঘিরি।
শিথিল-চিকুরে অমল মালিকা
পরাইয়া দিল ধীরি।
হাসিয়া হাসিয়া কহিল সবাই
উমার চিবুক ধোরে,
"বলিগো স্বজনী, বিদেশে বিজনে
আছিলি কেমন কোরে?
আমরাত সখি সারাটি বরষ
রহিয়াছি পথ চেয়ে,
কবে আসিবেক আমাদের সেই
মেনকা-রাণীর মেয়ে!
এইনে স্বজনী ফুলের ভূষণ
এইনে মৃণাল বালা,
হাসি মুখখানি কেমন সাজিবে
পরিলে কুসুম মালা।"
কেহবা কহিল "এবার স্বজনি
দিবনা তোমায় ছেড়ে
ভিখারী ভবের সরবস ধন
আমরা লইব কেড়ে!
বলত স্বজনি এ কেমন ধারা
এয়েছ বরষ পরে,
কেমনে নিদয়া রহিবে কেবল
তিনটি দিনের তরে।"
কেহবা কহিল "বল দেখি সখি
মনে পড়ে ছেলেবেলা?
সকলে মিলিয়া এ গিরি ভবনে
কতনা করেছি খেলা!
সেই মনে পড়ে যেদিন স্বজনী,
গেলে তপোবন মাঝে,
নয়নের জলে আমরা সকলে
সাজায়ু তাপসী সাজে।

কোমল শরীরে বাকল পরিয়া,
এলায়ে নিবিড় কেশ,
লভিবারে পতি মনের মতন
কত না সহিলে ক্লেশ!
ছেলেবেলাকার সখীদের সব
এখনোত মনে আছে,
ভয় হয় বড় পতির সোহাগে
ভুলিস্ তাদের পাছে!"
কত কি কহিয়া হরষে বিষাদে
চলিল আলয় মুখে,
কাঁদিয়া বালিকা পড়িল ঝাঁপায়ে
আকুল মায়ের বুকে।
হাসিয়া কাঁদিয়া কহিল রাণী,
চুমিয়া উমার অধর খানি,
"আয় মা জননি আয় মা কোলে,
আজ বরষের পরে।
দুখিনী মাতার নয়নের জল
তুই যদি মাগো না মুছাবি বল্
তবে উমা আর, কে আছে আমার
এ শূন্য আঁধার ঘরে?
সারাটি বরষ যে দুখে গিয়াছে
কি হবে শুনে সে কথা,
বল্ দেখি উমা পতির ঘরের
সকল কুশল কথা।"
এত বলি রাণী হরষে আদরে
উমারে কোলেতে লয়ে,
হরষের ধারা বরষি নয়নে
পশিল গিরি আলয়ে।
আজিকে গিরির প্রাসাদে কুটীরে
উঠিল হরষ-ধ্বনি,
কত দিন পরে মেনকা মহিষী
পেয়েছে নয়ন-মণি!

কুমারপাল।

কুমারপাল হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করত জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জৈন সম্প্রদায়ের সমূহ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। জৈন ইতিবৃত্ত সমূহ কুমারপাল ও হেমসূরির গুণানুবাদে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এই প্রস্তাব পাঠে পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন যে, জৈনগণ অতি সুনিয়মে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী লিপিবদ্ধ করিতেন। আমরা বিবিধ দুষ্প্রাপ্য জৈন ঐতিহাসিক গ্রন্থ বহু পরিশ্রমে সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং ক্রমে ক্রমে তাহা পুরাতত্ত্ব-প্রিয় পাঠক মহোদয়গণকে উপহার প্রদান করিব। জৈন-মাহাত্ম্য-প্রকাশক গ্রন্থনিচয় ভবিষ্যৎ বাক্য ও পুরাণের ন্যায় অলৌকিক বিবরণে পরিপূর্ণ, এজন্য তাহার মত এ সকল প্রস্তাবে গ্রহণ করিব না। আমরা কেবল জৈন ঐতিহাসিক প্রবন্ধের সারাংশ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। সোমসুন্দর সূরির শিষ্য জিনমণ্ডনোপাধ্যায় কুমারপাল-প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহার সংক্ষেপ-বিবরণ স্থলে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন।—

"তত শ্চৌলুক্যবংশৈকমৌক্তিকস্য
মহৌজসঃ। শ্রীহেমচন্দ্র সূরীন্দ্রপাদ-
পদ্মোপসেবিনঃ॥ ... ... (১)

জিনধর্ম্মরসাবেসোল্লাসোল্লাসিতচেতসঃ
কৃপৈকপ্রাণনাথস্য ... (১)
রাজ্ঞঃ কুমারপালস্যাধুনা সঙ্ক্ষাপূর্য্যতে
... প্রবন্ধং বচ্মি কিঞ্চন ॥ (২)

চৌলুক্য বংশের একমাত্র মণিস্বরূপ মহাতেজা কুমার পাল রাজার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ প্রবন্ধ বলিতে উদ্যত হইয়াছি। রাজা কুমারপাল হেমচন্দ্র সূরির শিষ্য এবং তিনি জৈন ধর্ম্মের রসাবেসে উল্লসিতচিত্ত ছিলেন ও কৃপা দেবীর এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় নাথ ছিলেন।—

এই বলিয়া গ্রন্থাবতরণ করিয়া প্রথমে জিন সম্প্রদায়ের বংশবর্ণনা করিয়াছেন। যথা,

ইক্ষ্বাকুবংশ ১, সূর্য্যবংশ ২, চন্দ্রবংশ ৩, যাদববংশ ৪, পরমারবংশ ৫, দাহমান ৬, চৌলুক্য ৭, বৈন্দক ৮, সিলার ৯, সৈন্ধব ১০, চাপোৎকট ১১, প্রতীহার ১২, চন্দুক ১৩, রাট্ ১৪, কূর্পট ১৫, নাক ১৬, করক ১৭, পাল ১৮. করঙ্গ ১৯, বাউল ২০, বন্দেল ২১, উহিল্লপুত্র ২২, পৌলিক ২৩, মৌরিক ২৪, মঙ্কুরাজক ২৫, ধান্য-পালক ২৬, রাজপালক ২৭, [illegible] ২৮, নিলুম্ভ ২৯, দধিলক্ষ ৩০, তুকদলিয়ক ৩১ ডুন ৩২, হবিজড় ৩৩, নট ৩৪, মাস ৩৫, পোষর ৩৬, ইহার মধ্যে কুমারপাল চৌলুক্য বংশীয়।

কান্যকুব্জ দেশে কাঞ্চন কটকপুরে শ্রীভূয় রাজা ছিলেন। ইহাঁর কন্যা মহল্লনা দেবী। ইনি গুর্জ্জররাজ কুম্ভকের পত্নী ছিলেন। গুর্জ্জর দেশের বড়িয়ার রাজ্যের পচ্‌গ্রাসর গ্রামের শ্রীশ্রীল সূরির যত্নে চাপোৎকট বংশের একটি বালক প্রতিপালিত হয়। এই বালক ৮ বৎসর বয়সে সমস্ত রাজলক্ষণে লক্ষিত এবং শ্রীগুরুদত্ত বলরাজ নাম প্রাপ্ত হয়েন। ইনি শ্রীপত্তনের সামন্তসিংহের ভগিনী লীলা দেবীকে বিবাহ করেন। লীলা-দেবী গর্ভিণী-অবস্থায় মৃত হইলে মন্ত্রিবর্গ তাঁহার উদর হইতে এক বালক নিষ্কাশিত করেন। ঐ বালকের নাম মূলরাজ হইল। মূলরাজের জন্ম হওয়ার পর সামন্ত সিংহের অনেক রাজ্য দিন দিন বৃদ্ধি এবং ভূরি ভূরি মঙ্গল হইতে লাগিল দেখিয়া সামন্ত সিংহ তাঁহাকে রাজা করিলেন। মূলরাজ কোন কারণ বশত মাতুলকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং রাজা হইলেন। তিনি প্রবল-প্রতাপশালী নৃপতি ছিলেন। তিনি ৯৯৮ শকবর্ষে রাজ্যা-ভিষিক্ত হইয়া স্বসমকালীন মহাবল পরা-ক্রম লাশোক রাজাকে পরাজয় করিয়া একছত্র হইয়াছিলেন। লাশোক-রাজ ১১ বার মূলরাজকে তাড়িত করিয়া ছিলেন। পরিশেষে কপিলকোট নগরে অবরুদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। মূলরাজ ৫৫ বৎসর রাজ্য করিয়া কোন কারণে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। অনন্তর বলরাজ রাজা গ্রহণ করেন। বলরাজ ভগিনীর শুভাদৃষ্টবলে রাজা হইয়াছিলেন। ৮০২ বর্ষে শ্রীশ্রীল সূরি জৈন মন্ত্রপূত করিয়া শ্রীপত্তনে রাজ্য স্থাপনা করিয়াছিলেন। বলরাজ হইতে স্থাপিত গুর্জ্জরীয় রাজ্য জৈন ব্যতীত কেহ ভোগ করিতে পারিবে না এই প্রসঙ্গ রটনা হয়। বলরাজের রাজ্যভোগকাল ৩৫ বর্ষ।

তাঁহার পুত্র যোগরাজের ২৫, ক্ষেমরাজের ২৯। তৎপরে ভূয়ড়রাজ ২৫, বীরসিংহ ১৫, রত্নাদিত্য ৭, সামন্তসিংহ ০ ০ বর্ষ রাজ্য করিয়াছিলেন। এইরূপে ১৯৬ বর্ষে চৌলুক্যকুলে ৭ রাজা হয় তৎপরে এতদ্দৌহিত্র সন্তানের চৌলুক্যকুলে রাজ্য প্রাপ্তি হয়। চৌলুক্য কানাকুব্জীয়। তাঁহার নাম শ্রীভূয়ড় (প্রথমেই ইহার কথা বলা হইয়াছে) ভূয়ড়ের পুত্র কর্ণাদিত্য। তৎপুত্র চন্দ্রাদিত্য, তৎপুত্র সোমাদিত্য; ইনি পরলোকগত হইলে চামুণ্ডরাজ রাজা হইয়া ১৩ বৎসর রাজ্য করেন। তৎপরে বল্লভরাজ ৬ তৎপরে দুর্ল্লভরাজ ১১।৬ মাস রাজ্য করিয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্র ভীম। এই ভীমের সহিত মুঞ্জের শত্রুতা হইয়াছিল। ভীমের বৃদ্ধাবস্থায় বকুলদেবীর গর্ভোদ্ভব ক্ষেমরাজ। আর এক স্ত্রীর নাম উদয়মতী। ইহার সন্তান কর্ণদেব। ক্ষেমরাজ আর কর্ণদেবের পরস্পর রাম লক্ষ্মণের ন্যায় সৌহৃদ্য ছিল। ক্ষেমরাজ কিছুকাল রাজ্য করিয়া কর্ণদেবকে রাজসিংহাসন প্রদান করেন। ইহার নামান্তর ভোগীকর্ণ। ইহার পুত্র জয়সিংহদেব। ধনেশ্বর সূরি ভদ্রেশ্বর সূরি ও মদনপাল কর্ণরাজার সাময়িক সভ্য। এই সকল পণ্ডিতেরা রাজাকে উপদেশ দিতেন।

'অপ্যাহুঙ্গরি তুম্বি অহুঙ্গরিতু তেহিং তি অবংসো অন্নে অভবি অসতাঁহুমোঅস্তরে-জিন ভবণং।'

"জিনা ভবনাইংজে হুঙ্গবন্তি ভত্তি প ড়ণী অপড়িআইং তেহুঙ্গবন্তি অপ্যং ভীমাহু ভব সমদ্দাতু।"

"মাণিক্য হেমরত্নাদ্যৈঃ
প্রাসাদায়ে * ০ ০
তেষাং পুণ্যৈকমূর্ত্তীনাং
কোবেদ ফলমুত্তমম্।'
'কাষ্ঠাদীনাং জিনাবাসে
যদ্বস্তুঃ পরমাণবঃ।
তাবন্তি বর্ষলক্ষাণি
তৎকর্ত্তা স্বর্গভাগ্ভবেৎ॥
নবীনজিনগেহস্য বিধানে যৎফলং ভবেৎ
তস্মাদষ্টাদশগুণং জীর্ণোদ্ধারেণ জায়তে॥"
জীর্ণোদ্ধারায় বিস্রব্ধঃ স্বজনেন নৃপস্ততঃ।
সুরাষ্ট্রোৎগ্রাহিতঃ ০ ০ ০ ভিল্ল পুরংগতো॥

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, যাঁহারা মণিমাণিক্যাদি দ্বারা জিনদেবের প্রাসাদ অলঙ্কৃত করেন তাঁহারা সাক্ষাৎ পুণ্য-মূর্ত্তি এবং তাঁহাদের সেই সেই কার্য্যের ফল-পরিমাণ কত, কে বলিতে পারে? তৃণ কাষ্ঠাদি যাহা কিছু জিন-মন্দিরে প্রদত্ত হয় তাহার প্রত্যেকের পরমাণু-সমসংখ্যক লক্ষ-বর্ষ স্বর্গ ভোগ করে। বিশেষতঃ নূতন গৃহ নির্ম্মাণ অপেক্ষা জীর্ণ-সংস্কার করার ১৮ গুণ অধিক ফল।—ইত্যাদি। ইহার মাতাও নানাবিধ সদুপদেশ দিতেন। তিনি আপন পুত্রকে বলিয়াছেন, পুত্র!—

"দীপে ম্লায়তি তৈলপূরণবিধি স্তোয়ং চ
সংশুষ্যতি।
প্রাবারো হিমসঙ্গমে জলগৃহং গ্রীষ্মজ্বরে
জাগরে।
নির্ম্মাতং কবচং শরব্যতিকরে রোগোদ্ভবে ভেষজম্।
ধর্ম্মোমৃত্যুমহাভয়ে সতি সতাং সংসেবিতুং যুজ্যতে॥'

এইরূপ নানা উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া অনেক চৈত্যাদি* নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে মাতার উপদেশে ভদ্রেশ্বরাচার্য্যের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কর্ণরাজ আশাপল্লী নামক স্থানবাসী এক লক্ষ ভিল্ল জাতির অধিপতি অশোক নামক ভিল্লকে জয় করিয়া সেই স্থানে আপনার নামে অর্থাৎ কর্ণাবতী নামে নগর নির্ম্মাণ করেন। ইনি ২৯ বর্ষ রাজ্য করিয়াছিলেন। এতৎ পুত্র জয়সিংহদেব ৩০ বর্ষ রাজ্য করেন। ইহাঁর খ্যাতি শ্রীসিদ্ধ চক্রবর্ত্তী। ইনি যোগ-মার্গে সিদ্ধ ছিলেন। এই সিদ্ধরাজ হেমচন্দ্রের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এক দিন কথাপ্রসঙ্গে ও কাব্য-প্রসঙ্গে হেমচন্দ্র বলিলেন শ্রীবীর জিনেন্দ্র সমক্ষে শিশুকালে আমি যে যে তাঁহার ব্যাখ্যাত গ্রন্থ শুনিয়াছি সেই জৈনেন্দ্র নামক ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া থাকি। (আমাদের ব্যাকরণে "ইতি জিনেন্দ্র বুদ্ধিপাদ" বলিয়া অনেক উদাহরণ দৃষ্ট হয়) সিদ্ধ বলিলেন "পুরাতন ত্যাগ করিয়া এখন কেহ নূতন ব্যাকরণ করিতে পারেন কি না—তাহাই বলুন। "হেমচন্দ্র বলিলেন" "যদি সিদ্ধরাজ সাহায্য করেন তবে আমি পঞ্চাঙ্গ ব্যাকরণ নির্ম্মাণ করিতে পারি।" এই কথায় রাজা ১৮ নানা দেশ হইতে সমস্ত ব্যাকরণ আনাইয়াছিলেন; তাহা অবলম্বন করিয়া হেম এক লক্ষ পঁচিশ হাজার শ্লোকে গ্রথিত এক বৃহৎ পঞ্চাঙ্গ লক্ষণে যুক্ত ব্যাকরণ এক বৎসর মধ্যে প্রস্তুত করিলেন। তাহার নাম হইল "শ্রীসিদ্ধ হেমচন্দ্র।" এই ব্যাকরণ প্রস্তুত হইবার পর উত্তম সজ্জায় সজ্জিত করিয়া শ্বেতহস্তীর উপর রক্ষা করিয়া চামরাদি ব্যজন করিতে করিতে (রাজার ন্যায়, ব্যাকরণের রাজা বলিয়া) রাজসভায় নীত হয়। সকল দেশের পণ্ডিত আহ্বান করিয়া তাহা পাঠ ও সংশোধন করা হইয়াছিল। ইহার পূজা করিয়া "সরস্বতী যোগানামক" পুস্তকালয়ে রাখা হয়। এই সময়ে পণ্ডিতেরা নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিয়াছিলেন।

"
... ...
পাণিনিপ্রলপিতং কাতন্ত্রকে কা কথা
মাকার্ষী কটুশাকটায়নবচঃ ক্ষুদ্রেণ চান্দ্রেণ-কিম্

... ...
শ্রূয়ন্তে যদিতাচদর্থ মধুরাশ্রীসিদ্ধহেমোক্তয়ঃ॥

অর্থাৎ শ্রীসিদ্ধ হেমের মধুর উক্তি শ্রবণ কর তবে পণিনির ব্যাকরণ প্রলাপ বলিয়া বোধ হইবে সুতরাং কাতন্ত্র প্রভৃতির ত কথাই নাই। শাকটায়নের ব্যাকরণ ভাল বটে কিন্তু বড় কটু। ক্ষুদ্র চান্দ্র ব্যাকরণ কোন কার্য্যে আইসে না। ইত্যাদি

দধিস্থলি পুরের ভীমদেবের পুত্র ক্ষেম রাজ ও তৎপুত্র দেবপ্রসাদ। ইহার পুত্র ত্রিভুবনপাল* ও ভার্য্যা কশ্মীর দেবী। ইহারই গর্ভে কুমারপালের জন্ম। ইনি যুদ্ধ-বিজ্ঞানে পারদর্শী এবং নীতি-পরায়ণ ভূপতি ছিলেন।

কুমারপাল হেমচন্দ্রের নিকট নানা সদুপদেশ প্রাপ্ত হন। কুমারপাল জয়সিংহের

সমীপে থাকিয়া পরিশেষে দধিস্থলীতে রাজ্য ভোগ করিয়া ছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধরাজার সন্তান ছিল না। ইনি সন্তান-কামনায় হরি-বংশাদি শ্রবণ ও অনেক ক্রিয়াকাণ্ড করিয়াছিলেন। তৎপরে হেমচন্দ্রের উপদেশে তীর্থ ভ্রমণও করিয়াছিলেন।

তিনি রাজ্যলোভে ত্রিভুবনপালকে গোপনে বিনাশ করিয়া কুমারপালকে বিনাশ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। তাহা সিদ্ধ হয় নাই, কিন্তু কুমারপাল রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। রাজ্যহীন হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের সহিত এই অবস্থায় পুনশ্চ সাক্ষাৎ হয়। হেম তাঁহাকে বলিলেন।—

"ভো কুমার! গুণাধার! নবাঙ্গেশ্বর বৎসরে (১১৯৯) চতুর্থ্যাং মার্গশীর্ষস্য শ্যামায়াং রবিবাসরে। পুষ্পকক্ষেঽপরাহ্নে চ তব রাজ্যং ন জায়তে॥"—*

অর্থাৎ ১১৯৯ শকের অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ চতুর্থীতে পুনরায় তুমি রাজ্য পাইবে। কুমার মন্ত্রীগৃহে লুক্কায়িত থাকিতেন। বিজয়সিংহ দেব তাঁহার বিনাশার্থে চর নিযুক্ত করিলেন। চর সন্ধান করিয়া সেখানে গিয়া হেম সূরিকে জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু তিনি মিথ্যা করিয়া বলিলেন "এখানে নাই।" হেমাচার্য্য মনে করিলেন "প্রাণ পরিত্রাণং মহৎ পুণ্যম্" মিথ্যা বলার, পাপ অপেক্ষা এক জনের প্রাণ রক্ষা করায় মহৎ পুণ্য লাভ হয়। কুমারপাল পরিত্রাণ পাইয়া ভৃগুকচ্ছে গেলেন। তৎপরে কৈলম্বপত্তনে গমন করেন। এই কৌলম্ব-স্বামী ইঁহাকে স্বীয় রাজ্যের অর্দ্ধ প্রদান করেন। তাঁহারই সাহায্যে পুনর্ব্বার স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রতিষ্ঠানপুরে কিয়দ্দিবস অবস্থিতি করিয়া উজ্জয়িনীতে গমন করেন। এখানে বিক্রমাদিত্যের যশ শুনিলেন। এক জন বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন "বিক্রমাদিত্যের সিদ্ধসেন দিবাকর নামে এক পার্শ্বদ ছিলেন। তিনি জৈন মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার উপদেশ সতত বিক্রমাদিত্য গ্রহণ করিতেন।" কুমার এখান হইতে নগেন্দ্র পত্তনে গমন করেন। তিনি তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীকৃষ্ণদেবের গৃহে থাকিলেন। ইঁহার ভগিনীর নাম প্রেমল দেবী। এপর্য্যন্ত ইনি রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন নাই। ইহার পরেই অবসর ক্রমে খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক সিংহাসন গ্রহণ করেন এবং সে সময় বলিয়া ছিলেন যে, "খড়্গেনাত্তম্য ভূমিহীত্ত্ব বীরভোগ্যাং বসুন্ধরাম্" এই কার্য্যে তাঁহার ভগিনীপতি কৃষ্ণদেব প্রভৃতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি সম্বৎ অব্দের ১১৯৯ বর্ষে মার্গশীর্ষ চতুর্থীতে রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এখন ইঁহার বয়স ৫০ বর্ষ। উদয়ন তাঁহার মহামাত্য ছিলেন। ইনি পণ্ডিত সর্ব্বগুণযুক্ত এবং কুমারের পূর্ব্বোপকারী। ৫০ বৎসর বয়সে কুমার স্বয়ং রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বের

* মেরুতুঙ্গাচার্য্য কৃত প্রবন্ধচিন্তামণি গ্রন্থে লিখিত আছে "বিক্রমার্কসম্বৎ প্রবর্ত্তেষু নব নব ত্যাধিকৈকাদশশতীমিতেষু কার্ত্তিক শুক্লপঞ্চম্যাং কুমার পালস্য রাজ্যাভিষেকোঽভূৎ।"

ব্রহ্মমাতা ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাঁকে গোপনে বিনাশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। তিনি তাহা জানিতে পারিয়া তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। কুমারপাল এই সকল রাজ্য জয় করিয়া ছিলেন যথা, পূর্ব্ব দিকে শূরসেন, কশাবর্ত্ত, পাঞ্চাল, বিদেহ, দশার্ণ, মগধ ইত্যাদি। উত্তর দিকে কাশ্মীর উড্ডীয়ন, জলেন্ধর, সপাদ লক্ষ পর্ব্বত প্রভৃতি পার্ব্বতীয় অসভ্য দেশ। দক্ষিণে—লাট, মহারাষ্ট্র, তিলঙ্গ। তৎপশ্চিমে—সুরাষ্ট্র—ব্রাহ্মণবাহক, পঞ্চনদ, সিন্ধুসৌবীর প্রভৃতি। এই দিগ্বিজয়-কালে সিন্ধুর পশ্চিম পারের পদ্মপুর নগরের রাজকন্যা পদ্মিনীকে বিবাহ করেন। মূলস্থানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে ১০০০০০ অশ্ব, ১০০০ গজ, ১৪০ রথ, ১৮ লক্ষ পদাতি সৈন্য ছিল। বীরচরিত্রে লিখিত আছে,—

"আগস্ত মৈস্ত্রিবিধাং যাসামাসিন্ধু পশ্চিমং। আতুঙ্গক কৌবেরীং চৌলুক্যং সাধয়িষ্যতি।"

রাজা এক দিন মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্রীসিদ্ধ রাজার কি আমার গুণ অধিক।"

কুমারপালের রাজ্যকালে হেমাচার্য্য দ্বারা জৈনদিগের নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধীয় অনেক নিয়ম প্রচারিত হয়। জৈন মতে মাংস ভোজন বড় নিষেধ। যথা,—

"জাতু মাংসং ন ভোক্তব্যং প্রাণৈঃ কণ্ঠাগতৈরপি।

জৈনেরা রাত্রে আহার করে না। রাত্রের জল রুধির এবং অন্ন মাংস-তুল্য জ্ঞান করে "তাজামো ভোজনোদকে" (হেমসূরি।)

"হরি চাস্তমিতে দেয় আপোরুধির-মুচ্যতে"

এই স্কন্দ পুরাণের বচন লইয়া হেমসূরি এই নিয়ম প্রচার করেন। অদ্যাবধি জৈনেরা বৈকালে আহার করে, রাত্রে ভোজন করে না। জৈনদিগের মতে জৈন মুনিরাই বৈষ্ণব, আর কেহ বৈষ্ণব নাই। কুমারপাল হেমসূরির উপদেশ ক্রমে অনেক জৈন মন্দিরের জীর্ণসংস্কার করিয়াছিলেন। তিনি ১২১১ সম্বৎ বর্ষে হেমসূরি দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিয়া ত্রিভুবনপালবিহার নির্ম্মাণ করেন।

হেমাচার্য্য কহেন "বাগভট্টং মন্ত্রিণ মূচুঃ' কুমারপালের বাগভট্ট নামা মন্ত্রী ছিল। ইনিই প্রসিদ্ধ জৈন আলঙ্কারিক বাগভট্ট। ইহার কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ ও অলঙ্কারতিলক বৃত্তি জৈন-সাহিত্য-সংসার উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে।

কুমার এই সকল দেশে অমারিপটহ অর্থাৎ অহিংসা ঘোষণা করিয়াছিলেন। কর্ণাট, গুর্জ্জর, লাট, সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ, সৈন্ধব, উচ্ছা, ভত্তেরী, মালব, মারব, কোঙ্কণ, স্বরাজ্য, কীর, জলোদর, সপাদ, লক্ষ, মিবাড়, দীপীক্ষ, আভীরাক্ষ, কুমারগিরি, কাশী ও গাজনী প্রভৃতি দেশে কোথাও বিনয় কোথাও বা বল পূর্ব্বক হিংসা নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকারস্থ সমুদায় দেবমন্দিরে পশুবলিদান নিষেধ করিয়াছিলেন।—

জৈনদিগের তীর্থ ২ প্রকার। স্থাবর ও জঙ্গম। জৈন মুনিরা জঙ্গম-তীর্থ, আর তাঁহাদের সেবিত স্থান সকল স্থাবর তীর্থ যথা—

'জঙ্গমঃ স্থাবরশ্চৈব তীর্থং দ্বিবিধমুচ্যতে। জঙ্গমঃ মুনয়ঃ প্রোক্তং স্থাবরস্তন্নিষেবিতম্॥'

শত্রুঞ্জয় রৈবত গিরি, বৈভার, অষ্টাপাদ গিরি, সম্মেত শিখর, ইত্যাদি স্থাবর-তীর্থ। এতন্মধ্যে শত্রুঞ্জয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শত্রুঞ্জয়-যাত্রায় সকল তীর্থযাত্রার ফল হয়। জিন গণধর সকল জঙ্গম তীর্থ। শত্রুঞ্জয়ের অনেক নাম যথা—

শত্রুঞ্জয়ঃ পুণ্ডরীকঃ সিদ্ধিক্ষেত্রং মহাবলং সুরশৈলো বিমলাদ্রিঃ পুণ্যরাশিঃ ॰ ॰ ॰। পর্ব্বতেন্দ্র সুভদ্রণ দৃষ্টশক্তিশ্চ কর্ম্মকঃ। মুক্তিগেহং মহাতীর্থং শাশ্বতঃ সর্ব্বকামদঃ। পুষ্পদন্তো মহাপদ্মং পৃথ্বীপীঠং প্রভাপ্রদং।— ইত্যাদি। ১০৮ নাম আছে।—

শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতে কুমারপাল পার্শ্বনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। জৈনেরা গুরুমূর্ত্তি, গুরু-পাদুকা, পার্শ্বনাথ প্রভৃতি জিন-মূর্ত্তির পূজা করে ও ধূপদীপ নৈবেদ্য ফুল প্রদান করে।

নেমির জন্মস্থান রৈবতক পর্ব্বত। এই জন্য ইহা মহাতীর্থ এবং ওখানে নেমির নির্ব্বাণ হইলে ৯০৯ বৎসর পরে কাশ্মীর দেশ হইতে রত্নদেব শ্রাবণ রৈবতে আসিয়া যাত্রা মহোৎসব করিয়াছিলেন, তদবধি যাত্রা মহোৎসব হইয়া থাকে। সেই নেমিমূর্ত্তি ব্রহ্মেন্দ্রের স্থাপিত।

৮৪ বৎসর বয়সে হেমচন্দ্র আপনার মরণকাল আগত বুঝিতে পারিয়া সমস্ত সংঘ ও রাজাকে নিকটে ডাকিয়া সমাধি-যোগে শরীর ত্যাগ করেন। রাজা কুমারপাল রোদন করিতে লাগিলেন। হেমাচার্য্যের সম্বৎ ১১৪কার্ত্তিকী পূর্ণিমার রাত্রে জন্ম, ১১৯৫ সম্বতে স্বর্গ লাভ হয়। তাঁহার শরীর চন্দনাগুরু প্রভৃতি দ্বারা সুগন্ধময় করিয়া মৃত্তিকা-প্রোথিত করা হইয়াছিল। সেই স্থান হেমঘট্ট নামে প্রসিদ্ধ। হেমচন্দ্রের মৃত্যুর ৬ বৎসর পরে, কুমারপাল ৩০ বৎসর ৮ মাস ২৭ দিন রাজ্য করিয়া ১২৩৫ সম্বৎ অব্দে শরীর ত্যাগ করেন। তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র অজয়পাল রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি মহীপালের পুত্র। ১৪৩ অব্দে এই কুমারপালের প্রবন্ধ সংগ্রহ হয়। তৎপরে তাহা সোমসুন্দর গুরুর শিষ্য জিনমণ্ডল উপাধ্যায় কর্ত্তৃক গদ্য পদ্যে রচিত হইয়া ১৪৯৫ সম্বতে প্রচারিত হয়। যথা—'বাস্তে সঙ্করিতৈ র্ণবোহক্তি মহুদ্রিঃ কৈলাস বৈহায়িকৈঃ'—ইত্যাদি।

শ্রীসোমসুন্দরগুরোঃ শিরোঃ শিষ্যেণ যথাশ্রুতানুসারেণ শ্রীজিনমণ্ডল গণিনা মহুপ্রচিত সংসরে রুচির।—

কুমারপাল প্রবন্ধে কুমারপাল চরিত এইরূপ লিখিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবট উক্ত গ্রন্থের সার-সঙ্কলন মাত্র। মূল প্রস্তাবে শ্রীপত্তন, ধারানগরী, ধঙ্কুকপুর, নাগপুর, কর্ণাবতী, শঙ্খপুর, কুমার গ্রাম, প্রভৃতি স্থান মদনবর্ম্মা, শ্রীদত্তসূরি, গুণসেনসূরি প্রদ্যুম্নসূরি ও শূরশেখর প্রভৃতি ব্যক্তি দৃষ্টান্তের ও সিদ্ধান্তবৃত্তি," নেমিচরিত্র, হরিবংশ,

পদ্মপুরাণ, বীরচরিত্র প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লে আছে এবং জৈন নীতি, ও ব্রতকথার নান বিবরণ আছে তাহা বাহুল্য-ভয়ে এই প্র স্তাবে পরিত্যক্ত হইল। আমরা কেবল কুমারপাল-প্রবন্ধের ঐতিহাসিক বিবরণ সঙ্কলন করিলাম এবং আবশ্যক বোধে স্থানে স্থানে কুমারপাল সম্বন্ধীয় কোন কোন বিষয় কৃষ্ণাজী-প্রণীত রত্ন মালা রাজশেখ কৃত প্রবন্ধকোষ ও মেরুতুঙ্গাচার্য্য কৃত প্রবন্ধ-চিন্তামণি হইতে সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

শ্রীরামদাস সেন

জ্ঞান, নীতি ও ইংরাজী সভ্যতা।

(বকল্ সাহেব-কৃত ইংলণ্ডীয় সভ্যতার ইতিহাস।)

ইংরাজী সভ্যতা-প্রভাবে ইংরাজ-সমাজ-মধ্যে যে নীতির দিন দিন অবনতি হইতেছে পূর্ব্ব-সংখ্যায় তাহা ইংরাজদের বাক্যেই সপ্রমাণ হইয়াছে। সেই ইংরাজী সভ্যতা আমাদের দেশে প্রবেশ করিয়াছে। এক্ষণে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত যেন তা-হার প্রবল স্রোতে আমাদের জাতীয় সদ্‌গুণ সকল এবং আমাদের সুনীতি-মূলক আচার-ব্যবহার-গুলি ভাসিয়া না যায়। যে সকল গুণ আমাদের জাতীয় চরিত্রের অলঙ্কার-স্বরূপ, তাহা যেন আমরা এই মহা বিপ্লবের মধ্যে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করি। ধর্ম্মভাব, মর্য্যাদা-বোধ, আত্মোৎসর্গ, বিশ্বস্ততা, মমতা, বন্ধুতা, কৃতজ্ঞতা, দয়া দাক্ষিণ্য, বদান্যতা, পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি, এই সকলই হিন্দু-চরিত্রের বিশেষ গুণ। ইংরাজদিগের মধ্যে যাঁহারা সত্য-প্রিয়, অপক্ষপাতী ও সূক্ষ্মদর্শী তাঁহা-রাও ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন।

এসিয়াটিক সোসাইটীর ভূতপূর্ব্ব সভা-পতি কর্ণেল্ সাইক্স বলেন—"সদভিমান ও মর্য্যাদা-বোধ হিন্দু-চরিত্রের একটি বিশেষ লক্ষণ। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে লাল-পল্‌টন্ নামক বঙ্গীয় সৈন্যদল, যাহারা পলাসির ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহারা বিদ্রোহী হইয়া তাহাদিগের ইংরাজ নায়কদিগকে প্রথমে বন্দী করে। পরে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া চলিয়া যায়। তাহারা বলে যে, তাহাদি-গকে যে পুরস্কার অঙ্গীকার করা হইয়াছিল সেই অঙ্গীকার পালন না করাই তাহাদের বিদ্রোহের কারণ। তৎপরে ইউরোপীয় মেরীন সৈন্যদল ও ট্রিব্যানিয়নের সিপাহি-পল্টন বিদ্রোহীদিগের অনুসরণ করিয়া তাহাদিগকে ধৃত করিয়া আনে। সেনাপতি মেজর মন্‌রো তাহাদিগের বধ-দণ্ডের আজ্ঞা প্রচার করেন। আটজন বিদ্রোহী সি-পাহীকে কামানের মুখে বাঁধিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহাদিগের মধ্যে গ্রেন্যাডিয়র নামক দীর্ঘকায় সৈন্যদলের তিন জন সৈ-নিক ছিল। তাহারা এই অনুরোধ করিল যেন তাহাদিগকে দক্ষিণ দিকস্থ কামান

গুলিতে বন্ধন করা হয়—কেন না তাহারা বরাবর দক্ষিণ দিকে থাকিয়াই যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে। তাহারা বলিল তাহাদিগের শেষ অনুরোধটি এই—যেন তাহারা মরিবার সময়েও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া মরিতে পারে। সেনাপতি তাহাদিগের এই অনুরোধ গ্রাহ্য করিলেন—এবং সর্ব্বাগ্রে তাহাদেরই প্রাণদণ্ড হইল।

জেনেরাল্ ব্রিগ্ বলেন যে, ভরতপুর-দুর্গ অবরোধের সময় ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে আমাদের সৈন্যেরা চারিবার ঐ দুর্গ আক্রমণ করে, কিন্তু চারিবারই তাড়িত হয়—পরে পঞ্চম আক্রমনের আজ্ঞা প্রচার হইল। এই সময় লর্ড লেকের আর্দ্দালি এক জন হাবেলদার সেই দিন তাহার সৈন্যদলে যোগ দিবার জন্য লর্ড্ লেকের অনুমতি প্রার্থনা করিল। প্রথমে লর্ড লেক তাহার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন—কিন্তু অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করায় যাইতে অনুমতি দিলেন। সে বলিল—'যদি আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারি তাহা হইলে সাহেব আমার মুখ আর কখনই দেখিতে পাইবেন না'—সেই সৈন্য-দল দুর্গের প্রাকারে আরোহণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগের পৃষ্ঠ-রক্ষক কেহ না থাকায় হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়। কিন্তু একমাত্র সেই হাবেলদার অটল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সঙ্গীগণ তাহাকে চলিয়া আসিবার জন্য কত অনুরোধ করিল—কিন্তু সে ঐ কথাতে কর্ণপাতও করিল না। তাহাদিগকে এইমাত্র বলিল,—আমাকে কোথায় যে তোমরা ছাড়িয়া যাইতেছ তাহা লর্ড্-লেককে বলিও—এই বলিয়া প্রাকারোপরি অটলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বন্দুক গাদিতে লাগিল—পরক্ষণেই বিপক্ষগণের গুলির আঘাতে নিহত হইল। (ব্রিগ্ সাহেবের পত্র ৪৫ পৃষ্ঠা)

লর্ড লেক্ ভরতপুর-দুর্গ অনেক বার আক্রমণ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া আর একবার আক্রমণ করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। দুর্গ প্রাকার ভেদ করা অসাধ্য এই কথা বলিয়া ইউরোপীয় সৈন্য দল আক্রমণে অসম্মত হইল—কিন্তু সিপাহি-সৈন্য দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য নির্গত হইল। এ আক্রমণেও লর্ড লেক্ কৃতকার্য্য হইলেন না,—তিনি এইরূপ ঘোষণা প্রচার করিলেন,—'যদিও সিপাহি সৈন্যেরা গত কল্যকার আক্রমণে সাহস ও অধ্যবসায়ের জাজ্বল্যমান পরিচয় দেয় এবং তিন তিন বার দুর্গ-প্রাকারে ব্রিটিস্ পতাকা উড্ডীন করে তথাপি জয় লাভের পক্ষে যে, সকল বাধা বিঘ্ন আছে তাহা দুরতিক্রমণীয়।

এই অবস্থায় যখন সেনাপতি লেক্ পলায়নের আজ্ঞা দিলেন, তখন সিপাহিরা প্রথমত কিছুতেই সম্মত হইল না—তাহারা পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল—"হয় এই স্থান আমরা অধিকার করিব নয় মরিব।" এই প্রতিজ্ঞানুসারেই তাঁহারা কার্য্য করিল—তাহাদিগের মধ্যে অর্দ্ধেকেরও অধিক ঐ যুদ্ধে আহত ও নিহত হইল। সেনা নায়কগণ পুনঃ পুনঃ পলায়নের আজ্ঞা প্রচার করায় তবে অবশিষ্ট সিপাহি-সৈন্য পলায়নে স্বীকৃত হয়। পৃথিবীর মধ্যে কি কোনও

সৈন্য-দল কোন কালে স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এই সিপাহি সৈন্য অপেক্ষা অধিক মহত্বের পরিচয় দিয়াছে?

রাজপুতদিগের মধ্যে তো দেখা যায় তাহারা প্রাণান্তেও শত্রুহস্তে আত্ম-সমর্পণ করে না। যখন নিতান্ত নিরুপায় হয় তখন অসি-হস্তে শত্রুগণকে প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করে এবং তাহাদের মধ্যে এক জনও জীবিত থাকিতে পরাঙ্মুখ হয় না। রাজপুত-রাজ্যের সহিত মুসলমানদিগের যুদ্ধে তো ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। এই রূপ একটি ঘটনা আমার নিজ জ্ঞানে ঘটিয়াছিল। গাইকবাড়ের করদ, কাটেওয়ার অকলের চইয়া প্রদেশের রাজপুত অধিপতি প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহী হয়। গাইকবাড়ের সহিত ইংরাজেরা যে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ ছিল তাহারই নিয়মানুসারে বিদ্রোহী রাজপুতকে বলদ্বারা বশীভূত করিবার জন্য গাইকবাড় ইংরাজদিগকে অনুরোধ করেন। এই হেতু ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ রাজার দুর্গ অবরোধ করিল এবং শীঘ্রই কামানের গোলায় দুর্গ-প্রাকার ভেদ করিল। দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে—ইংরাজ-সৈন্য রাজাকে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করিল, কিন্তু রাজা ও দুর্গস্থ সৈন্যেরা আপন আপন স্ত্রী পুত্রগণকে বধ করিয়া তাহাদিগের মৃত দেহ কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করিল—এবং তাহাদের উষ্ণীষ দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া এবং মস্তকের শিখা আলুলিত করিয়া অসি-হস্তে দুর্গ-হইতে নির্গত হওত ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিল। ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইল। একটি রাজপুতও জীবিত রহিল না—পরে ইংরাজগণ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে গিয়া ভয়ঙ্কর দৃশ্য তাহাদের দৃষ্টি পথে পতিত হইল। স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের দেহ তখন কূপ মধ্য হইতে উত্তোলন করা হইয়াছে, কিন্তু কেহই জীবিত নাই। তাহার মধ্যে কেবল রাণী মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন। তাঁহার পায়ে একটী বৃহৎ স্বর্ণ-মল ছিল। যে সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহাকে প্রথম দেখিতে পান তিনি তাঁহাকে নিরাপদ মনে করিয়া অন্যান্য কূপ দেখিবার জন্য গমন করেন। সেখান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন যে রাণীও গতাসু হইয়াছেন—তাঁহার যে পায়ে মল ছিল সে পাও নাই—সে মলও নাই। সৈন্যাধ্যক্ষ এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, অপরাধীকে যে ধৃত করিতে পারিবে তাহাকে পুরস্কার দিবেন এই রূপ ঘোষণা করিলেন। কিছুকাল পরে কাটেওয়ার প্রদেশে নবনগর যখন আক্রমণ করা হয়—তখন দুর্গস্থ বিপক্ষ সৈন্যগণ আত্মসমর্পণ করিবার পূর্ব্বে যে শেষ কামান ছুঁড়িয়াছিল সেই কামানের গোলায় আমাদের এক জন গোলন্দাজ নিহত হয়—আমাদের আর এক জন গোলন্দাজ অমনি বলিয়া উঠে—'চইয়াতে ঐ ব্যক্তি যেমন রাণীর পা কাটিয়াছিল তেমনি তাহার ফল ফলিয়াছে।' ইহাকেই কি ধর্ম্মের বিচার বলে না?

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল অ্যাডাম্‌সের অধীন এক দল সৈন্য ভাগলপুর প্রদেশে

এন্তরি-দুর্গ আক্রমণ করে—দুর্গস্থ বিপক্ষ সৈন্যগণ প্রাণ-পণে তাহার প্রতিরোধ করে। এক জন উপস্থিত ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ বলেন—দুর্গ মধ্যে ১৫০ জন মাত্র সৈন্য ছিল ; গোলার আঘাতে দুর্গ-প্রাকারে যে রন্ধ্র হইয়াছিল সেই রন্ধ্রদেশ রক্ষা করত চারি ঘণ্টা কালেরও অধিক তাহারা ব্যাঘ্রের ন্যায় যুদ্ধ করিয়াছিল। যখন প্রায় সমস্ত স্থানটি ইংরাজগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল তখন তাহারা দুর্গের নানাস্থলে অগ্নি জ্বালাইয়া দিয়া সমস্ত স্থানটিকে একটি বিশাল অগ্নি-ক্ষেত্র করিয়া তুলিল। এই অগ্নি-রাশির মধ্যে তাহারা যুদ্ধ করিতে লাগিল—এবং যখন রক্ষার আর কোন উপায় নাই, তখন দুর্গ-পতি পাছে শত্রু-হস্তে পতিত হয়েন এই আশঙ্কায় স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষার্থ বারুদে অগ্নি সংযোগ করিয়া স্বীয় দেহকে গগনমার্গে উড়াইয়া দিলেন।

আত্মোৎসর্গ ও প্রভুভক্তি হিন্দুদিগের চরিত্র-গত আর একটি প্রধান লক্ষণ।

'অন্' সাহেব তাঁহার ভারতবর্ষীয় ইতিবৃত্তে ক্লাইব কর্ত্তৃক আর্কট-সংরক্ষণের বর্ণনা কালে যে দুইটি গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হিন্দু চরিত্রের মহত্ব প্রতিপাদন করে। একবার শত্রুগণ-কর্ত্তৃক এই দুর্গ আক্রমণ-সময়ে তাহাদিগের সেনাপতি "দুর্গের পরি-খার মধ্যে পড়িয়া যায়। ঐ ব্যক্তি আক্রমণ কালে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করে, এই হেতু তাহার অধীনস্থ সৈন্যেরা তাহার এরূপ অনুরক্ত হইয়াছিল যে তাহাদের মধ্যে এক জন ৪০ টা বন্দুকের গুলি-বৃষ্টির মুখে পরিখায় নামিয়া তাহাকে তুলিয়া আনে।

আর একটি ঘটনাও মর্ম্মস্পর্শক। এই আর্কট্-দুর্গ ৫০ দিন পর্য্যন্ত অবরুদ্ধাবস্থায় থাকে—দুর্গাভ্যন্তরস্থ ইউরোপীয় ও এত-দ্দেশীয় সৈন্যগণের অন্নাভাবে ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। অর্ম্ বলেন, 'আমি এই প্রসিদ্ধ অবরোধের ইতিবৃত্তে এমনি একটি বিশ্বাস-যোগ্য ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিতে পারি, যাহাতে হিন্দু-চরিত্রের বিল-ক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। এই অব-রোধের সময় আহার্য্য দ্রব্যের এত অনটন হইয়া পড়ে যে, সকলের আশঙ্কা হইয়া-ছিল পাছে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত হইয়া শত্রু হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। এই সময় সিপাহিরা ক্লাইবকে বলিল "আমরা কেন খাইয়াই থাকিতে পারিব—ইংরাজদিগের জন্য ভাত দরকার।" সিপাহিরা অনেক স্থলে জাতি গত স্বার্থপরতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইউরোপীয়গণের সহিত ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত হইয়া কতবার ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল করিয়াছে! ভেলোরাবাদে সাহসী সেনাপতি মেলের অধীন দুর্গাভ্যন্তরস্থ কোম্পানির সৈন্যগণ যখন অবরুদ্ধ অবস্থায় অনাহারে কষ্ট পাইতেছিল, তখন তাহারা মধ্যে মধ্যে দুর্গ হইতে বলপূর্ব্বক নির্গত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতেয়ে সকল মেষ চরিত তাহাদিগকে ধরিয়া আনিত। ইহার মধ্যে কতকগুলি সিপাহিদিগের অংশে পড়ে—কিন্তু তাহারা সর্ব্ব শ্লাঘা আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়া বলিল, "আমাদের জীবন যার

লের জন্য মাংস নিতান্ত আবশ্যক নয়—মাংসাহার আমাদের অভ্যাসও নহে—অতএব যে গুলি আমাদের অংশে পড়িয়াছে সে সকল ইউরোপীয়গণকেই দেওয়া হউক।"

টিপুসুলতান বেড্‌নোর অধিকার করিলে ইংরাজ সেনাপতি মাথু্স্ সসৈন্যে তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। এই সময় টিপু নিজ সৈন্য দলে প্রবিষ্ট করিবার জন্য সিপাহিদিগকে অনেক প্রলোভন দেখান—কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সিপাহিদিগকে ইউরোপীয় বন্দিগণ হইতে পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছিল—তাহাদের মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী প্রভৃতি দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান ছিল। কিন্তু একজন বন্দী ইংরাজ সেনানায়ক পরে প্রকাশ করে যে, প্রতি রাত্রে সিপাহিরা এই সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া,ক্রোশ-ব্যাপী পুষ্করিণী সকল সন্তরণ পূর্ব্বক, সতর্ক-রক্ষকদিগের চক্ষু এড়াইয়া, টিপু-সুলতানের নিকট হইতে যৎসামান্য যে খোরাকি পয়সা পাইত তাহার মধ্যে যাহা কিছু বাঁচাইতে পারিয়াছিল তাহা সঙ্গে লইয়া, ইউরোপীয় বন্দিগণের শিবিরে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে উপহার প্রদান করে। তাহারা ইংরাজ সৈন্যগণকে বলে—"আমরা যা—তা খাইয়াই জীবন ধারণ করিতে পারি—কিন্তু তোমাদিগের মাংস আবশ্যক।"

ম্যাল্‌কম সিপাহিদিগের সম্বন্ধে আর একটি গল্প বলেন। দাক্ষিণাত্যে নিজামের সৈন্যগণ একটি গ্রাম লুঠ করে এবং গ্রামবাসীগণ অনাহারে মৃতপ্রায় হয়। ম্যাল্‌কম তাঁহার সিপাহি সৈন্যদলের কতকগুলিকে রক্ষক স্বরূপে ঐ গ্রামে প্রেরণ করেন—ঐ সিপাহিরা আপনাদিগের আহার্য্য চাউল হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া অনাহারী গ্রাম বাসীদিগকে বিতরণ করে।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লাসোয়ারি যুদ্ধের পর সৈন্যগণের মধ্যে আহত ও পীড়িতের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, হাস্‌পাতালের দ্বারা আর কোন সাহায্য হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এই অবস্থায় সেনাপতি এই আহত ও পীড়িতদিগকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে সিপাহিদিগকে অনুরোধ করিলেন। সিপাহিরা প্রফুল্লচিত্তে এই অনুরোধ রক্ষা করে।

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি মন্‌সন্ যখন হোল্‌কারের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া সসৈন্যে পলায়ন করিতেছিলেন, তখন হোলকার ইংরাজদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিবার জন্য সিপাহিদিগকে বলিয়া পাঠান। সিপাহিরা যদিও সেই সময় ভয়ানক কষ্ট সহ্য করিতেছিল—এবং হোলকারও তাহাদিগকে অনেক ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল, তথাপি তাহারা ইংরাজের লবণ খাইয়াছে বলিয়া ইংরাজদিগের পক্ষ কিছুতেই পরিত্যাগ করে নাই।

১৮১৭ খৃঃ কির্কির যুদ্ধে আমার অধীনে যে সৈন্যদল ছিল, পেষোয়ার চরেরা তাহাদিগকে ধন-দ্বারা বশীভূত করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সিপাহিরা সেই সব কথা আমার নিকট বলিয়া দেয়।

আমার বন্ধুর নিকট হইতে একটি পত্র পাই তাহার প্রতিলিপি নিম্নে প্রকাশ করিতেছি—

আমি সেপ্টেম্বরের প্রারম্ভেই বোম্বাই নগরে উপনীত হই এবং ঐ মাসের শেষে আমার অধীন সৈন্যদল পারস্য দেশ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয়। তাহাদের অবিশ্বস্ততা সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক জনরব উঠিয়াছিল—কিন্তু আমি আনন্দের সহিত বলিতেছি তাহারা যেরূপ সাহস ও সদাচারের পরিচয় দিয়াছে তদ্দ্বারা তাহাদের বিশ্বস্ততা বিশেষরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে। এমন কি মৃত সর্ হেনরি হ্যাবেলক্ এই ২৬ সংখ্যক বোম্বাই সিপাহি সৈন্যদিগকে ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করেন। * * * দাক্ষিণাত্য ও খান্দেশ প্রদেশে যখন ভিলদিগের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন এই সৈন্যদল তাহাদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করে। এই প্রদেশটি এরূপ পর্ব্বতময়, জঙ্গলে পরিপূর্ণ ও খালখন্দে বিভক্ত, যে এখানে ভিলদিগের সহিত আঁটিয়া উঠা ভার—কিন্তু এই সিপাহি সৈন্যদল তাহাদিগকে পদে পদে পরাভূত করে। ইহারা ইংরাজ সেনানায়কদিগকে নিরাপদে রাখিবার জন্য কতই আগ্রহ প্রকাশ করে; যখন আমার পার্শ্ব ঘেঁষিয়া গোলা গুলি ছুটিতেছিল, তখন এক-জন ব্রাহ্মণ সিপাহি আমাকে আপনার শরীরের অন্তরালে রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল। আর এক সময় এক জন মহারাষ্ট্রীয় সৈনিক, তাহার কাপ্তেনের প্রতি বিপক্ষের এক জন বন্দুক লক্ষ্য করিতেছে দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইল—এবং সেই খানে দাঁড়াইবামাত্র সেই বন্দুকের গুলি কাপ্তেনের গায়ে না লাগিয়া তাহার শরীরে প্রবেশ করিল।'

এই রূপ বিশ্বস্ততার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতা হিন্দু চরিত্রের আর একটি লক্ষণ।

মেজর ফলেট্, ২৫ সংখ্যক বোম্বাই সিপাহি সৈন্যদলের নেতা হইয়া আমেদ-নগর হইতে আসীরগড়ে যাত্রাকালীন ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হয়েন। মেজর ফলেট্ যদিও এক জন কঠোর নিয়ন্তা ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার অখণ্ড ন্যায়পরতা নিবন্ধন সৈন্যগণের এতদূর অনুরাগ-ভাজন হইয়াছিলেন যে, রাজপুত ও ব্রাহ্মণ সৈনিকেরা তাহাদিগের জাতীয় নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদিগের সেনাপতির মৃতদেহ ডুলি হইতে নামাইয়া গোরের মধ্যে স্থাপন করে—এবং তাহারা নিজে গোর মধ্যে অবতরণ করিয়া ঐ মৃত শরীরকে তন্মধ্যে উত্তম রূপে প্রসারিত করিয়া তাহার উপর মৃত্তিকা চাপা দেয়। যদিও এই মৃত ম্লেচ্ছদেহস্পর্শে তাহারা আপনাদিগকে অপবিত্র মনে করিয়া পরে তাহার যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হয়, তথাপি জাতীয় সংস্কারের অনুরোধে তাহাদিগের মৃত কাপ্তেনের সৎকার করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে নাই। সেই দিন অপরাহ্নে কতকগুলি ইংরাজ

সেনানায়ক সেই সমাধি স্থলে শিলা-খণ্ড সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছে দেখিয়া সিপাহিরা তাহাদিগের শিবির হইতে বেগে নির্গত হইয়া একটি ক্ষুদ্র স্মরণ-স্তম্ভ-নির্ম্মাণ-কার্য্যে ইংরাজ সৈন্যগণকে যথেষ্ট সাহায্য করিল।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সেনানায়ক সিতোয়েল্ কোহাটের নিকটে যুদ্ধে হত হইলে তাঁহার অধীনস্থ সিপাহিরা তাঁহার মৃতশরীর উদ্ধার করিয়া আনিবার জন্য অক্ষুব্ধচিত্তে স্বকীয় জীবন উৎসর্গ করে।

আমি যখন গভর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক স্টাটিস্টিকাল রিপোর্টরের পদে নিয়োজিত হইয়াছিলাম তখন প্রায় বৎসরের মধ্যে আট মাস আমাকে শিবিরে শিবিরে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে একটা ব্যাঘ্র দুই জন কৃষককে দন্তাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করে; এই সাঙ্ঘাতিক অবস্থায় তাহারা আমার শিবিরে আনীত হয়। আমি তাহাদিগের ক্ষত স্থানে প্রতি দিন ঔষধাদি দিতাম। পরে তাহারা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলে তাহাদিগকে তাহাদের গ্রামে পাঠাইয়া দিলাম। আর যে কখন তাহাদিগের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে এরূপ মনেও করি নাই। মে মাসের শেষে আমি পুনা অকলাণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিতেছি এমন সময়ে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে সেই দুইজন কৃষক পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা আমার গতি-বিধির সন্ধান লইয়া ৫ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া কতকগুলি পাত্রে মধু, টাট্‌কা মাখন ও দুগ্ধ—অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতার উপহার স্বরূপ আমার নিকট লইয়া আসিয়াছে।

উপচিকীর্ষা হিন্দুচরিত্রের আর একটি লক্ষণ। গত সিপাহি বিদ্রোহের মধ্যেও যে উপচিকীর্ষার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে! যৎকালে গোয়ালিয়ারে সিন্ধিয়া-সৈন্য-দলের মধ্যে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তখন লেফটনেণ্ট,—সত্বর অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক কাওয়াজের স্থানে যেমন উপস্থিত হইবেন অমনি সিপাহিদল হইতে গুলি বর্ষণ হইল—তাঁহার অশ্ব হত হইল—এবং চারি জন সিপাহি দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে বন্দী করিল। পরে তাহারা তাঁহাকে ছাউনির বাহিরে লইয়া নদী পার হইয়া একটা কম্বল দিয়া বলিল "যাও জীবন লইয়া আগ্রাভিমুখে পলাও।" কিন্তু তিনি তাঁহার স্ত্রীকে রোগ-শয্যায় পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন—স্ত্রীকে ছাড়িয়া যাইতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। উহার মধ্যে দুইজন সিপাহি বলিল "আচ্ছা আমরা তোমার স্ত্রীকে এখানে আনিয়া দিতেছি", এই বলিয়া তাহারা প্রস্থান করিল। কিয়ৎকাল পরে সেই রোগ-ক্লিষ্টা স্ত্রীলোকটিকে তাহারা সঙ্গে করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। কিন্তু তিনি সেই রুগ্না স্ত্রীকে কি করিয়া লইয়া যাইবেন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে বলিলেন আমাদের দুজনকেই গুলি কর; কিন্তু গুলি করা দূরে থাকুক, তাহারা কম্বলের শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে রুগ্না স্ত্রীলোককে শুয়াইয়া

বন্ধুকে ঐ কম্বলের শয্যা অলঙ্কিত করিয়া কোন নিরাপদ স্থানে তাঁহাদিগকে পৌছাইয়া দিল।

কোন বন্ধুর পত্র হইতে নিম্নলিখিতটি উদ্ধৃত করিতেছি—

'গত সিপাহি বিদ্রোহের গোলযোগের বিষয় স্মরণ করিবার সময় পঞ্চবিংশতি সিপাহি সৈন্যদলের মহত্বের প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। ২৩ শে তারিখের যুদ্ধে ঐ সৈন্যদলের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। তাহারা সর্ব্ব প্রকার আঘাতে আহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের হাসপাতালে গমন করে। তাহাদিগের হস্তপদ বৃহৎ গোলার আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বন্দুকের গুলি দ্বারা বিদ্ধাদ্বিবিদ্ধ হয় এবং শরীরের মাংশেও সাঙ্ঘাতিক আঘাত লাগে। এই সকল লোক আহত হইয়া জ্বলন্ত সূর্য্যোত্তাপে কেহ বা শুইয়া কেহ বা বসিয়া কল্পনাতীত অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিল. এবং অম্লান বদনে দেখিতেছিল যে,তাহাদের পূর্ব্বে যে সকল আহত ব্যক্তি হাসপাতালে আসিয়াছে তাহাদিগকে লইয়াই অস্ত্র-চিকিৎসকেরা ব্যস্ত আছেন। এই দৃশ্যটি কেমন মহত্বপূর্ণ!—তাহারা সকলে এইরূপ বলিতেছে যে "আমাদের কষ্ট কিসের? আমরা অনেক দিন সরকারের লবণ খাইয়াছি—আমরা মরিলে কি ক্ষতি? আমরা ভাল কাজ করিয়াছি—আমরা মরিলে সরকার অবশ্য আমাদিগের পরিবারের ভরণ-পোষণের ভারগ্রহণ করিবেন।" এক জনের স্কন্ধাস্থি-সন্ধি হইতে অজস্র ধারে রক্ত নির্গত হইতেছিল—বলাধানের জন্য তাহাকে জল-মিশ্রিত বাণ্ডি প্রদত্ত হয় কিন্তু তাহার পার্শ্বে আর একজন যন্ত্রণায় গোঙরাইতেছিল; পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি উদারতার পরিচয় দিয়া বলিল—"আগে আমার ভাইকে দাও।"—তৎপরে সে তাহা পান করিয়া বলিল "আমি আহত হইয়াছি তাহাতে ক্ষতি নাই, কারণ আমি জানি সরকার আমাকে ভুলিবেন না।" অস্ত্রচিকিৎসক সেই আহত ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহারও বাহারও অঙ্গ ছেদনে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা বীরোচিত ধৈর্য্য-সহকারে তাহা সহ্য করিল। ক্লোরোফরম্ দিয়া তাহাদিগকে অচেতন করা হয় নাই—অথচ যখন সেই ভয়ানক ছুরিকা তাহাদের শরীর হইতে কোন অঙ্গ বিশেষ বিচ্ছিন্ন করিতেছিল, তখন তাহাদিগের মুখ হইতে একটি হা হুতাশও নির্গত হয় নাই। তাহারা যুদ্ধের সময় যেরূপ ধীর সাহসী ও নির্ভীক; সেইরূপ অস্ত্রচিকিৎসকের বিষম যন্ত্রণা জনক অস্ত্রাঘাতেও তাহারা ধৈর্য্য, দৃঢ়তা ও চিত্ত প্রসাদের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছিল!

হল্ট ম্যাকেনজি একটি আশ্চর্য্য ঘটনার কথা আমার নিকট উল্লেখ করেন। কোন দাঙ্গায় দুই ভ্রাতা দণ্ডনীয় হয়; ইহার মধ্যে একজনের অতি সামান্য দণ্ড হয়—আর একজনের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়। যাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য অপর ভ্রাতা তাহার নামের পরিচয় দিয়া স্বয়ং ফাঁশিকাষ্ঠে আরোহণ করিবার চেষ্টা করে।

ম্যাকেনজি বলেন ইংলণ্ডের নিউগেট্ কারাগারের ইতিবৃত্তে বোধ হয় ঈদৃশ ঘটনা দৃষ্ট হয় না।

বদান্যতা হিন্দুচরিত্রের আর একটি লক্ষণ। ভারতবর্ষে (Poor law) অর্থাৎ দারিদ্র্য নিবারণের জন্য কোন বিশেষ রাজ-বিধি নাই,—কোন কালে ছিলও না। এদেশে কেহ কখন বাধ্য হইয়া ক্ষুধিতকে অন্ন ও উলঙ্গকে বস্ত্র দান করে নাই। ভূমি যতই ফলবতী হউক না কেন—লোক-সমাজের যতই উন্নত অবস্থা হউক না কেন—বিংশতি কোটি লোকের মধ্যে দীন দরিদ্র থাকিবেই থাকিবে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষ যেরূপ দুর্ভিক্ষ মহামারী ও অশেষ যুদ্ধ বিপ্লবের রঙ্গভূমি, তাহাতে এখানে দরিদ্রের সংখ্যা তো আরও অধিক হইবার কথা। তথাপি এখানে যে দারিদ্র্য-কষ্ট নিবারণ হইতেছে তাহার একমাত্র কারণ এই যে, হিন্দু-সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা দানশীলতা একবারে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। খৃষ্ট জন্মিবার ছয় শতাব্দী পূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রথম অধিষ্ঠান হইতে আবহমান কাল পর্য্যন্ত—বুদ্ধ পুরোহিতেরা কমণ্ডলু-হস্তে ভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করে! ইউরোপে ভিখারীগণকে যেরূপ কঠোর অর্দ্ধ-চন্দ্র খাইতে হয় ভারতবর্ষে সেরূপ নহে। এখানে ভিখারীগণের যাচ্ঞা নিষ্ফল হয় না—তাহারা বিশ্বস্ত চিত্তে ভিক্ষা করে—তাহারা বিলক্ষণ জানে যে এখানে লোকেরা ধর্ম্মের জন্যই দান করে। সর জন ম্যালকম বলেন প্রসিদ্ধ আলা-বাইয়ের বদান্যতা এতদূর ছিল যে তিনি হোলকার রাজ্যের অনেক স্থানে যে কেবল নিজ হস্তে প্রতিদিন দরিদ্রগণকে দান করিতেন এমত নহে, তিনি পথ-প্রান্তে তৃষিত পথিকদিগের জন্য অসংখ্য জলছত্র ও সরাই নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার উপচিকীর্ষা মনুষ্য-জাতিতে বদ্ধ ছিল না। যে সকল পক্ষিগণকে কৃষকেরা নিজ নিজ ক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিত, তাহাদিগের জন্য তিনি স্বতন্ত্র শস্যময় ক্ষেত্র সকল উন্মুক্ত রাখিতেন। এই রূপ পশুদিগের প্রতি দয়াভাব যে শুদ্ধ পক্ষি-জাতিতে বদ্ধ এমত নহে, যাঁহারা ভারতবর্ষে আসিয়াছেন তাঁহারা অবশ্য দেখিয়া থাকিবেন—ধর্ম্মের ষাঁড় সকল নগরের পথে ঘাটে মুক্তভাবে বিচরণ করিতেছে এবং অবাধে পথ-প্রান্তস্থিত দোকানদারদের শস্য-পূর্ণ চাঙ্গারি মধ্যে মুখ দিতেছে—দোকানদারগণ তাহাদিগকে প্রহার না করিয়া শুধু ধমকাইয়া তাড়াইয়া দিতেছে। * * *। পুষ্করিণী, সরাই, জলছত্র, অন্নছত্র প্রভৃতি জনহিতকারী সাধারণ কার্য্যে কত লোকে কত ব্যয় স্বীকার করিতেছে, তাহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

পিতামাতা ও আত্মীয় কুটুম্বদিগের প্রতি অনুরাগ হিন্দু-চরিত্রের আর একটি প্রধান লক্ষণ।

১৭৯৬-৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ হইতে এক দল সিপাহিসৈন্য—হায়দ্রাবাদে প্রেরিত হয়। তাহারা তাহাদিগের বেতন হইতে কিয়দংশ টাকা লইয়া স্ত্রীপরিবারগণকে

দিবার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা করিয়া যায়। কাপ্তেন উইলিয়ামস্ বলেন যে, এ বিষয়ে তাহাদিগের চরিত্র ও আচরণ আদর্শ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে। তাহারা কেবল যে স্বীয় স্ত্রীপুত্রগণকেই তাহাদিগের আয়ের অধিকাংশ দেয় এরূপ নহে; তাহাদিগকে তো দিতেই হইবে।* কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে অনেকে স্বীয় বৃদ্ধ পিতামাতা ও দরিদ্র আত্মীয় স্বজনকেও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রফুল্লচিত্তে সাহায্য করে। তাহারা পিতামাতা আত্মীয় স্বজনকে এত অধিক দান করে যে, বিদেশ-যাত্রাকালে পাছে তাহারা নিজে অর্থাভাবে কষ্ট পায় এই জন্য গভর্ণমেণ্টকে সময়ে সময়ে তাহাদের আয়-ব্যয়ে হস্ত-ক্ষেপ করিতে হয়। ব্রহ্মদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, এই তিন স্থানের সৈনাগণের মধ্যেই এই রূপ সদ্ব্যবহার লক্ষিত হয়।

শিষ্টাচার হিন্দুচরিত্রের আর একটী প্রধান লক্ষণ। সর্ জন ম্যাল্‌কম বলেন—ভারতবর্ষবাসীগণ সকল জাতি অপেক্ষা অধিক শিষ্টাচারী। তাহারা প্রায় কখনই শিষ্টাচারের ব্যতিক্রম করে না। তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া প্রথমেই কাজকর্ম্মের প্রসঙ্গ উপস্থিত করা শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ। পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের বিষয়, আভিজাত্য বা ব্যক্তিগত কোন বিশেষ অভ্যাস বা রীতি নীতির কথা, ভদ্রের সহিত কথোপকথনে উপস্থিত করিতে নাই; পরিচ্ছদ বা কোন কুটুম্বের মুখশ্রী লইয়া কোন কথা বলা রূঢ়তা বলিয়া প্রসিদ্ধ। সম্মুখে অলঙ্কার, অশ্ব, হস্তী, প্রভৃতি যান বাহনের প্রশংসা করিলে বক্তাকে নম্রভাবে নিরস্ত করিয়া দেওয়া একটি শিষ্টাচারের নিয়ম। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই জানেন আমরা কেমন উদারতা-সহকারে এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি 'নিগর্' এই ঘৃণা-ব্যঞ্জক শব্দটি অকাতরে প্রয়োগ করিয়া থাকি।

প্রসিদ্ধ পার্সি পোত-নির্ম্মাতা জ্যাম্‌সেট্‌জি এই নিগর্-শব্দ-প্রয়োগ লইয়া একটি যে তীব্র শ্লেষ-পূর্ণ উত্তর দিয়াছিলেন, জেনেরাল ব্রিগ্‌স্ তাহার উল্লেখ করেন। জ্যাম্‌সেট্‌জি একজন সামান্য ছুতার মিস্ত্রী হইতে পোত-নির্ম্মাতার পদে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি একমাত্র এতদ্দেশীয়দিগের কায়িক শ্রমের সাহায্যে রয়াল নেভির জন্য একটি জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ জাহাজ ভাসাইবার যোগ্য হইলে, তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও তাঁহার অনুচরগণ এবং নৌ-বিভাগের কর্ম্মচারিগণকে নিমন্ত্রণ করেন। জ্যাম্‌সেট্‌জি নিমন্ত্রিতদিগের জন্য সমস্ত আয়োজন করিতে করিতে জাহাজের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং গর্ব্ব ও সন্তোষ-সহকারে উহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

* প্রধান সেনাপতি সর্ চার্লস নেপিয়রের কালে কোন সৈনিক পুরুষ তাহার বিলাতস্থ মাতাকে আপনার বেতনের কিয়দংশ প্রতিমাসে প্রেরণ করাতে প্রধান সেনাপতি এই আচরণ অনুকরণ-যোগ্য বলিয়া সাধারণ সৈন্য সমীপে ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ আচরণ ভারতবর্ষীয়দিগের সম্বন্ধে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

তৎপরে তিনি তদুপরি আরোহণ-পূর্ব্বক জাহাজের খোলের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া এই কথাগুলি খুদিয়া রাখিলেন,—'১৮০০ খৃষ্টাব্দে এক জন কদাকার নিগর কর্ত্তৃক এই জাহাজ নির্ম্মিত হয়।' সে সময় তিনি এ কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই—কিন্তু অনেক বৎসর পরে যখন জাহাজ আবার ডকে ফিরিয়া আসিল—তখন তিনি সকলকে সেই খোদিত লিপি দেখাইয়া দিলেন এবং তাহার মধ্যে যে একটি গূঢ় ভর্ৎসনা নিহিত ছিল তাহার ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন।"

উপরোক্ত সমস্তই আমরা সাইক্‌সের প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

আমাদের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর জেনেরল ওয়ারেন্ হেস্‌টিংস্ পার্লিয়ামেণ্টে সাক্ষ্য দিবার সময় হিন্দুচরিত্র সম্বন্ধে যাহা ব্যক্ত করেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।—"কেহ কেহ অনেক কষ্ট করিয়া এখানকার সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এই রূপ একটি সংস্কার জন্মাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন যে, ভারতবর্ষবাসীদিগের মধ্যে নীতি জ্ঞানের অত্যন্ত হীনাবস্থা এবং যে সকল পাপাচার মনুষ্য-প্রকৃতিকে কলঙ্কিত করে, সেই সমস্ত তাহাদিগের কর্ত্তৃক অবাধে সচরাচর অনুষ্ঠিত হয়! আমি যে শপথ গ্রহণ করিয়াছি তাহার উল্লেখ করিয়া পুনর্ব্বার দৃঢ়তা সহকারে বলিতেছি যে, তাহাদিগের সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা অসত্য এবং সম্পূর্ণরূপে অমূলক। ভারতবর্ষ-বাসীদিগের কথা বলিতে গেলে হিন্দুদিগকে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা আবশ্যক, যে হেতু ভারতবর্ষনিবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু—ইহাদিগের মধ্যে মুসলমানও অনেক আছে, কিন্তু তাহারা স্বতন্ত্র সমাজে অবস্থান করে। হিন্দুরা অতি ভদ্র, উপচিকীর্ষু—তাহাদিগের প্রতি অন্যায়াচরণ করিলে তাহারা প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যগ্র হয় না বরং কেহ সদ্ব্যবহার করিলে তাহার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়। মনুষ্য-হৃদয়ের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মধ্যে যেরূপ দৃষ্ট হয়, ইহাদের মধ্যে তদপেক্ষা কিছুমাত্র অধিক দৃষ্ট হয় না। তাহাদিগের মধ্যে কুসংস্কার আছে সত্য, কিন্তু তাহাদের ন্যায় আমাদের সংস্কার নয় বলিয়া, তাহারা আমাদিগের সম্বন্ধে কিছুই মন্দ মনে করে না। তাহাদিগের উপাসনা-প্রণালী হীন হইলেও তাহাদিগের ধর্ম্মমধ্যে যে সকল উপদেশ আছে তাহা জনসমাজের উৎকৃষ্টতম উদ্দেশ্য-সাধন-পক্ষে উপযোগী।"

ইংরাজদিগের মধ্যে যাঁহারা সত্যপ্রিয় তাঁহারা স্বীয় সমাজ ও আমাদিগের সমাজসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা স্বতন্ত্র রূপে উদ্ধৃত করিয়াছি। নীতি বিষয়ে তাঁহাদের সমাজ অপেক্ষা ভারতবর্ষীয় সমাজ যে অনেকাংশে উৎকৃষ্ট তাহা তাঁহাদের বাক্যেই এক প্রকার সপ্রমাণ হইতেছে। বুদ্ধি জ্ঞান বিষয়ে আমরা যে এক্ষণে তাঁহাদিগের অপেক্ষা অনেক পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছি তাহা আমরা অস্বীকার করি না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি

যে জ্ঞান ও নীতি যদিও পরস্পর পরস্পরের উন্নতি-সাপেক্ষ তথাপি প্রত্যেকের স্বতন্ত্র সাধনা আবশ্যক। জ্ঞানের উন্নতিতে নীতিরও যে কিয়ৎপরিমাণে উন্নতি হয়—তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই, যে পরিমাণে জ্ঞানের উন্নতি হয় সেই পরিমাণেই যে নীতির উন্নতি হইবে,জ্ঞান নীতির মধ্যে এইরূপ কোন বাধ্যবাধক সম্বন্ধ নাই। তাহা যদি থাকিত তাহা হইলে ইংরাজেরা নীতি-বিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা অসংখ্য গুণে শ্রেষ্ঠ হইত সন্দেহ নাই। কারণ তাহারা আমাদিগের অপেক্ষা জ্ঞান-বিষয়ে অনেক পরিমাণে উন্নত। আমাদের যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে শরীর মন হৃদয় তিনই পরস্পর পরস্পরের উন্নতি-সাপেক্ষ, কারণ এই তিনই পরস্পর পরস্পরের সহিত জড়িত হইয়া আছে। শরীরের উন্নতিতে মনেরও কিয়ৎপরিমাণে উন্নতি হয় বটে, কিন্তু কেহ যদি মনে করেন যে, ব্যায়াম দ্বারা শরীর সবল ও সুস্থ হইলেই মন সাধনা-ব্যতীত আপনা হইতেই বুদ্ধি জ্ঞানে পুষ্ট হইবে, তিনি যেরূপ মহাভ্রমে পতিত হয়েন, সেই রূপ যিনি মনে করেন, যে পরিমাণে বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হইবে সেই পরিমাণে হৃদয়ের বৃত্তি সকলও উন্নত হইবে, তিনিও তদ্রূপ মহাভ্রমে পতিত হয়েন। নীতির মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞানের অংশ আছে সত্য—কিন্তু ভাবই উহার মূল উপকরণ—ভাবই উহার পত্তন-ভূমি, এবং ভাবই উহার প্রাণ। এই জন্যই আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, এক জন লোক হয় তো সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি পণ্ডিত, অথচ সে নীতি বিষয়ে পশু অপেক্ষাও অধম—আর এক জন নিতান্ত নির্ব্বোধ অনক্ষর মূর্খ অথচ সে নীতি বিষয়ে উপরি উক্ত পণ্ডিত অপেক্ষাও অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। বেকনের ন্যায় অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন পণ্ডিত বোধ হয় পৃথিবীতে অল্পই জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন--কিন্তু তাঁহার দুর্নীতি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ইংরাজ-কবি পোপ লিখিয়াছেন;—

"If parts allure thee, think how Bacon shined,
The wisest, brightest, the meanest of mankind."

ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে যখন এইরূপ বৈষম্য দৃষ্ট হয় তখন ব্যক্তি-বিশেষের সমষ্টি জাতি বিশেষের মধ্যেও যে এই রূপ বৈষম্য থাকিতে পারে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি, এবং ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষীয় জনসমাজ-মধ্যে যে এইরূপ বৈষম্য আছে তাহাও আমরা এক প্রকার দেখাইয়াছি।

মনুষ্য দয়া, ভক্তি, প্রেম, ন্যায়পরতা প্রভৃতি হৃদয়ের উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে সকল কার্য্য করে এবং যাহা ভাল বলিয়া হৃদয়ও আপনা হইতেই সায় দেয়, তাহাই যে সুনীতি মূলক কার্য্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হৃদয়ের এই সকল উৎকৃষ্ট ভাব হইতে যে সমস্ত কার্য্য স্বতই উৎপন্ন হয় সেই সকল কার্য্যের ফলাফল যখন আমরা আ

বার বুদ্ধি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখি যে তদ্দ্বারা জন-সমাজের কোন হানি হয় না প্রত্যুত প্রভূত মঙ্গল হয়, তখন সেই সকল কার্য্য যে সুনীতি-মূলক তাহা জ্ঞান দ্বারা আমরা পরে দৃঢ়ীভূত করিয়া লই মাত্র। মিথ্যা কথা কহিবে না—ইহা একটি নৈতিক সত্য। পার্ব্বত্য-জাতি ও সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্যেরা যে, মিথ্যা কথা প্রাণান্তেও কহে না তাহারা কি সমাজের ভাবী অনিষ্ট চিন্তা করিয়া ঐ রূপ আচরণ করে?—এরূপ বিচার শক্তি তাহাদিগের নাই। আবার যখন কোন বুদ্ধি-জ্ঞান-সম্পন্ন সুসভ্য ব্যক্তি ইহার ফলাফল-বিচারে প্রবৃত্ত হন, তখন দেখিতে পান যে, সত্য কথা বলিলে জন-সমাজের সর্ব্বাংশে মঙ্গল হইবারই সম্ভাবনা। অতএব দেখা যাইতেছে হৃদয় হইতে যে সকল নীতি সমুদ্ভূত হয় বুদ্ধি তাহাকে পরে দৃঢ়ীকৃত করে মাত্র। অতএব শুদ্ধ জ্ঞানের উন্নতিতে নীতির উন্নতি হয় না, হৃদয়ের উন্নতি সর্ব্বাগ্রে বিশেষ আবশ্যক।

বিষয়-রাশির সহিত সংঘর্ষণে জ্ঞান যেরূপ ক্রমশঃ উদ্বোধিত হয়, হৃদয়ের ভাবও সেই রূপ ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তি লাভ করে। সাধনা অভ্যাস ও অবস্থা বিশেষে স্মৃতি, তুলনা কল্পনা প্রভৃতি মনুষ্যের বিশেষ বিশেষ বুদ্ধি-বৃত্তি সকলের যেরূপ উন্নতি হয়—হৃদয়ের বৃত্তি-সম্বন্ধেও সেই রূপ নিয়ম দৃষ্ট হয়।

বকল সাহেব বলেন কুনীতি অপেক্ষা অজ্ঞান হইতে জনসমাজের অধিক অনিষ্ট হয়। তিনি বলেন—এক জন লোকের অভিপ্রায় সৎ হইলেও তদ্দ্বারা এরূপ সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে যাহা জনসাধারণের পক্ষে অতীব অনিষ্টকর। ইহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি বলেন, পূর্ব্বতন রোমীয় সম্রাটগণের মধ্যে যাঁহারা খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের প্রতি দারুণ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই সৎ প্রকৃতির লোক ছিলেন; অর্থাৎ তাঁহারা জনসমাজের মঙ্গল-কামনায় নিঃস্বার্থ ভাবে ঐরূপ পীড়ন করিয়াছিলেন। সদভিপ্রায় সত্ত্বেও অজ্ঞানতা বশতঃ যে অনেক মন্দ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, এক জন লোক অজ্ঞান অথচ সৎ—আর এক জন জ্ঞানবান্ অথচ অসৎ—এই উভয় লোকের মধ্যে কাহার দ্বারা জগতের অধিক অমঙ্গল হয়?—এক জন জ্ঞানবান অসৎ লোক এরূপ কৌশলে আর এক জনের সর্ব্বনাশ করিতে পারে যে, সেই নিপীড়িত ব্যক্তি বুঝিতেও পারিবে না যে তাহার সর্ব্বনাশ হইতেছে, কিম্বা এত বিলম্বে বুঝিবে যে তখন প্রতিবিধানেরও আর কোন উপায় নাই। ইতিহাস ইহার নিদর্শন। যখন আক্‌বর শা, ভারতবর্ষের সিংহাসনে প্রথম অধিরূঢ় হয়েন, তখন তাঁহার রাজকার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মে নাই এবং বুদ্ধিরও তাদৃশ পরিণতি হয় নাই।* এই

* "He was long ranked with Shabudin, Alla, and other instruments of

জন্য তিনিও প্রথমে আল্লাউদ্দীন প্রভৃতি অত্যাচারী মুসলমানের ন্যায় ধর্ম্মান্ধ হইয়া হিন্দুদিগের মন্দির সকল চূর্ণ করিয়া সেই সেই স্থানে মস্‌জিদ্ স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমান আকবর আপনার এই ভ্রম শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন যে, স্পষ্টতঃ এরূপ হিন্দুদিগের ধর্ম্মের উপর অত্যাচার করিলে স্বীয় রাজত্ব রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিবে। এই জন্য তিনি প্রকাশ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধে অপক্ষপাতিতা দেখাইয়া ভিতরে ভিতরে হিন্দুধর্ম্মের বন্ধন শিথিল করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। † তিনি নানা প্রলোভন দেখাইয়া স্বীয় পরিবার-মধ্যে রাজপুত-মহিলাগণের সহিত বিবাহ-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে লাগিলেন। চতুর আকবর এই এক রাজনীতির বলে রাজপুতদিগের রাজ্যসম্বন্ধীয় স্বাধীনতা ও ধর্ম্মের উপর অলক্ষিত ভাবে এবং বিনা আড়ম্বরে জয় লাভ করিলেন। কাহারও স্বাধীনতা হরণ করা যদি বিষম অনিষ্টজনক কার্য্য-মধ্যে গণনীয় হয়, তাহা হইলে আকবর শা রাজপুত জনসমাজের যে বিষম অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার পূর্ব্বে কোন মুসলমান সম্রাট বাহুবলে রাজপুতদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। ‡ আকবর শা বুদ্ধিবলেই তাহাদিগের স্বাধীনতা হরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিবল না থাকিলে তিনি এই অনিষ্ট সাধনে কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। সেকন্দর শা—নেপোলিয়ন প্রভৃতি রাজ-দস্যুগণ যাঁহারা মানব-মণ্ডলীর স্বাধীনতা অপহরণ করিয়াছিলেন, বাহুবলের সহিত তাঁহাদিগের বুদ্ধি-বল না থাকিলে কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না।

বকল সাহেব বলেন জ্ঞানের উন্নতিতেই পৃথিবীর মঙ্গল সাধিত হয়, তাহাতে নীতির প্রায় কোন হস্ত নাই। তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি এই কথা বলেন যে, ইউরোপে যে এত যুদ্ধ-বিগ্রহ কমিয়াছে তাহার কারণ বারুদের আবিষ্কার, আডাম্‌স্মিথ্ কর্ত্তৃক বার্ত্তা-শাস্ত্রের মত-পরিবর্ত্তন এবং বাষ্পীয় শকট ও অর্ণব-

destuction, and with every just claim; and like these, he constructed a Mumba for the Koran from the altars of Eklinga."

Tod's Rajasthan Vo I—P. 324.

† Oodoy-'le gros was the first of his race who gave a daughter in marriage to a Tatar. The bribe for which he bartered his honour was splendid; for four provinces yeilding 200,000 Ls of anunal revenue, were given in exchange for Jod Bae at once doubling the fisc of Marwar. With examples as Amber and Marwar, and with less power to resist the tamptation, the minor chiefs of Rajasthan with a brave and numerous vassalage, were transformed into Satraps of Deli. Do-P. 335.

‡ "Akber was the real founder of the empire of the Moguls, the first successful conqueror of Rajpoot independence."—Do—P. 324.

জ্ঞানের সাহায্যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সংস্রব স্থাপন ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাঁহার বলিবার তাৎপর্য্য এই—যেহেতু এই সমস্ত ব্যাপার জ্ঞানের ফল, অতএব জ্ঞানের উন্নতিতেই যুদ্ধ রূপ অমঙ্গল তিরোহিত হইয়াছে।

বকল যে সময় সভ্যতার ইতিহাস লিখিয়াছিলেন তখন প্রায় চত্বারিংশ বৎসর ব্যাপী শান্তির পর, ইউরোপের মধ্যে অসভ্যতম জাতিদ্বয় তুর্ক ও রুশীয়দিগের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়াছিল, তাই তিনি মনে করিয়াছিলেন বুঝি জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের সভ্যদেশ হইতে যুদ্ধ বিগ্রহ চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইল। কিন্তু বকল সাহেব যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে অবশ্য তাঁহার মতের অসারতা এক্ষণে বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিতেন। ইউরোপের মধ্যে যে দুই জাতি সর্ব্বাপেক্ষা সভ্যতম, জর্ম্মান ও ফরাসি, তাহাদিগের মধ্যে সে দিন কি ভয়ানক যুদ্ধই না হইয়া গেল। এক্ষণে তো রুসিয়া তুর্কির মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে। এই যুদ্ধানলে সমস্ত ইউরোপ যে আবার প্রজ্বলিত হইবে না তাহাই বা কে বলিতে পারে। গত জর্ম্মণ ফরাসি যুদ্ধের নৈতিক কারণ অনুসন্ধান করিলে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইবে যে, জর্ম্মণ জাতির প্রতি-হিংসা প্রবৃত্তি এবং ফরাসি জাতির অযথা আত্মাভিমানই সেই যুদ্ধের মূল কারণ।

বাষ্পীয় শকট ও অর্ণব-যানের প্রভাবে ইউরোপে কি যুদ্ধবিগ্রহের কিছুমাত্র হ্রাস হইয়াছে? প্রত্যুত এখন এইরূপ বোধ হয় যেন যুদ্ধবিগ্রহের জন্যই বাষ্পীয় শকট প্রভৃতির সৃষ্টি; কারণ প্রায়ই দেখা যায় যেখানে আর কোন প্রয়োজন সাধিত হইতেছে না, সেখানে কেবল যুদ্ধবিগ্রহের সৌকর্য্যার্থে লৌহবর্ত্মের জাল বিস্তৃত হইতেছে। বরং এক্ষণে যেরূপ জ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, সেই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হত্যাসাধক নানাবিধ কৌশলময় যন্ত্রেরও সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। যতদিন ইউরোপে স্বার্থপরতার প্রাদুর্ভাব থাকিবে, যত দিন না সেখানে সমগ্র মানবজাতির প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ও মমতার উদয় হইবে, তত দিন যে তথা হইতে যুদ্ধবিগ্রহ একেবারে তিরোহিত হইবে এরূপ আশা আমরা কখনই করিতে পারি না। এই অনুরাগ এই মমতা ধর্ম্ম-নীতিরই অন্তর্ভূত। অতএব বকল সাহেব যে বলেন জ্ঞানের উন্নতিতেই যুদ্ধবিগ্রহ কমিয়াছে তাহা যুক্তি-সঙ্গত নহে। ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, কেবল বাষ্পীয় শকট প্রভৃতির বহুলতা হইলেই হয় না—জনসাধারণের হৃদয়ের উন্নতি সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। বাষ্পীয় শকট প্রভৃতি দ্বারা বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে গতিবিধির সুবিধা হইয়া পরস্পরের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে সৌহার্দ্দ্য বর্দ্ধিত হইতে পারে বটে—এবং এইরূপে জনসাধারণের হৃদয়ের উন্নতি সাধন-পক্ষে সহায়তা হইতে পারে সত্য, কিন্তু ইহা অন্যান্য উপায়ের মধ্যে একটী উপায় মাত্র। যদি এই সকল উপায়ে যুদ্ধবিগ্রহের উপশম হয়, তবে ইহার অব্যবহিত কারণ কি জানা

আবশ্যক; ধর্ম্ম-নীতিই যে ইহার অব্যবহিত কারণ তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। মনুষ্য সমাজে যে পরিমাণে অমঙ্গল সকল তিরোহিত হইয়া মঙ্গলের রাজ্য বিস্তৃত হয়, সেই পরিমাণে জনসমাজে প্রকৃত সভ্যতার উদয় হয়। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে ধর্ম্মনীতি ব্যতীত কেবল জ্ঞান দ্বারা জনসমাজের অমঙ্গল সকল দূরীকৃত হয় না, অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে জ্ঞান ও নীতির সামঞ্জস্য ব্যতীত জনসমাজে প্রকৃত সভ্যতারও অভ্যুদয় হয় না।

সুঃ

* ভানুসিংহের কবিতা।

মল্লার—

সজনি গো——
অঁধার রজনী ঘোর ঘন ঘটা
চমকত দামিনী রে।
কুঞ্জপথে সখি, কয়্‌সে যাওব
অবলা কামিনীরে॥ ধুয়া॥
উন্মদ পবনে যমুনা উথলত
ঘন ঘন গরজত মেহ।
দমকত বিদ্যুত বজ্র নিনাদত,
থর হর কম্পত দেহ॥
ঘন ঘন রিম্ ঝিম্, রিম্ ঝিম্, রিম্ ঝিম্,
বরখত নীরদ-রাশি।

অব সখি কয়সে যায়ব অবলা
কুঞ্জে কানুক পাশ॥
বোল ত সজনী এ দুরযোগে
কুঞ্জে নিরদয় কান।
দারুণ বাঁশী কাহে বজায়ত
রাধা রাধা নাম॥

সজনি—

মোতিম হারে বেশ বনাদে
সীঁথি লগাদে ভালে।
উরহি বিলোলিত শিথিল চিকুর মম
বাঁধহ মালতী মালে॥
নয়নে অঞ্জন রঞ্জহ সত্বর
অলত লগাদে পায়।
একলি যাওব যঁহি রে বাঁশী
রাধা রাধা গায়॥
হিয়া মাঝ সখি প্রেম দীপতহ
অঁধামে ক্যা হয় ডরলো।
শ্যাম ক ছোড়য় রাধা কবসে
একলি রহবে ঘর লো॥
গহন রয়নমে ন যাও বালা
নয়ল কিশোর-ক পাশ।
গরজে ঘন ঘন, বহু ডর থাওব
কহে ভানু তব দাস॥

* এই ব্রজগাথাগুলি হিন্দুস্থানী উচ্চারণে ও দীর্ঘ হ্রস্ব রক্ষা করিয়া সংস্কৃত ছন্দের নিয়মানুসারে না পড়িলে শ্রুতি-মধুর হয় না—প্রত্যুত হাস্যজনক হইয়া পড়ে।

মেহ——মেঘ
বরখত——বর্ষিতেছে
দুরযোগ——দুর্য্যোগ
উরহি বিলোলিত—বক্ষে আন্দোলিত
অলত——জ্বালতা
যঁহি——যথায়
দীপতহ——জ্বলিতেছে
রয়ন——রাত্রি
নয়ল——নবীন

উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে।

যখন বিবেচনা করি যে, এ প্রদেশে ইউরোপীয় সভ্যতা আসিয়া কি বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে, যখন বিবেচনা করি যে ইউরোপীয়দিগের গুণ সকল আমাদিগের দ্বারা অনুকৃত না হইয়া দোষ সকল অনুকৃত হইতেছে এবং যে লোকযাত্রা-নির্ব্বাহ-প্রণালী ইংলণ্ডের উপযুক্ত, এদেশে তাহা আরোপিত হইয়া কি অনিষ্ট সাধন করিতেছে, তখন আমার মনে হয় যে, উদোর বোঝা বেচারা বুদোর ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে তজ্জন্যই এইরূপ হইতেছে।

যখন দেখি যে, যৎকালে নিদাঘ-তাপের আতিশয্যে সমস্ত প্রকৃতি অবসন্ন, সমস্ত প্রাণী আকুল, মনুষ্যেরা ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে, তখন কোন ইঙ্গ-বঙ্গ ইংরাজী-পরিচ্ছদ আঁটিয়া কন্টে-স্ৃষ্টে সকরণ করিতেছেন, তথাপি তাহা পরিত্যাগ করিতেছেন না, তখন মনে হয় যে উদোর বোঝা বেচারা বুদোর ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে, তজ্জন্যই এরূপ হইতেছে।

যখন দেখি যে আমাদিগের দেশের ইংরাজী-নবিশেরা আমাদিগের জাতির যেন কোন সুখাদ্য নাই এই জন্য ইংরাজী অর্দ্ধপক্ক আমপ্রায় মাংস ও "সজীব" পনির ভক্ষণে রত হইতেছে, যখন দেখি যে, লোকে খানা খাইয়া তাহা গোপন করিবার চেষ্টায় কপট ব্যবহার করিতেছে, যখন দেখি বাঙ্গালী, হোটেলে আহার করিয়া হোটেলস্থ ইংরাজ অভ্যাগতদিগের হাস্যাস্পদ হইতেছে, যখন দেখি যে, বাঙ্গালীরা ইংরাজী প্রণালী-অনুসারে আহারে বসিয়া ইংরাজী শিষ্টাচারের কতই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া থাকে, যখন দেখি যে, যাহাদিগের পেটে ইংরাজী A অক্ষর নাই, তাহারা তাহাদিগের অজ্ঞাত ইংরাজী আহার দ্রব্য অঙ্গুলী দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া "এটা দেও ওটা দেও" বলে, যখন দেখি যে, তাহারা ইংরাজী শব্দ good health অজ্ঞাত থাকা প্রযুক্ত good hell বলিয়া মদ্যপান করে, তখন মনে হয় যে, উদোর বোঝা বেচারা বুদোর ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে তজ্জন্যই এইরূপ হইয়াছে।

যখন দেখি যে, লোকে স্বদেশীয় ভাষা অপেক্ষা বিদেশীয় ভাষা অনুশীলনের প্রতি অধিক মনোযোগ প্রদান করিতেছে, ঐ ভাষা আয়ত্ত করিবার মানসে অনেক বৎসর ক্ষেপণ করিতেছে, তথাপি প্রকৃত-রূপে আয়ত্ত করিতে পারিতেছে না; যখন দেখি যে,বাঙ্গালী ইংরাজের মত ইংরাজী লিখিতে ও কহিতে পারগ হইবার দুরাকাঙ্ক্ষায় কি কষ্ট না পাইতেছে; যখন দেখি যে,বিদেশীয় ভাষার কোন শব্দ-উচ্চারণে অশুদ্ধ প্রয়োগ ধৃত হইলে যেন কত অপকর্ম্ম করিয়াছে মনে করিয়া লোকে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়; অথচ বাঙ্গালায় অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করা শ্লাঘার বিষয় মনে করে; যখন দেখি যে, লোকে ইংরাজী ভাষায় অসংখ্য ভুল করিয়াও তাহাতে সামান্য পত্র লিখিবে

তথাচ দেশীয় ভাষায় উহা লিখিবে না; যখন দেখি,যে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সঙ্গে দশটা ইংরাজী শব্দ মিশাইয়া কথা কহেন, যখন শুনি যে,তাঁহারা আপনাদিগের ছাত্রকে বাঙ্গালায় দরজা দিতে না বলিয়া ইংরাজীতে 'give the door' বলেন; যখন বিবেচনা করি যে, এ-বিড়ম্বনার কারণ কি; তখন মনে হয় যে, উদোর বোঝা বেচারা বুদোর ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে তজ্জন্যই এইরূপ হইতেছে।

যখন দেখি, সন্তানদিগকে ইংরাজী বিদ্যা শিখাইবার জন্য লোকে অতিশয় আগ্রহবিশিষ্ট,ও তাহাদিগকে তৎপাঠে প্রবৃত্ত করাইয়া এত পরিশ্রম করাইতেছে যে, তাহাদিগের আর আহারের অবকাশ নাই,শারীরিক স্বাস্থ্য ও উন্নতির প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ নাই; যখন দেখি, বিদেশীয় ভাষা আয়ত্ত করিবার জন্য কলেজের ছাত্রেরা এত পরিশ্রম করিতেছে যে, তদ্দ্বারা তাহাদিগের দৃষ্টি ক্ষীণ হইতেছে, মস্তক ঘুরিতেছে, তথাপি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতেছে না ও নিবৃত্ত হইলেও চলে না, যখন বিবেচনা করি এ বিপদের কারণ কি, তখন মনে হয় যে, উদোর বোঝা বেচারা বুদোর ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে তজ্জন্যই এইরূপ হইতেছে।

যখন স্মরণ করি যে, সেকালের লোক অল্প অর্থে কিরূপ প্রফুল্লচিত্তে কাল কাটাইতেন, যখন বিবেচনা করি যে, এক্ষণে আমাদিগের অবাস্তব অভাব ও প্রয়োজন কত বৃদ্ধি পাইয়াছে, যখন বিবেচনা করি যে, জিনিস-পত্র ক্রমে কিরূপ দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে, যখন দেখি যে, উপজীবিকার উদ্বেগে লোকের হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যাইতেছে,ও ভবিষ্যতে কি হইবে এই ভাবনায় আকুল হইতেছে, যখন বিবেচনা করি যে, আমরা ত এক রূপে কাটাইলাম, ছেলে-পুলের দশা ইহার পর কি হইবে,যখন বিবেচনা করি যে, এ মহান বিপদের কারণ কি, তখন মনে হয় যে, উদোর বোঝা হতভাগ্য বুদোর ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে তজ্জন্যই এরূপ হইতেছে।

উদো যদি চেষ্টা করে বুদোর বোঝা কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব করিতে পারে কিন্তু সে দিকে মনোযোগ নাই। বরং তাহাকে সেই বোঝা আহ্লাদ-পূর্ব্বক বহন করাইতে ইচ্ছুক দেখা যায়। বুধো চেষ্টা করিলে অনুকরণের স্রোত অনেক পরিমাণে রোধ করিয়া সমাজের সারবত্তা ও নিজের কুশল রক্ষা করিতে পারে কিন্তু সেদিকে মনোযোগ নাই। উদোর ন্যায় পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সাহস-সম্পন্ন হইলে এবং তাহাদিগের ন্যায় দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিলে উদোর যে বোঝা বুদোর ঘাড়ে পড়িয়াছে, তাহা অনেক লাঘব হইতে পারে, কিন্তু সে দিকে বুদোর মনোযোগ নাই। এই জন্যই দেশ ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে।

বঃ—.

করুণা।

ভূমিকা।

গ্রামের মধ্যে অনূপকুমারের ন্যায় ধনবান আর কেহই ছিল না। অতিথিশালা নির্ম্মাণ, দেবালয় প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি নানা সৎকর্ম্মে তিনি ধনব্যয় করিতেন। তাঁহার সিন্দুক পূর্ণ টাকা ছিল, দেশ-বিখ্যাত যশ ছিল, ও রূপবতী কন্যা ছিল। সমস্ত যৌবন-কাল ধন উপার্জ্জন করিয়া অনূপ বৃদ্ধ বয়সে বিশ্রাম করিতেছিলেন। এখন কেবল তাঁহার একমাত্র ভাবনা ছিল যে, কন্যার বিবাহ দিবেন কোথায়। সৎপাত্র পান নাই ও বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র আশ্রয়স্থল কন্যাকে পরগৃহে পাঠাইতে ইচ্ছা নাই, তজ্জন্যও আজ কাল করিয়া আর তাঁহার দুহিতার বিবাহ হইতেছে না।

সঙ্গিনী অভাবে করুণার কিছুমাত্র কষ্ট হইত না, সে এমন কাল্পনিক ছিল, কল্পনার স্বপ্নে সে সমস্ত দিন-রাত্রি এমন সুখে কাটাইয়া দিত যে, মুহূর্ত্ত মাত্রও তাহাকে কষ্ট অনুভব করিতে হয় নাই। তাহার একটি পাখী ছিল, সেই পাখীটি হাতে করিয়া অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর পাড়ে কল্পনার রাজ্য নির্ম্মাণ করিত। কাঠবিড়ালীর পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটাছুটি করিয়া, জলে ফুল ভাসাইয়া, মাটির শিব গড়িয়া, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিত। এক একটি গাছকে আপনার সঙ্গিনী, ভগ্নী, কন্যা বা পুত্র কল্পনা করিয়া তাহাদের সত্য সত্যই সেই রূপ যত্ন করিত, তাহাদিগকে খাবার আনিয়া দিত, মালা পরাইয়া দিত, নানা প্রকার আদর করিত, এবং তাদের পাতা শুকাইলে, ফুল ঝরিয়া পড়িলে অতিশয় ব্যথিত হইত। সন্ধ্যাবেলা পিতার নিকট যা কিছু গল্প শুনিত, বাগানে পাখীটিকে তাহাই শুনান হইত। এই রূপে করুণা তাহার জীবনের প্রত্যূষ-কাল অতিশয় সুখে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার পিতা ও প্রতিবাসীরা মনে করিতেন যে, চির কালই বুঝি ইহার এইরূপে কাটিয়া যাইবে।

কিছু দিন পরে করুণার একটি সঙ্গী মিলিল। অনূপের অনুগত কোন একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মরিবার সময় তাঁহার অনাথ পুত্র নরেন্দ্রকে অনূপকুমারের হস্তে সঁপিয়া যান। নরেন্দ্র অনূপের বাটিতে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিত, পুত্রহীন অনূপ নরেন্দ্রকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। নরেন্দ্রের মুখশ্রী বড় প্রীতিজনক ছিল না, কিন্তু সে কাহারো সহিত মিশিত না, খেলিত না, ও কথা কহিত না বলিয়া ভাল মানুষ বলিয়া তাহার বড়ই সুখ্যাতি হইয়াছিল; পল্লীময় রাষ্ট্র হইয়াছিল যে, নরেন্দ্রের মত শান্ত শিষ্ট সুবোধ বালক আর নাই, এবং পাড়ায় এমন বৃদ্ধ ছিল না যে তাহার বাড়ীর ছেলেদের প্রত্যেক কার্য্যেই নরেন্দ্রের উদাহরণ উত্থাপন

না করিত। কিন্তু আমি তখনই বলিয়াছিলাম যে,"নরেন্দ্র তুমি বড় ভাল ছেলে নও।" কে জানে নরেন্দ্রের মুখশ্রী আমার কোন মতে ভাল লাগিত না। আসল কথা এই, অমন বালবৃদ্ধ গম্ভীর সুবোধ শান্ত বালক আমার ভাল লাগে না।

অনুপকুমারের স্থাপিত পাঠশালায় রঘুনাথ সার্ব্বভৌম নামে এক গুরুমহাশয় ছিলেন, তিনি নরেন্দ্রকে অপরিমিত ভাল বাসিতেন, নরেন্দ্রকে প্রায় আপনার বাড়িতে লইয়া যাইতেন এবং অনুপের নিকট তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন।

এই নরেন্দ্রই করুণার সঙ্গী, করুণা নরেন্দ্রের সহিত সেই পুষ্করিণীর পাড়ে গিয়া কাদার ঘর নির্ম্মাণ করিত, ফুলের মালা গাঁথিত, এবং পিতার কাছে যে সকল গল্প শুনিয়াছিল, তাহাই নরেন্দ্রকে শুনাইত, কাল্পনিক বালিকার যত কল্পনা সব নরেন্দ্রের উপরে ন্যস্ত হইল। করুণা নরেন্দ্রকে এত ভাল বাসিত যে, কিছুক্ষণ তাহাকে না দেখিতে পাইলে ভাল থাকিত না, নরেন্দ্র পাঠশালে গেলে সে সেই পাখীটি হাতে করিয়া গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিত, দূর হইতে নরেন্দ্রকে দেখিলে তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া সেই পুষ্করিণীর পাড়ে সেই নারিকেল গাছের তলায় আসিত, ও তাহার কল্পনারচিত কতকি অদ্ভুত কথা শুনাইত।

নরেন্দ্র ক্রমে কিছু বড় হইলে কলিকাতায় ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইল। কলিকাতার বাতাস লাগিয়া পল্লীগ্রামের বালকের কতকগুলি উৎকট রোগ জন্মিল। শুনিয়াছি স্কুলের বেতন ও পুস্তকাদি ক্রয় করিবার ব্যয় যাহা কিছু পাইত তাহাতে নরেন্দ্রের তামাকের খরচটা বেশ চলিত। প্রতি শনিবারে দেশে যাইবার নিয়ম আছে, কিন্তু নরেন্দ্র তাহার সঙ্গীদের মুখে শুনিল যে, শনিবারে যদি কলিকাতা ছাড়িয়া যাওয়া হয় তবে গলায় দড়ি দিয়া মরাটাই বা কি মন্দ? বালক বাটীতে গিয়া অনুপকে বুঝাইয়া দিল যে, সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন বাড়িতে থাকিলে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। অনুপ নরেন্দ্রের বিদ্যাভ্যাসে অনুরাগ দেখিয়া মনে মনে ঠিক দিয়া রাখিলেন যে, বড় হইলে সে ডিপুটি মাজিস্টর হইবে। তখন দুই এক মাস অন্তর নরেন্দ্র বাড়িতে আসিত, কিন্তু এ আর সে নরেন্দ্র নহে, পানের পিকে ওষ্ঠাধর প্লাবিত করিয়া, মাথায় চাদর বাঁধিয়া, দুই পার্শ্বের দুই সঙ্গীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া, কনষ্টেবলদের ভীতিজনক যে নরেন্দ্র প্রদোষে কলিকাতার গলিতে গলিতে মারামারি খুঁজিয়া বেড়াইত, গাড়িতে ভদ্রলোক দেখিলে কদলীর অনুকরণে বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিত, নিরীহ পান্থ বেচারীদিগের দেহে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া নির্দ্দোষীর মত আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিত, এ সে নরেন্দ্র নহে; অতি নিরীহ, আসিয়াই অনুপকে টীপ্ করিয়া প্রণাম করে, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, মৃদুস্বরে, নত মুখে, অতি দীন ভাবে উত্তর দেয় এবং যে পথে অনুপ সর্ব্বদা যাতায়াত করেন সেই খানে

একটি ওয়েব্‌ষ্টার ডিক্‌ষনারী বা তৎসদৃশ অন্য কোন দীর্ঘকায় পুস্তক খুলিয়া বসিয়া থাকে।

নরেন্দ্র বহুদিনের পর বাড়ি আসিলে করুণা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। নরেন্দ্রকে ডাকিয়া লইয়া কতকি গল্প শুনাইত, বালিকা গল্প শুনাইতে যত উৎসুক, শুনিতে তত নহে। কাহারো কাছে কোন নূতন কথা শুনিলেই যতক্ষণ না নরেন্দ্রকে শুনাইতে পাইত, ততক্ষণ উহা তাহার নিকট বোঝা-স্বরূপ হইয়া থাকিত। কিন্তু করুণার এই রূপ ছেলেমানুষীতে নরেন্দ্রের বড়ই হাসি পাইত, কখন কখন সে বিরক্ত হইয়া পলাইবার উদ্যোগ করিত। নরেন্দ্র সঙ্গীদের নিকটে করুণার কথা-প্রসঙ্গে নানাবিধ উপহাস করিত।

নরেন্দ্র বাড়ি আসিলে পণ্ডিত মহাশয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যগ্র হইয়া পড়েন। এমন কি, সেদিন সন্ধ্যার সময়েও গৃহ হইতে নির্গত হইয়া বাঁশঝাড়ময় পল্লীপথ দিয়া রাম নাম জপিতে জপিতে নরেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, নরেন্দ্রকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া নানাবিধ কুশল সংবাদ লইতেন। এই পণ্ডিতের কথা শুনিয়া দুই এক জন সঙ্গী নরেন্দ্রকে তাঁহার টিকি কাটিতে পরামর্শ দিয়াছিল, এবিষয় লইয়া গম্ভীর ভাবে অনেক পরামর্শ ও অনেক ষড়যন্ত্র চলিয়াছিল, কিন্তু দেশে নরেন্দ্রের তেমন দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল না বলিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের টিকিটি নির্ব্বিঘ্নে ছিল। এই রূপে দেশে আদর ও বিদেশে আমোদ পাইয়া নরেন্দ্র বাড়িতে লাগিল।

নরেন্দ্রের বাল্যকাল অতীত হইল। অনুপ এখন অতিশয় বৃদ্ধ, চক্ষে দেখিতে পান না, শয্যা হইতে উঠিতে পারেন না, এক মুহূর্ত্তও করুণাকে কাছ-ছাড়া করিতেন না; অনুপের জীবনের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে; তিনি নরেন্দ্রকে কলিকাতা হইতে ডাকাইয়া আনিয়াছেন; অন্তিম কালে নরেন্দ্র ও পণ্ডিত মহাশয়কে ডাকাইয়া তাঁহাদের হস্তে কন্যাকে সমর্পণ করিয়া গেলেন।

অনুপের মৃত্যুর পর সার্ব্বভৌম মহাশয় নিজে পৌরোহিত্য করিয়া, নরেন্দ্রের সহিত করুণার বিবাহ দিলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমি যাহা মনে করিয়াছিলাম তাহাই হইয়াছে; নরেন্দ্র যে কিরূপ লোক তাহা এত দিনে পাড়ার লোকেরা টের পাইল, আর হততাগিনী করুণাকে যে কষ্ট পাইতে হইবে তাহা এত দিনে তাহারা বুঝিতে পারিল, কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় দুয়ের কোনটাই বুঝিলেন না।

করুণা আজকাল কিছু মনের কষ্টে আছে। মনের উল্লাসে বিজন কাননে সে খেলা করিবে, বক্ষে করিয়া লইয়া পাখীর সঙ্গে কতকি কথা কহিবে, কোলের উপর রাশি রাশি ফুল রাখিয়া পাপড়ি ছড়াইয়া আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাইতে গাইতে মালা গাঁথিবে, যাহাকে

ভাল বাসে তাহার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া অস্ফুট আহ্লাদে বিহ্বল ও অস্ফুট ভাবে ভোর হইয়া যাইবে, সেই বালিকা বড় কষ্ট পাইয়াছে। তাহার মনের মত কিছুই হয় না; অভাগিনী যে নরেন্দ্রকে এত ভাল বাসে, যাহাকে দেখিলে খেলা ভুলিয়া যায়, মালা ফেলিয়া দেয়, পাখী রাখিয়া দিয়া ছুটিয়া আসে, সে কেন করুণাকে দেখিলে যেন বিরক্ত হয়? করুণা হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে কি বলিতে আসে সে কেন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মুখ ভার করিয়া থাকে? করুণা তাহাকে কাছে বসিতে কত মিনতি করে, সে কেন কোন ছল করিয়া চলিয়া যায়? নরেন্দ্র তাহার সহিত এমন নির্জ্জীব ভাবে এমন নীরস ভাবে কথাবার্ত্তা কয়, সকল কথায় এমন বিরক্ত ভাবে উত্তর দেয়, সকল কাজে এমন প্রভুভাবে আদেশ করে যে, বালিকার খেলা ঘুরিয়া যায় ও মালা গাঁথা সাঙ্গ হয় বুঝি, বালিকার আর বুঝি পাখীর সহিত গান গাওয়া হইয়া উঠে না!

মূল কথাটা এই, নরেন্দ্র ও করুণায় কখনই বনিতে পারে না; দুইজনে দুই বিভিন্ন উপাদানে নির্ম্মিত. নরেন্দ্র করুণার সেই ভালবাসার কতকি অসংলগ্ন কথার মধ্যে কিছুই মিষ্টতা পাইত না, তাহার সেই প্রেমে মাখানো অতৃপ্ত স্থির দৃষ্টি-মধ্যে ঢল ঢল লাবণ্য দেখিতে পাইত না, তাহার সেই উচ্ছ্বসিত নির্ঝরিণীর ন্যায় অধীর সৌন্দর্য্যের মিষ্টতা নরেন্দ্র কিছুই বুঝিত না। কিন্তু সরলা করুণা সে অত কি বুঝিবে? সে ছেলে বেলা হইতেই নরেন্দ্রের গুণ ছাড়া দোষের কথা কিছুই শুনে নাই। কিন্তু করুণার একি দায় হইল? তাহার কেমন কিছুতেই আশ মিটে না, সে আশ-মিটাইয়া নরেন্দ্রকে দেখিতে পায় না, সে আশ-মিটাইয়া মনের সকল কথা নরেন্দ্রকে বলিতে পারে না, সে সকল কথাই বলে অথচ মনে করে যেন কোন কথাই বলা হইল না।

এক দিন নরেন্দ্রকে বেশ পরিবর্ত্তন করিতে দেখিয়া করুণা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতেছ?" নরেন্দ্র কহিলেন—"কলিকাতায়।" "ক।—কলিকাতায় কেন যাইবে?" নরেন্দ্র ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল "কাজ না থাকিলে কখনো যাইতাম না। একটা বিড়াল-শাবক ছুটিয়া গেল, করুণা তাহাকে ধরিতে গেল, অনেক ক্ষণ ছুটাছুটি করিয়া ধরিতে পারিল না, অবশেষে ঘরে ছুটিয়া আসিয়া নরেন্দ্রের কাঁধে হাত রাখিয়া কহিল "আজ যদি তোমাকে কলিকাতায় যাইতে না দিই?" নরেন্দ্র কাঁধ হইতে হাত ফেলিয়া দিয়া কহিল "সর, দেখ দেখি আর একটু হলেই ডিক্যাণ্টারটি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আর কি?"

করুণা—"দেখ, তুমি কলিকাতায় যাইও না, পণ্ডিত মহাশয় তোমাকে যাইতে দিতে নিষেধ করেন।" নরেন্দ্র কিছুই উত্তর না দিয়া শিশ্ দিতে দিতে চুল আঁচড়াইতে লাগিলেন। করুণা ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল ও এক শিশি এসেন্স্ আনিয়া নরেন্দ্রের চাদরে খানিকটা ঢালিয়া

দিল। নরেন্দ্র কলিকাতায় চলিয়া গেলেন, করুণা দুই একবার বারণ করিল, কিছু হাঁ হুঁ না দিয়া লক্ষ্ণৌ ঠুংরি গাইতে গাইতে নরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন। যতক্ষণ নরেন্দ্রকে দেখা যায় করুণা চাহিয়া রহিল। নরেন্দ্র চলিয়া গেলে পর°সে বালিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিল। কিয়ৎক্ষণ কাঁদিয়া মনের বেগ শান্ত হইতেই চখের জল মুছিয়া ফেলিয়া পাখীটি হাতে করিয়া লইয়া অন্তঃপুরের বাগানে মালা গাঁথিতে বসিল।

বালিকা স্বভাবতঃ এমন প্রফুল্ল হৃদয় যে, বিষাদ অধিক ক্ষণ তাহার মনে তিষ্ঠিতে পারে না। হাসির লাবণ্যে তাহার বিশাল নেত্র দুটি এমন মগ্ন যে রোদনের সময়ও অশ্রুর-রেখা ভেদ করিয়া হাসির কিরণ জ্বলিতে থাকে। যাহা হউক্ করুণার চপল ব্যবহারে পাড়ার মেয়ে মহলে বেহায়া বলিয়া তাহার বড়ই অখ্যাতি জন্মিয়াছিল,"বুড়াধাড়ি মেয়ের" অভটা বাড়াবাড়ি তাহাদের ভাল লাগিত না। এ সকল নিন্দার কথা করুণা বাড়ির পুরাতন দাসী ভবির কাছে সব শুনিতে পাইত; কিন্তু তাহাতে তাহার আইল গেল কি? সে তেমনি ছুটাছুটি করিত, সে ভবির গলা ধরিয়া তেমনি করিয়াই হাসিত, সে পাখীর কাছে মুখ নাড়িয়া তেমনি করিয়াই গল্প করিত। কিন্তু এই প্রফুল্ল হৃদয় একবার যদি বিষাদের আঘাতে ভাঙ্গিয়া যায়, এই হাস্যময় অজ্ঞান শিশুর মত চিন্তাশূন্য সরল মুখশ্রী একবার যদি দুঃখের অন্ধকারে মলিন হইয়া যায়, তবে বোধ হয় বালিকা আহত লতাটির ন্যায় জন্মের মত ম্রিয়মাণ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, বর্ষার সলিল-সেকে, বসন্তের বায়ু-বীজনে আর বোধ হয় সে মাথা তুলিতে পারে না।

নরেন্দ্র অনুপের যে অর্থ পাইয়াছিলেন, তাহাতে পল্লিগ্রামে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিতেন। অনুপের জীবদ্দশায় ক্ষেতের ধান, পুকুরের মাছ ও বাগানের শাক্-সব্জি ফল মূলে দৈনিক আহার ব্যয় যৎসামান্য ছিল। ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব সম্পন্ন হইত, নিয়মিত পূজা অর্চ্চনা দান ধ্যান, ও আতিথ্যের ব্যয় ভিন্ন আর কোন ব্যয়ই ছিল না। অনুপের মৃত্যুর পর অতিথিশালাটি বারুর্চিখানা হইয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণগুলার জ্বালায় গোটা চারেক দরোয়ান রাখিতে হইল, তাহারা প্রত্যেক ভট্টাচার্য্যকে রীতিমত অর্দ্ধ চন্দ্রের ব্যবস্থা করিত, এবং প্রত্যেক ভট্টাচার্য্য বিধিমতে নরেন্দ্রকে উচ্ছিন্ন যাইবার ব্যবস্থা করিয়া যাইত। নরেন্দ্র গ্রামে নিজ ব্যয়ে একটি ডিস্পেন্সরী স্থাপন করিলেন। শুনিয়াছি নহিলে সেখানে ব্রাণ্ডি কিনিবার অন্য কোন সুবিধা ছিল না। গবর্ণমেণ্টের সস্তা দোকান হইতে রায় বাহাদুরের খেলানা কিনিবার জন্য ঘোড়দৌড়ের চাঁদা-পুস্তকে হাজার টাকা সই করিয়াছিলেন, এবং এমন আরো অনেক সৎকার্য্য করিয়াছিলেন যাহা লইয়া অমৃত বাজারের একজন পত্রপ্রেরক ভারি ধুমধাম করিয়া একপত্র লেখে,তাহার প্রতিবাদ ও তাহার পুনঃ প্রতিবাদের সময় অমূলক অপবাদ দেওয়া যে ভদ্র লোকের অকর্ত্তব্য ইহা লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হয়।

নরেন্দ্রকে পল্লীর লোকেরা জাতিচ্যুত করিল, কিন্তু নরেন্দ্র সে দিকে কটাক্ষপাতও করিলেন না, নরেন্দ্রের একজন সমাজ-সংস্কারক বন্ধু তাঁহার "মরাল করেজ" লইয়া সভায় তুমুল আন্দোলন করিলেন।

নরেন্দ্র বাগবাজারে এক বাড়ি ভাড়া করিয়াছেন ও কাশীপুরে এক বাগান ক্রয় করিয়াছেন। এক দিন বাগবাজারের বাড়িতে সকালে বসিয়া নরেন্দ্র চা খাইতেছেন। নরেন্দ্রের সকাল ও আমাদের সকালে অনেক তফাৎ,সে দিন শনিবারে কুঠি যাইবার সময় দেখিয়া আসিলাম, নরেন্দ্রের নাক ডাকিতেছে। দুইটার সময় ফিরিয়া আসিবার কালে দেখি, চোক্ রগড়াইতেছেন, তখনো আন্তরিক ইচ্ছা আর এক ঘুম দেন। যাহাই হউক্ নরেন্দ্র চা খাইতেছেন এমন সময়ে সমাজ-সংস্কারক গদাধর বাবু, কবিতা-কুসুম-মঞ্জরী-প্রণেতা কবিবর স্বরূপচন্দ্র বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রণম অভ্যর্থনা সমাপ্ত হইলে সকলে চেয়ারে উপবিষ্ট হইলেন।

নানাবিধ কথোপকথনের পর গদাধর বাবু কহিলেন "দেখুন মশায় আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের দশা বড় শোচনীয়।" এই সময়ে নরেন্দ্র শোচনীয় শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বরূপচন্দ্র বাবু কহিলেন 'Deplorable;' নরেন্দ্রের পক্ষে উভয় কথাই সমান ছিল, কিন্তু নরেন্দ্র এই প্রতিশব্দটি শুনিয়া শোচনীয় শব্দের অর্থটা যেন জল বুঝিয়া গেলেন। গদাধর বাবু কহিলেন "এখন আমাদিগের উচিত তাহাদের অন্তঃপুরের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দেওয়া।" অমনি নরেন্দ্র গম্ভীর ভাবে কহিলেন, কিন্তু এটা কতদূর হ'তে পারে তাই দেখা যাক্, তেমন সুবিধা পাইলে অন্তঃপুরের প্রাচীর অনেক সময় ভাঙ্গিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে বটে কিন্তু পুলিসের লোকেরা তাহাতে বড়ই আপত্তি করিবে, ভাঙ্গিয়া ফেলা দূরে থাক একবার আমি অন্তঃপুরের প্রাচীর লঙ্ঘন করিতে গিয়াছিলাম ম্যাজিস্ট্রেট তাতে আমার উপর বড় সন্তুষ্ট হয় নাই। অনেক তর্কের পর গদাধর ও স্বরূপে মিলিয়া নরেন্দ্রকে বুঝাইয়া দিল যে, সত্য সত্যই অন্তঃপুরের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিবার প্রস্তাব হইতেছে না, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, স্ত্রীলোকদের অন্তঃপুর হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া।

গদাধর বাবু কহিলেন "কত বিধবা একাদশীর যন্ত্রণায় রোদন করিতেছে, কত কুলীন পত্নী স্বামী জীবিত সত্ত্বেও বৈধব্য-জ্বালা সহ্য করিতেছে।" স্বরূপ বাবু কহিলেন— এ বিষয়ে আমার অনেক কবিতা আছে, কাগজওয়ালারা তার বড় ভাল সমালোচনা কোরেছে; দেখ নরেন্দ্র বাবু, শরৎ কালের জ্যোৎস্না-রাত্রে কখনো ছাতে শুয়েছ? চাঁদ যখন ঢল ঢল হাসি ঢাল্‌তে-ঢাল্‌তে আকাশে ভেসে যায় তখন তাঁকে দেখেছ? আবার সেই হাস্যময় চাঁদকে যখন ঘোর অন্ধকারে মেঘে আচ্ছন্ন করে ফ্যালে তখন মনের মধ্যে কেমন একটা কষ্ট উপস্থিত হয় তাকি কখন সহ্য কোরেছ? তা যদি কোরে থাক তবে বল দেখি স্ত্রীলোকের কষ্ট দেখ্‌লে

সেইরূপ কষ্ট হয় কি না?" নরেন্দ্রের সম্মুখে এতগুলি প্রশ্ন একে একে খাড়া হইল, নরেন্দ্র ভাবিয়া আকুল, অনেক ক্ষণের পর কহিলেন "আমার এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।" গদাধর বাবু কহিলেন "এখন কথা হচ্চে যে, স্ত্রীলোকদের কষ্ট মোচনে আমরা যদি দৃষ্টান্ত না দেখাই তবে কে দেখাইবে? এস, আজ থেকেই এবিষয়ের চেষ্টা করা যাক্।" নরেন্দ্রের তাহাতে কোন আপত্তি ছিল না, তিনি মনে মনে কেবল ভাবিতে লাগিলেন এখন কাহার অন্তঃপুরের প্রাচীর ভাঙ্গিতে হইবে? গদাধর বাবু কহিলেন "স্মরণ থাকতে পারে মোহিনী নামে এক বিধবার কথা সে দিন বলে ছিলুম, আমাদের প্রথম পরীক্ষা তাহার উপর দিয়াই চলুক্। এবিষয়ে যা কিছু বাধা আছে তা আলোচনা কোরে দেখা যাক্, যেমন এক একটা পোষা পাখী শৃঙ্খল-মুক্ত হলেও স্বাধীনতা পেতে চায় না, তেমনি সেই বিধবাটিও স্বাধীনতার সহস্র উপায় থাকিতেও অন্তঃপুরের কারাগার হইতে মুক্ত হইতে চায় না, সুতরাং আমাদের প্রথম কর্তব্য তাহাকে স্বাধীনতার সুমিষ্ট আস্বাদ জানাইয়া দেওয়া।" নরেন্দ্র কহিলেন সকল দিক ভাবিয়া দেখিলে এ বিষয়ে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকিতে পারে না। সে বিধবার ভরণ পোষণ বাস-স্থান ইত্যাদি সমুদয় বন্দোবস্তের ভার নরেন্দ্র নিজ স্কন্ধে লইতে স্বীকৃত হইলেন। ক্রমে ত্রিভঙ্গচন্দ্র, বিশ্বম্ভর, ও জয়েজয় বাবু আসিলেন, ক্রমে সন্ধ্যাও হইল, প্লেট্ আসিল, বোতল আসিল। গদাধর বাবু স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে অনেক বক্তৃতা দিয়া ও স্বরূপ বাবু জ্যোৎস্নারাত্রির বিষয়ে নানাবিধ কবিতাময় উদাহরণ প্রয়োগ করিয়া শুইয়া পড়িলেন, ত্রিভঙ্গচন্দ্র ও বিশ্বম্ভর বাবু স্খলিত স্বরে গান জুড়িয়া দিলেন, নরেন্দ্র ও জয়েজয় কাহাকে যে গালাগালি দিতে লাগিলেন বুঝা গেল না।

উৎসর্গ-গীতি।

জয়জয়ন্তি—তাল চৌতাল

তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ
তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ।
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে
এবীণা তোমারি গাইবে গান॥
যদিও এবাহু অক্ষম দুর্ব্বল
তোমারি কার্য্য সাধিবে।
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন
তোমারি পাপ নাশিবে॥
যদিও হে দেবি, শোণিতে আমার
কিছুই তোমার হবে না,
তবুও গো মাতা পারিতা' ঢালিতে
এক তিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে
নিভাতে তোমার যাতনা॥
যদিও জননি, যদিও আমার
এবীণার কিছু নাহিক বল।
কি জানি যদি মা একটি সন্তান
জাগি উঠে শুনি এবীণা-তান॥

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু বিরচিত—স্থষ্টি।
শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ বিরচিত—সাংখ্য দর্শন।

আত্ম-প্রত্যয়টি তত্ত্বজ্ঞানের প্রথম সোপান। অতঃপর আত্মার অতলস্পর্শ গভীরতা এবং জগতের অপরিসীম বিস্তার এ দুয়ের মধ্যে অপরিমেয় ভাবের যেরূপ মিল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে দুইকে একই সত্যের এপিট ওপিট মনে না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারা যায় না। সে সত্য এমনি যে, তাহাতে অতলস্পর্শ জ্ঞানের গভীরতা এবং অপরিসীম শক্তির বিস্তার উভয়ই একাধারে পাওয়া যায়।

আত্মপ্রত্যয় কিনা আত্মাতে বিশ্বাস, আপনার জ্ঞানেতে বিশ্বাস। আপনার জ্ঞানের উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে, নিকটের বস্তুকে যেমন সত্য বলিয়া বোধ হয়, দূরের বস্তুকেও তেমনি সত্য বলিয়া বোধ হয়; ক্ষুদ্র বস্তুকেও যেমন সত্য বলিয়া বোধ হয়, বৃহৎ বস্তুকেও তেমনি সত্য বলিয়া বোধ হয়; ইন্দ্রিয়-গোচর বস্তুকেও যেমন সত্য বলিয়া বোধ হয়, ইন্দ্রিয়ের অগোচর বস্তুকেও তেমনি সত্য বলিয়া বোধ হয়; সসীম বস্তুকেও যেমন সত্য বলিয়া বোধ হয়, অসীম বস্তুকেও তেমনি সত্য বলিয়া বোধ হয়। আপনার জ্ঞানের প্রতি আর্কিমীডিসের এমনি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, শুদ্ধ কেবল জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া, পৃথিবীকেও নড়াইতে পারা যায়, ইহা বলিতে তিনি সঙ্কুচিত হ'ন নাই। আপনার জ্ঞানের উপরে যাহাদের সেরূপ আস্থা নাই তাহারা জানে যে, কাষ্ঠ-লোষ্ট্রকেই নড়ানো যায়; পৃথিবী এত বড় প্রকাণ্ড, ইহাকে নড়ানো কোন কালেই কাহারো সাধ্যায়ত্ত হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, জ্ঞানের প্রতি যাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে তাঁহারা কাষ্ঠ-লোষ্ট্রকেও যেমন মনে করেন, পৃথিবীকেও তেমনি মনে করেন; ক্ষুদ্রকেও যেমন মনে করেন, বৃহৎকেও তেমনি মনে করেন; যাহাদের সেরূপ বিশ্বাস নাই, তাহারা ক্ষুদ্র বিষয়-সকলকে জ্ঞানের অধিকারায়ত্ত মনে করে, বৃহৎ বিষয়কে জ্ঞানের অধিকার-বহির্ভূত মনে করে। বৃহৎ ব্যাপার দেখিলেই তাহারা আপনার জ্ঞানকে বলে "সাবধান! ওদিকে যাইও না।" আপনার জ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস নিউটনের এমনি প্রবল ছিল যে, বৃক্ষচ্যুত ফল পৃথিবী-কর্তৃক আকৃষ্ট হয় দেখিয়া পৃথিবীও সূর্য্য-কর্তৃক আকৃষ্ট হয় ইহা বলিতে তিনি কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হ'ন নাই। আপন জ্ঞানের প্রতি যাহাদের অনাস্থা, তাহারা বলে, "হাঃ রাখিয়া দেও ও-সব অর্ব্বাচীনের কথা! কোথায় একটা বৃক্ষচ্যুত ফল আর কোথায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, দুই কি সমান হইল!" ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়ী ব্যক্তিরা নিকট বস্তুর উপরে যেমন আস্থা রাখে, দূর বস্তুর উপরে তেমন নহে; ক্ষুদ্র বস্তুর উপর যেমন আস্থা রাখে, বৃহৎ বস্তুর উপর তেমন নহে; জ্ঞানপ্রত্যয়ী অথবা আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তিরা দূর নিকট ক্ষুদ্র

বৃহৎ সকলকেই সমভাবে দেখেন। প্রামাণিক পণ্ডিত এদিকে বলেন যে "মনুষ্যের জন্য জগৎ" এ ভাবটি ছাড়িয়া দিয়া, জগতের নিয়ম-সকল নিরপেক্ষ-ভাবে আলোচনা কর; ওদিকে বলেন যে, বিজ্ঞানের পক্ষে সৌর জগৎ পর্য্যন্তই যথেষ্ট, তাহা অপেক্ষা আর অধিক উচ্চে উঠিবার প্রয়োজন করে না, কেন না সৌর জগতের বহির্ভূত প্রদেশের সঙ্গে মনুষ্যের কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। কমটির প্রথম অভিপ্রায় এই যে, মনুষ্যকে দূরে রাখিয়া জগতের নিয়ম-সকল যত আবিষ্কার করিতে পার ততই ভাল; তাঁহার দ্বিতীয় অভিপ্রায় এই যে, মনুষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিবে। প্রথম অভিপ্রায়টি দ্বিতীয় অভিপ্রায়ের সহিত স্পষ্টই মিলিতেছে না। এই ত এক অসঙ্গতি-দোষ। আর একটি দোষ এই যে, সৌরাতীত জগতের সঙ্গে মনুষ্যের কোন সম্পর্ক নাই যে, ইহার কোন প্রমাণ নাই, প্রমাণ সম্ভবেও না। সূর্য্যের সহিত পৃথিবীর সম্বন্ধ আছে, ইহাও যেমন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত, নাক্ষত্রিক জগতের সহিত সূর্য্যের সম্বন্ধ আছে, ইহাও তেমনি বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত। হর্শেল-নামক জ্যোতির্ব্বেত্তা প্রাচীন কালের নক্ষত্রাবলীর স্থান-নির্ণায়ক তালিকার সঙ্গে বর্ত্তমান কালের নক্ষত্রাবলীর স্থানের ঐক্য করিয়া দেখিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আকাশের একাংশে নক্ষত্রগণ পূর্ব্বাপেক্ষা কাছাকাছি হইয়া আসিতেছে, অপরাংশে তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা ফাঁক ফাঁক হইয়া পড়িতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন যে, সৌর জগৎ হর্কুলীস্-নামক নক্ষত্র-মণ্ডলের মধ্যগত কোন একটি স্থানের অভিমুখে চলিতেছে। তাঁহার পরে তিন চারি জন বিখ্যাত জ্যোতির্বিৎ ইহা স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সপ্তর্ষি-মণ্ডলের মধ্যস্থিত আল্সিওন্ নামক নক্ষত্রই সৌর-জগতের প্রদক্ষিণ-কেন্দ্র। এ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে জ্যোতির্বিদ্গণের যদিও অনেক মত-ভেদ আছে কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত যে, সেই নক্ষত্রের অনতিদূর-স্থিত কোন না কোন প্রদেশে উক্ত প্রদক্ষিণ-কেন্দ্র অবস্থিতি করিতেছে। অতএব সৌর জগতের সহিত পৃথিবীর যেমন সম্বন্ধ আছে, নাক্ষত্রিক জগতের সহিত সৌর-জগতের তেমনি সম্বন্ধ আছে, সুতরাং নাক্ষত্রিক জগতেরও পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ আছে, ইহাতে আর সংশয় নাই। যদিই বা সে সম্বন্ধ কি, তাহা আমরা স্পষ্ট দেখিতে না পাই, কিন্তু তাহা বলিয়া কি বিজ্ঞান সত্য নিরূপণে নিরস্ত হইবে? কম্‌টি নিজেই বলিয়াছেন The most important practical results continually flow from theories formed purely with scientific intent, and which have sometimes been pursued for ages without any practical result. A remarkable example is furnished by the beautiful researches of the greek geometers upon conic section, which after a long series of generations have renovated the science of

astronomy, and thus brought the art of navigation to a pitch of perfection which it could never have reached but for the purely theoretic enquiries of Archimedes and Apollonios. অতএব নিরপেক্ষ ভাবে বিজ্ঞান চর্চ্চা করা কর্ত্তব্য।

ইহা জানিয়াও কম্‌টি নাক্ষত্রিক জগৎকে বিজ্ঞান-রাজ্য হইতে স্বচ্ছন্দে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। আরো অনেক বিষয়কে তিনি বিজ্ঞান-রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। কম্‌টির শাস্ত্রে এইরূপ লেখে যে, যদি কোন বিষয় তাঁহার বিরোধী পক্ষে সহায়তা করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিজ্ঞান-রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইবে। কম্‌টির শিষ্যেরা এখন দেখিতেছেন যে, তিনি যে ঐরূপ লঘু পাপে গুরু দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন, বড় ভাল করেন নাই। তাঁহারা ইহাও বলেন যে, তত্ত্বজ্ঞান অপরাধ করিয়াছে তাহাকেই দ্বীপান্তরে পাঠাও, মনোবিজ্ঞানকেও তাহার সঙ্গে ধরা হয় কেন? কম্‌টির আধুনিক শিষ্যেরা মনোবিজ্ঞানকে যথোচিত সম্মান পুনঃসর পুনর্ব্বার বিজ্ঞান-রাজ্যে অভ্যর্থনা করিয়া আনিতেছেন। এমন কি তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিও তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সদয় ব্যবহার করিতেছেন। কম্‌টি বলেন মূল সত্য থাকিলেও থাকিতে পারে, না থাকিলেও না থাকিতে পারে। স্পেন্‌সর বলেন, মূল সত্য আছে ইহা সুনিশ্চিত, তবে কি না তাহা আমাদের জ্ঞানায়ত্ত হইতে পারে না। জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের ভবিষ্যৎ বাণী অনেকবার ফলিতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, কম্‌টির ভবিষ্যৎ বাণী প্রায়শই ব্যর্থ হইয়াছে। কাণ্ট্ ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন যে, আকাশের অমুক স্থানে একটি গ্রহ থাকা খুব সম্ভব; পরে পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে তাঁহার সে কথা অতি সত্য। এই রূপ গেটে নামক জর্ম্মনদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের অনেক ভবিষ্যৎ বাণী ফলিয়াছে। হর্ষেলের অনেক ভবিষ্যৎ বাণী ফলিয়াছে। কিন্তু কম্‌টির ভবিষ্যৎ বাণী সদ্য সদ্যই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। ফরাসীস্ রাজ্য চিরকাল ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য থাকিবে, এই যে তাঁহার গর্ব্বোক্তি তাহা কি ভয়ানক রূপে ব্যর্থ হইয়াছে! নাক্ষত্রিক জগৎকে তিনি বিজ্ঞানের অধিকার-বহির্ভূত করিয়া তুলিয়াছিলেন; এক্ষণে রশ্মি-নির্ব্বাচন-প্রণালী (Spectrum analysis) নূতন আবিষ্কৃত হওয়াতে নাক্ষত্রিক জগতের অনেকানেক জটিল তত্ত্ব জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের জ্ঞানায়ত্ত হইতেছে। তিনি মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের অযোগ্য বলিয়া একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন; তাঁহার চেলারাই মনোবিজ্ঞানের অনুশীলনে বিশেষ তৎপর হইয়াছেন। অতএব ইহা নিতান্ত অসম্ভব নহে যে, কম্‌টি যেমন পারমার্থিক হইতে দার্শনিক, দার্শনিক হইতে প্রামাণিক পদ্ধতিতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তেমনি তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যেরা প্রামাণিক হইতে উচ্চতর দার্শনিক, উচ্চতর দার্শনিক হইতে উচ্চতর পারমার্থিক পদ্ধতিতে উপনীত হইবেন।

উপরে যাহা দেখা গেল, তাহা হইতে

একটি উত্তম উপদেশ পাওয়া যাইতেছে। বিজ্ঞানের অধিকার এই পর্য্যন্ত, তাহার ও-দিকে নহে, এরূপ কথা যখন প্লেটোর সময় অবধি করিয়া কম্‌টির সময় পর্য্যন্ত ক্রমাগতই ব্যর্থ হইয়া আসিতেছে, তখন প্রামাণিক পণ্ডিতগণের বলা উচিত হয় কেবল এই, যে, বিজ্ঞান এ বিষয় ভাল করিয়া আয়ত্ত করিয়াছেন, ও বিষয় একাল পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিতে পারেন নাই,—এটি যেন তাঁহারা না বলেন যে, বিজ্ঞান এই বিষয়ই ক্রমাগত অনুশীলন করুন, ও বিষয় কোন কালে আয়ত্ত করিতে পারিবেন না, সুতরাং ছাড়িয়া দিউন।

প্রকৃত কথা এই যে, জ্ঞানের অধিকারকে অল্পের মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া রাখা একটি অসাধ্য ব্যাপার। পৃথিবীতে যে-সকল প্রাকৃতিক নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়, বিজ্ঞান সে-সমস্ত সৌর-জগতে বিস্তার করিতে সঙ্কোচ করেন নাই, এবং সৌর-জগতে যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় সে-সমস্ত নাক্ষত্রিক জগতে বিস্তার করিতেও ত্রুটি করেন নাই। বিজ্ঞান ক্রমশই ব্যাপক হইতে ব্যাপক নিয়ম উদ্ধার করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিশেষ কোন সৃষ্টি, যেমন মনুষ্য-সৃষ্টি,—তাহার নিয়ম যেমন সেই বিশেষ-সৃষ্টি অপেক্ষা ব্যাপক, সেইরূপ নির্ব্বিশেষে বলা যাইতে পারে যে সৃষ্টির নিয়ম সৃষ্টি অপেক্ষা ব্যাপক। বিশেষ-সৃষ্টির নিয়ম যেমন তাহার কারণ পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি-শীল সেইরূপ সাধারণতঃ সৃষ্টির নিয়ম সৃষ্টির কারণ পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি-শীল। মনুষ্য-সৃষ্টির যে নিয়ম তাহার ব্যাপ্তি উক্ত সৃষ্টির কারণ পর্য্যন্ত; সেই যে কারণ তাহাও কার্য্য-বিশেষ, সুতরাং তাহারও সৃষ্টি-নিয়মের ব্যাপ্তি তাহার কারণ পর্য্যন্ত; এই রূপ নিম্ন সোপান হইতে উচ্চ সোপানে ক্রমশই সৃষ্টি-নিয়মের ব্যাপ্তি দেখা যাইতেছে। পুনশ্চ মনুষ্য জীব জন্তু উদ্ভিদ্‌কে এক জাতি বলিয়া ধরিলে, সমস্তেরই সৃষ্টির নিয়ম যেমন পৃথিবীরূপ কারণেতে বর্ত্তমান ছিল বলিয়া প্রতীতি হয়; সেইরূপ আবার জীব জন্তু উদ্ভিদ্ ও পৃথিবীকে এক-জাতি বলিয়া ধরিলে তাহার সৃষ্টির নিয়ম সূর্য্যরূপ কারণেতে বর্ত্তমান ছিল বলিয়া প্রতীতি হয়; ইত্যাদি যেমন, তেমনি ভূতাদি* হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সমস্ত সৃষ্টিকে যদি এক-জাতি বলিয়া ধরা যায়, তবে তৎসমস্তের সৃষ্টি-নিয়ম কোথায় বর্ত্তমান থাকা উচিত? এই খানে জগতের নিয়ন্তা না মানিলে কোন মতেই চলে না।

* ভূতাদি কিনা আদিভূত। নৈহারিক-মত (Nebular theory) লাপ্লাস্ প্রভৃতি বড় বড় নৈজ্ঞানিক পণ্ডিত-গণের মত। মধ্যে এক সময় সে মত জ্যোতির্বিদ্‌গণের অগ্রাহ্য হইয়াছিল। ইহার কারণ এই যে, তৎপূর্ব্বে যাহা নক্ষত্র নীহার (Nebulæ) বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল, হর্ষেলের বড় দূরবীক্ষণে তাহা দূর দূরান্তরস্থিত নক্ষত্র রাশির সমষ্টি বলিয়া সপ্রমাণ হয়। এখন আবার (Spectrum analysis) রশ্মি-নির্ণাচন প্রণালীর সাহায্যে পূর্ব্বমত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখনকার মত এইরূপ যে, স্থল-বিশেষে তারকাগণের সমষ্টিকে নীহার বলিয়া ভ্রম হইয়াছে, এই বলিয়া নৈহারিক জগৎ যে নাই, তাহা নহে। এখনকার বিজ্ঞান এতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছে যে, কোন্‌টি নক্ষত্র-মণ্ডল আর কোন্‌টিই বা নীহার-মণ্ডল ইহা রশ্মি পরীক্ষা দ্বারা ধরা পড়িতে পারে। উক্ত পরীক্ষায় এইরূপ স্থির হইয়াছে যে, সুদূর আকাশের স্থল-বিশেষে নক্ষত্র-মণ্ডল এবং স্থল বিশেষে নীহার-মণ্ডল দুইই আছে।

পৃথিবী পর্য্যন্তই জ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট সৌর-জগতে কাজ নাই, অথবা সৌর-জগৎই জ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট নাক্ষত্রিক জগতে কাজ নাই, অথবা নাক্ষত্রিক জগৎ পর্য্যন্তই জ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট, তাহার ও-দিকে আর কাজ নাই, এ কথা বলিয়া যেমন জ্ঞানকে ধরিয়া রাখা যায় না, জগৎ পর্য্যন্তই জ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট, তাহার ওদিকে আর কাজ নাই, এ প্রকার স্তোক-বাক্যেও জ্ঞানকে ভুলাইয়া রাখিতে পারা যায় না। বৃক্ষের গুঁড়িতে কেবল রস-সঞ্চালন হইবে শাখাতে নহে, শাখাতেই হইবে প্রশাখাতে নহে, শাখা প্রশাখাতেই হইবে পত্রেতে নহে, পত্রেতেই হইবে পুষ্পেতে নহে, পুষ্পেতেই হইবে ফলেতে নহে, বিশ্বরাজ্যে এরূপ অবিচার কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। একটি শাখালম্বিত আম্র-ফলের পরমাণু যে নিয়মে তাহার ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, মনুষ্যের শরীরস্থিত পরমাণু যে নিয়মে শরীরাভ্যন্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়, সৌর-জগৎও সেই নিয়মে অপরিমেয় আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রকৃতির নিকট বড় ছোট নাই, দূর নিকট নাই, প্রকৃতির যে-সকল মূল নিয়ম, তাহা ছোটোতে যেমন বড়তেও তেমনি, দূরেও যেমন নিকটেও তেমনি, সর্ব্বত্রই তাহা সমবৎ, কোথাও তাহার ব্যভিচার নাই। কম্‌টি আপনার ক্ষুদ্র বিজ্ঞান-রাজ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতির বিজ্ঞান-রাজ্য হইতে কাহাকেও তিনি বহিষ্কার করিয়া দিতে পারেন না। প্রকৃতির নিয়ম সৌর-জগতে যেমন, নাক্ষত্রিক জগতেও তেমনি, জগতের আদি অন্ত মধ্য সমুদায় ব্যাপিয়া প্রকৃতির নিয়ম স্থিতি করিতেছে। প্রকৃতির মূল নিয়ম ইহার বেলায় খাটিবে, উহার বেলায় খাটিবে না, ছোটোর বেলায় খাটিবে, বড়র বেলায় খাটিবে না, বিশেষ-সৃষ্টির বেলায় খাটিবে, সাধারণ-সৃষ্টির বেলায় খাটিবে না, এরূপ হইতে পারে না। এই জন্যই বলি যে, মনুষ্য-সৃষ্টির নিয়ম যদি মনুষ্য অপেক্ষা ব্যাপক হইল, পৃথিবী-সৃষ্টির নিয়ম যদি পৃথিবী অপেক্ষা ব্যাপক হইল, তবে কি ভূতাদি সৃষ্টির নিয়ম ভূতাদি-অপেক্ষা ব্যাপক হইবে না, সমুদায় সৃষ্টির নিয়ম সমুদায় সৃষ্টি অপেক্ষা ব্যাপক হইবে না। ব্যাপকতাই নিয়মের প্রাণ; নিয়মের ব্যাপকতা নষ্ট হইলে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হয়। নিয়ম যেমন ব্যাপক, জ্ঞানও তেমনি ব্যাপক, এজন্য জ্ঞান-ভিন্ন নিয়ম আর কোন কিছুর আশ্রয়ে থাকিতে পারে না, কেন না আর যাহার আশ্রয়ে থাকিবে, তাহাতে করিয়া তাহার ব্যাপকতা নষ্ট হইবে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে, নিয়মিত ঘটনা হইতে নিয়মের দিকে যাওয়া, আর জড়-জগতের আবির্ভাব হইতে জ্ঞানের দিকে যাওয়া, উভয়ের মধ্যে বস্তুতঃ কোন প্রভেদ নাই। এ কাগজের এপিট আছে মানিলেই ওপিট আছে মানিতে হইবে, নিয়ম আছে মানিলেই তাহার মূলাধার মানিতে হইবে—নিয়ন্তা মানিতে হইবে।

কম্‌টির কথা গুলি যেরূপ বল-গর্ভ সেরূপ যুক্তিগর্ভ নহে; কিন্তু স্পেন্সর প্রভৃতি পণ্ডিত-

গণ যাঁহারা তাঁহার পরবর্ত্তী তাঁহাদের কথা-গুলি যুক্তিতে পরিপূর্ণ, ইহা দেখিবা-মাত্রই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। স্পেন্‌সরের মূল সিদ্ধান্ত এই যে, মূল সত্য একে-বারেই জ্ঞানের অধিকার-বহির্ভূত, কিন্তু মূল সত্য আছে ইহা নিঃসংশয়। স্পেন্‌সর এই যে একটি কথা বলিয়াছেন, ইহা যদি তিনি কেবল পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত সকলের পরীক্ষা হইতে পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহার অত বড় কথাটা একেবারেই মাটি হইয়া যাইতেছে। কম্‌টি বিজ্ঞানের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত দেখিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, অদ্যাপিও ত কেহ নাক্ষ-ত্রিক জগতের বিশেষ সংবাদ বলিতে পারিল না, তবে মিথ্যা কেন আর ও-সকল লইয়া মাথা ঘুরাণো। অতএব উহাকে একেবা-রেই বিজ্ঞান-রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া যাউক। তাঁহার এই রূপ বলপ্রকা-শের এক্ষণে দর্পচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। হইবেই ত। পূর্ব্ব-বৃত্তান্তের পরীক্ষাই তাঁহার এক-মাত্র বল, কোন নূতন বৃত্তান্ত আবিষ্কৃত হইয়া তাঁহার প্রতিবল হইয়া দাঁড়াইতে কতক্ষণ;—তাহাই ঘটিয়াছে। অতএব অতীত কালের কোন পরীক্ষা-পরম্পরাই, নূতন প্রকারের পরীক্ষার একেবারেই পথ-রোধ করিতে পারে না। স্পেন্‌সর যদি তাহার ঐ সিদ্ধান্তটিকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন তবেই আমরা তাঁহার কথা শিরোধার্য্য করিব, নচেৎ উহা সহস্র পূর্ব্ব-বৃত্তান্তের অনুযায়ী হইলেও আমরা তাহাতে কোন আস্থা রাখিব না—নূতন প্রকারের কোন বৃত্তান্ত আবিষ্কৃত হইতে কতক্ষণ! তবে যদি স্পেন্‌সর বলেন যে, মূল সত্য বুদ্ধির আয়ত্তাধীন নহে, কিন্তু আছে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ. তবে আমাদের বক্তব্য এই যে, ঐ প্রকার স্বতঃসিদ্ধ সত্য আরো অনেক গুলি আছে। যথা, মূল সত্য আছে ইহা যেমন সত্য, মূল সত্য অসীম ইহাও তেমনি সত্য, মূল সত্য অতলস্পর্শ গভীর অন্তরতর অন্তরতম, ইহাও তেমনি সত্য।

এই খানেই অবরোহ-প্রণালীর সূত্রপাত হইল। আপেক্ষিক সত্য মাত্রই মূল সত্যকে অপেক্ষা করে।

মূল-সত্য আমাদের বুদ্ধির অগোচর ইহা সত্য, কিন্তু মূল সত্যের অস্তিত্বের প্রতি আর কাহারো কোন সংশয় হইতে পারে না। কেন না এপিট থাকিলেই ওপিট থাকা চাই, গৃহীতা থাকিলেই দাতা থাকা চাই, আপেক্ষিক সত্য থাকিলেই মূল-সত্য থাকা চাই। অতএব স্থির হইল যে, মূল-সত্যের অস্তিত্ব কোন মতে অস্বীকার করিতে পারা যায় না। মূল-সত্য অবলম্বন পূর্ব্বক স্থূল সত্য সমর্থন করাই অবরোহ-প্রণালীর কার্য্য। অগ্রে মূল-সত্যের মূল উপাধি গুলি প্রদর্শন করি।

প্রথমতঃ আপেক্ষিক সত্যের নিয়ম যত আছে তন্মধ্যে—এইটি সর্ব্বাগ্রগণ্য যে, বাহ্য বস্তু জ্ঞানাভ্যন্তরে যে ভাবে প্রকাশ পায় জ্ঞানের বাহিরেও তাহা ঠিক সেই ভাবে থাকিতে পারে না। কেননা বাহ্য বস্তুর গুণ যাহা আমাদের জ্ঞান-সাপেক্ষ, এবং বাহ্য বস্তুর সত্তা যাহা আমাদের জ্ঞান-নিরপেক্ষ, উভ-

দুই এক হইতে পারে না। জীব যদি আদবেই না থাকে, তথাপি বাহ্য বস্তুর সত্তা থাকিবে, কিন্তু গুণ-গ্রাহী ব্যক্তির অভাব প্রযুক্ত তাহার গুণ অব্যক্তে পরিণত হইবে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, যাহা বস্তুর প্রকাশ জীবের জ্ঞানকে অপেক্ষা করে। আমাদের জ্ঞানের নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রকাশ পায়, তাহা সত্তা নহে, তাহা সত্তার অভিব্যক্তি মাত্র, সত্তার ভাণ মাত্র, সত্তার আভাস মাত্র। অভিব্যক্তি দুই প্রকার, বহির্বস্তুর গুণ এবং অন্তঃকরণের অবস্থা। ফুলের সুগন্ধ ঘ্রাণ করিবামাত্র, অন্তঃকরণে সুখোদয় হইল, এ স্থলে ফুলেতে সুগন্ধি গুণের অভিব্যক্তি এবং অন্তঃকরণে সুখের অভিব্যক্তি, একই সময়ে ঘটিতেছে।

কতক-খানি আকাশ জুড়িয়া বাহ্য বস্তুর গুণ অভিব্যক্ত হয়। ফুলের প্রত্যেক অংশ অপরাংশের বাহিরে অবস্থিতি করিতেছে, এবং তাহার সর্ব্বাংশ ব্যাপিয়া সৌরভ-গুণ অবস্থিতি করিতেছে। আকাশ-ব্যাপ্তি ভিন্ন বাহ্য বস্তুর গুণ অভিব্যক্ত হইতে পারে না। অন্তঃকরণে যখন অবস্থা-বিশেষের অভিব্যক্তি হয়, তখন তাহা আকাশে নয় কিন্তু কালেতেই হইয়া থাকে। দুঃখাবস্থার পরে যখন সুখাবস্থা উদিত হয়, তখন এরূপ মনে হয় না যে, দুঃখের অবস্থা আত্মার একাংশ, সুখের অবস্থা আত্মার অপরাংশ; ইহাই মনে হয় যে, দুঃখের অবস্থাকে অভিভূত করিয়া সুখের অবস্থা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। একাংশের বাহিরে অপরাংশ এ ভাব আকাশের; এক অবস্থার পরিবর্ত্তে অপর অবস্থা, যথা অতীতাবস্থার পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান অবস্থা, এ ভাব কালের; এইরূপে দেশকালে যাহা কিছু অভিব্যক্ত হয়, সমুদায়ই আপেক্ষিক সত্য, মূল-সত্য দেশ-কালের অতীত। পুষ্পের সুগন্ধ, এবং অন্তঃকরণের সুখ, দুয়ের কোনটিকে আমরা মূল-সত্য বলিতে পারি না; কেন না বাহ্য বস্তুর গুণ-অভিব্যক্তি কতক পরিমাণে মনোযোগের অপেক্ষা করে, এবং অন্তঃকরণের অবস্থা পরিবর্ত্তন কতক পরিমাণে বহির্বস্তুর অপেক্ষা করে। উক্ত উভয় প্রকারের অভিব্যক্তিকেই আমরা অবশ্য সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, কিন্তু উহার কোনটিকেই মূল-সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। অন্তঃকরণের অভিব্যক্তি হইতে বহির্বস্তুর অভিব্যক্তি এত যে ভিন্ন, তথাপি উভয়কেই আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি। ইহাও কতক সত্য, উহাও কতক সত্য, সম্পূর্ণ সত্য ইহাও নয় উহাও নয়; উভয়ই আপেক্ষিক সত্য। যে সত্যের অধিষ্ঠান-প্রভাবে ইহাও সত্য হইয়াছে, উহাও সত্য হইয়াছে, সেই সত্যই মূল-সত্য। এক সেই সত্যের ভাব যাহা আমাদের আত্মাভ্যন্তরে আছে, তাহার সঙ্গে যাহার যত মিল হয়, তাহাকে সেই পরিমাণে সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করি; এবং অন্য কোন সত্যের সহিত সেই মূল-সত্যের ভাব সম্পূর্ণ-রূপে সংলগ্ন হয় না বলিয়াই আর সকল সত্যকে আমরা আংশিক সত্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়া থাকি। মূল-সত্যকে যদি না মানা যায়, তবে আপেক্ষিক সত্যও সম্পূর্ণ-রূপে অসত্য হইয়া দাঁড়ায়। সত্য আদবেই

নাই এইরূপ দাঁড়ায়। জলই যদি নাই তবে ঘোলা জল কিরূপে থাকিবে; পূর্ণ সত্যই যদি নাই তবে অপূর্ণ সত্য কিরূপে থাকিবে।

এক্ষণে আপেক্ষিক সত্যের সহিত মূল সত্যের কি রূপ ভেদাভেদ তাহা নির্ণয় করা যাইতেছে। ক এবং খ এই দুইটিকে মনে কর যেন আপেক্ষিক সত্য। ক-য়েতে এমনি একটি সত্য আছে যাহা খ-য়েতে নাই; খ-য়েতে এমনি একটি সত্য আছে যাহা ক-য়েতে নাই। কিন্তু মূল-সত্য যেহেতু উভয়েরই মূলবর্ত্তী এ জন্য ক-য়ে যে সত্য আছে তাহা মূল সত্যে আছে, কিন্তু ক-য়ে সত্যের অভাব যেটি আছে তাহা মূল-সত্যে নাই; এইরূপ আবার খ-য়ে যে সত্য আছে তাহা মূল-সত্যে আছে কিন্তু খ-য়ে সত্যের অভাব যেটি আছে তাহা মূল-সত্যে নাই। ক-য়েতেও যেমন খ-য়েতেও তেমনি সত্যও আছে সত্যের অভাবও আছে, কিন্তু মূল-সত্যে সত্য ভিন্ন সত্যের অভাব কিছু মাত্র নাই। এ জন্য মূল-সত্যের "পরিপূর্ণ" এই একটী উপাধি। মূল-সত্যের বাহিরে যদি দ্বিতীয় মূল-সত্য থাকে, তবে একেতে অন্যের সম্পূর্ণ অভাব প্রযুক্ত দাঁড়ায় এই যে, উভয়ের কোনটিই মূল-সত্য নহে—উভয়ই আপেক্ষিক সত্য। অতএব মূল-সত্য এক অদ্বিতীয় এবং পরিপূর্ণ। এক অদ্বিতীয়, এই উপাধিতে মূল-সত্যের অপরিসীম ব্যাপ্তি বুঝায়, এই বুঝায় যে, তাঁহার ন্যায় দ্বিতীয়ের একেবারেই স্থানাভাব। যদি মূল সত্যের সহিত সমস্ত জগতের তুলনা করিতে ইচ্ছা কর, তবে জগতের প্রত্যেকাংশ হইতে সত্য লইয়া তাহার সমষ্টি এক দিকে ধর, এবং প্রত্যেক অংশ হইতে সত্যের অভাব লইয়া তাহার সমষ্টি অপর দিকে ধর; পূর্ব্বোক্ত সত্য-সমষ্টি মূল-সত্যে আছে, শেষোক্ত অভাব-সমষ্টি মূল-সত্যে নাই। জগতের মধ্যে সত্যও আছে সত্যের অভাবও আছে, মূল-সত্যে সত্য ভিন্ন সত্যের অভাব মূলেই নাই; এ জন্য মূল-সত্যে ভাবসূচক লক্ষণ ভিন্ন কোন অভাব-সূচক লক্ষণ স্থান পাইতে পারে না। এই হেতু জড়-উপাধি অপেক্ষা জ্ঞান-উপাধি মূল সত্যের সহিত অধিকতর সংলগ্ন হয়। কেন না জড়েতে সত্যের কেবল এক পিট মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়, জ্ঞেয় ভাবটি মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়; জ্ঞানেতে জ্ঞেয়-ভাব ত আছেই, তদ্ব্যতীত এমন একটি সত্য তাহাতে আছে, যাহা জড়েতে সম্ভবে না; কি? না জ্ঞাতৃ-ভাব। জ্ঞান-পদার্থ আপনার নিকট জ্ঞাতও বটে জ্ঞাতাও বটে, জড়বস্তু জ্ঞাতই হইতে পারে, জ্ঞাতা হইতে পারে না; এই রূপ জড় পদার্থ অপেক্ষা জ্ঞান-পদার্থে সত্যের ভাবাধিক্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এবং জ্ঞান পদার্থ অপেক্ষা জড় পদার্থে সত্যের অভাবাধিক্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই জন্য জড়-লক্ষণ অপেক্ষা জ্ঞান-লক্ষণ পূর্ণতার লক্ষণ। জড় অপেক্ষা আমাদের আত্মা সত্যে পরিপূর্ণ,—জীবাত্মার এই যে পূর্ণভাব ইহা আপেক্ষিক মাত্র। প্রকৃত পূর্ণ-ভাব এক অদ্বিতীয় মূল সত্য ভিন্ন আর কাহারো হইতে পারে না। জড় হইতে আত্মার দিকে চলিলে আমরা পূর্ণতার দিকে

চলি, এই মাত্র কারণে আমরা পূর্ণ সত্যকে আত্মারও অন্তরাত্মা বলিয়া, পরমাত্মা বলিয়া, সম্বোধন করিয়া থাকি। এক অদ্বিতীয় ব-লাতে মূল-সত্যে যেমন সত্যের অসীম ব্যাপ্তি প্রতিপন্ন হয়, সেই রূপ পূর্ণ পরমাত্মা বলাতে তাঁহাতে সত্যের অসীম প্রগাঢ়তা প্রতিপন্ন হয়।

উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে যে মূল-সত্য আত্মার অন্তরাত্মা। এ বিষয়টি আর একটু বি-বৃত করিয়া বলা প্রয়োজন বোধ হইতেছে। জড় এবং আত্মা উভয়কে পরস্পর তুলনা করিয়া দেখ, দেখিবে যে, জড়-পদার্থে যে কিছু সত্য আছে, সকলই জ্ঞেয়-ভাবের সত্য, এবং তাহাতে যে সত্যটির অভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা জ্ঞাতৃ-ভাবের সত্য। জড়-পদার্থের ঐ যে সত্যভাব, ঐ যে জ্ঞেয়-ভাব, তাহা আত্মাতেও আছে; কিন্তু জড় পদার্থের ঐ যে সত্যভাব, জ্ঞাতৃ-ভাবের ঐ যে অভাব, তাহা আত্মাতে নাই; জড়-পদা-র্থের ন্যায় আত্মাতে শুদ্ধ যে কেবল জ্ঞেয়-ভাবটি আছে,-তাহা নহে, তা'ছাড়া আর একটী ভাব আছে, সে ভাব জ্ঞাতৃভাব। জড়-বস্তুতে কেবল জ্ঞেয়-ভাবের সত্য আছে, আ-ত্মাতে জ্ঞেয়-ভাব এবং জ্ঞাতৃভাব দুই ভাবের সত্য আছে। অতএব জড় পদার্থ যদি এক গুণ সত্য হয়, আত্মা তবে দ্বিগুণ সত্য, তা-হাতে সন্দেহ মাত্র নাই। জড় পদার্থের ঐ যে এক-গুণ সত্যভাব, তাহা আত্মাতে আছে, কিন্তু আত্মার ঐ যে দ্বিগুণ সত্যভাব, তাহা জড় পদার্থে নাই। পরমাত্মার সহিত জীবা-ত্মার তুলনা করিয়া ঐ রূপ বলা যাইতে পারে যে, জীবাত্মার ঐ যে দ্বিগুণ সত্যভাব, তাহা পরমাত্মাতে আছে, কিন্তু জীবাত্মাতে সত্যের অভাব যে-টি আছে, সে অভাবটি পরমাত্মাতে নাই। এক জীবাত্মা অন্য জীবা-ত্মাকে এবং জড়-জগৎকে অপেক্ষা করে, আবার জড়োপাধি-সমেত সকল জীবাত্মা মূল-সত্য পরমাত্মাকে অপেক্ষা করে; জীবাত্মাতে এই যে নিরবলম্ব ভাবের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়, পরমাত্মাতে তাহা নাই। যাহা বলা হইল, তাহা সংক্ষেপে এই:—

জড়েতে——জ্ঞেয় ভাব মাত্র—এক গুণসত্য।

জীবাত্মাতে—{ জ্ঞেয় ভাব / জ্ঞাতৃ ভাব } দ্বিগুণ সত্য।

পরমাত্মাতে—{ জ্ঞেয়ভাব / জ্ঞাতৃভাব / অসীম ভাব } অসীম সত্য।

জড় যেমন—বস্তু, জীবাত্মাও তেমনি—বস্তু; কিন্তু জড় আত্মা নহে, জীবাত্মা আত্মা; জড় যেমন—বস্তু, পরমাত্মাও তেমনি—বস্তু; জীবাত্মা যেমন—আত্মা, পরমাত্মাও তেমনি—আত্মা; কিন্তু জীবাত্মা নিরবলম্ব পরিপূর্ণ আত্মা নহে, পরমাত্মা নিরবলম্ব পরি-পূর্ণ মহান্ আত্মা। জড় অপেক্ষা জীবাত্মা পরমাত্মার নিকটবর্ত্তী, এ-জন্য জীবাত্মার মধ্য দিয়াই পরমাত্মার অনুসন্ধান করা শ্রেয়:কল্প। পরমাত্মা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান দুই প্রকার,—ভাবাত্মক এবং অভাবাত্মক। জীবাত্মা যেমন—আত্মা, পরমাত্মা তেমনি—আত্মা, এইটি ভাবাত্মক জ্ঞান। পরমাত্মা অসীম অনাদ্যন্ত নিরবলম্ব, এইটি অভাবাত্মক জ্ঞান। শরীর মন রূপ আপনার ক্ষুদ্র পরি-

সবের মধ্যে জীবাত্মা এক, জীবাত্মা বিগুণ সত্য, জীবাত্মা নিয়ন্তা; পরমাত্মা সর্ব্বতোভাবে এক, সর্ব্বতোভাবে সত্য, সর্ব্বতোভাবে নিয়ন্তা, এইটুকু স্পষ্টরূপে আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। কিন্তু নিরবলম্ব-ভাব যে কিরূপ ভাব, অসীম-ভাব যে কিরূপ ভাব, অতলস্পর্শ-ভাব যে কিরূপ ভাব, ইহা কোন কালেই আমরা জ্ঞানায়ত্ত করিতে পারিব না। এই শেষোক্ত অভাবাত্মক জ্ঞান এইরূপ যে, মূল-সত্য আছে, ইহা নিশ্চিত জানিয়াও, কোথাও তাঁহার অন্ত না পাইয়া—জানি না বলিতে বাধ্য হয়। পরমাত্মা-বিষয়ক অভাবাত্মক জ্ঞানের এইরূপ নতশির ভাব দেখিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে ভাবাত্মক জ্ঞান যেটুকু আমাদের আছে, তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা অতীব অন্যায়। উচিত এই যে, ভাবাত্মক এবং অভাবাত্মক উভয়-বিধ জ্ঞানকেই এক-যোগে আমরা পরমাত্মার প্রতি পরিচালনা করি। তাঁহাকে যে অংশে আমরা আত্মা রূপে হৃদয়ঙ্গম করি, সে অংশে আমাদের প্রীতিবৃত্তি চরিতার্থ হয়, এবং যে অংশে মহান্ অনাদ্যনন্ত অচিন্ত্য অনির্ব্বাচ্য রূপে হৃদয়ঙ্গম করি, সে অংশে আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা চরিতার্থ হয়; এই দুই ভাবের যোগে ঈশ্বরের উপাসনা করিলে সমগ্রভাবে তাঁহার উপাসনা করা হয়।

অতঃপর পরমাত্মা আত্মা, এই ভাবাত্মক সত্যটি অবলম্বন করিয়া তাঁহার সৃষ্টির নিয়ম অন্বেষণ করা যাইতেছে। এইরূপ অন্বেষণ প্রণালীকেই অবরোহ-প্রণালী বলে।

শারদ জ্যোৎস্নায়

ভগ্ন হৃদয়ের গীতোচ্ছ্বাস।

আবার, আবার, শুনা রে আবার,
পীযূষ-ভরা সে প্রেমের গান,
আবার, আবার, সে রবে আমার,
মাতিয়ে উঠুক অবশ প্রাণ!

সুমধুর সুরে বাঁধ্ রে বীণা,
পঞ্চমে চড়ায়ে ললিত তান,
আবার, আবার, সে রবে আমার,
মাতিয়ে উঠুক অবশ প্রাণ!

মাতিয়ে উঠুক অবশ পরাণ,
নাচিয়ে উঠুক হৃদয় আজ;
জোছনা-হাসিনী এমন যামিনী,—
বিষাদের মাথে পড়ুক বাজ!

"জোছনা হাসিনী, এমন যামিনী,"
প্রতিধ্বনি দিল সকল দিক্,
দিগঙ্গনা মেলি, দিল করতালি,
কুহু কুহু করি উঠিল পিক্!

ভাবে উছলিল যমুনার জল,
কুমুদের মুখে হাসি না ধরে,
হরষে পাপিয়া, আকাশ ভাসিয়া,
ধরিল সে গীত মধুর স্বরে!

ভ্রমর ভূতলে, ফুল-দলে দলে
গুন্ গুন্ রবে ধরিল তান,
"জোছনা-হাসিনী, এমন যামিনী"
দিশি দিশি এই উঠিল গান!

কর কর শশি, সুধা বরিষণ!
মিটাও মিটাও চকোর-আশ,
ফুটাও ফুটাও কুমুদের বন,
পরাও জগতে রজত বাস!

"সব-ই অকারণ, বৃথাই জীবন,
জীবন কেবলি যাতনা সার—"
ধিক্ ও কথায়, শুনিতে কে চায়,
কবির কাঁদুনি সহেনা আর!

জোছনা-হাসিনী, এমন যামিনী—
এমন সরস, এমন শশী,
আবার ভূতলে, যমুনার জলে,
কত ভাঙা চাঁদ প'ড়েছে খসি!

লহরী লীলায়, নেচে নেচে যায়,
নেচে নেচে যায় তারকাকুল!
লতাপাতা গুলি, নাচে হেলি দুলি,
ঘুম ঘুম আঁখি মেলিল ফুল!

ডাগর ডাগর, ফুটেছে টগর,
গোলাপ প্রলাপ বাড়ায় প্রাণে,
চামেলির ফুল, হেসেই আকুল,
কেতকী কত কি কুহক জানে!

শেফালিকা বেলা, করে কত খেলা,
মৃদুল পবন সহায় তায়,
মৃদুল পরশে, অলস-আবেশে
ঢুলে ঢুলে পড়ে এ ওর গায়!

বাঁধ্ তবে বীণা, আরো তুলে বাঁধ্,
নিখাদে চড়ায়ে ললিত তান,
আবার আবার, সে রবে আমার,
মাতিয়ে উঠুক অবশ প্রাণ!

এই সে চাঁদিমা বিমান উজলে,
উজলে ত আজি আমারি তরে,
আমারি ত লাগি, হইয়ে সোহাগী,
বহিছে যমুনা পুলক ভরে!

বিষাদের ঘোর কেন রবে তবে,
ভাবনায় কেন দলিত হ'ব,
চাহে না পৃথিবী, চাহিনা পৃথিবী,
আপনার ভাবে আপনি র'ব!

আমার হৃদয় আমারি হৃদয়,
বেচিনে ত তাহা কাহারো কাছে,
ভাঙা-চোরা হোক্, যা-হোক্ তা হোক্,
আমার হৃদয় আমারি আছে!

চাহিনে কাহারো আদরের হাসি,
ভ্রূকুটীর কারো ধারিনে ধার,
মায়া-হাসিময় মিছে মমতায়,
ছলনে কাহারও ভুলিনে আর!

কাহারো ছলনে আর নাহি ভুলি
জলিয়া পুড়িয়া হয়েছি খাক্,
তাদের সোহাগ, তাদের বিরাগ
তাদের আদর তাদেরি থাক্!

বাঁধ্ তবে বীণা, আরো তুলে বাঁধ্,
নিখাদে চড়ায়ে ললিত তান,
আপনার মন আপনারি ঠাঁই,
আপনারি ভাবে ভাসুক প্রাণ।

থাক্ থাক্ বীণা, শুনিতে চাহি না,
মরম-বিধুনি ও সব গান,
শোন শোন শোন কোকিল উদিকে,
ধরেছে কেমন মধুর তান!

ক্ষণেক দাঁড়াও যমুনা! যমুনা!
পিউ পিউ ওই পাপীয়া গায়;
আকাশ পাতাল, সে রবে মাতাল,
আকাশ পাতাল অঘোর প্রায়!

গাও গাও, পাখি, আমোদের গান!
মৃদুল পবন, মাতিয়ে বও!
আয় লো যমুনা বহিয়ে উজান!
আজ শশি! তুমি হেথাই রও!

নিশি তুমি! আজ হয়োনা প্রভাত,
ভামুর মাথায় পড়ুক বাজ,
কাঁদায়ে চকোরে, ফেলিয়ে আমারে,
মধুর যামিনী, যেয়োনা আজ॥

বঙ্গ সাহিত্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রথমেই ষ্টুয়ার্ট্ মিলের সঙ্গে আমাদের বিসম্বাদটা মিটাই। তাহা হইলেই আমাদের গন্তব্য পথটা নিষ্কণ্টক হইয়া পড়িবে। ভাবোদ্দীপক-বাক্যের সহিত কবিতার প্রভেদ নিরূপণ করিতে গিয়া মিল বলেন যে "উদ্দীপনা-বাক্য আমরা প্রকাশ্যভাবে শুনিয়া থাকি, আর কবিতা আমরা লুকাইয়া শুনি। উদ্দীপনা-বাক্য বলিতে গেলেই শ্রোতৃমণ্ডলীর উপস্থিতি মনে হয়, কিন্তু কবিতার বিশেষ লক্ষণ এই যে, বাহিরে কেহ শুনিতেছে কি না, এ বিষয়ে কবি সম্পূর্ণ বীতচেতন থাকেন।" * মিলের কাছে এরূপ অসঙ্গত কথা কখনই আমরা প্রত্যাশা করি নাই। "কেহ শ্রোতা আছেন কি না, এ বিষয়ে

* "——We should say that eloquence is heard, poetry is overheard. Eloquence supposes an audience, the peculiarity of poetry appears to us to lie in the poet's utter unconciousness of a listener."
Mill's Discussions and dissertations Vol. I.

কবি সম্পূর্ণ বীতচেতন থাকেন"—এ কথা আমরা কেমন করিয়া স্বীকার করিব? জগদ্বিখ্যাত মহাকাব্যগুলি দেখিলে কি মিলের কথার সার্থকতা থাকে? বাল্মীকি তাঁহার রামায়ণের প্রারম্ভেই বলিতেছেন, "পাঠক, এক্ষণে সেই সমাস-সন্ধি ও প্রকৃতি-প্রত্যয়-যোগসম্পন্ন দোষ-বিরহিত প্রসাদ-গুণোপেত বাক্য-সঙ্কলিত ঋষিপ্রণীত রাম-চরিত ও রাবণবধ শ্রবণ কর।"* গ্রীকদিগের মনোরঞ্জন করিবার জন্যই অন্ধ হোমর তাঁহার ইলিয়াড রচনা করিয়া নগরের পথে পথে গাহিয়া বেড়াইতেন। অগষ্টস্ সিজ-রের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ রোমান-দিগের চক্ষে প্রীতিকর করিবার জন্যই বর্জিল তাঁহার ইনিয়াড রচনা করিয়াছিলেন। কাল-প্রবাহে আরও একটু নামিয়া আসিলে মিলটনকৃত প্যারাডাইজ লষ্ট আমাদের চক্ষে পড়ে। এই কাব্যের প্রথম সর্গেই কবি দিব্য-আত্মাকে নিবেদন করিতেছেন যে, ঈশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ্য প্রতিপন্ন করাই তাঁহার কাব্যের মুখ্য অভিপ্রায়। সেই মহাকাব্যের সপ্তম সর্গে আবার কবি দেবী ইউরেনীয়াকে বন্দনা করিয়া বলিতেছেন যে, "হে দেবি! তুমিই আমাকে উপযুক্ত শ্রোতৃমণ্ডলী সংগ্রহ করিয়া দাও—তাহাদের সংখ্যা অল্প হইলেও আমার দুঃখ নাই।" এই সকল প্রমাণ সত্ত্বেও আমরা কেমন করিয়া মিলের সহিত এক বাক্যে বলিব যে "বাহিরে কেহ শুনিতেছে কি না, এ বিষয়ে কবি সম্পূর্ণ বীতচেতন থাকেন।"

* শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুবাদিত রামায়ণ

কিন্তু মিলের কথা এখনও শেষ হয় নাই। তাঁহার উপরি-উক্ত মতটী সমর্থন করিবার জন্য তিনি কবিতাসমূহ মুদ্রাঙ্কিত ও প্রচারিত হওয়ার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া আরও বলেন, "সকল কবিতাই আত্মগত উক্তিমাত্র। কিন্তু আমরা যাহা এক সময়ে আপনা আপনি বলি, অন্য সময়ে তাহা পরের নিকটে বলিতে পারি; যাহা আমরা এক সময়ে নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিয়াছি, তাহা আমরা অন্য সময়ে অন্যের সম্মুখে প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু প্রকৃত কবিতাতে অন্যের দৃষ্টি যে আমাদের উপর আছে, এরূপ জ্ঞানের চিহ্ন মাত্রও থাকিবে না। যখন কোন কবি, অন্যের নিকট তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিতে যান, যখন তাঁহার বাক্যবিন্যাস বাক্যবিন্যাসেরই উদ্দেশে নহে, যখন তাহা একটী স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যের উপায় মাত্র—অর্থাৎ যখন তিনি আপন মনের ভাব প্রকাশ করিয়া অন্যের মনোভাব বা বিশ্বাস বা ইচ্ছাতে কোনরূপ বিকার উৎপাদন করিতে চাহেন, যখন তাঁর আত্মভাব প্রকাশটী ঐরূপ উদ্দেশ্য দ্বারা, ঐরূপ অন্যের মনে সংস্কার উৎপাদনের ইচ্ছা দ্বারা রঞ্জিত হয়, তখন তাহাকে আর কবিতা বলিব না, তখন তাহা উদ্দীপনা-বাক্য হইয়া পড়ে।"* এখন

* All poetry is of the nature of soliloquy. (But) what we have said to ourselves we tell to others afterwards; what we have said or done in solitude we may voluntarily reproduce when we know that other eyes are upon us. But no trace of consciousness that other eyes are upon us must be visible in the work itself. When he turns round and

দেখা যাক্, মহাত্মা মিলের একথা গুলি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মহাকাব্য সমূহের ইতিবৃত্ত দ্বারা কত দূর সমর্থন করা যাইতে পারে। বাল্মীকির রামায়ণ ও হোমরের ইলিয়াড্—এ উভয়েরই সম্পর্কে প্রকৃত ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন, সুতরাং রামায়ণ ও ইলিয়াড্‌কে তর্কভূমি হইতে অপসৃত করিয়া বর্জ্জিলের ইনিয়াড্ লইয়া আমরা মিলের মতটী খণ্ডন করিতে চেষ্টা পাইতেছি।

অগষ্টস্ সিজর যখন রোম রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন রোমের আপামর সকলেই সাধারণ-তন্ত্রপ্রিয় ছিল। জুলিয়স্ সিজরের হত্যাকাণ্ডেই তাহাদের এই আসক্তির জলন্ত প্রমাণ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সুতরাং অগষ্টস্ সিজর রাজা হইতে পারিলেও পুরবাসীদের হস্তে বিষম বৈরিতার আশঙ্কা তাঁহার মনে জাগরূক ছিল। সেই আশঙ্কা অপনোদনার্থে তিনি বর্জ্জিলকে একখানি কাব্য রচনা করিতে বলেন। বর্জ্জিল ইনিয়াড্ লেখেন। কবি এই কাব্যে ইহাই প্রচার করেন যে, অগষ্টস্ সিজর দেবী বিনস্-প্রসূত ইনিয়সের বংশোদ্ভব, সুতরাং রাজ-সিংহাসনে তাঁহার ন্যায্য অধিকারই ছিল; বিশেষতঃ অগষ্টস্ সিজর যেরূপ সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন, তাহাতে তিনি যে রাজা হইয়া কেবল দেবদেব জুপিটারের একটী অঙ্গীকার সিদ্ধ করিতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই সকল জানিয়া শুনিয়াও কি আমরা বলিতে পারি যে, ইনিয়াড্-খানি লোক-রঞ্জন-রূপ উদ্দেশ্য বিরহিত আত্মগত উক্তি মাত্র? যদি কেহ এমন বলেন যে, কবির নিগূঢ় উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, আমাদের তাহা জানিবার কোন অধিকার নাই, প্রচারিত কাব্যগ্রন্থখানিই দেখিতে আমাদের অধিকার, যদি সেই কবিতার অন্তরের প্রকাশ্য বা গূঢ় স্থানে অন্য সংক্রান্ত কোন উদ্দেশ্য উপলব্ধ না হয়, তাহা হইলে সে কবিতাকে আমরা কবির আত্মগত উক্তি ব্যতীত আর কি বলিতে পারি? মিল ত আপনিই বলিয়াছেন যে, "এক সময়ে যাহা কবি আপনি ভাবেন, অন্য সময়ে তাহা তিনি পরের কাছে প্রকাশ করিতে পারেন." সুতরাং বর্জিলের এক সময়কার আত্মগত উক্তিমাত্র সময়ান্তরে অন্যের কাছে ইনিয়াড্ রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্জ্জিলের মুখ্য উদ্দেশ্য অগষ্টস্ সিজরের মনোরঞ্জন হইতে পারে; কিন্তু যখন বর্জ্জিল ইনিয়াড্ কাব্যখানি রচনা করিতে গিয়া আপনার কল্পনার তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছিলেন, যখন তিনি আপনার ভাবোচ্ছ্বাসে আপনিই উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছিলেন, তখন তাঁর রোমের কথাও তাঁহার মনে ছিল না, অগষ্টস্ সিজরের অনুরোধও তাহার মনে ছিল

addresses himself to another person, when the act of utterance is not itself the end, but a means to an end,—viz by the feelings he himself expresses to work upon the feelings, or upon the belief or the will of another, when the expression of his emotion, or of his thoughts tinged by his emotions is tinged also by that purpose, by that desire of making an impression on another mind, then it ceases to be poetry and becomes eloquence. Do.

না, তিনি আপনার মনে আপনিই আপনা-হারা হইয়াছিলেন।

মিলের কথার মর্ম্মার্থ বোধ হয় ইহা অপেক্ষা আর বিশদ রূপে ব্যক্ত হইতে পারে না; এখন মিলের কথা আনিয়া এই-রূপে প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইতেছি;—ইনিয়াডের ষষ্ঠ সর্গে ইনিয়াস্ প্রেত-লোকে অধিষ্ঠিত হইলেন। সেখানে তাঁহার পিতা ইঙ্কাইসিসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পুত্রবৎসল ইঙ্কাইসিস্ ইনিয়াসকে সঙ্গে লইয়া তথাকার নানাপ্রকার বিস্ময়কর ব্যাপার প্রদর্শন করিলেন, এবং ভবিষ্যতে যাঁহারা রোম রাজ্যে মহাবীরপুরুষ রূপে অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহাদিগের পরিচয় দিতে লাগিলেন। কেবল জুলিয়স ও অগষ্টসেরই অসামান্য গুণ-কীর্ত্তনে ক্ষান্ত না হইয়া তিনি আর একটী যুবা পুরুষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ঐ যে পরমসুন্দর যুবা পুরুষটীকে দেখিতেছ, উনি ট্রোজন বংশের গরিমাস্থল ও রোম রাজ্যের অহঙ্কার-রূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন। উনি জীবদ্দশায় সকলের ভক্তি-ভাজন ও জীবনান্তে সকলের পূজিত হইবেন। উনি অল্প বয়সে ধর্ম্মভাব, অপ্রতিহত বীর্য্য, ও অপ্রতিহত সত্য নিষ্ঠার দর্পণ স্বরূপ হইবেন। সমর ক্ষেত্রে অরাতি নিপাতে উনি অদ্বিতীয় বল-বিক্রম প্রকাশ করিবেন।"—আমরা হেঁয়ালী-ছলে পাঠককে জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই যুবা পুরুষটি কে? আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, পাঠক যাহাকে মনে করিতেছেন, ইনি তিনি নন। ইনি দেবতা-সদৃশ অগষ্টস সিজরের দেবতা-স্বরূপা সহোদরা অক্টেভিয়ার পুত্র মার্সিলস! ইহাকে লইয়াই ভর্জিল প্রায় চল্লিশ পংক্তি অপব্যয় করিয়াছেন, অথচ রোমের এত শত বীরপুরুষের গুণ-কীর্ত্তন-মধ্যে পম্পে বা ব্রুটসের নাম কোথাও উল্লেখ নাই কেন? কারণ তাঁহারা জুলিয়স সিজরের বিপক্ষ ছিলেন। অ্যাণ্টনির নাম কোথাও উল্লেখ নাই কেন? কেন না তিনি অগষ্টস সিজরের বিপক্ষ ছিলেন। এখনো কি আমরা বলিতে পারি যে, ইনিয়াড্-খানি উদ্দেশ্য-বিরহিত কবির আত্মগত উক্তিমাত্র? যে কবিতার প্রত্যেক গ্রন্থিতে, প্রত্যেক উপগ্রন্থিতে, প্রত্যেক কল্পনাময়ী বর্ণনাতে লোকরঞ্জন-রূপ উদ্দেশ্যটী আজ্বলামান রহিয়াছে, তাহা কি কবির আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের তরঙ্গ মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি?

যদি এই সূত্রে আমরা মহাকবিদের নাটকের কথা উল্লেখ করি, তাহা হইলে মিল কি উত্তর দিবেন? হ্যামলেটে যে সকল নাটক-অভিনয় সম্বন্ধে উপহাস ও উপদেশ আছে, ম্যাকবেথে ষ্টুয়ার্ট্ বংশের যে গুণগরিমা কীর্ত্তিত আছে, মেরী ওয়াইব্স্ অফ্ উইণ্ডসরে, স্যার্ লিউসীর প্রতি যে সকল ব্যঙ্গ পরিহাস লক্ষিত আছে, মিড্সমর্ নাইট্স্ ড্রীমে কটাক্ষচ্ছলে এলিজাবেথের যে প্রশংসা-বাদ ও স্কটলণ্ডের হতভাগিনী মেরীর প্রতি এলিজাবেথের প্রীতিকর যে সকল ঈষৎ বিদ্রূপ আছে, সে-সকল দেখিয়া কে মনে করিতে পারে যে, সে-সকল উদ্দেশ্য-বিরহিত কবির আত্মগত উক্তি মাত্র?

আমরা কিছু এমন বলি না, যে মিল যে

বলিয়াছেন, যে, "আমরা এক সময়ে আপনা আপনি যাহা ভাবি, পরক্ষণে তাহা অন্যের নিকট বলিতে পারি"——একথা অসঙ্গত, কারণ কালিদাসের মেঘদূত বা মিলটনের লিসিডস্ বা শেলির এডোনিয়স্ বা টেনিসনের ইনমেমোরিয়ম ইত্যাদি অনেকগুলি কবিতা উক্ত কথার সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে; কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐরূপ কবিতা না হইলে কি কিছুই কবিতা নহে? আমরা তাহা বলি না।

যদি কেহ এমন বলেন যে, কবির উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন, কিন্তু যখন তিনি একটী কবিতা রচনা করিতেছেন, যখন তিনি আপনার ভাবোচ্ছ্বাসে প্রধাবিত হইয়া ছুটিতেছেন, তখন আর তাঁহার বহির্জগতের কথা মনে থাকে না। অর্থাৎ মার্সিলসের গুণকীর্ত্তন কবির উদ্দেশ্যগত হইলেও যখন তিনি সেই গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন, যখন তিনি তাঁহার কল্পনার পক্ষ সঞ্চালন পূর্ব্বক দেবতাদিগের সমস্ত গুণ আহরণ করিয়া মার্সিলসকে সাজাইতেছেন, তখন আর তাঁহার বহির্জগতের কথা মনে নাই। আমরা উত্তরে এই বলিব যে, বহির্জগৎ হইতে ওরূপ আত্ম-অপসারণা কবিতার হৃদয়গত একটী বিশেষ লক্ষণ হইতে পারে না, কেন না ভাবোদ্দীপনা যাঁহাদের লক্ষ্য, সেই বাগ্মীরাও অন্যকে মাতাইতে গিয়া আপনারা মাতিয়া উঠেন। আপনারা না মাতিলে অন্যকেও ভাল করিয়া মাতান যায় না, বাগ্মীরা যে পরিমাণে আপনা-হারা হইয়া আপনাদিগকে অন্যের স্থলে আরোপিত করিতে পারেন, সেই পরিমাণে তাঁহাদের বক্তৃতা সফল হয়। মহাকাব্য-লেখক সুকবিরাও আপনা হারা হইয়া আপনারা অন্যের স্বভাবসিদ্ধ হইয়া নায়ক নায়িকার চরিত্র বর্ণন করেন। উপস্থিত-ভাবী কবি-ওয়ালা এবং কথকেরাও আপনারা মাতিয়ে তবে অন্যকে মাতাইতে পারেন। অতএব দেখা যাইতেছে, আপনা হারা হওয়া সম্বন্ধে কবিতা ও উদ্দীপনা বাক্যের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই! তাহা হইলে মিলের মতব্যাখ্যানে কবিতার প্রকৃতি-বিষয়ে আমরা কি বিশেষ জ্ঞান লাভ করিলাম? যাহা করিলাম, তাহা ত আরো ভ্রমাত্মক। মিল উদ্দীপনা-বাক্যের সঙ্গে আর কবিতার সঙ্গে একটী সূক্ষ্ম প্রভেদ রক্ষা করিতে গিয়া এই রূপ প্রলাপ-সাগরে ডুবিয়াছেন। ক্যাটিলাইনের বিরুদ্ধে সিসিরো যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা সমস্তই কবিতাময় উদ্দীপনা, আবার ফ্রান্স্ দেশে "লা মার্সেইএল্" বলিয়া যে গীতটী আছে, তাহা সমস্তই জ্বলন্ত উদ্দীপনাময় কবিতা। এবিষয়ে আর অধিক কিছু বলিব না, কারণ কবিতার লক্ষণ নিরূপণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য, উদ্দীপনার সহিত তাহার প্রভেদ নিরূপণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কবিতার লক্ষণ প্রকৃত প্রস্তাবে নিরূপিত হইলে, অন্য অন্য বিষয়ের সহিত তাহার যে সৌসাদৃশ্য ও প্রভেদ, তাহা আপনা আপনি দেদীপ্যমান হইয়া উঠিবে।

ক্রমশঃ

মেঘনাদ-বধ কাব্য।

(মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত)

লক্ষ্মী ইন্দ্রকে আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন।

কহিলেন স্বরীশ্বর ; "এ ঘোর বিপদে
বিশ্বনাথ বিনা, মাতঃ কে আর রাখিবে
রাঘবে ? দুর্ব্বার রণে রাবণ-নন্দন।
পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত,
ততোধিক ডরি তারে আমি।"

ইন্দ্র ইন্দ্রজিতের নিকট শতবার পরাজিত হইতে পারেন, কিন্তু তথাপি

"পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত,
ততোধিক ডরি তারে আমি,"

একথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইতে পারে না। ইন্দ্রজিৎকে বাড়াইবার জন্য ইন্দ্রকে নত করা অন্যায় হইয়াছে ; প্রতিনায়ককে নত করিলেই যে নায়ককে উন্নত করা হয়, তাহা নহে ; হিমালয়কে তুমি অপেক্ষা উচ্চ বলিলে হিমালয়ের উচ্চত্ব প্রতিভাত হয় না, সকল পর্ব্বত হইতে হিমালয়কে উচ্চ বলিলেই তাহাকে যথার্থ উন্নত বলিয়া বোধ হয়। এক বার, দুই বার, তিন বার পরাজিত হইলে কাহার মন দমিয়া যায় ? পৃথিবীর বীরের। সহস্র বার অকৃতকার্য্য হইলেও কাহার উদ্যম টলে না ? স্বর্গের দেবতার। ইন্দ্র ইন্দ্রজিতের অপেক্ষা দুর্ব্বল হইতে পারেন, কিন্তু ভীরু কেন হইবেন ? চিত্রের প্রারম্ভ ভাগেই কবি যে ইন্দ্রকে কাপুরুষ করিয়া আঁকিয়াছেন, তাহা বড় সুকবি-সঙ্গত হয় নাই।

ইন্দ্র শচীর সহিত কৈলাস-শিখরে দুর্গার নিকটে গমন করিলেন এবং রাঘবকে রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। এক বিষয়ে আমরা ইন্দ্রের প্রতি বড় অসন্তুষ্ট হইলাম, পাঠকের মনে আছে যে, ইন্দ্রের কৈলাসে আসিবার সময় লক্ষ্মী প্রায় মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে,

"বড় ভাল বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে।
কহিও, বৈকুণ্ঠ পুরী বহুদিন ছাড়ি
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে ! কত যে বিরলে
ভাবয়ে সে অবিরল ; একবার তিনি,
কি দোষ দেখিয়া তারে না ভাবেন মনে ?
কোন্ শিক্ষা, দুহিতারে পতিগৃহ হতে
রাখে দূরে জিজ্ঞাসিও বিশ্ব জটাধরে।"

পাছে শিবের সহিত দেখা না হয় ও তিনি শিবের বিরুদ্ধের উপর যে ভয়ানক কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন, তাহা অনর্থক নষ্ট হয়, এই নিমিত্ত তিনি বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন যে,—

"ত্র্যম্বকে না পাও যদি, অম্বিকার পদে
কহিও এ সব কথা।"

লক্ষ্মীর এমন সাধের অনুরোধটি ইন্দ্র পালন করেন নাই।

মহাদেবের পরামর্শ মতে ইন্দ্র মায়াদেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন।

"সৌর-খরতর-করজাল-সঙ্কলিত—
আভাময় স্বর্ণাসনে বসি কুহকিনী
শক্তীশ্বরী।"

আমাদের মতে মায়াদেবীর আসন সৌর-খরতর-করজাল-সঙ্কলিত না হইয়া যদি অস্ফুট অন্ধকার-কুজ্ঝটিকা-মণ্ডিত জলদময় হইত, তবে ভাল হইত। মায়াদেবীর নিকট হইতে দেব-অস্ত্র লইয়া ইন্দ্র রাম-সমীপে প্রেরণ করিলেন।

পঞ্চম সর্গে ইন্দ্রজিতের ভাবনায় ইন্দ্রের ঘুম নাই;

"—কুসুম শয্যা ত্যজি, মৌন-ভাবে
বসেন ত্রিদিব-পতি রত্ন-সিংহাসনে;—
সুবর্ণ মন্দিরে সুপ্ত আর দেব যত।"

দেবতাদিগের ঘুমটা না থাকিলেই ভাল হইত, যদি বা ঘুম রহিল, তবে ইন্দ্রজিতের ভয়ে ইন্দ্রের রাতটা না জাগিলেই ভাল হইত।

শচী ইন্দ্রের ভয় ভাঙ্গিবার জন্য নানাবিধ প্রবোধ দিতে লাগিলেন,

"পাইয়াছ অস্ত্র কান্ত" কহিলা পৌলোমী
অনন্ত যৌবনা "যাহে বধিলা তারকে
মহাসুর তারকারি; তব ভাগ্য বলে
তব পক্ষ বিরূপাক্ষ; আপনি পার্বতী,
দাসীর সাধনে সাধ্বী কহিলা, সুসিদ্ধ
হবে মনোরথ কালি; মায়া দেবীশ্বরী
বধের বিধান কহি দিবেন আপনি;—
তবে এ ভাবনা নাথ কহ কি কারণে?"

কিন্তু ইন্দ্র কিছুতেই প্রবোধ মানিবার নহেন, দেব অস্ত্র পাইয়াছেন তাহা সত্য, শিব তাঁহার পক্ষ তাহাও সত্য, কিন্তু তথাপি ইন্দ্রের বিশ্বাস হইতেছে না,—

"সত্য যা কহিলে,
দেবেন্দ্রাণি; প্রেরিয়াছি অস্ত্র লঙ্কাপুরে;
কিন্তু কি কৌশলে মায়া রক্ষিবে লক্ষ্মণে
রক্ষোযুদ্ধে, বিশালাক্ষি, না পারি বুঝিতে।
জানি আমি মহাবলী সুমিত্রা নন্দন;
কিন্তু দন্তী কবে দেখি আঁটে মৃগরাজে?
দম্ভোলী নির্ঘোষ আমি শুনি, সুবদনে;
মেঘের গর্জ্জন ঘোর; দেখি ইরম্মদে,
বিমানে আমার সদা ঝলে সৌদামিনী;
তবু থর থরি হিয়া কাঁপে, দেবি, যবে
নাদে রুষি মেঘনাদ,"

পাঠক দেখিলেন ত, ইন্দ্র কোনমতে শচীর সান্ত্বনা মানিলেন না।

"বিষাদে নিশ্বাসি
নীরবিলা সুরনাথ; নিশ্বাসি বিষাদে
(পতিখেদে সতী প্রাণ কাঁদেরে সতত।)
বসিলা ত্রিদিব-দেবী দেবেন্দ্রের পাশে।"

আহা, অসহায় শিশুর প্রতি আমাদের যেরূপ মমতা জন্মে, ভয় ও বিষাদে আকুল ইন্দ্র বেচারীর উপর আমাদের সেই রূপ জন্মিতেছে।

উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা চিত্রলেখা প্রভৃতি অপ্সরারা বিষণ্ণ ইন্দ্রকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

সরসে যেমতি
সুধাকর কর রাশি বেড়ে নিশাকালে
নীরবে মুদিত পদ্মে।

বিষণ্ণ-সৌন্দর্য্যের তুলনা এখানে সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু মাইকেল যেখানেই "কিম্বা" আনেন, সেখানেই আমাদের বড় ভয় হয়,

কিম্বা দীপাবলী
অম্বিকার পীঠতলে শারদ পার্ব্বণে

হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েরে
চির বাঞ্ছা।

পূর্ব্বকার তুলনাটির সহিত ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে, দীপাবলী, শারদ পার্ব্বণ, সমুদয় গুলিই উল্লাস-সূচক।

এমন সময়ে মায়াদেবী আসিয়া কহিলেন,

"যাই, আদিতেয়,
লঙ্কাপুরে, মনোরথ তোমার পূরিব ;
রক্ষঃকুল চূড়ামণি চূর্ণিব কৌশলে।"

এতক্ষণে ইন্দ্র সান্ত্বনা পাইলেন, নিদ্রাতুরা শচী ও অপ্সরীরাও বাঁচিল, নহিলে হয় ত বেচারীদের সমস্ত রাত্রি জাগিতে হইত।

ইন্দ্রজিৎ হত হইয়াছেন। লক্ষ্মী ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইবামাত্র ইন্দ্র আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া কহিতেছেন,

"দেহ পদধূলি,
জননি ; নিঃশঙ্ক দাস তোমার প্রসাদে—
গত জীব রণে আজি দুরন্ত রাবণি !
ভুঞ্জিব স্বর্গের সুখ নিরাপদে এবে।"

বড় বাড়াবাড়ি হইয়াছে ; ইন্দ্রের ভীরুতা কিছু অতিরিক্ত হইয়াছে। এইবার সকলে কহিবেন, যে, পুরাণে ইন্দ্রকে বড় সাহসী করে নাই, এক একটি দৈত্য আসে, আর ইন্দ্র পাতালে পলায়ন করেন ও একবার ব্রহ্মা একবার মহাদেবকে সাধাসাধি করিয়া বেড়ান, তবে মাইকেলের কি অপরাধ? কিন্তু এ আপত্তি কোন কার্য্যেরই নহে। মেঘনাদ-বধে যদি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পুরাণের কথা যথাযথ রূপে রক্ষিত হইত, তবে তাঁহাদের কথা আমরা স্বীকার করিতাম। কত স্থানে তিনি অকারণে পুরাণ লঙ্ঘন করিয়াছেন, রাবণের মাতুল কালনেমীকে তিনি ইন্দ্রজিতের শ্বশুর করিলেন, প্রমীলার দ্বারা রামের নিকট তিনি মল্লযুদ্ধের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, বীর চূড়ামণি রাবণকে কাপুরুষ বানাইলেন ; আর যেখানে পুরাণকে মার্জ্জিত করিবার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন ছিল, সেখানেই পুরাণের অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে মার্জ্জনা করিতে পারি না। ইন্দ্রের পর দুর্গার অবতারণা করা হইয়াছে।

ইন্দ্রজিতের বধোপায় অবধারিত করিবার জন্য ইন্দ্র দুর্গার নিকট উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রের অনুরোধে পার্ব্বতী শিবের নিকট গমনোদ্যত হইলেন। রতিকে আহ্বান করিতেই রতি উপস্থিত হইলেন, এবং রতির পরামর্শে মোহিনী মূর্ত্তি ধরিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

দুর্গা মদনকে আহ্বান করিলেন ও কহিলেন,

"চল মোর সাথে,
হে মন্মথ, যাব আমি যথা যোগিপতি
যোগে মগ্ন এবে, বাছা ; চল ত্বরা করি।"

"বাছা" কহিলেন—

"কেমনে মন্দির হোতে, নগেন্দ্রনন্দিনি,
বাহিরিবা, কহ দাসে, এ মোহিনী বেশে,
মুহূর্ত্তে মাতিবে, মাতঃ, জগত হেরিলে,
ও রূপ মাধুরী সত্য কহিনু তোমারে।
হিতে বিপরীত, দেবি, সত্বরে ঘটিবে।
সুরাসুর-বৃন্দ যবে মথি জলনাথে,
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতিসুত যত

বিবাদিল দেব সহ সুধা-মধু হেতু।
মোহিনী মূরতি ধরি আইলা শ্রীপতি।
ছদ্মবেশী হৃষিকেশে ত্রিভুবন হেরি,
হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের পরে!
অধর-অমৃত-আশে ভুলিলা অমৃত
দেব দৈত্য; নাগদল নম্রশিরঃ লাজে,
হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী; মন্দর আপনি
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচযুগে!
স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে,
মলম্বা অম্বরে তার এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন
কান্তি কত মনোহর!"

"বাছার" সহিত মাতার" কি চমৎকার মিষ্টালাপ হইতেছে দেখিয়াছেন? মলম্বা অম্বরের (গিল্‌টি) উদাহরণ দিয়া, মদন কথাটি আরো কেমন রসময় করিয়া তুলিয়াছে দেখিয়াছেন? মহাদেবের নিকট পার্ব্বতী গমন করিলেন,

মোহিত মোহিনী রূপে; কহিলা হরষে
পশুপতি, "কেন হেথা একাকিনী দেখি,
এ বিজন স্থলে তোমা, গণেন্দ্র জননি?
কোথায় মৃগেন্দ্র তব কিঙ্কর শঙ্করি?
কোথায় বিজয়া, জয়া?" হাসি উত্তরিলা
সুচারু হাসিনী উমা; "এ দাসীরে ভুলি,
হে যোগীন্দ্র, বহু দিন আছ এ বিরলে;
তেঁই আসিয়াছি নাথ, দরশন আশে
পা দুখানি। যে রমণী পতি পরায়ণা,
সহচরী সহ সেকি যায় পতি পাশে?"

পতিপরায়ণা নারীর সহচরীর সহিত পতি-সমীপে যাইতে যে নিষেধ আছে, এমন কথা আমরা কোন ধর্ম্ম-শাস্ত্রে পড়ি নাই। পুনশ্চ মহাদেবের নিকট দাসী ভাবে আত্ম-নিবেদন করা পার্ব্বতীর পৌরাণিক চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। উচ্চ দেব-ভাবের সহিত দম্পতির একাত্মভাব যেরূপ সংলগ্ন হয়, উচ্চ নীচ-ভাব সেরূপ নহে।

রাবণের সহিত যখন কার্ত্তিকেয়ের যুদ্ধ হইতেছে, তখন দুর্গা কাতর হইয়া সখী বিজয়াকে কহিতেছেন।

"যালো তুই সৌদামিনী গতি,
নিবার কুমারে, সই। বিদরিছে হিয়া
আমার, লো সহচরি, হেরি রক্তধারা
বাছার কোমল দেহে।" ইত্যাদি

অসুরমর্দ্দিনী শক্তিরূপিণী ভগবতীকে "বাছার কোমল দেহে রক্তধারা" দেখিয়া এরূপ অধীর করা বড় সুকল্পনা নহে; পৃথিবীতেও এমন নারী আছেন, যাঁহারা পুত্রকে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করিবার জন্য সহচরী প্রেরণ করেন না; তবে মহাদেবী পার্ব্বতীকে এত ক্ষুদ্র করা কতদূর অসঙ্গত হইয়াছে, সুরুচি পাঠকদের বুঝাইবার জন্য অধিক আড়ম্বর করিতে হইবে না।

গুজরাটে নাম করণ।

গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া পর্য্যন্ত যে ষোড়শ বৈদিক সংস্কার বিধিবদ্ধ আছে, তাহার মধ্যে নামকরণ পঞ্চম সংস্কার। জাতকর্ম্মের পর নামকরণ —সন্তান জন্মিবার

দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত সামান্যতঃ ইহার সময় নির্দ্দিষ্ট। সকল বর্ণের মধ্যে সময়ের একই নিয়ম নাই; ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দ্বাদশ দিবস, ক্ষত্রিয়দের ত্রয়োদশ, বৈশ্যদের ষোড়শ, শূদ্রদের দ্বাবিংশ দিবস নামকরণের নির্দ্ধারিত কাল। আর কার্য্যগতিকে এই কালের ব্যতিক্রমও ঘটিয়া থাকে।

গুজরাটী ব্রাহ্মণদের মধ্যে জাতকর্ম্ম-প্রথা এক্ষণে প্রচলিত নাই, মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেহ কেহ তাহা অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, কিন্তু নামকরণ সাধারণ হিন্দুজাতির মধ্যে প্রচলিত। তাহা যে শাস্ত্রের বিধানানুসারে সম্পন্ন হয়, কেবল তাহা নহে, লৌকিক ব্যবহারে তাহা ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে।

আশ্বলায়ন গৃহ্য সূত্রের মতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার দ্বাদশ দিবসে কিম্বা প্রথম মাসের অন্য কোন দিবসে, অথবা প্রথম সংবৎসরে পিতা পুত্রের নামকরণ করিবেন। পিতা যদি বিদেশে গিয়া থাকেন, তবে তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নামকরণ করিবেন। নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া পুত্রের তিনবার মস্তক আঘ্রাণ করিবেন।

অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে।
আত্মা বৈ পুত্রনামাঽসি স জীব শরদঃ শতম্॥

ককারাদি বর্গের প্রথম দ্বিতীয় অথবা চতুর্থ বর্ণ নামের আদিতে ও বিসর্গান্ত হ্রস্ব স্বর অন্তে থাকা বিধেয়, প্রতিষ্ঠাকাম ব্যক্তি দ্বি অক্ষর নাম রাখিবেন; ব্রহ্ম-বর্চ্চস্-কাম চতুরক্ষরের নাম রাখিবেন; পুরুষের নামে যুক্তাক্ষর মিলিত থাকিলে হানি নাই, কন্যার নামের আদিতে যুক্তাক্ষর না থাকে, এইরূপ নাম রাখিবে, যথা সুখদা, সুভদ্রা, বসুদা, যশোদা, সাবিত্রী, সুমঙ্গলা, কলাবতী ইত্যাদি। পারস্কর গৃহ্য সূত্রের মতে পুরুষের নাম তদ্ধিতান্ত হওয়া বিধেয় নয় (দৈবদত্তিঃ ঔপমন্যবঃ ইত্যাদি।) স্ত্রীর নাম তদ্ধিতান্ত হইবার বাধা নাই, যথা, গান্ধারী, কৈকেয়ী, জানকী ইত্যাদি। ব্রাহ্মণের উপাধি শর্ম্মণ্, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মন্, বৈশ্যের গুপ্ত, শূদ্রের দাস।

গোভিলীয় গৃহ্য-সূত্রে নামকরণ-প্রথা এইরূপ লিখিত আছে।

কুমারকে শুদ্ধ বসন পরিধান করাইয়া মাতা বামভাগে উপবিষ্ট পিতার হস্তে তাহাকে দিবেন। তৎপরে পত্নী পৃষ্ঠদেশ হইতে পতিকে পরিক্রমণ করত তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবেন। পতি "যজ্ঞে সুনীমে" "যথা যন্ন প্রমীয়েত পুত্রো অনিত্র্যা অধীতি" প্রভৃতি বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া পত্নীকে কুমার প্রত্যর্পণ করিবেন। পরে "যদদশ্চন্দ্রমসীত্যাদি" মন্ত্রে চন্দ্রমার অর্চ্চনা করিয়া পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিবেন ও যথোক্তপ্রকার হোমাদি অনুষ্ঠান করিয়া পুত্রের নামকরণ করিবেন।

কালক্রমে এই বৈদিক প্রথার অনেক পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর হইয়া আসিয়াছে।

সংস্কার-পদ্ধতি প্রয়োগে নাম করণ পদ্ধতি নিম্নলিখিত প্রকার।

একাদশ কিম্বা দ্বাদশ দিবসে পিতা সন্তানের দীর্ঘায়ু ও কল্যাণ উদ্দেশে নামকরণ সঙ্কল্প করিবেন। হোম ক্রিয়া ইচ্ছাধীন। নিম্নলিখিত নাম হইতে নাম নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত।

১	২	৩	৪
কৃষ্ণ	অনন্ত	অচ্যুত	চক্রী
৫	৬	৭	৮
বৈকুণ্ঠ	জনার্দ্দন	উপেন্দ্র	যজ্ঞপুরুষ
৯	১০	১১	১২
বাসুদেব	হরি	যোগীশ	পুণ্ডরীকাক্ষ

চৈত্র হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত এক এক মাসের এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা,—চৈত্র-প্রধান কৃষ্ণ, বৈশাখ-প্রধান অনন্ত ইত্যাদি। এই হেতু যে মাসে সন্তান জন্মে সেই মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নামে তাহার নাম রাখিতে হইবে। যথা চৈত্রে জন্মিলে তাহাকে কৃষ্ণের নাম দেওয়া বিধেয়।

অপিচ গৃহ-দেবতা কি কুল-দেবতার নাম হইতেও সন্তানের নাম দেওয়া যায়, যথা শঙ্কর, মহাদেব, গোবিন্দ, গণেশ, গোপাল, বামন ইত্যাদি।

সংস্কার-পদ্ধতিতে নাম রাখিবার আর এক প্রথা নির্দ্দিষ্ট আছে।

একটী কাংস্য পাত্রে স্বর্ণ লেখনী দ্বারা চতুর্ব্বিধ নাম লিখিত হইবে যথা।

১। কুলদেবতার নাম (রাম, কৃষ্ণ, বিঠোবা ইত্যাদি)।

২। মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম (কৃষ্ণ অনন্ত ইত্যাদি)।

৩। রাশি নাম।

৪। কুলাচার-অনুযায়ী নাম।

রাশি নাম স্থিরীকৃত হইবার নিয়ম এই;—মেষ, বৃষ প্রভৃতি রাশি ২৭ নক্ষত্রে বিভক্ত। প্রত্যেক রাশির জন্য পৃথক্ পৃথক্ অক্ষর নির্দ্দিষ্ট আছে—মেষ রাশির অ, ল, ই—বৃষভে ব, ব, উ—মিথুনে ক, ছ, গ ইত্যাদি। মেষ রাশিতে জন্ম হইলে অ, ল, অথবা ইকারাদি নাম রাখা যায় যথা, অনন্ত, ললুভাই, ঈশ্বর।

উল্লিখিত প্রকারে কাংস্য-পাত্রে নাম লিখিত হইলে মাতা শিশুকে দক্ষিণ-ক্রোড়ে বসাইবেন ও পিতা শিশুর দক্ষিণ কর্ণে নাম উচ্চারণ করিয়া "তদস্তু মিত্রাবরুণ" মন্ত্র পাঠ করিবেন ও পুরোহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া কর্ম্ম সমাপন করিবেন।

এই সকল নিয়মেও বৈদিক অনুষ্ঠানের মধ্যে অনেক প্রভেদ প্রতীয়মান হইবে। কুলদেবতার নাম ও রাশি-নাম রাখিবার প্রথা বৈদিক কালে প্রচলিত ছিল না। অবতার-বাদ হিন্দু-সমাজে প্রবিষ্ট হইবার পর এই সকল নাম প্রচার হইয়াছে, ইহা সহজেই প্রতীতি হয়। কি মহারাষ্ট্রদেশে কি গুজরাটে পুত্র কন্যার নাম প্রায়ই দেবদেবীর নাম হইতে গৃহীত। বৈদিক নাম প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। মুসলমানদের অনুকরণে দেবকরায়, হুকুমতরায়, গুলালরায়, মহতাবরায়, জমত রায় প্রভৃতি কতকগুলি নাম পারসী ভাষায় সংরচিত দেখা যায়।

আমি গুজরাট হইতে লিখিতেছি। এ প্রদেশে নামকরণ পদ্ধতিকে 'বারা বলিয়া' অথবা 'বারসা' (বার বাসর) বলে; ইহাতে বিশেষ কোন অনুষ্ঠানের আড়ম্বর নাই; নামকরণ কার্য্য স্ত্রীদের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। সন্তানের নাম রাখিবার ভারবিশেষ রূপে তাহার ফোই অর্থাৎ পিসিমার হস্তে সমর্পিত, ও এই উপলক্ষে তিনি তাঁহার

ভ্রাতার নিকট হইতে উপহার প্রত্যাশা করেন।

গুজরাটে নামকরণের প্রথা এইরূপ,—

চারিজন বালক যাহাদের উপনয়ন হয় নাই, অথবা চারি স্ত্রী একখণ্ড রেশমের কাপড়ের চারি কোণ ধরিয়া দাঁড়ায়, পরে মাতা সন্তানকে তাহাতে রাখিয়া দেন। বালকেরা অথবা স্ত্রীগণ সেই ঝোলা দুলাইতে দুলাইতে এই শ্লোক আবৃত্তি করে,—

ঝোলী পোলী পীপল পান
ফোইয়ে পাড়্যা (অমুক) নাম
(পিসিমায় রাখে অমুক নাম)

পরে মিষ্টান্ন পরিবেশন হইয়া ক্রিয়া সমাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণদের সচরাচর দুই নাম থাকে; এক ডাকনাম, এক রাশি নাম।

মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে কতকগুলি নাম কেবল পরিবার ও আত্মীয়দের মধ্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জন-সাধারণের মধ্যে তাহারা এক নামে পরিচিত, আপনাদের মধ্যে তাহাদের আর এক নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে—যথা

কৃষ্ণরাও	নানা সাহেব
ভীমরাও	তাত্যা সাহেব
খণ্ডেরাও	ভাউ
গণপতরাও	বালা

এইরূপ অপ্পা, অন্না প্রভৃতি আরো কতকগুলি ঘরাও নাম আছে। গুজরাটীদের মধ্যে এইরূপ নাহু, মণু, মোটা-ভাই বলিয়া কতকগুলি নাম শ্রবণ করা যায়। অনেক সময় পিতাকে পুত্রেরা বাবার পরিবর্ত্তে হয়ত মোটা-ভাই বলিয়া সম্বোধন করে। মাতাকে 'মা' না বলিয়া মোটা-বেন' বলিয়া ডাকে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর জন্য দাদা দিদির অনুরূপ কোন নাম নাই।

মহারাষ্ট্রী গুজরাটী ও বাঙ্গালা ভাষায় সম্বন্ধসূচক নামাবলী পাঠ করিয়া পাঠকগণ এই তিন ভাষার সৌসাদৃশ্য অনেকাংশে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বাঙলা	গুজরাতী	মহারাষ্ট্রী
বাপ / পিতা	বাপ / পিতা	বাপ / পিতা
মা / মাতা	মা / মাতা	আই / মাঁতুশ্রী
ভাই	ভাই	ভাউ
ভগিনী / বোন		বহিন
খুড়তুতো ভাই	পিত্রাই	চুলত ভাউ
কাকা	কাকা	কাকা
কাকী	কাকী	কাকী
স্বামী	ধনী / বর	নবরা-ভ্রতার
স্ত্রী	বায়ড়ী	বায়কো
বড় ঠাকুর	জেঠ	জেঠ
দেওর-ঠাকুরপো	দের	দীর
ননদ	ননদ	ননদ
শালা	সাঁলা	মেহমনা
ভাজ	ভোজাই / ভাবী	ভাউজাই
ভগ্নীপতি / বোনাই	বনেবী	বনেবী-দাজী
সতীন	সোপ	সবত

ভাগনে	ভানেজ	ভাচা
ভাগনী	ভানেজ	ভাচা
মামা	মামা	মামা
পিসি	ফোই	ফোই
মাসী	মাউসী	মাউসী
বউ	বহু	সুন
জামাই	জমাই	জাঁবই
ঠাকুর দাদা	দাদা	আজা
দিদিমা	দাদী	আজী
পৌত্র) নাতী)	পৌত্র	নাতু
ভাইপো	ভতুজ	পুতনা

জ্যেষ্ঠা ও মূল, এই দুই নক্ষত্র অশুভ বলিয়া পরিগণিত। এই দুই নক্ষত্রে পুত্র কি কন্যা জন্মিলে জনক জননী আপনাদের মৃত্যু আশঙ্কা করেন। এই অমঙ্গল নিবারণ হেতু সেই নক্ষত্রের নামে সন্তানের নাম রাখিবার নিয়ম আছে। জ্যেষ্ঠাতে জন্ম হইলে নাম জেঠা কিম্বা জেঠী, মূলনক্ষত্রে জন্ম হইলে নাম মূলজী, মূলশঙ্কর অথবা মূলী রাখা হইয়া থাকে। যদি অনেক সন্তান মৃত হইয়া দৈববশাৎ এক সন্তান বাঁচিয়া থাকে, তবে তাহার নাম জীবা কি জীবী রাখা হয়। যে গৃহে বালকের সংখ্যা এত অধিক যে, তাহাদের যত্ন নাই, তথায় হয়ত ধুলা, কচরা, ঝুঠা, পুঁজা, প্রভৃতি অপত্য-সূচক নাম শ্রুতিগোচর হয়।

এদেশে নাম রাখিবার সময় পুত্রের নামের সঙ্গে পিতার নাম যোগ করিয়া দিবার এক রীতি সর্ব্বত্র প্রচলিত। মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী পারসী সকলেরই মধ্যে এই রীতি দৃষ্ট হয়। যথা—পিতার নাম সারাভাই—পুত্রের নাম ভোলানাথ সারাভাই—পৌত্রের নাম ভীমরাও ভোলানাথ। পারসীদের মধ্যেও এইরূপ—পিতার নাম খরসদ্-জী, পুত্রের নাম মানকজী খরসদ্-জী, পৌত্রের নাম জাহাঙ্গীর মানকজী। অনেক স্থলে এই স্বনাম ও পিতৃ-নাম ভিন্ন জাতি-সূচক নাম কিম্বা মর্য্যাদা-সূচক কোন উপাধি দৃষ্ট হয় না। বঙ্গ-বাসীদের মধ্যে যেমন বন্দ্য, চট্ট, মিত্র, দাস প্রভৃতি জাতি-সূচক নাম ব্যবহৃত হয়, এখানে সেরূপ নিয়ম নাই। তবে মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে অনেকেরই কুল-পদবী থাকে—যথা গোড়বোলে (মিষ্ট ভাষী), কড়কড়ে, জোশীমুনসি, তথড়কর ইত্যাদি। ইহা অপরিবর্ত্তনশীল বংশগত নাম।

গুজরাটে 'জী' ও 'ভাই' শব্দান্ত নামই অধিক প্রচলিত, কায়স্থ ও বণিকদের মধ্যে দেবতার নামের শেষে দাস শব্দ সংযুক্ত করিবার রীতি আছে, যেমন জগজীবন দাস, লক্ষ্মণ দাস, নরোত্তম দাস ইত্যাদি। এক প্রদেশে রণছোড় নামক এক ভীরুস্বভাব দেবতা আছে, অনেকে সেই নাম ধারণ করেন। একজন নব্য সম্প্রদায়ের গুজরাটী কায়স্থ, ঐ নামের উপর চটিয়া আপনার পুত্রের নাম 'রণজিৎ' রাখিয়াছেন, ইহা উন্নতির লক্ষণ বলিতে হইবে। মহারাষ্ট্র দেশে বিঠোবা-নামক দেবতা-বিশেষ প্রসিদ্ধ আছে, এই হেতু মহারাষ্ট্রীদের মধ্যে "বিঠোবা" "বিঠ্ঠল রাও" অনেকের এই নাম শ্রুত হওয়া যায়।

স্ত্রীলোকের নাম দেবী ও অধিকাংশ নদী হইতে গৃহীত হয়; যথা, পার্ব্বতী, লক্ষ্মী, উমা, দুর্গা, রেবা, যমুনা। সীতা চিরদুঃখিনী বলিয়া কন্যার ঐ নাম রাখিতে বঙ্গবাসীরা যেরূপ কুণ্ঠিত, এখানে সেরূপ ভাব দেখা যায় না। সীতা, জানকী প্রভৃতি নাম এখানে অত্যন্ত প্রচলিত। এতদ্ভিন্ন পুষ্প কিম্বা স্বর্ণ মাণিক্য হইতে কন্যার নাম প্রদত্ত হয়। মোতী, সোনু, জহর, রত্ন, চম্পক, চমেলী এ সকল নামও প্রচলিত। বিবাহিতা স্ত্রী পতি-গৃহে নামান্তর গ্রহণ করেন। বিবাহের দিন কন্যা পতি-গৃহে উপস্থিত হইলে গৃহ-দেবতার সম্মুখে দম্পতী উপবিষ্ট হয়েন। বরের মাতা তাঁহার বধূর যে নাম রাখা স্থির করেন, তাহা এক পাত্রে চাল রাখিয়া তাহার উপরে অঙ্কিত করেন। পরে বর কন্যার কাণে কাণে সেই নাম বলিয়া দেন। জ্যেষ্ঠা পুত্র-বধূর নাম সচরাচর লক্ষ্মী রাখা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার বিশেষ কোন নিয়ম নাই, তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, স্বামীর নাম অনুসারে স্ত্রীর নাম রচিত হয়। স্বামীর নাম মহাদেব হইলে স্ত্রীর নাম পার্ব্বতী, শঙ্কর হইলে উমা, কৃষ্ণ হইলে রাধা, বিঠোবা হইলে রুক্মা, রাম হইলে সীতা। কন্যার নাম যদি আবড়ী (আছরী) থাকে, তবে আত্মা-রামের সঙ্গে বিবাহ হইলে তাহার নাম রাধা হইতে পারে, কেননা কৃষ্ণের আর এক নাম আত্মারাম। গুজরাটে অনেক সময় অবিবাহিতা কন্যার প্রতি 'কুমারী' ও বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি 'বধূ' শব্দের প্রয়োগ হয়।

যথা. পার্ব্বতী কুমারী—পার্ব্বতী বধূ
রুক্মিণী কুমারী—রুক্মিণী বধূ

বাই-শব্দ মর্য্যাদা-সূচক—স্ত্রীদের নামের প্রথমে কি শেষে ইহা যুক্ত হয়; যথা,—সোনু বাই, আনা বাই, দুর্গা বাই, বাই রতন, বাই মানক ইত্যাদি।

পারসীরা তাহাদের পারস্যদেশীয় পুরাতন বীরপুরুষদের নাম সচরাচর ধারণ করে, যথা রোস্তম কাইখসরু (Cyrus) জমসদ, জহাঙ্গীর, খুরসদ, দোরাব, সোরাব ইত্যাদি। এই সকল নামে গুজরাটের প্রথা-অনুসারে জী কিম্বা ভাই যোগ করিয়া দিলে পারসী নাম সম্পূর্ণ হয়। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি হিন্দু নামও তাহারা ব্যবহার করিয়া থাকে, রতন-জী, পদম-জী, ডোসা-ভাই, দাদা-ভাই, আদর-জী, জীবন-জী ইত্যাদি। পারসী স্ত্রীগণ হিন্দু স্ত্রীর নামানুযায়ী নাম ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু কতকগুলি পারসী নামও প্রচলিত আছে যথা সিরীন—পরোচিস্তা ইত্যাদি।

পারসীদের মধ্যে কতকগুলি হাস্যকর পদবী ও উপাধি দৃষ্ট হয়, তাহা অনেক স্থলে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের অবলম্বিত ব্যবসা হইতে কল্পিত বোধ হয়। তাহার দৃষ্টান্ত—বোতল-ওয়ালা—দারুখানা-ওয়ালা—ঘাস-ওয়ালা। এই সকল নামের মধ্যে দুইটি নাম বোম্বাই মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ—বোতল-ওয়ালা ও রেডিমণি (নগদ পয়সা-ওয়ালা)। সর জমসদজী জি জি ভাই প্রসিদ্ধ নাইটের পদবী বোতল-ওয়ালা। প্রবাদ আছে যে প্রথম সর জমসদজী বোতল

বিক্রয়ের ব্যবসা আরম্ভ করেন ও ক্রমে বাণিজ্য-কার্য্যে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তাহার সম্ভ্রম দ্বারা ব্রিটিষ নাইটের উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। অপর এক জন পারসী নাইটের উপাধি Ready money (নগদ-কড়ি) কিন্তু ইনি ভারত-নক্ষত্রের নাইট, ইঁহার নাম সর কাওয়াসজী জহাঙ্গীর, ইনিও উদারতা ও বদান্যতায় নাইট পদবী পাইয়াছেন। এমন কোন হিতকর বিষয় নাই, যাহাতে ইঁহার দান প্রকাশ না পায়, ইঁহার দান দেশ-কাল-পাত্র-সাপেক্ষ নহে। সকল জাতির জন্যই ইহাঁর ধনাগার মুক্ত রহিয়াছে। ইংলণ্ড-বাসীদের দারিদ্র্য-মোচনই বল—স্বদেশের কল্যাণ-সাধনই বল, ইহাঁর নগদ টাকা সর্ব্বত্রই কার্য্যে আইসে।

বঙ্গদেশ ও বোম্বায়ের মধ্যে তুলনা করিলে দেখা যায়, বঙ্গদেশে নাম-রাজ্য অপেক্ষাকৃত সুবিস্তীর্ণ। বঙ্গ-বাসীর মধ্যে দেব-দেবীর নামেরও অভাব নাই—দ্বারকানাথ, গোপীমোহন, গোকুলকৃষ্ণ, নবগোপাল, শারদা, বরদা, লক্ষ্মী প্রভৃতি তাহার উদাহরণ। তদ্ভিন্ন প্রকৃতির মনোহর সুন্দর পদার্থ হইতে আমরা অনেক সময়ে নাম গ্রহণ করি—এদেশে প্রায় সেরূপ নাম শুনা যায় না, যেমন চারুচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, শশীন্দ্র, নীলকমল, ইত্যাদি। কতকগুলি নাম গুণ-বাচক—যথা সত্য, করুণা, প্রতাপ, মনোমোহন; আর কতকগুলি নাম রাজা অথবা বীর-সংজ্ঞক—যথা রাজেন্দ্র, দেবেন্দ্র, সুরেন্দ্র, মহীন্দ্র, নরেন্দ্র, এ সকল নাম এ প্রদেশে প্রচলিত নাই। স্ত্রীলোকের নাম তুলনা করিয়া দেখিলেও বঙ্গাঙ্গনাদের প্রাধান্য দিতে হয়। বঙ্গাঙ্গনাদের নামের বিচিত্রতা ও শ্রুতিমাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, সৃষ্টির সমুদয় মধুর পদার্থ হইতে সেই সকল নাম সংগৃহীত। সৌদামিনী, উষা, নলিনী কুমুদিনী মালতী প্রভৃতি নানা জাতীয় পুষ্প, ঋতু-প্রধান বসন্ত ও শরতের অধিষ্ঠাত্রী কুমারী, সুশীলতা, দয়া, করুণা প্রভৃতি গুণসমূহ, স্বর্ণ হীরা মুক্তা মণি মাণিক্য, এ সকলই বঙ্গাঙ্গনাদিগের নামের কল্পতরু-স্বরূপ। নামের সঙ্গে গুণের যোগ থাকা যদি স্বাভাবিক হয়, তবে বঙ্গ-স্ত্রীদের মত রূপগুণসম্পন্ন নারীরত্ন কোথায় পাওয়া যাইবে?

শ্রীস—

করুণা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র।

মহেন্দ্র এত দিন বেশ ভাল ছিল। ইস্কুলে ছাত্র-বৃত্তি পাইয়াছে, কলেজে এলে, বিয়ে, পাস করিয়াছে, মেডিকাল কলেজে তিন চার বৎসর পড়িয়াছে, আর কিছু দিন

পড়িলেই পাশ হইত, কিন্তু বিবাহ হওয়ার পর হইতেই অমন হইয়া গেল কেন? আমাদের সঙ্গে আর দেখা করিতে আসে না, আমরা গেলে ভাল করিয়া কথা কয় না, এসব ত ভাল লক্ষণ নয়। সহসা এরূপ পরিবর্ত্তন যে কেন হইল, আমরা ভিতরে ভিতরে তাহার সন্ধান লইয়াছি। মূল কথাটা এই, কন্যা-কর্ত্তাদিগের নিকট হইতে অর্থ লইয়া মহেন্দ্রের পিতা যে কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন, তাহা মহেন্দ্রের বড় মনোনীত হয় নাই, মনোনীত না হইবারই কথা বটে; তাহার নাম রজনী ছিল, বর্ণও রজনীর ন্যায় অন্ধকার, তাহার গঠনও যে কিছু উৎকৃষ্ট ছিল, তাহা নয়; কিন্তু মুখ দেখিলে তাহাকে অতিশয় ভাল মানুষ বলিয়া বোধ হয়। বেচারী কখনো কাহারো কাছে আদর পায় নাই, পিত্রালয়ে অতিশয় উপেক্ষিত হইয়াছিল, বিশেষতঃ তাহার রূপের দোষে বর পওয়া যাইতেছেনা বলিয়া যাহার-তাহার তাহাকে কাছে নিগ্রহ সহিতে হইত, কখনো কাহারো সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহিতে সাহস করে নাই; এক দিন আয়না খুলিয়া কপালে টিপ পরিতেছিল, বলিয়া কত লোকে কত রকম ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছিল, সেই অবধি উপহাসের ভয়ে বেচারী কখনো আয়নাও খুলে নাই, কখনো বেশভূষাও করে নাই। স্বামী-আলয়ে আসিল। সেখানে স্বামীর নিকট হইতে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও আদর পাইল না, বিবাহ-রাত্রের পরদিন হইতে মহেন্দ্র তাহার কাছে শুইত না। এদিকে মহেন্দ্র এমন বিদ্বান, এমন মৃদু-স্বভাব, এমন সদ্বন্ধু ছিল, এমন আমোদ-দায়ক সহচর ছিল, এমন সহৃদয় লোক ছিল যে, সেও সকলকে ভাল বাসিত, তাহাকেও সকলে ভাল বাসিত, রজনীর কপাল-দোষে সে মহেন্দ্রও বিগড়াইয়া গেল। মহেন্দ্র পিতাকে কখনো অভক্তি করে নাই, কিন্তু বিবাহের পরদিনেই পিতাকে যাহা বলিবার নয়, তাহাই বলিয়া তিরস্কার করিয়াছে। পিতা ভাবিলেন, তাঁহারই বুঝিবার ভুল, কলেজে পড়িলেই ছেলেরা যে অবাধ্য হইয়া যাইবে, ইহা ত কথাই আছে।

রজনীর সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া আমার অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল, আমি মহেন্দ্রকে গিয়া বুঝাইলাম. আমি বলিলাম, রজনীর ইহাতে কি দোষ আছে, তাহার কুরূপের জন্য সে কিছু দোষী নহে, দ্বিতীয়তঃ তাহার বিবাহের জন্য তোমার পিতাই দোষী, তবে বিনা অপরাধে বেচারীকে কেন কষ্ট দাও? মহেন্দ্র কিছুই বুঝিল না বা আমাকেও বুঝাইল না, কেবল বলিল তাহার অবস্থায় যদি পড়িতাম, তবে আমিও ঐরূপ ব্যবহার করিতাম; এ কথা যে মহেন্দ্র অতি ভুল বুঝিয়াছিল, তাহা বুঝাইবার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ আমার সহিত গল্পের অতি অল্পই সম্বন্ধ আছে।

এ সময়ে মহেন্দ্রের কলেজ ছাড়িয়া দেওয়াটা ভাল হয় নাই, পড়ো জমিতে কাঁটা গাছ জন্মায়, অব্যবহৃত লৌহে মরিচা পড়ে, মহেন্দ্র এমন অবস্থায় কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া বসিয়া থাকিলে অনেক কুফল ঘটিবার সম্ভাবনা। আমি আপনি মহেন্দ্রের কাছে গেলাম,

সকল কথা বুঝাইয়া বলিলাম, মহেন্দ্র বিরক্ত হইল, আমি আস্তে আস্তে চলিয়া আসিলাম।

একটা কিছু আমোদ নহিলে কি মানুষে বাঁচিতে পারে? মহেন্দ্র যেরূপ কৃত-বিদ্য, লেখা পড়ায় সেত অনেক আমোদ পাইতে পারে, কিন্তু পরীক্ষা দিয়া দিয়া বই গুলার উপর মহেন্দ্রের এমন একটা অরুচি জন্মিয়াছে যে, কলেজ হইতে টাট্‌কা বাহির হইয়াই আর একটা কিছু নূতন আমোদ পাইলেই তাহার পক্ষে ভাল হইত। মহেন্দ্র এখন একটু আধটু করিয়া সেরী খায়, কিন্তু তাহাতে কি হানি হইল? কিন্তু হইল বৈকি, মহেন্দ্রও তাহা বুঝিত, এক একবার বড় ভয় হইত, এক একবার অনুতাপ করিত, এক একবার প্রতিজ্ঞা করিত, আবার এক এক দিন খাইয়াও ফেলিত এবং খাইবার পক্ষে নানা-বিধ যুক্তিও ঠিক করিত। ক্রমে ক্রমে মহেন্দ্র অধোগতির গহ্বরে এক এক সোপান করিয়া নাবিতে লাগিলেন। মদ্যটা মহেন্দ্রের এখন খুব অভ্যস্ত হইয়াছে। আমি কখনো জানিতাম না, এমন সকল সামান্য বিষয় হইতে এমন গুরুতর ব্যাপার ঘটিতে পারে। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, সেই ভাল মানুষ মহেন্দ্র স্কুলে যে ধীরে ধীরে কথা কহিত, মৃদু মৃদু হাসিত, অতি সন্তর্পণে চলাফিরা করিত, সে আজ মাতাল হইয়া অমন যা-তা বকিতে থাকিবে, সে অমন বৃদ্ধ পিতার মুখের উপর উত্তর প্রত্যুত্তর করিবে। সর্ব্বাপেক্ষা অসম্ভব মনে করিতাম যে, ছেলেবেলা আমার সঙ্গে মহেন্দ্রের এত ভাব ছিল, সে আজ আমাকে দেখিলেই বিরক্ত হইবে, আমাকে দেখিলেই ভয় করিবে যে, বুঝি ঐ আবার লেক্‌চার দিতে আসিয়াছে। কিন্তু আমি আর তাহাকে কিছু বুঝাইতে যাইতাম না, কাজকি, কথা মানিবে না যখন, কেবল বিরক্ত হইবে মাত্র, তখন তাহাকে বুঝাইয়া আর কি করিব? কিন্তু তাহাও বলি, মহেন্দ্র হাজার মাতাল হউক, তাহার অন্য কোন দোষ ছিল না, আপনার ঘরে বসিয়াই মাতাল হইত, কখনো ঘরের বাহির হইত না। কিন্তু অল্প দিন হইল, মহেন্দ্রের চাকর শম্ভু আসিয়া আমাকে কহিল যে, বাবু বিকাল হইলে বাহির হইয়া যান আর অনেক রাত্রি হইলে বাড়ি ফিরিয়া আসেন, এই কথা শুনিয়া আমার বড় কষ্ট হইল; খোঁজ লইলাম, দেখিলাম দৃশ্য কিছু নয়, মহেন্দ্র তাহাদের বাগানের ঘাটে বসিয়া থাকে, কিন্তু তাহার কারণ কি? এখনও ত বিশেষ কিছু সন্ধান পাই নাই।

সংস্কারক মহাশয় যে বিধবা মোহিনীর কথা বলিতেছিলেন, সে মহেন্দ্রের বাড়ির পাশেই থাকিত, মহেন্দ্রের বাড়িও আসিত, মহেন্দ্রও রোগ বিপদে সাহায্য করিতে তাহাদের বাড়ি যাইত। মোহিনীকে দেখিতে বেশ ভাল ছিল, কেমন উজ্জ্বল চক্ষু, কেমন প্রফুল্ল ওষ্ঠাধর, সমস্ত মুখের মধ্যে কেমন একটি মিষ্ট ভাব ছিল, তাহা বলিবার নয়।

যাহা হউক, মোহিনীকে স্বাধীনতার আলোকে আনিবার জন্য নানাবিধ ষড়যন্ত্র চলিতেছে। মোহিনীকে একাদশী করিতে হয়, মোহিনী মাছ খাইতে পায় না, মোহিনীর প্রতি সমাজের এই সকল অন্যায় অত্যাচার

দেখিয়া গদাধর বাবু অত্যন্ত কাতর আছেন। স্বরূপ বাবু মোহিনীর উদ্দেশে নানা সংবাদ পত্রে ও মাসিক পত্রিকায় নানাবিধ প্রেমের কবিতা লিখিয়া ফেলিলেন, তাহার মধ্যে আমাদের বাঙ্গালা সমাজকে ও দেশাচারকে অনেক গালি দিলেন ও অবশেষে সমস্ত মানব জাতির উপর বিষম ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। তিনি নিজে বড় বিষণ্ণ হইয়া গেলেন ও সমস্ত দিন রাত্রি অনেক নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রের কাশীপুরস্থ বাগানের পাশেই মোহিনীর বাড়ি। যে ঘাটে মোহিনী জল আনিতে যাইত, নরেন্দ্র সেখানে দিন কতক আনাগোনা করিতে লাগিলেন। এই সকল দেখিয়া মোহিনী বড় ভাল বুঝিল না, সে আর সে ঘাটে জল আনিতে যাইত না। সে তখন হইতে মহেন্দ্রের বাগানের ঘাটে জল তুলিতে ও স্নান করিতে যাইত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মোহিনীর ও মহেন্দ্রের মনের কথা।

"এমন করিলে পারিয়া উঠা যায় না। মহেন্দ্রের বাড়ি ছাড়িয়া দিলাম, ভাবিলাম দূর হোক্‌গে, ওদিকে আর যাব দিব না। মহেন্দ্র আমাদের বাড়িতে আসিলে আমি রান্নাঘরে গিয়া লুকাইতাম, কিন্তু আজ কাল মহেন্দ্র আবার ঘাটে গিয়া বসিয়া থাকে, কি দায়েই পড়িলাম, তাহার জন্য জল আনা বন্ধ হইবে নাকি? আচ্ছা না হয় ঘাটেই বসিয়া থাকিল, কিন্তু অমন করিয়া তাকাইয়া থাকে কেন? লোকে কি বলিবে? আমার বড় লজ্জা করে। মনে করি ঘাটে আর যাইব না, কিন্তু না যাইয়া কি করি? আর কেনই বা না যাইব? সত্য কথা বলিতেছি, মহেন্দ্রকে দেখিলে আমার নানান্ ভাবনা আইসে, কিন্তু সে সব ভাবনা ভুলিতেও ইচ্ছা করে না। বিকাল বেলা একবার যদি মহেন্দ্রকে দেখিতে পাই তাহাতে হানি কি? হানি হয় হউক গে, আমিত না দেখিয়া বাঁচিব না। কিন্তু মহেন্দ্রকে জানিতে দিব না যে, তাহাকে ভাল বাসি, তাহা হইলে সে আমার প্রতি যাহা খুসী তাহাই করিবে। আর এ সকল ভালবাসাবাসির কথা রাষ্ট্র হওয়াও কিছু নয়" এইত গেল মোহিনীর মনের কথা।

মহেন্দ্র ভাবে "আমিত রোজ ঘাটে বসিয়া থাকি, কিন্তু মোহিনী ত এক দিনও আমার দিকে ফিরিয়া চায় না। আমি যে দিকে থাকি, সে দিক দিয়াও যায় না, আমাকে দেখিলে শশব্যস্তে ঘোমটা টানিয়া দেয়, পথে আমাকে দেখিলে প্রান্ত-ভাগে সরিয়া যায়, মোহিনীর বাড়িতে গেলে কোথায় পলাইয়া যায়, এমন করিলে বড় কষ্ট হয়। আগে জানিতাম মোহিনী আমাকে ভাল বাসে, ভাল না বাসুক যত্ন করে, কিন্তু আজ কাল অনন করে কেন? এ কথা মোহিনীকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, জিজ্ঞাসা করিতে কি দোষ আছে? মোহিনীকে ত আমি কত কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, মোহিনীর বাড়ির সকলে আমাকে এত ভাল

বাসে যে, মোহিনীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিলে কেহত কিছু মনে করে না।"

এক দিন বিকালে মোহিনী জল তুলিতে আসিল। মহেন্দ্র যেমন ঘাটে বসিয়া থাকিত, তেমনি বসিয়া আছে। বাগানে আর কেহ লোক নাই। মোহিনী জল তুলিয়া চলিয়া যায়। মহেন্দ্র কম্পিত স্বরে ধীরে ধীরে ডাকিল "মোহিনী," মোহিনী যেন শুনিতে পাইল না, চলিয়া গেল। মহেন্দ্র ফিরিয়া আর ডাকিতে সাহস করিল না। আর একদিন মোহিনী বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছে, মহেন্দ্র সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন; মোহিনী তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া দিল, মহেন্দ্র ধীরে ধীরে ঘর্ম্মাক্ত-ললাট হইয়া কত কথা কহিল, কত কথা বাধিয়া গেল, কোন কথাই ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারিল না। মোহিনী শশব্যস্তে কহিল "সরিয়া যান, আমি জল লইয়া যাইতেছি।"

সেই দিন মহেন্দ্র বাড়ি গিয়াই একটা কি সামান্য কথা লইয়া পিতার সহিত ঝগড়া করিল, নির্দ্দোষী রজনীকে অকারণ অনেক ক্ষণ ধরিয়া তিরস্কার করিল, শম্ভু চাকরটাকে দুই তিন বার মারিতে উদ্যত হইল, ও মদের মাত্রা আরো খানিকটা বাড়াইল। কিছু দিনের মধ্যে গদাধরের সহিত মহেন্দ্রের আলাপ হইল, তাহার দিন চারেক পরে স্বরূপ বাবুর সহিত মুখ্যাতা জন্মিল, তাহার সপ্তাহ খানেক পরে নরেন্দ্রের সহিত পরিচয় হইল, ও মাসেকের মধ্যে মহেন্দ্র নরেন্দ্রের সভায় সন্ধ্যাগমে নিত্য অতিথিরূপে হাজির হইতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ।

পূর্ব্বে রঘুনাথ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের একটি টোল ছিল। অর্থাভাবে অল্প দিনেই টোলটি উঠিয়া যায়। গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার অনুপকুমার যে পাঠশালা স্থাপন করেন, অল্প বেতনে তিনি তাহার গুরু-মহাশয়-পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু গুরুমহাশয়ের পদে আসীন হইয়া তাঁহার শান্তপ্রকৃতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই।

পণ্ডিত মহাশয় বলিতেন, তাঁহার বয়স সবে চল্লিশ বৎসর; এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া শপথ করিয়া বলা যায় তাঁহার বয়স আটচল্লিশ বৎসরের ন্যূন নয়। সাধারণ পণ্ডিতদের সহিত তাঁহার আর কোন বিষয়ে মিল ছিল না; তিনি খুব টস্‌টোসে রসিক পুরুষ ছিলেন না বা খট্‌খটে ঘট-পট-বাগীশ ছিলেন না, দলাদলির চক্রান্ত করিতেন না, শাস্ত্রের বিচার লইয়া বিবাদে লিপ্ত থাকিতেন না, বিদ্যার আদরের কোন আশাই রাখিতেন না, কেবল মিল ছিল প্রশস্ত উদরটিতে, নস্যের ডিবাটিতে, ক্ষুদ্র টিকিটিতে ও শ্মশ্রুবিহীন মুখে। পাঠশালার বালকেরা প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা তাঁহার বাড়িতেই পড়িয়া থাকিত। এই বালকদের জন্য তাঁহার অনেক সন্দেশ খরচ হইত; সন্দেশের লোভ পাইয়া বালকেরা ছিনা জোঁকের মত তাঁহার বাড়ির হাঁটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিত। পণ্ডিতমহাশয় বড়ই ভাল মানুষ ছিলেন এবং দুষ্ট বাল

কেরা তাঁহার উপর বড়ই অত্যাচার করিত। পণ্ডিত মহাশয়ের নিদ্রাটি এমন অভ্যস্ত ছিল যে, তিনি শুইলেই ঘুমাইতেন, বসিলেই ঢুলিতেন ও দাঁড়াইলেই হাই তুলিতেন, এই সুবিধা পাইয়া বালকেরা তাঁহার নস্যের ডিবা, চটিজুতা ও চসমার ঠুঙ্গিটি চুরি করিয়া লইত। একেত পণ্ডিত মহাশয় অতিশয় আল্‌গা লোক, তাহাতে পাঠশালার দুষ্ট বালকেরা তাঁহার বাটিতে কিছুমাত্র শৃঙ্খলা রাখিত না। পাঠশালায় যাইবার সময় কোন মতে তাঁহার চটিজুতা খুঁজিয়া পাইতেন না, অবশেষে খালিপদেই যাইতেন। একদিন সকালে উঠিয়া দৈবাৎ দেখিতে পাইলেন তাঁহার শয়ন-গৃহে বোল্‌তায় চাক করিয়াছে, ভয়ে বিব্রত হইয়া সে ঘরই পরিত্যাগ করিলেন; সে ঘরে তিন পরিবার বোল্‌তায় তিনটি চাক বাঁধিল, ইঁদুরে গর্ত্ত করিয়া, মাকড়্‌সা প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিল এবং লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র পিপীলিকা সার বাঁধিয়া গৃহমর রাজপথ বসাইয়া দিল। বাঙ্গীর পক্ষে ঋষ্যমুখ পর্ব্বত যেরূপ, পণ্ডিত মহাশয়ের পক্ষে এই ঘরটি সেইরূপ হইয়া পড়িয়াছিল। পাঠশালায় গমনে অনিচ্ছুক কোন বালক যদি সেই গৃহে লুকাইত তবে আর পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে ধরিতে পারিতেন না।

গৃহের এইরূপ আল্‌গা অবস্থা দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয় অনেক দিন হইতে একটি গৃহিণীর চিন্তায় আছেন। পূর্ব্বকার গৃহিণীটি বড় প্রচণ্ড স্ত্রীলোক ছিলেন। নিরীহ প্রকৃতি সার্ব্বভৌম মহাশয় দিল্লীশ্বরের ন্যায় তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেন। স্ত্রী নিকটে থাকিলে অন্য স্ত্রীলোক দেখিয়া চক্ষু মুদিয়া থাকিতেন। একবার একটি অষ্টম বর্ষীয়া বালিকার দিকে চাহিয়া ছিলেন বলিয়া তাঁহার পত্নী সেই বালিকাটির মৃত পিতৃপিতামহ প্রপিতামহের নামোল্লেখ করিয়া যথেষ্ট গালি বর্ষণ করেন, ও সার্ব্বভৌম মহাশয়ের মুখের নিকট হাত নাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "তুমি মর, তুমি মর, তুমি মর!" পণ্ডিত মহাশয় মরণকে বড় ভয় করিতেন, মরণের কথা শুনিয়া তাঁহার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর দৈনিক গালি না পাইয়া অভ্যাস-দোষে দিনকতক বড় কষ্ট অনুভব করিতেন। যাহা হউক অনেক কারণে পণ্ডিত মহাশয় বিবাহের চেষ্টায় আছেন। পণ্ডিত মহাশয়ের একটা কেমন অভ্যাস ছিল, যে তিনি সহস্র মিষ্টান্নের লোভ পাইলেও কাহারো বিবাহ-সভায় উপস্থিত থাকিতেন না, কাহারো বিবাহের সংবাদ শুনিলে সমস্ত দিন মন খারাপ হইয়া থাকিত। পণ্ডিত মহাশয়ের এক ভট্টাচার্য্য বন্ধু ছিল, তাঁহার মনে ধারণা ছিল যে, তিনি বড়ই রসিক, যে ব্যক্তি তাঁহার কথা শুনিয়া না হাসিত, তাহার উপরে তিনি আন্তরিক চটিয়া যাইতেন। এই রসিক বন্ধু মাঝে মাঝে আসিয়া ভট্টাচার্য্যীয় ভঙ্গী ও স্বরে সার্ব্বভৌম মহাশয়কে কহিতেন "ওহে ভায়া—শাস্ত্রে আছে "যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্। যন্ন বালৈঃ পরিবৃতং শ্মশানমিব তদ্‌গৃহম্।" কিন্তু তোমাতে তদ্বৈপরীত্যই লক্ষিত হচ্ছে, কারণ কিনা, যখন তোমার ব্রাহ্মণী বিদ্যমান ছিলেন

তখন তুমি ভয়ে আশঙ্কায় অর্দ্ধেক হোয়ে গিয়ে ছিলে, স্ত্রী-বিয়োগের পর আবার দেখ্‌তে দেখ্‌তে শরীর দ্বিগুণ হোয়ে উঠল। অপরন্তু শাস্ত্রে যে লিখ্‌চে বালকের দ্বারা পরিবৃত না হইলে গৃহ শ্মশান-সমান হয়, কিন্তু বালক কর্ত্তৃক পরিবৃত হওয়া প্রযুক্তই তোমার গৃহ শ্মশান-সমান হোয়েছে।" এই বলিয়া সমীপস্থ সকলকে চোক্ টিপিতেন, ও সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিলে পর তিনি সন্তোষের সহিত মুহুর্মুহুঃ নস্য লইতেন ওপারের একটি মেয়ের সঙ্গে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সম্বন্ধ হইয়াছে। এ কয় দিন পণ্ডিত মহাশয় বড় মনের স্ফূর্ত্তিতে আছেন। পাঠশালার ছুটি হইয়াছে। আজ পাত্র দেখিতে আসিবে, পাড়ার কোন দুষ্ট লোকের পরামর্শ শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয় নরেন্দ্রের নিকট হইতে এক জোড়া ফুল মোজা, জরির পোষাক ও পাগ্‌ড়ি চাহিয়া আনিলেন। পাড়ার দুষ্ট লোকেরা এই সকল বেশ পরাইয়া তাঁহাকে সং সাজাইয়া দিল। ক্ষুদ্র পরিসর পাগ্‌ড়িটি পণ্ডিত মহাশয়ের বিশাল মস্তকের টিকির অংশ টুকু অধিকার করিয়া রহিল মাত্র, চার পাঁচটা বোতাম ছিঁড়িয়া কষ্টে স্বষ্টে পণ্ডিত মহাশয়ের উদরের বেড়ে চাপকান কুলাইল। অনেক ক্ষণের পর বেশ ভূষা সমাপ্ত হইলে পর সার্ব্বভৌম মহাশয় দর্পণে একবার মুখ দেখিলেন। জরির পোষাকের চাকচিক্য দেখিয়া তাঁহার মন বড় তৃপ্ত হইল। কিন্তু সেই ঢল্‌ঢোলে জুতা পরিয়া, আঁট সাঁট চাপকান গায়ে দিয়া চলিতেও পারেন না, নড়িতেও পারেন না, জড় ভরতের মত একস্থানে বসিয়াই রহিলেন। মাথা একটু নিচু করিলেই মনে হইতেছে পাগ্‌ড়ি বুঝি খসিয়া পড়িবে। ঘাড় বেদনা হইয়া উঠিল, তথাপি যথাসাধ্য মাথা উঁচু করিয়া রাখিলেন। ঘণ্টা খানেক এইরূপ বেশে থাকিয়া তাঁহার মাথা ধরিয়া উঠিল, মুখ শুকাইয়া গেল, অনর্গল ঘর্ম্ম প্রবাহিত হইতে লাগিল, প্রাণ কণ্ঠাগত হইল। পল্লীর ভদ্রলোকেরা আসিয়া অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাঁহার বেশ পরিবর্ত্তন করাইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার অবাবহিত গৃহ পরিষ্কৃত ও সজ্জিত করিবার নিমিত্ত নানা খোসামোদ করিয়া নিধিরাম ভট্টকে আহ্বান করিয়াছেন। এই নিধিরামের উপর পণ্ডিত মহাশয়ের অতিরিক্ত ভক্তি ছিল, তিনি বলিতেন, গার্হস্থ্য ব্যাপার সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতে নিধি তাঁহার পুরাতন গৃহিণীর সমান, মকদ্দমার নানাবিধ জটিল তর্কে সে স্বয়ং মেজেষ্টোর সাহেবকেও ঘোল পান করাইতে পারে এবং সকল বিষয়ের সংবাদ রাখিতে ও চতুরতা পূর্ব্বক সকল কাজ সম্পন্ন করিতে সে কালেজের ছেলেদের. সমানই হউক্ বা কিছু কমই হউক্।

চতুরতাভিমানী লোকেরা আপনার অভাব লইয়া গর্ব্ব করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি গার্হস্থ্য ব্যবস্থার চতুরতা জানাইতে চায়, সে আপনার দারিদ্র্য লইয়া গর্ব্ব করে, অর্থাৎ অর্থের অভাব সত্বেও কেমন সুচারু রূপে সংসারের শৃঙ্খলা সম্পাদন করিতেছি। নিধি তাঁহার মূর্খতা লইয়া গর্ব্ব করিতেন। গল্প-বাগীশ লোক মাত্রেই পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি বড়

অনুকূল, কারণ নীরবে সকল প্রকারের গল্প শুনিয়া যাইতে ও বিশ্বাস করিতে পল্লীতে পণ্ডিত মহাশয়ের মত আর কেহই ছিল না। এই গুণে বশীভূত হইয়া নিধি মাসের মধ্যে প্রায় দুই শত বার করিয়া তাঁহার এক বিবাহের গল্প শুনাইতেন। গল্পের ডাল পালা ছাঁটিয়া ছুটিয়া দিলে, সার মর্ম্ম এইরূপ দাঁড়ায়—নিধিরাম ভট্ট বর্ণ পরিচয় পর্য্যন্ত শিখিয়াই লেখা পড়ায় দাঁড়ি দিয়াছিলেন, কিন্তু চালাকির জোরে বিদ্যার অভাব পূরণ করিতেন। নিধির বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে; কিন্তু এমন শ্বশুর পৃথিবীতে নাই, যে নিধির মত গোমূর্খকে জানিয়া শুনিয়া কন্যা সম্প্রদান করে। অনেক কৌশলে ও পরিশ্রমে পাত্রী স্থির হইল। আজ জামাতাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছে। অদ্বিতীয় চতুর নিধি দাদার সহিত পরামর্শ করিয়া একটি পাল্কী আনাইল এবং চাপকান ও শামলা পরিয়া ওটি কতক কাগজের তাড়া হাতে করিয়া কন্যা-কর্ত্তাদিগের সম্মুখেই পাল্কীতে চড়িলেন। দাদা কহিলেন "ও নিধি, আজ যে তোমাকে দেখতে এয়েচেন।" নিধি কহিলেন "না দাদা, আজ সাহেব সকাল সকাল আস্‌বে, ঢের কাজ ঢের লেখা পড়া আছে, আজ আর হোচ্চে না।" কন্যা-কর্ত্তারা জানিয়া গেল যে, নিধি কাজ কর্ম্ম করে, লেখা পড়াও জানে। তাহার পর দিনেই বিবাহ হইয়া গেল। নিধি ইহার মধ্যে একটি কথা চাঁটিয়া যায়, আমরা সেটি সন্ধান পাইয়াছি; পাড়ার একটী এণ্ট্রেন্স ক্লাসের ছাত্র তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল যে, যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কোন্ কলেজে পড়, তবে বলিও বিষ্ণু কলেজে।" দৈবক্রমে বিবাহ-সভায় ঐ প্রশ্ন করায় নিধি গম্ভীর ভাবে উত্তর দিয়াছিল বিষ্ণু কালেজে! ভাগ্যে কন্যা-কর্ত্তারা নিধির মূর্খতাকে রসিকতা মনে করে তাই সে যাত্রায় সে মানে মানে রক্ষা পায়।

নিধি আসিয়াই মহা গোলযোগ বাধাইয়া দিলেন। ওরে ও—ওরে তা—এ ঘরে একবার, ও ঘরে একবার, এটা ওল্টাইয়া, ওটা পাল্টাইয়া, দুই একটা বাসন ভাঙ্গিয়া, দুই একটা পুঁথি ছিঁড়িয়া, পাড়া শুদ্ধ তোল পাড় করিয়া তুলিলেন। কোন কাজই করিতেছেন না অথচ মহা গোল, মহা ব্যস্ত; চটি জুতা চট্ চট্ করিয়া এঘর ওঘর, এবাড়ি ওবাড়ি, এপাড়া ওপাড়া করিতেছেন, কোন খানেই দাঁড়াইতেছেন না, উর্দ্ধশ্বাসে ইহাকে দু একটি উহাকে দুই একটি কথা বলিয়া আবার সট্ সট্ করিয়া গুরু মহাশয়ের বাড়ি প্রবেশ করিতেছেন। ফলটা এই, সন্ধ্যার সময় গিয়া দেখিব, সার্ব্বভৌম মহাশয়ের বাড়ি যে কে সেই, তবে পূর্ব্বে একদিনে যাহা পরিষ্কৃত হইত, এখন এক সপ্তাহেও তাহা হইবে না। যাহা হউক্, গৃহ পরিষ্কার করিতে গিয়া একটি গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছিল, ঝাঁটার আঘাতে, লোক জনের কোলাহলে তিন ঘর বোলতা বদ্রোহী হইয়া উঠিল। নিধিরামের নাক মুখ ফুলিয়া উঠিল, চটি জুতা ফেলিয়া, টিকি উড়াইয়া, কোঁচার কাপড়ে পা জড়াইতে জড়াইতে, চৌকাটে হুঁচট খাইতে খাইতে, পণ্ডিত

মহাশয়কে গালি দিতে দিতে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। এক সপ্তাহ ধরিয়া বাড়ির ঘরে ঘরে বিশৃঙ্খল বোলতার দল উড়িয়া বেড়াইত; বেচারী পণ্ডিত মহাশয় দশ দিন আর অরক্ষিত গৃহে বোলতার ভয়ে প্রবেশ করেন নাই, প্রতিবাসীর বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পরে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, ও যাইবার সময় ঘট ঘড়া ইত্যাদি যে সকল দ্রব্য বাড়িতে দেখিয়া গিয়াছিলেন,আসিবার সময় তাহা আর দেখিতে পাইলেন না।

অদ্য বিবাহ হইবে। পণ্ডিত মহাশয় কাল সমস্ত রাত স্বপ্ন দেখিয়াছেন। বহুকালের পুরাণো সেই ঝাঁটা গাছটি স্বপ্নে দেখিতে পাইয়াছিলেন, এটি তাঁহার শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে হইল। হাসিতে হাসিতে প্রত্যুষেই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াছেন। চেলীর জোড় পরিয়া চন্দন-চর্চ্চিত কলেবরে ভাবে ভোর হইয়া বসিয়া আছেন। থাকিয়া থাকিয়া সহসা পণ্ডিত মহাশয়ের মনে একটি দুর্ভাবনার উদয় হইল; তিনি ভাবিলেন, সকলইত হইল এখন নৌকায় উঠিবেন কি করিয়া। অনেক ক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিলেন; বিশ বাইশ ছিলিম তামকূট ভস্ম হইলে ও দুই এক ডিবা নস্য ফুরাইয়া গেলে পর একটা সদুপায় নির্দ্ধারিত হইল। তিনি ঠিক করিলেন যে, নিধিরামকে সঙ্গে লইবেন, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, নিধিরাম সঙ্গে থাকিলে নৌকা ডুবিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। নিধির অন্বেষণে চলিলেন; সেদিনকার দুর্ঘটনার পরে নিধি, আর পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়িমুখা হইব না বলিয়া স্থির করিয়াছিল, অনেক খোষামোদে স্বীকৃত হইল। এইবার নৌকায় উঠিতে হইবে। সার্ব্বভৌম মহাশয় তীরে দাঁড়াইয়া নস্য লইতে লাগিলেন। আমাদের নিধিরামও নৌকাকে বড় কম ভয় করিতেন না, যদি কর্ত্তা কর্ত্রীদের বাড়িতে আহারের প্রলোভন না থাকিত তাহা হইলে প্রাণান্তেও নৌকায় উঠিতেন না। অনেক কষ্টে পাঁচ ছয় জন মাঝিতে ধরাধরি করিয়া তাঁহাদিগকে কোন ক্রমে ত নৌকায় তুলিল। নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকা যতই নড়ে চড়ে পণ্ডিত মহাশয় ততই ছট্‌ফট করেন। পণ্ডিত মহাশয় যতই ছট্‌ফট করেন, নৌকা ততই টল্‌মল করে; মহা হাঙ্গাম, মাঝীরা বিব্রত, পণ্ডিত মহাশয় চিৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন, ও মাঝিদিগকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন যে, যদিই পাড়ি দিতে হইল তবে যেন ধার ধার দিয়া দেওয়া হয়। নিধিরামের মুখে কথাটি নাই, তিনি এমন অবস্থায় আছেন যে, একটু বাতাস উঠিলে বা একটু মেঘ দেখা দিলেই নৌকার মাস্তলটা লইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন। পণ্ডিত মহাশয় আকুল ভাবে নিধির মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। দুই এক জায়গায় তরঙ্গ বেগে নৌকা একটু টলমল করিল, নিধি লাফাইয়া উঠিল, পণ্ডিত মহাশয় নিধিকে জড়াইয়া ধরিলেন। তখনো তাঁহার বিশ্বাস ছিল নিধিকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে প্রাণহানির কোন সম্ভাবনা নাই। নিধি সার্ব্বভৌম মহাশয়ের বাহুপাশ ছাড়াইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, পণ্ডিত মহা-

শয় ততই প্রাণপণে আঁটিয়া ধরিতে লাগিলেন। শীর্ণকায় নিধি দারুণ নিষ্পেষণে রুদ্ধশ্বাস হইয়া যায় আর কি, রোষে, বিরক্তিতে, যন্ত্রণায় চিৎকার করিতে লাগিল। এইরূপ গোলযোগ করিতে করিতে নৌকা তীরে লাগিল। মাঝিরা এরূপ নৌকা-যাত্রা আর কখনো দেখে নাই, তাহারা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, কণ্ঠাগত-প্রাণ নিধি নিশ্বাস লইয়া বাঁচিলেন, পণ্ডিত মহাশয় এক ঘটি জল খাইয়া বাঁচিলেন।

বিবাহের সন্ধ্যা উপস্থিত, পণ্ডিত মহাশয় টিকিযুক্ত শিরে টোপর পরিয়া গদির উপর বসিয়া আছেন। অনাহারে, নৌকার পরিশ্রমে ও অভ্যাস-দোষে দারুণ ঢুলিতেছেন, মাথার উপর হইতে মাঝে মাঝে টোপর খসিয়া পড়িতেছে, পার্শ্ববর্তী নিধি মাঝে মাঝে এক একটি গুঁতা মারিতেছে, সে এমন গুঁতা যে তাহাতে মৃত ব্যক্তিরও চৈতন্য হয়, সেই গুঁতা খাইয়া পণ্ডিত মহাশয় আবার ধড়ফড়িয়া উঠিতেছেন ও শিরচ্যুত টোপরটি মাথায় পরিয়া মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে চারি দিক অবলোকন করিতেছেন, সভায় চোক টেপাটেপী করিয়া হাসি চলিতেছে। লগ্ন উপস্থিত হইল, বিবাহের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। পণ্ডিত মহাশয় দেখিলেন, পুরোহিতটি তাঁহারি টোলআউট্ শিষ্য। শিষ্য মহা লজ্জায় পড়িয়া গেল, পণ্ডিত মহাশয় কানে কানে কহিলেন, তাহাতে আর লজ্জা কি, এবং লজ্জা করিবার যে কোন প্রয়োজন নাই একথা তিনি স্কন্দ ও কল্কিপুরাণ হইতে উদাহরণ প্রয়োগ করিয়া প্রমাণ করিলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় বিবাহ-আসনে উপবিষ্ট হইলেন। পুরোহিত মন্ত্র বলিবার সময় একটা ভুল করিল। সংস্কৃতে ভুল পণ্ডিত মহাশয়ের সহ্য হইল না, অমনি মুগ্ধবোধ ও পাণিনি হইতে গণ্ডা আষ্টেক সূত্র আওড়াইয়া ও তাহা ব্যাখ্যা করিয়া পুরোহিতের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলেন। পুরোহিত অপ্রস্তুত হইয়া ও ভেবাচেকা খাইয়া আরো কতকগুলি ভুল করিল। পণ্ডিত মহাশয় দেখিলেন যে, তিনি টোলে তাহাকে যাহা শিখাইয়াছিলেন, পুরোহিত বাবাজি চাল কলার সহিত তাহা নিঃশেষে হজম করিয়াছেন। বিবাহ হইয়া গেল, উঠিবার সময় সার্ব্বভৌম মহাশয় কিরূপ বেগতিকে পায়ে পা জড়াইয়া তাঁহার শ্বশুরের ঘাড়ে পড়িয়া গেলেন, উভয়ে বিবাহ সভায় ভূমিসাৎ হইলেন। বরের কাপড় ছিঁড়িয়া গেল, টোপর ভাঙ্গিয়া গেল, শ্বশুরের শূলবেদনা ছিল, স্থূলকায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার উদর চাপিয়া পড়াতে তিনি বিষম চিৎকার করিয়া উঠিলেন। ৭।৮ জন ধরাধরি করিয়া উভয়কে তুলিল, সভাশুদ্ধ লোক হাসিতে লাগিল, পণ্ডিত মহাশয় মর্ম্মান্তিক অপ্রস্তুত হইলেন ও দুই একটি কি কথা বলিলেন, তাহার অর্থ বুঝা গেল না। একবার দৈবাৎ অপ্রস্তুত হইলে পদে পদে অপ্রস্তুত হইতেই হইবে। অন্তঃপুরে গিয়া গোলেমালে পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার শাশুড়ির পা মাড়াইয়া দিলেন, তাঁহার শাশুড়ি "নাঃ—কিছু হয় নাই!" বলিলেন ও অন্তরে গিয়া সিক্ত বস্ত্রখণ্ড তাঁহার পায়ের আঙুলে

বাধিয়া আসিলেন। আহার করিবার সময় দৈবক্রমে গলায় জল বাধিয়া গেল, আধ-ঘণ্টা ধরিয়া কাশিতে কাশিতে নেত্র অশ্রু-জলে ভরিয়া গেল। বাসর-ঘরে বসিয়া আছেন এমন সময়ে একটা আরসুলা আসিয়া তাঁহার গায়ে উড়িয়া বসিল। অমনি লাফা-ইয়া ঝাঁপাইয়া, হাত পা ছড়াইয়া, মুখ বি-কটাকার করিয়া তাঁহার শালীদের ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িলেন। আবার দুইটি চারিটি কান মলা খাইয়া ঠিক স্থানে আসিয়া বসি-লেন। একটা কথা ভুলিয়া গিয়াছি, স্ত্রী-আচার করিবার সময় পণ্ডিত মহাশয় এমন উপর্য্যু-পরি হাঁচিতে লাগিলেন, যে চারি দিকের মেয়েরা বিব্রত হইয়া পড়িল। বাসর ঘরের বিপদ হইতে কি করিয়া উদ্ধার হইবেন এবিষয়ে পণ্ডিত মহাশয় অনেক ভাবিয়া ছিলেন, সহসা নিধিকে মনে পড়িয়াছিল, কিন্তু নিধির বাসর-ঘরে যাইবার কোন উপায় ছিল না। যাহা হউক্ ভাল মানুষ বেচারী অতিশয় গোলে পড়িয়া ছিলেন। শুনিয়াছি দুটি একটি কি কথার উত্তর দিতে গিয়া স্মৃতি ও বেদান্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া ছিলেন। এবং যখন তাঁহাকে গান করিতে অনুরোধ করে, অনেক পীড়াপীড়ির পর গাহিয়া ছিলেন "কোথায় তারিণী মাগো বিপদে তারহ সুতে।" এই তিনি মনের সঙ্গে গাহিয়া ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাগিণীর দিকে বড় একটা নজর করেন নাই, যে সুরে তিনি পুঁতি পড়ি-তেন, সেই সুরেই গানটি গাহিয়া ছিলেন। যাহা হউক অনেক কষ্টে বিবাহ-রাত্রি অতি-বাহিত হইল।

স্বাস্থ্য।

অতঃপর যে সকল শারীরিক নিয়ম প্রতিপালিত হইলে জনসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষা হইতে পারে এই প্রস্তাবে যথাসাধ্য ঐ সকল নিয়ম প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইব। এতদুপলক্ষে উপদেশ বাক্য আমাদের সক-লের তুষ্টিকর না হইলেও হইতে পারে। কিন্তু ঐ গুলি যে তাহাদের স্বাস্থ্য রক্ষার বিশেষ উপযোগী হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

আমাদের জীবিত-কাল চারি ভাগে বিভক্ত। ১ম শৈশব, ২য় যৌবন, ৩য় প্রৌঢ়, ৪র্থ বার্দ্ধক্য। জন্ম হইতে ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শৈশব বা বাল্য কাল, তাহার পরই যৌবন কাল। ১৬ হইতে ৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ কালের সীমা। ৩৫ বৎসর হইতে পঞ্চাশ পর্য্যন্ত প্রৌঢ়াবস্থা। তাহার পর বার্দ্ধক্য। স্ত্রীলোকেরা পুরুষ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অগ্রে যৌবন-সীমায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার অবস্থানুসারে স্বা-স্থ্যের পৃথক পৃথক নিয়ম আছে। সুতরাং আম-রাও তদনুসারে উহার এক একটি অবস্থার নিয়ম পৃথক করিয়া বলিব। ইহাতে কোন কোন স্থানে পুনরুক্তি-দোষ ঘটিলেও ঘটিতে

পারে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়া পাঠকগণ সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

১ম শৈশব, কৌমার বা বাল্যাবস্থা।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত কালকে বাল্য কাল বলে। এই কালে প্রায় সকলেই পিতা মাতার অধীন থাকে। সুতরাং মানুষের সুস্থা-সুস্থতা তাঁহাদের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। দুঃখের বিষয় এই যে অনেকেই এই কালে কিরূপে সন্তান প্রতিপালন করিতে হয় তাহা জানেন না। আর যাঁহারা জানেন তাঁহারাও তদ্বিষয়ে মনোযোগী হন না। এই জন্যই আমাদের দেশে কি ধনী কি দরিদ্র সকলের গৃহেই বালক বালিকার মৃত্যু সংখ্যা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। আবার ধনী অপেক্ষা নির্ধনের মধ্যে শৈশব মৃত্যু আরও বেশী। ঐ সকল লোকের অনভিজ্ঞতা ও অসাবধানতাই ঐ রূপ ঘটনার মূল-কারণ। এক্ষণে যে যে উপায় অবলম্বন করিলে সাধারণে এই অনর্থ-পরম্পরা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে তাহা নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

১। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে পর প্রথমতঃ তাহার নাড়ী কাটিতে হইবে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত সন্তান কাঁদিয়া না উঠে, অথবা উহার শ্বাস প্রশ্বাস বহিতে আরম্ভ না হয়, ততক্ষণ নাড়ী কাটা উচিত নহে। ইহার পূর্ব্বে নাড়ীচ্ছেদ করিলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। নাড়ীচ্ছেদনের নিয়ম এই যে, সন্তানের নাভিমূলের ৩।৪ ইঞ্চ উপরে ফিতে দিয়া একটি শক্ত গাঁঠ দিবে। এই গ্রন্থির ১॥।২ ইঞ্চ উপরে ঐরূপ আর একটি গাঁঠ দিতে হইবে। তাহার পর একখানি কাঁচি লইয়া এই দুই গ্রন্থির মধ্যস্থলে কাটিয়া ফেলিবে। এই গুলি ধাত্রীর কার্য্য। কিন্তু পিতা মাতারও ইহা জানা উচিত। কারণ অনেক স্থলে ধাত্রীর অভাব হইতে পারে। এবং অভাব না হইলেও স্থান-বিশেষে ঐ সকল লোক এতই অজ্ঞ যে, সন্তানের নাড়ী সমূলে ছেদ করিয়া বিষম অনর্থ ঘটাইয়া থাকে।

কখন কখন সন্তান মৃতবৎ ভূমিষ্ঠ হয়। তখন চিকিৎসক উপস্থিত না থাকিলে সহসা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। এজন্য তদ্বিষয়ে যাহা যাহা করিতে হয় তাহাও বলিতেছি। প্রথমতঃ সন্তানের মুখের ভিতর একটি অঙ্গুলি দিয়া তন্মধ্যস্থ বদ্ধ শ্লেষ্মা বাহির করিবে। পরে গুহ্য-দ্বারের উপরিভাগে কয়েক বার আস্তে আস্তে আঘাত করিতে হইবে। ইহাতেও সন্তানের চেতনা সম্পাদন না হইলে বক্ষঃস্থল, পৃষ্ঠদেশ, ও পাদমূলে কোমল বস্ত্র বা ব্রুশ দিয়া ঘর্ষণ করিতে থাকিবে, অথবা ঐ সকল স্থানে সুশীতল জল নিক্ষেপ পূর্ব্বক ফ্লানেল বা রেশমি কাপড় দিয়া ঘন ঘন ঘর্ষণ করিবে। এতদ্ভিন্ন সন্তানের মুখে ও নাসিকা মধ্যে পালুক ও ফুৎকার দেওয়াতেও অনেক সময়ে চৈতন্যের সঞ্চার হইতে পারে। এই সময়ে যাহাতে সন্তানের গাত্রে শীতল বাতাস না লাগে তজ্জন্য গরম ফ্লানেল দিয়া সর্ব্ব শরীর আবৃত রাখা উচিত। যদি

তাহাতেও সন্তানের চেতনা না হয় তাহা হইলে উহাকে গরম জলের টবে বসাইবে ও বুক পিঠ ঘর্ষণ করিতে থাকিবে। দুই ঘণ্টাকাল এইরূপ চেষ্টা করিয়াও যদি বিফল-যত্ন হও তবেই উহার জীবনাশা ত্যাগ করিবে।

যে সন্তান সুস্থ শরীরে জন্মগ্রহণ করে, তাহার জন্য ঐরূপ কোন ক্রিয়ার আবশ্যকতা নাই। নাড়ী কাটার পর উহার সর্ব্ব শরীর গরম জল (৮০ ডিগ্রি) দিয়া পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়, তাহার পর শুষ্ক বস্ত্র দিয়া মুছাইতে হয়। মুছাইবার সময় বগল ও কুঁচকির জায়গা উত্তম রূপে দেখিতে হয়, কারণ ঐ সকল স্থানে ক্লেদ থাকিলে পরে তথায় ঘা হইবার সম্ভাবনা। অনন্তর দুই পুরু পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা নাভিস্থল আবৃত করিয়া তদুপরি একটী পেটী বাঁধিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু এমন করিয়া বাঁধা উচিত নাহাতে সন্তানের হস্তপদ চালনার ব্যাঘাৎ না হয়। পরে উহাকে একটী পরিষ্কার শয্যায় শয়ন করাইবে এবং যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে তজ্জন্য গলদেশ পর্য্যন্ত গরম কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। যাহাতে চক্ষের উপর সূর্য্য বা প্রদীপের আলো না পড়িতে পায় তাহারও উপায় বিধান করিয়া দিবে। অনেক জননী এই আলোক হইতে কি অনিষ্ট ঘটিতে পারে, তাহা অবগত না থাকায় চিরকালের জন্য সন্তানের চক্ষু নষ্ট করিয়া ফেলেন।

ভূমিষ্ঠ হইলে পর কিছু দিন পর্য্যন্ত সন্তানকে গরমে রাখিতে হয়। কারণ বহির্স্থ বায়ুর অপেক্ষা মাতৃগর্ভের উষ্ণতা অনেক বেশী। সুতরাং সহসা উত্তাপের এত ইতর বিশেষ ঘটিলে সন্তানের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ হানি হইবার সম্ভাবনা। এজন্য যাহাতে উক্ত উত্তাপের বৈষম্য না হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। এজন্য আমাদের দেশে আপামর সাধারণ সকলেই সূতিকা-গৃহে আগুন রাখিয়া থাকে। অনেকে আবার ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া অগ্নির তাপ দ্বারা সন্তানের শরীর উষ্ণ রাখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের দেশে এই সকল অনুষ্ঠান নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে তাপ দেওয়া দূরে থাকুক, গৃহ মধ্যে অগ্নি রাখাও অবিধেয়। যদি কোন সন্তানের শরীর স্পর্শ করিলে শীতল বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলেই উক্ত প্রকার কৃত্রিম তাপের আবশ্যক হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা যতই উহার উষ্ণতা সম্পাদন করি না কেন, সদ্য-প্রসূত সন্তান মাতৃ-ক্রোড়ে যেমন উষ্ণ থাকে এমন আর কিছুতেই নহে। এই জন্যই দরিদ্র সন্তানের তাপ রক্ষার্থ শীত বস্ত্রাদির তত আবশ্যক হয় না। তিন চার মাসের হইলে সন্তানের শরীরে কৃত্রিম তাপ দেওয়াতে কোন ফলোদয় হয় না। তখন বায়ুর স্বাভাবিক তাপই উহার পক্ষে যথেষ্ট।

এস্থলে আমরা সন্তানের গাত্রাবরণ সম্বন্ধে আর একটি কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। যাহারা মনে করিলে সন্তানের স্বাস্থ্যের জন্য যথোচিত

অর্থ-ব্যয় করিতে পারেন তাঁহারা যেন অর্থ-ব্যয়ের ভয়ে সূতিকা-গৃহে প্রসূতির নিকট দুই চারি খানি পুরাতন কাপড় দিয়া নিশ্চিন্ত না হন। এ সময়ে মাতার নিকট অন্ততঃ ২ ডজন শুতি ও এক ডজন ফ্লানেলের চাদর থাকা উচিত। তাহা হইলে সন্তান ও মাতার কোন প্রকার অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

২। স্তনপান-বিধি।—প্রসবের পূর্ব্ব হইতেই সন্তানের জীবন রক্ষার্থ প্রকৃতি দেবী মাতৃস্তনে দুগ্ধের সঞ্চার করেন। কিন্তু প্রসবের পরেই উহা যথোচিত রূপে নিঃসৃত হইতে থাকে। স্তন হইতে প্রথমে যে দুগ্ধ বাহির হয়, তাহার নাম গাঁজলা। উহা আটার মত গাঢ়, এজন্য অনেকে উহা গালিয়া ফেলে। সন্তানকে খাইতে দেয় না। কিন্তু এরূপ আচরণ কত যুক্তিযুক্ত তাহা বলা যায় না। কারণ ইহাও দেখা গিয়াছে যে, ঐ দুগ্ধ সন্তানের উদরস্থ হইবামাত্র বালক গর্ভাবস্থার সঞ্চিত মল (Meconium) পরিত্যাগ করে। সে যাহাই হউক প্রসূতী একটু সুস্থ ও সবল না হইলে এবং যৎকিঞ্চিৎ আহার না করিলে, সন্তানকে স্তনপান করিতে দেওয়া কখনই উচিত নহে। ইত্যবসরে সন্তান ক্ষুধায় অস্থির হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলে এক বোতল চিনিপানা প্রস্তুত করিয়া কিয়ৎকাল গরম জলে ডুবাইয়া রাখিবে, এবং উহা হইতে মধ্যে মধ্যে চামোচ বা পোলুতে করিয়া সন্তানকে খাইতে দিবে। পরে মাতার প্রসবশ্রান্তি দূর হইলে উহাকে স্তনপান করিতে দিবে। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে অথবা রাত্রিতে প্রসব হইলে সন্তান ও মাতা উভয়েই প্রায় রাত্রিকাল নিদ্রায় অতিবাহিত করে, সুতরাং তন্মধ্যে স্তন, পান করাইবার কোন প্রয়োজন হয় না। যদি হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব প্রকারে চিনি পানার জল দিলেই সন্তান নিস্তব্ধ হইয়া থাকে। ইহাতে আর এই উপকার দর্শে যে, সন্তানের মুখ-মধ্যগত অবশিষ্ট গাঢ় লালা বা শ্লেষ্মা তথা হইতে অপসৃত হইয়া যায় এবং মাতারও রাত্রিকালে বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটে না।

অনেকে প্রসবের পর অকারণ মাতাকে চা, কফি, বা পোর্ট দিয়া থাকেন,কিন্তু এরূপ প্রথা কি প্রসূতী কি সন্তান কাহারো পক্ষে স্বাস্থ্যকর নহে। তৎকালে গরম জল বা দুগ্ধই বিশেষ উপকারী। যতক্ষণ শরীর গরম থাকিবে ততক্ষণ ঈষদুষ্ণ পানীয় দ্রব্যই ব্যবস্থা, শরীর শীতল হইলে ঠাণ্ডা জল বা দুগ্ধে কোন হানি হয় না।

প্রাচীন ভারতের শিল্প।

কালজ্ঞান-সাধন শিল্প।

আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের শিল্প বিষয়ে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তন্মধ্যে কাল-জ্ঞান-সাধন শিল্পই আমাদের প্রথম আলোচ্য বিষয়। পৃথিবী সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া

দিবা রাত্রি উৎপাদন করিতেছেন। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন পুনঃপুনঃ ফিরিয়া আইসে, মনুষ্য জন্মিয়াই ইহা দেখিতে পায়। তাহা লইয়া পক্ষ, মাস, বৎসর, শত বৎসর, যুগ প্রভৃতির কল্পনা করে। এ সকল স্থূল কাল। এইরূপ সূক্ষ্মকালও আদিম মানবের কল্পনার বিষয় হইয়াছিল স্পষ্ট প্রমাণ হয়। যাম, অর্দ্ধযাম, মুহূর্ত্ত, দণ্ড, দণ্ডার্দ্ধ,—পল, অনুপল, বিপল, ত্রুটি প্রভৃতি প্রাচীন প্রাচীন শব্দ সকল উহার সাক্ষ্য-স্থল।

দণ্ড, দণ্ডার্দ্ধ প্রভৃতি সূক্ষ্মকাল সকল কি বর্ত্তমান কালিক কি প্রাচীন কালিক ব্যক্তি মাত্রেরই প্রয়োজনীয়। মনে করিবেন না যে, প্রথম কালের মানবদিগের অত সূক্ষ্ম কালের প্রয়োজন ছিল না। সূক্ষ্মকালের প্রয়োজন ছিল বলিয়াই তদ্বোধক শব্দ-রাশি উৎপন্ন হয়। যখন দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন কালেও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কালের ব্যবহারের আবশ্যকতা ছিল এবং তদ্বোধক শব্দ ছিল, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই সেই কাল নির্ণয় করিবার কোন না কোন উপায় ছিল। বৈদিক কালের যন্ত্র-বিদ্যা পর্য্যালোচনা করিলেই সেই সেই সূক্ষ্ম কালের ব্যবহার-সত্তা নির্ণয় হয়। অতএব সূক্ষ্মকালের ব্যবহার এবং তাহার নির্ণয়োপায় সকল আমাদের, পূর্ব্বপুরুষদিগের অজ্ঞাত ছিল না।

অনুসন্ধান দ্বারা জানা যায় যে, অতি প্রাচীন কালে সূক্ষ্ম বা খণ্ড কাল-গুলি স্বাভাবিক ঘটনা দ্বারা নির্ণীত হইত। শব্দোচ্চারণ, শ্বাস-প্রশ্বাস, মনুষ্য-দেহের রক্ত সঞ্চালন (নাড়ীর গতি), সূর্য্যের ছায়া, চক্ষের নিমেষ নক্ষত্রের উদয়াস্ত ইত্যাদি।

এই রূপে প্রত্যেক দিবা রাত্রের নিয়মিত নৈসর্গিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া তাহার ভাগ প্রভাগ দ্বারা কাল নির্ণয় হইত। ক্রমে ঐ সকল নৈসর্গিক প্রক্রিয়া আদর্শ করিয়া কৃত্রিম প্রক্রিয়ার আবির্ভাব হইল। ছায়া-যন্ত্র (সন্ ডায়াল) ধনুর্যন্ত্র, চক্রযন্ত্র, তোয়যন্ত্র (জল-ঘড়ি বা তামী ঘড়ি), ময়ূর, নর ও বানরাকৃতি যন্ত্র প্রভৃতি বিবিধ কালজ্ঞান-সাধন যন্ত্রের আবির্ভাব হইল। অবশেষে তৎপরে পারদ ও জল-ঘটিত গ্রীষ্ম বর্ষাদি পরিমাপক যন্ত্রও (থর্ম্মোমেটর ও ব্যারোমেটর) সৃষ্ট হইয়াছিল। এ সকলের বিশ্বাস্য প্রমাণ ও নির্ম্মাণ-কৌশল প্রভৃতি পরে প্রদর্শিত হইবে। শব্দোচ্চারণ শ্বাস প্রশ্বাস, নাড়ীর গতি, নেত্রোন্মেষ প্রভৃতি নিয়মিত নৈসর্গিক ঘটনা দৃষ্টে যে কাল নির্ণয় হইত—অগ্রে তাহারই বর্ণন করা যাউক।

শব্দোচ্চারণ—শব্দোচ্চারণ দ্বারা কিরূপে খণ্ড কালের নির্ণয় হইত, তাহা দেখান যাইতেছে।

কণ্ঠ দ্বারা বর্ণ ব্যক্ত করিতে যে স্বরের আবশ্যক হয়, সেই স্বরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার প্রত্যেক সম সূক্ষ্মাংশ গুলিকে মাত্রা বলে; ছন্দঃগাঁথার মতন তাহার ১।২ বা ততোধিক একত্রিত করিয়া যে বিশেষ বিশেষ মাত্রা জন্মে, তাহারই বিশেষ বিশেষ নাম হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত। এই হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত কাল-ঘটিত নিয়ম হইতে সম্ভূত।

ইহা উচ্চ, নীচ, বিভিন্ন স্বরে আবদ্ধ হইলে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত নামে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন কালের ঋষিরা যখন বর্ণোচ্চারণ সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিলেন, তখন তাঁহারা দেখিলেন যে, সমস্ত দিবা রাত্রের মধ্যে ২১৬০০০—এর অধিক গুরুবর্ণ উচ্চারিত হয় না। একটি গুরুবর্ণে দুইটি মাত্রা থাকে, সুতরাং সমস্ত দিবারাত্রে, ৪৩২০০০ মাত্রাত্মক সূক্ষ্ম খণ্ড-কাল আছে। পরে তাঁহারা ইহাও অবধারিত করিলেন যে, এক দিবারাত্রের ৪৩২০০০ অংশের এক অংশ একমাত্রা।

যখন এইরূপ কাল-জ্ঞান ও এবম্প্রকার বর্ণোচ্চারণ নির্ণীত হইল তখনই তাহাকে ভাগ করিয়া তদন্তর্গত দণ্ড, দণ্ডার্দ্ধ প্রভৃতি কাল-নিশ্চায়ক বর্ণোচ্চারণ বিধিবদ্ধ করিলেন—

"দশগুর্ব্বক্ষরোচ্চারঃ
কালঃ প্রাণঃ ষড়াত্মকঃ।
তৈঃ পলং স্যাৎ ততঃ
ষষ্ট্যা দণ্ড ইত্যভিধীয়তে॥"

ইহার অর্থ এই যে, দশটি গুরু অক্ষর ঠিক্ করিয়া উচ্চারণ করিতে যে সময় টুকু লাগে, তাহার নাম প্রাণ। ছয় প্রাণে ১ পল। তাহার ৬০ পলে ১ দণ্ড এবং এতাদৃশ ৬০ দণ্ডে এক অহোরাত্র।

এই রূপে অতি প্রাচীন কালের লোকেরা অক্ষর উচ্চারণ করিয়া দণ্ড পল, দণ্ডার্দ্ধ প্রভৃতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খণ্ড কাল সকল ব্যবহার করিতেন, যাহাতে অক্ষর ঠিক্ হয় অর্থাৎ সমরাত্রিন্দিবার এক অহোরাত্রের ২১৬০০০ গুরুবর্ণ বা ৪৩২০০০ লঘু বর্ণের উচ্চারণ সমাপ্ত হয়, এরূপ করিয়া শিক্ষা ও অভ্যাস করিতেন। শিক্ষা ও অভ্যাস-বলে তাঁহারা অক্ষর উচ্চারণ করিয়া অনায়াসে সূক্ষ্ম কাল গুলি অবধারণ করিতেন। পূর্ব্বে এই শ্রেণীর শিক্ষিত লোক অনেক ছিল। পরবর্ত্তী ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা এই কাল নির্ণায়ক বর্ণ-ঘটিত একটি শ্লোক প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি প্রচারিত আছে। তাহার নাম "পল পড়া শ্লোক"। যথা—

মাকান্তে পক্কস্তান্তে
পর্য্যাকাশে দেশে স্বাপ্সীঃ।
কান্তং বক্ত্রং পূর্ণং চন্দ্রং
মত্বা রাত্রৌ চেৎ ক্ষুৎকামঃ॥
প্রাটং প্রাটং শ্চেতশ্চেতো
রাহুঃ ক্রূরঃ প্রাদ্যাৎ।
তস্মাদ্ধান্তে হর্ম্যস্থান্তে
শয্যৈকান্তে কর্ত্তব্যা॥

এই শ্লোকটি একবারে ৬০টি গুরু অক্ষরে রচিত। ঠিক নিয়মে একবার এই শ্লোকটি পড়া হইলেই জানা যাইত যে, এক পল সময় হইল। ইতি পূর্ব্বে দুর্গোৎসবের সন্ধি-পূজার সময় কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে পল-পড়া বামনেরা এই শ্লোক পাঠ করিয়া সন্ধি-পূজার সময় অবধারণ করিয়া দিত।

অনেকে বলিতে পারেন যে, উপরোক্ত শ্লোকটি একবার পড়িলেই যে এক পল হইবে এবং ৬০ বার পড়িলেই যে এক দণ্ড হইবে, উহা ঠিক্ হইতেও না পারে। তবে একটা স্থূল বুঝা মাত্র। আমরা তাহাতে

উত্তর করি যে, না—শুদ্ধ স্থূল বুঝা নহে, উহা সূক্ষ্ম বুঝাও বটে, কারণ; উহার উচ্চারণের যেরূপ নিয়ম দৃষ্ট হয়, তাহাতে ন্যূনাতিরেক হইবার সম্ভাবনা নাই। ইচ্ছা করিয়া দ্রুত, কি ইচ্ছা করিয়া বিলম্বিত পাঠ করিবার যো নাই। পাঠ মাত্রেরই নিয়ম আছে। অদ্রুত, অবিলম্বিত, অবিস্পষ্ট, অতিবিস্পষ্ট, অল্প প্রাণ, ইত্যাদি অনেক প্রকার নিয়ম হিন্দুদিগের বর্ণোচ্চারণে অনুগত আছে। সে সকল নিয়ম রক্ষা করিয়া পাঠ করিলে, বিশেষত তাদৃশরূপে শিক্ষিত ও অভ্যস্ত ব্যক্তি অতি সাবধানে পাঠ করিলে কখনই ন্যূনাধিক্য ঘটে না। আমরা অশিক্ষিত, তথাপি আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, প্রায় ঠিক্ হয়।

২৪ মিনিটে বাঙ্গালা ১ দণ্ড এবং ২৪ সেকেণ্ডে বাঙ্গালা ১ পল। উপরোক্ত ৬০ গুরুবর্ণ-গ্রথিত শ্লোকটীর উচ্চারণ কাল ১ পল অথবা ২৪ সেকেণ্ড। আমাদের অভ্যাস নাই এবং আমরা বৈদিকদিগের ন্যায় বর্ণোচ্চারণ বিষয়ে শিক্ষিত নহি, তথাপি আমরা ঘড়ি ধরিয়া পাঠ করিয়া দেখিয়াছি, ঐ শ্লোক আবৃত্তি করিতে দুই সেকেণ্ডের অধিক তফাৎ হয় নাই।

ভারতবর্ষবাসী পুরাতন মনুষ্যেরা যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে এইরূপে বর্ণোচ্চারণ-দ্বারা সূক্ষ্ম কাল নির্ণয় করিতেন। ইহাতে অসুবিধা অনেক হইত। একজনে কার্য্য করিবেন, অন্য জনকে তথায় উপস্থিত থাকিয়া অনন্যমনে বর্ণোচ্চারণ করিতে হইত।

বর্ণোচ্চারণের দ্বারা কাল-নির্ণয়ের প্রথা ব্যক্ত করা গেল। আগামী পত্রিকায় শ্বাস প্রশ্বাস, নেত্র-নিমেষ এবং নাড়ীর গতি অনুসারে যে কাল নির্ণয় হইত তাহা ব্যক্ত করিবার মানস রহিল।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

সম্পাদকের বৈঠক।

বাতুলদিগের উপর সূর্য্যের প্রভাব।

গ্যাজেট্ ডেজোপিটো নামক ফরাসিস পত্রিকায় এই বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। পিয়েমো প্রদেশের অ্যালেস্যাণ্ড্রিয়া নামক নগরের বাতুলাশ্রমের অধ্যক্ষ ডাক্তার পঞ্জার মনে প্রথম উদয় হয় যে, হয় তো সূর্য্যকিরণে মস্তিষ্ক-পীড়ার আরোগ্য হইতে পারে। এই কথা তিনি রোম নগরের ফাদর্ সেকিকে বলেন। ফাদর সেকি তাহার এইরূপ উত্তর দেন;—চুম্বক শক্তি-গত আন্দোলনে এবং রঞ্জিত সূর্য্যকিরণে, বিশেষত সূর্য্যের বেগুনি রঙ্গে যেরূপে বাতুলদিগের অবস্থান্তর উপস্থিত হয় তাহার আলোচনা একটি গুরুতর বিষয়। এবং আমার বিবেচনায় ইহা আমাদিগের অনুশীলনেরও একটি অতি উপযুক্ত বিষয়।" ঐ প্রকার আলোক ঐ রংএর কাচের মধ্য-

দিয়া অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফাদর সেকি বলেন বেগুনি রংএ কি এক রকম বিষণ্ণ ভাব আছে—কি এক রকম ভাব যাহাতে মনটা একেবারে দমিয়া যায়। এই জন্যই বোধহয় কবিরা বিষণ্ণতার বেগুনি পরিচ্ছদ কল্পনা করিয়াছেন। বোধ হয় বেগুনি আলোকে দুর্ভাগা বাতুলদিগের স্নায়বীয় উত্তেজনার উপশম হইতে পারে। তিনি ডাক্তার পন্‌জাকে পত্রে এইরূপ পরামর্শ দেন যে তিনি যে ঘরে এই বিষয় লইয়া পরীক্ষা করিবেন যেন সেই ঘরের দেওয়াল ও জান্‌লার শার্শিগুলি বেগুনি রংএ রঞ্জিত হয়। এবং ঐ ঘরে অনেক গুলি জানলা থাকা আবশ্যক—কেন না, তাহা হইলে দিনের মধ্যে সকল সময়েই তন্মধ্যে আলোক প্রবেশ করিতে পারে। যে ঘরে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক দিয়া প্রচুর রূপে সূর্য্যালোক প্রবেশ করে এবং যাহার জানলার শার্শি ও দেওয়াল বেগুনি রংএ রঞ্জিত, রোগীকে এরূপ ঘরে রাত্রি যাপন করিতে হইবে। ডাক্তার পন্‌জা পণ্ডিতবর সেকির পরামর্শ-ক্রমে উপরি-বর্ণিত নিয়মানুসারে কতকগুলি ঘর প্রস্তুত করিয়া তথায় কতকগুলি রোগীকে পরীক্ষাধীন রাখিয়াছিলেন। উহাদের মধ্যে একজন আলাপ-বিমুখ রোগী তিন ঘণ্টা কাল একটা লাল ঘরে থাকিয়া প্রফুল্ল ও প্রিয়-বাদী হইয়া উঠে, আর এক জন আহার-বিমুখ রোগী ২৪ ঘণ্টা কাল ঐ লাল ঘরে থাকিয়া আহারের ইচ্ছা প্রকাশ করে। অত্যন্ত উত্তেজিত আর একজন বাতুলকে একটা নীল ঘরে সমস্ত দিন রাখা হইয়াছিল, এক ঘণ্টা পরে তাহার উত্তেজিত ভাব অনেক প্রশমিত হইল। চক্ষুস্নায়ুর উপর নীল বর্ণের এরূপ প্রবল প্রভাব যে উহাতে এক প্রকার কষ্ট অনুভব হয়। আর একজন রোগীকে নিশাকালে একটি বেগুনি বর্ণ ঘরে রাখা হইয়াছিল—তাহার পর দিবসে সেই ব্যক্তি আপনাকে রোগ-মুক্ত অনুভব করিয়া তাহাকে বাড়ি পাঠাইবার নিমিত্ত ডাক্তার পন্‌জাকে অনুরোধ করে। সেই অবধি সে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

এই সকল পরীক্ষার পর ডাক্তার পন্‌জা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন;—বেগুনি কিরণের বৈদ্যুৎ-রাসায়নিক শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রখর; লাল আলোকও তাপজনক কিরণে পরিপূর্ণ—কিন্তু নীল বর্ণ আলোকে তাপ-জনক কিরণও নাই, বৈদ্যুতিক বা রাসায়নিক কিরণও নাই। ইহার উপকারিতা কি রূপে অম্বিল বুঝান কঠিন; ইহাতে কোন প্রকার উত্তেজক শক্তি আদৌ না থাকায় ইহা উন্মাদ-গ্রস্তদিগের ভয়ানক উন্মত্ততা প্রশমনে আশ্চর্য্যরূপে কৃতকার্য্য হয়।——World of Science.

কৃত্রিম উপায়ে খাদ্যের অন্তঃপ্রয়োগ।

চর্ম্ম ঈষৎ কাটিয়া তাহার মধ্যে খাদ্য প্রবেশ করিয়া দিবার প্রণালী সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সকলেই জানেন চর্ম্ম কাটিয়া তন্মধ্যে মর্ফিয়া প্রবেশ করাইয়া রোগীর নিদ্রাকর্ষণ-প্রথা অনেক বৎসর হইতে প্রচলিত। ক্রয়েগ্ নামক ভিয়েনা নগরের এক-

জন ডাক্তার এই প্রণালী অনুসারে দুগ্ধ চিনি ও ডিমের শাঁস একত্র মিশ্রিত করিয়া চর্ম্ম মধ্যে প্রয়োগ করেন। যে সকল বাতুল-দিগকে সহজে আহার করান যায় না, তাহাদিগকে এইরূপে খাওয়ান সুবিধা। কণ্ঠ-নালীর মধ্যে ঘা হইলে যখন খাদ্য গিলিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়, তখনও বোধ হয় এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করা মন্দ নহে।

ইঁদুর-ধরা মেয়ে।—ফিলাডেল্-ফিয়া লেজর বলেন, পেন্‌সিলভেনিয়া প্রদে-শের এরি নামক স্থানের কিয়ৎ ক্রোশ দূরে একটি মেয়ের ব্যাবহারে সকলেই চমৎকৃত হইয়াছেন। এই মেয়েটির বয়ঃক্রম এক বৎসর। সে যে ঘরে থাকে সেখানে একটি পুরাতন অগ্নি-কুণ্ড আছে। এই অগ্নি কুণ্ডটি ক্ষুদ্র মূষিকে আকীর্ণ। এই অগ্নি-কুণ্ডের কোণে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। মেয়েটির অভ্যাস এই যে, যখনি তার ঘুম ভাঙ্গে তখনি সে বিড়ালবৎ গুঁড়ি মারিয়া সেই ছিদ্রে অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে চক্ষু দিয়া থাকে। যতক্ষণ না একটি মূষিক নির্গত হয় ততক্ষণ সে চুপ করিয়া ঐরূপ ভাবে বসিয়া থাকে। যখনি কোন ইঁদুর বাহির হয় অমনি সে থপ্ করিয়া তাহার গলা চাপিয়া ধরে। এইরূপে শীকারটি যখন তাহার কবলের মধ্যে আইসে, তখন তাহার আর আনন্দের ইয়ত্তা থাকে না—সমস্ত শরীর পুলকে স্পন্দিত হয়—ও বিড়ালের ন্যায় গোঁ গোঁ শব্দ করিতে থাকে। সেই মেয়েটির কেমন এক প্রকার মোহিনী শক্তি আছে যে মূষিকটী বাহির হইবামাত্র একে-বারে যেন অবশ হইয়া পড়ে। পলাইবার কোন চেষ্টা করে না। যদি কোন ব্যক্তি এই সময়ে আসিয়া মূষিকটি তাহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করে, তো সে তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুখের মধ্যে লুকাইয়া রাখে। এই পেন্‌সিলভেনিয়া সুশীলা মেয়েটির মত যদি সব মেয়ের স্বভাব হয়, তাহা হইলে শৈশবের মধুরতা যে কত গুণে বর্দ্ধিত হয় তাহা বলা যায় না!—পেলমেল্ গেজেট্।

ভল্‌টেয়ারের উক্তি।

জীবন।—জীবন-পথ কণ্টকে আকীর্ণ। এই পথে দ্রুত-পদে গমন ভিন্ন এই কণ্টক সকল হইতে উদ্ধার পাইবার আর কোন উপায় নাই। দুঃখের বিষয় আমরা যতই ভাবিব, ততই দুঃখ আমাদিগকে যন্ত্রণা দিবে।

ঔষধ।—একজন যুবক ভল্‌টেয়ারের নি-কট বলে যে তাহার চিকিৎসা শাস্ত্র শিখি-বার সংকল্প আছে। ইহাতে ভল্‌টেয়ার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন;—তুমি যে ব্যাপা-রে হস্তক্ষেপ করিতে যাইতেছ তাহা এই—যে সকল গাছ গাছরার গুণাগুণ প্রায় কিছুই জানা নাই, সেই সকল গাছ গাছরা এমন শরীরে প্রবিষ্ট করা, যে শরীরের বিষয় আরও কম জানা আছে।

ঔষধ অপেক্ষা পথ্য-নিয়ম উৎকৃষ্ট। আপনি আপনার চিকিৎসক হওয়া কর্ত্তব্য। প্রকৃতিকে কেবল সাহায্য করা বিধেয়—তাহার উপর বল প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে।

বিশেষতঃ কি করিয়া সহ্য করিতে হয়—বৃদ্ধ হইতে হয়—অবশেষে মরিতে হয় তাহা আমাদিগের জানা উচিত। কতকগুলি পদার্থ আছে যাহা স্বাস্থ্য জনক—এবং কতকগুলি অনিষ্ট জনক। যাহা পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছ তোমার ধাতে সহ্য হয়, তাহাই অল্প পরিমাণে আহার করিবে। যাহা পরিপাক করা যায় তদ্ভিন্ন আর কিছুই উপকারী নহে। কোন্ ঔষধে পরিপাক হয়?——ব্যায়াম। কিসে ক্ষয়-গ্রস্ত বলের ক্ষতি-পূরণ হয়?——নিদ্রা। কিসে অচিকিৎস্য রোগের উপশম হয়?——ধৈর্য্য।

শ্রমশীলতা।—"আমার যদি ১০০ টা শরীর থাকিত, আমি সকল গুলিকেই ক্লান্ত করিয়া ফেলিতাম।"

মৃত ব্যক্তির গ্রন্থ-সমালোচনা।—সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি-কবি কর্ণেই সম্বন্ধে ভল্টেয়ার বলিয়াছিলেন——"তোষামোদে তাঁহার কি উপকার, সত্য কথা কহিলেই বা তাঁহার কি হানি হইতে পারে? আমি তোষামোদ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছি, না—জন-হিতকারী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি?—কর্ণেই অপেক্ষা সত্য প্রার্থনীয়। মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধার অনুরোধে, জীবন্ত ব্যক্তিদিগকে প্রতারণা করা আমাদিগের উচিত নহে।"

অন্ধ সমালোচনা—"আমি অধুনাতন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের সহিত একদিন আহার করিতেছি। লামট্ হৃদারের নবপ্রকাশিত আখ্যায়িকা সম্বন্ধে সকলেই পরোনাস্তি নিন্দা করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—লাফন্টেনের একটা অতি নিকৃষ্ট আখ্যায়িকারও নিকটে উহা বেঁসিতে পারে না। এই সময়ে আমি বলিলাম লাফন্টেনের রচনাবলীর যে একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কতকগুলি নূতন আখ্যায়িকা যোজিত হইয়াছে। লাফণ্টেনের রচিত বলিয়া একটি আখ্যায়িকা আমি উঁহাদিগের নিকট আবৃত্তি করিলাম। আবৃত্তি করিবামাত্র সকলেই একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন—বলিতে লাগিলেন "ইহা লামটের রচনা-প্রণালী অপেক্ষা কত বিভিন্ন!—কেমন প্রাঞ্জল!—কেমন পরিপাটী!—লাফণ্টেন যে ইহার লেখক, প্রত্যেক কথাতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।" যখন এই সব কথা হইতেছিল আমি তখন মনে মনে হাসিতেছিলাম। কেন না,—ঐ আখ্যায়িকাটি বাস্তবিক লামটের প্রণীত—লাফণ্টেনের নহে।

মিতব্যয়িতা।—মিতব্যয়িতা বদান্যতার আকর।

সুরুচি।—সুরুচি সহজে উপার্জ্জিত হয় না। ইহার উপার্জনে প্রথমে কষ্ট বোধ হয়—সুখ বোধ হয় না। কতকগুলি খেলা আছে যাহাতে কতকটা ব্যুৎপত্তি না জন্মিলে, আমোদ হয় না। ইহাও তদ্রূপ। প্যারি নগরে এরূপ অনেক বিদেশীয়দিগের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে যাঁহারা র‍্যাসীন্ ও দান্তের রচনা-প্রণালীর বিভিন্নতা বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা "আমিদ্" না ক্রয় করিয়া নূতন উপন্যাসগুলি ক্রয় করেন; আমি

অনেক বিদেশে ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি যে যাঁহারা খুব পণ্ডিত তাঁহারা সকল সময়ে সুরুচি-সম্পন্ন নহেন। কারণ আমি প্রায়ই দেখিয়াছি তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের রচনাবলী হইতে এরূপ স্থল সকল উদ্ধৃত করেন যাহা তেমন কিছুই চমৎকার-জনক নহে। তাঁহারা আসল ও ঝুঁটা হিরার বিভিন্নতা বুঝিতে পারেন না। পণ্ডিতগণের মধ্যে অতি অল্প লোকেই সুরুচি-বিষয়ে ভাগ্যবান্। যে সকল কার্য্য আইন-ঘটিত—আয়ব্যয়ের হিসাব-ঘটিত বা ব্যবসা-বাণিজ্য-ঘটিত সে সকল কার্য্য সুকুমার শিল্পের অত্যন্ত বিরোধী। মানব জাতির পক্ষে ইহা অতি লজ্জার বিষয় বলিতে হইবে যে, সুরুচি-দেবী প্রায় শিক্ষিত সমৃদ্ধ অলসদিগেরই পক্ষপাতী হয়েন। ভের্সাই নগরে একজন বুদ্ধিমান মসি-জীবির সহিত আমার পরিচয় ছিল—সে প্রায়ই আমাকে বলিত "আমার অত্যন্ত দুর্ভাগ্য—সুরুচি অর্জনের আমার সময় নাই।"

মশার বাদ্য-যন্ত্র।—পাঠক-গণ আপনারা কি মশার বাদ্য-যন্ত্র কি তাহা জানেন? মশা কানের কাছে ভন্ ভন্ করিলে আমরা তিতিবিরক্ত হইয়া তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া রক্ষা পাই, কিন্তু মশক-ধ্বনি হইতে যে সুশ্রাব্য বাদ্যের সৃষ্টি হইতে পারে ইহা আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর। আমেরিকায় এই অভিনব বাদ্য-যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। সহস্র সহস্র বিজ্ঞাপন সত্ত্বেও অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহা কেহ বিশ্বাস করে নাই, কিন্তু এক্ষণে অবিশ্বাস দূর হইয়াছে ও সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিতে যাইতেছে। এই অদ্ভুত বাদ্য এককালে দেড়শত লোকের শ্রুতিগোচর হইতে পারে।

এই বাদ্যকর সেই লোকটি যিনি পূর্ব্বে মক্ষিকাবল শিক্ষিত করিয়া কৌতুক দর্শাইতেন। তিনি দেখিলেন যে তাঁহার মক্ষিকাদের দ্বারা আর বিশেষ কিছু হয় না। লোকদিগের কৌতূহল নিবৃত্তি হইয়াছে; আর তাহারা তাহাদের বাজীখেলা, গাড়ীটানা দেখিতে আইসে না। এই হেতু তিনি আমোদের এক নূতন পথ আবিষ্কার করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। মক্ষিকা হইতে মশকের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। প্রথমে তিনি মশকদিগকে মক্ষিকার মত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু যখন প্রদর্শনের সময় নিকটবর্ত্তী হইল তখন হঠাৎ এক নূতন ভাব তাঁহার মনে উদয় হইল। নিয়ত এই সকল জীবদিগের সঙ্গে থাকিয়া ও তাদের ভন্ ভন্ শব্দ শুনিয়া শুনিয়া তাহাদের স্বরের তারতম্য চিনিতে পারিলেন ও ভাবিলেন যে, কৌশলক্রমে এই শব্দ হইতে উৎকৃষ্ট বাদ্য-যন্ত্রের উৎপত্তি হইবার বাধা কি? ভাবিয়া ভাবিয়া ক্রমে এই আশ্চর্য্য মশক-বাদ্য-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া সকলকে বিস্মিত করিলেন।

এই বাদ্য-যন্ত্র বিংশতি চতুষ্কোণ কাষ্ঠের বাক্সে নির্ম্মিত। বাক্সগুলি প্রায় ৬ ইঞ্চ

সমচতুষ্কোণ। এই বাক্সের উপরকার ডালা ইচ্ছামত বন্ধ ও মুক্ত করা যাইতে পারে। প্রতি বাক্সের উপরি ভাগে এক একটী বলবৎ শব্দোদ্দীপক ফলক সংলগ্ন। ভিতরে সহজে ঘূর্ণিত হইতে পারে এই রূপ এক একটি তারযন্ত্র নির্ম্মিত। প্রত্যেক বাক্সে এক একটি মশক থাকে। প্রতি মশকের ঘর ভিন্ন ভিন্ন হওয়াতে বিংশতি প্রকার বিভিন্ন গ্রামের স্বর নির্গত হয়। বাদ্য বাজাইবার নিয়ম এই—বাক্সের অন্তঃস্থিত তারযন্ত্র সকল পরিচালিত হইলে, তাহাতে প্রত্যেক মশক উড়িয়া বেড়াইতে বাধ্য হয়, সুতরাং তাহারা ভন্ ভন্ স্বর অবিশ্রান্ত ছাড়িতে থাকে। বাক্সের উপরকার ডালা উঠাইবামাত্র একটি স্বর নির্গত হয়। এই স্বর শব্দফলকে প্রতিঘাত পাইয়া বিবৃদ্ধ-রবে শ্রোতৃবর্গের কর্ণে প্রবেশ করে। এই উপায়ে বাদ্যকর অনেকগুলি রাগ-রাগিণী আলাপ করিতে পারেন।

এই যন্ত্রের মৃদু মধুর সুকোমল বাদ্য শ্রবণ করিয়া অবাক্ হইতে হয়; বোধ হয় যেন স্বর্গ হইতে অপ্সরা নামিয়া গুণ গুণ স্বরে গান করিতেছে। ইহা শুনিবার জন্য লোকের এত ভিড় হয়, আর যাহারা একবার ইহা শুনিয়াছে তাহারা আবার আসিয়া শুনিতে এত ব্যগ্র যে, তাহাতে মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই হেতু বাদ্যকর নিয়ম করিয়াছেন যে, সিন্‌সিনাটি নগরের সমুদয় লোকের একবারে শোনা শেষ না হইলে, যিনি একবার শুনিয়াছেন তিনি দ্বিতীয় বার আসিতে পারিবেন না। ঐ সহরে ৫ লক্ষ লোকের বসতি, অতএব লেখক লিখিতেছেন আমি একবার শুনিয়াছি, সুতরাং অনেক কাল পরে আবার এ মধুময় বাদ্য শুনিবার সুযোগ পাইব।

রুষিয়াতে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষা।—আমরা সচরাচর শুনিয়া থাকি যে আমাদের দেশে অনেকে লোভে পড়িয়া খৃষ্টধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। কোন পল্লীগ্রামে খৃষ্টানদের সংখ্যা অধিক দেখিয়া যদি তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাই ত হয়ত শুনা যায় যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে যত না হউক, খাওয়া পরার প্রত্যাশা তদপেক্ষা ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের বলবত্তর কারণ। আমরা শুনিয়া থাকি খৃষ্টান প্রচারকগণ ছলে কৌশলে অনেক সময় আপনাদের মেষদলের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। কিন্তু মুসলমানেরা যেমন এক হাতে কোরাণ ও একহাতে তলবার ধারণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়া থাকে,খৃষ্ট-মতাবলম্বীগণ যে তাহার অনুকরণ করিবেন ইহা নূতন কথা। কিন্তু রুসিয়া রাজ্যে এরূপ ঘটনা ও নিত্য ঘটিয়া থাকে। এই বিষয়ে একজন ইংরাজ ৩৬ বৎসর রুষিয়ায় বাস করিয়া স্বীয় পরীক্ষিত যে সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন তাহা হইতে পাঠকগণ প্রকৃত ঘটনা কতক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। তিনি বলেন, "কাজান নগর যাহা পূর্ব্বে তাতার খাঁদিগের রাজধানী ছিল তথাকার ২০০০ চুবাশ জাতীয় চাসার খৃষ্টধর্ম্মে-দীক্ষা দর্শনার্থ সে প্রদেশের গবর্ণর জেনেরাল আমাকে নিমন্ত্রণ করেন। আমি মহা কৌতু-

হলের সহিত তথায় উপস্থিত হইলাম। গবর্ণর জেনেরাল, সেনাপতি, পুলিসের অধ্যক্ষ প্রভৃতি সকলেই কার্য্যানুষ্ঠানে প্রস্তুত।

বাইবল ও প্রার্থনা পুস্তকাবলি হস্তে করিয়া ও জয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া এক দঙ্গল পুরোহিত আসিতেছে ইহা দেখিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে বেত্র ও ভল্ল হস্তে ভয়ঙ্কর কসাক-সৈন্যদল আসিয়া উপস্থিত। "পেগানদিগকে" খৃষ্টান করিতে হইবে; কসাক-রীতি-অনুসারে দীক্ষাকার্য্যের আরম্ভ হইল।

কল্পিত কলেবর চুবাসদের শ্রেষ্ঠী ও প্রধানগণ গবর্ণর জেনেরলের সম্মুখে আনীত হইল। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা খৃষ্টান হইতে চাও কি না? অনেকে বলিল 'হাঁ', কেহ কেহ বলিল 'না'।

তৎক্ষণাৎ কসাক সেনাগনের প্রতি সঙ্কেত করা হইল,তাহারা সঙ্কেত বুঝিয়া প্রতিজনে এক এক চাবুক হস্তে আসিয়া পড়িল। কয়েক মিনিটের মধ্যে বেচারী চুবাসদের পৃষ্ঠদেশ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল।

এখনো তোমারা 'হীদেন' থাকিতে চাও? তোমরা ভূদেব-কেশরীর অবমাননা করিতে চাও?

না! না! না! চতুর্দ্দিক হইতে এই রূপ শব্দ উঠিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে বেত্র প্রহারের ফল ফলিয়াছে দেখা গেল।

এই ক্ষণে রুসীয় পুরোহিতগণ অগ্রসর হইল। দুই সহস্র যুবক জানু পাতিয়া বসিয়া গেল। তাহাদিগকে খৃষ্টের মৃত্যু-স্মরণচিহ্ন 'ক্রুস,' চুম্বন করিতে দেওয়া হইল। তাহারা প্রত্যেকে একটী কাগচের উপর 'ক্রুস' চিহ্নে স্ব স্ব নাম সাক্ষর করিল—এইরূপে ৪ ঘণ্টার মধ্যে রুষিয়া সম্রাটের দুই সহস্র 'হীদেন' প্রজা খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। মাসকতক পরে এই দুই সহস্র ব্যক্তি খৃষ্ট-ধর্ম্মে উৎকৃষ্ট উপদেশ ও শিক্ষা লাভ করিলে পর আমি কার্য্যবশাৎ তাহাদের এক খৃষ্টান গ্রামে গিয়া উপনীত হইলাম। একদল খৃষ্টান আসিয়া আমার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তোমরা ঈশ্বর-পুত্র ঈশাকে মান? তাঁকে মানি বৈ কি মহাশয়, অবশ্য অবশ্য মানি। এইরূপ উত্তর করিবার সময় সেই কসাকের বেত্র তাহ'দের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে নৃত্য করিতেছিল সন্দেহ নাই। ঈশ্বর পিতাকেও মান?—পরে এই প্রশ্নটি করিলাম। ইহাতে তাহারা যেন কিছু অপ্রস্তুতের মত হইল। অবশেষে তাহাদের মধ্য হইতে জনৈক বৃদ্ধ অগ্রসর হইয়া গম্ভীর-ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কি বলছেন মহাশয় সেই বৃদ্ধ পুরুষ কি এখনও পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছেন?" পিতা জীবিত থাকিতে পুত্র কিরূপে রাজ্য ভোগ করিবে ইহা তাহারা ভাবিয়া উঠিতে পারিল না।

প্রকৃত শিক্ষা-প্রণালী।

মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীন চিত্তোৎকর্ষ সাধনই শিক্ষা-বিধানের মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহাতে বয়োবৃদ্ধি-সহকারে শিশুগণের উদ্ভেদোন্মুখ মনোবৃত্তি সকল ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত ও পরিচালিত হয়, যাহাতে বিবেক, মেধা ও চিন্তাশক্তি উত্তেজিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়, যাহাতে চরিত্র বিশুদ্ধরূপে পরিণত হয়, যাহাতে বালক ভবিষ্যতে মানুষ হইয়া সংসারের গুরুভার বহন করিতে সক্ষম হয়, যাহাতে আত্ম-সম্বন্ধীয়, পরিবার-সম্বন্ধীয়, স্বদেশহিত-সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া তদনুষ্ঠানে যত্নবান্ হয়—এই সকল উদ্দেশ্য সাধনই শিক্ষা-বিধানের কার্য্য। এই সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রণালীর সম্যক্‌রূপে অনুসরণ করা অবস্থাক্রমে সকলের পক্ষে সম্ভাবিত নহে; কিন্তু এই উচ্চ আদর্শের অনুগমন করিতে যিনি যত দূর সক্ষম হয়েন তিনি সেই পরিমাণে আপনাকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথে উন্নত ও জীবনকে সার্থক করিতে পারেন। শৈশবাবস্থা হইতে এই শিক্ষার আরম্ভ হয় কিন্তু চিরজীবনে তাহার পরিসমাপ্তি হয় না। আমাদিগের মানসিক বৃত্তি-সকলের উন্নতির সীমা নাই; যতই কর্ষণ করিবে, যতই পরিচালনা করিবে ততই তাহা অধিকতর তেজস্বী হইবেক, ততই আমাদিগের আন্তরিক শক্তি ও কার্য্য-কুশলতার আয়ত্তি বৃদ্ধি হইবেক। কিন্তু শৈশবকালে এই শিক্ষাকে অবহেলা করিলে, অথবা তাহা সুপ্রণালী-ক্রমে প্রদত্ত না হইলে বিষম অনিষ্টোৎপত্তির কারণ হয়। পুত্র সুশিক্ষিত ও সুপণ্ডিত হইয়া সর্ব্বাংশে কৃতী ও সকলের নিকট যশোভাজন হইবেক ইহা সকল পিতা মাতারই একান্ত অভিলাষ। কিন্তু কি উপায়ে বালককে শিক্ষিত করিলে ভবিষ্যতে সে পিতা মাতার আশা ফলবতী করিতে পারিবেক, কিরূপে শিশুর সুকুমার চিত্ত স্বাভাবিক স্বাস্থ্য-সহকারে উন্নত ও স্বতেজে পরিবর্দ্ধিত হইবেক তাহার চিন্তা অল্প লোকেই করিয়া থাকেন এবং তাহার প্রকৃত তথ্য তদপেক্ষা স্বল্প লোকে অবগত আছেন। অথচ প্রকৃত শিক্ষাবিধানের নিয়মানুসারে শিক্ষাকার্য্য সম্পাদিত না হইলে যে চিত্তোৎকর্ষ-সাধনপক্ষে গুরুতর ব্যাঘাৎ এবং বালকগণের চিত্তবৃত্তি সকলের উন্নতির বিশেষ হানি হইয়া থাকে তাহার ভূরি ভূরি উদাহরণ সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইবেক। একারণ প্রকৃত শিক্ষাবিধানের কএকটি মূলতত্ত্ব আমরা এই প্রস্তাবে বিবৃত করিতে ইচ্ছা করি এবং সেই মূলতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া এতদ্দেশীয় বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর প্রভাব ও দোষগুণের আলোচনা করা যাইবেক।

পুরাকালে রাজভক্তির ন্যায় গুরুভক্তির একান্ত প্রাবল্য ছিল। তখন রাজা স্বেচ্ছাচারী হইয়া যাহা করিতেন তাহাই হইত;

রাজকার্য্য-সম্বন্ধে যখন যে আদেশ করিতেন, যে বিধি সংস্থাপন করিতেন, তাহাই প্রকৃতিবর্গ বিনীতভাবে শিরোধার্য্য করিত। কারণ লোকের দৃঢ় সংস্কার ছিল যে, ভূপতিগণ দেবাংশে জন্ম গ্রহণ করেন এবং স্ব স্ব রাজশক্তি ও প্রভাব দেবতাগণের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইরূপে গুরুকেও সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া লোকে মান্য করিত। জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিষয়ে গুরু যে শিক্ষা প্রদান করিতেন তাহাই অতর্কিত ভাবে অটল বিশ্বাসের সহিত সত্য বলিয়া গৃহীত ও হৃদ্‌গত করিয়া রাখা হইত। সেই গুরুবাক্য অলঙ্ঘনীয়,তাহার প্রতি লেশমাত্র সংশয় করিতে নাই। এই নিমিত্ত তাহার সত্যাসত্য বা দোষগুণ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান কি বিচার করিতে কাহারও সাহস কি সাধ্য হইত না। সুতরাং তৎকালে গুরূপদেশগুলি অভ্যাস করাই একমাত্র শিক্ষাকার্য্যের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কালসহকারে এই সকল মতের বহুল পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে। এক্ষণে জনসমাজে স্বাধীনতার ভাব বিস্তৃতরূপে প্রচার হইয়াছে, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ক্রমশ প্রবল হইতেছে এবং তৎসহকারে সুসভ্য জনপদ মাত্রেই রাজার যথেচ্ছাচার-শক্তির ও অপরিমিত পরাক্রমের খর্ব্বতা ও সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জনসমাজ যে রাজার ইচ্ছামত চালিত হইতে পারে না,তাহা যে নির্দ্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মাধীন এবং তাহার প্রকৃত হিত-সাধন করিতে হইলে সেই সকল নিয়মের অনুগামী হইয়া কার্য্য করাই কর্ত্তব্য ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই এক্ষণে স্বীকার করেন। জনসমাজের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের উন্নতিও অনেকাংশে স্বাভাবিক নিয়মাধীন জানিতে হইবেক। শিশুগণের চিত্তবৃত্তির উন্মেষ শিক্ষকের স্বেচ্ছাধীন নহে। শৈশব-চিত্ত বীজাঙ্কুরের ন্যায় আপনা হইতে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। প্রকৃত শিক্ষাপ্রণালী সেই পরিবর্দ্ধনের অনুকূলাচরণ করিয়া শিশুগণের মনোবৃত্তি সকলের উপযুক্তমত উত্তেজনা করিয়া দেয় এবং যাহাতে শিশুগণ আপনা হইতে কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তাহাদের বুদ্ধির উপযোগী নূতন নূতন বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে উৎসাহযুক্ত হয় সেই আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টাকে উদ্রেক করিয়া দেওয়াই শিক্ষাবিধানের প্রথম সোপান। বাস্তবিক শিক্ষাকার্য্যে বালকগণের স্বতঃ-প্রবৃত্তি জন্মাইতে হইবেক। কোন একটি জ্ঞানের বিষয় জানিতে তাহাদের কৌতূহল এত অধিক উত্তেজিত করিয়া দিতে হইবেক যে, তাহারা অবলীলাক্রমে আপনা হইতে তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হইয়া তাহার সবিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে সচেষ্টিত হয়। এইটি শিক্ষাবিধানের প্রথম মূল-সূত্র।

কোন বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে হইলে দুইটি বিষয়ে সংযোগ আবশ্যক;—এক শিক্ষকের সাহায্য, দ্বিতীয় শিক্ষার্থীর আন্তরিক চেষ্টা এবং বুদ্ধি-চালনা। শিক্ষক যদি সকল কথা বলিয়া দেন, তাহা হইলে বালক কেবল তৎপ্রদত্ত জ্ঞানের আধার স্বরূপে সেই কথা গুলি মনে ধারণ করিয়া রাখিলেই স্বল্পায়াসে কার্য্যসিদ্ধ হয় বটে

কিন্তু তাহাতে প্রকৃত ফলের অনেক হানি হয়। অনেকে এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া অল্পায়াসে অল্পকাল মধ্যে অধিক শিখাইবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়েন ও বালকগণকে শিক্ষাবিষয়ক সকল কথা বলিয়া দিয়া সহজে পাঠ অভ্যাস করাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহাতে অভ্যস্ত পাঠে নিজ নিজ বুদ্ধি ও চিন্তা-শক্তি সংযোগ করিয়া আপনা হইতে সকল কথা বুঝিয়া লইবার অবকাশ মাত্রও বালকগণ প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু এইরূপ শিক্ষার ফল কি? বুদ্ধি বিবেক ও চিন্তা-শক্তি পরিচালনা-অভাবে স্তম্ভিত ও নিদ্রিত থাকে এবং তজ্জন্য অভ্যস্ত পাঠ কদাপি মনোমধ্যে উজ্জ্বলরূপে উদ্ভাসিত বা স্থায়ীভাবে মুদ্রিত হয় না। সুতরাং অনেক সময়ে যাহা এ কাণে দিয়া প্রবেশ করে তাহা ও কাণ দিয়া নির্গত হইয়া যায়। যাহা সহজে আইসে তাহা সহজেই চলিয়া যায়, এই প্রবাদ বাক্যটি বিষয়-ব্যাপারে যেমন সর্ব্বদা সংলগ্ন হয় সেই রূপ শিক্ষাবিধান সম্বন্ধেও তাহার সার্থকতা সম্পূর্ণ রূপে স্বীকার করিতে হইবেক যে বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবেক তাহার তথ্য বালকগণকে অগ্রে বলিয়া না দিয়া যাহাতে তাহারা সেই তথ্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় তাহার উপায় প্রদর্শন করাই শিক্ষকের কর্ত্তব্য; যাহাতে বালকগণ নিজ নিজ বুদ্ধি চালনা করিয়া একাগ্রতার সহিত শিক্ষিতব্য বিষয় অনুধাবন করিতে সক্ষম হয় এই পর্য্যন্ত সাহায্য প্রদান করাই বিধেয় পূর্ব্বকৃত সিদ্ধান্ত সকল এক কালে ছাত্রগণকে বলিয়া দিবার অপেক্ষা যে যে প্রণালীক্রমে সেই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে তাহার অনুসরণ করিয়া যদি ছাত্রগণ সেই সিদ্ধান্তের মূলতত্ত্ব পুনরায় আপনা হইতে আবিষ্কার করিয়া লইতে পারে সেইরূপে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা করাই প্রকৃত শিক্ষকের কার্য্য। বালকগণ এই প্রকার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া সকল স্থলে নিজ আয়াসে অভিপ্রেত সিদ্ধান্তে যে উপনীত হইতে পারিবেক ইহা আশা করা যায় না বটে, কিন্তু সেই চেষ্টা কদাপি নিষ্ফল হয় না। তাহা অন্তত চিত্তোৎকর্ষ সাধনের একটি উৎকৃষ্ট উপায় হয়। প্রথমতঃ এই রূপ জ্ঞানান্বেষণে বুদ্ধিবৃত্তি সকলের বিশেষ পরিচালনা হয়; স্মৃতি, চিন্তা ও বিবেক-শক্তির সমূহ উত্তেজনা ও প্রখরতা সম্পাদিত হয় এবং তাহাতে আপাততঃ অভীষ্ট ফল লাভ না হইলেও আনুষঙ্গিক অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়, অভিনিবেশ শক্তি ও চিত্তের একাগ্রতা পরিবর্দ্ধিত হয়, এবং ভাবী অনুসন্ধান ও চিন্তার জন্য অন্তঃকরণ সমধিক উদ্যম ও উৎসাহযুক্ত হইতে থাকে। বালকগণ এই রূপে আপন আয়াস ও প্রযত্ন সহকারে যতই শিক্ষা করিতে থাকিবেক ততই শিক্ষিত বিষয় তাহাদের চিত্তে স্থায়ীভাবে ও সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হইতে থাকিবেক। নিজ যত্নে ও পরিশ্রমে যে বিদ্যা আয়ত্তাধীন হয় তাহা সহজে স্মৃতিপথ হইতে অপসৃত হইতে পারে না এবং এই রূপ জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে অন্যে জ্ঞানলাভের

জন্য আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে থাকে। একটি বালককে জ্যামিতির কোন একটি কঠিন প্রতিজ্ঞা আনুপূর্ব্বিক বুঝাইয়া দেও, সে আপাতত অনায়াসে বুঝিল, সুতরাং মনে করিল যে আর বুঝিবার বাকি নাই, কিন্তু দুই দিন পরে সেই প্রতিজ্ঞাটি তাহাকে প্রমাণ করিয়া দিতে বল, সে তাহাতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া এক স্থানে গোলযোগ দেখিল, তখন সকলই অন্ধকারময় দেখিতে লাগিল, শিক্ষক কি বলিয়া দিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিসের পর কোন্ কথা শিক্ষক বলিয়াছিলেন তাহার ক্রমটি ভুলিয়া গিয়াছে, নিজ বুদ্ধি চালনা করিয়া প্রতিজ্ঞাটির প্রমাণ পূর্ব্বে আত্মসাৎ করিয়া লয় নাই, সুতরাং এক্ষণে তাহাতে বুদ্ধি-সংযোগ করা কঠিন হইয়া উঠিল, অবশেষে হতাশ ও লজ্জিত হইয়া নিরস্ত হইল। পরন্তু যে বালক শিক্ষকের নিকট না গিয়া স্বয়ং সেই প্রতিজ্ঞাটি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে তাহার প্রতিপদে হয় তো অনেক চিন্তা করিয়া বুঝিতে হইয়াছে এবং প্রতিজ্ঞাটি প্রমাণ করিতে অনেক কষ্ট ও সময় লাগিয়াছে, কিন্তু সে এই রূপে এক বার যাহা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে তাহা আর কদাপি ভুলিবার নহে।

এই দুই দৃষ্টান্তে স্পষ্টই অনুভূত হইবেক যে শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থী ব্যক্তির নিজ চেষ্টা ও যত্নেরই প্রাধান্য সর্ব্বদা বলবৎ রাখিতে হইবেক, তাহা হইলেই প্রকৃত ও স্থায়ী ফল নিশ্চিত লাভ হইবেক। বালককে তোতা পাখীর ন্যায় কতকগুলি পাঠাভ্যাস করাইলে তাহার স্মরণ-শক্তি কিয়ৎ পরিমাণে মার্জ্জিত হয় বটে, কিন্তু তাহার বিবেক ও চিন্তাশক্তি উত্তেজিত ও পরিচালিত না হওয়ায় ক্রমে নিস্তেজ ও নিরুদ্যোগ হইয়া যায়। কোন বিষয় নিজ চেষ্টায় বুঝিতে আর তাহার যত্ন বা উৎসাহ হয় না, বুঝাইয়া না দিলে কোন কথাই আর তাহার সহজে বোধগম্য হয় না। এই রূপে সে বালক সম্পূর্ণ রূপে শিক্ষকের অধীন হইয়া পড়ে। শিক্ষকের বা শিক্ষাপ্রণালীর দোষেই শিশুদিগের সুকুমার চিত্তের এই রূপ দুরবস্থা অনেক স্থলে ঘটিয়া থাকে। বালকগণকে যে কোন বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবেক তাহা তাহাদের বুদ্ধির উপযোগী কি না তাহা অগ্রে দেখা কর্ত্তব্য, তাহাদিগের অন্তর্বৃত্তি সকল যে পরিমাণে উন্মীলিত হইতে থাকিবেক তদুপযোগী জ্ঞানের বিষয় সকল তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবেক। প্রথমে সরল ও সহজ ভাব সকল, পরে ক্রমে ক্রমে অধিকতর জটিল ও কঠিন বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক এবং একটি বিষয় যে পর্য্যন্ত সম্যক্ রূপে আয়ত্ত না হয় সে পর্য্যন্ত তদপেক্ষা কঠিনতর বিষয়ে তাহাদের বুদ্ধি চালনা করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু এই প্রণালী অবলম্বন করিতে হইলে অধিক সময় লাগে। ইহাতে শিক্ষকের বিলক্ষণ পরিশ্রম আছে এবং আশু ফলের প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহার আধিক্য দর্শাইয়া শিক্ষক যে প্রশংসাভাজন হইবেন তাহারও উপায় নাই। অথবা কোন স্থলে প্রচলিত প্রণালী-অনু-

সারে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাঠ সম্পূর্ণ করিতে হইবেক, এই সকল কারণে শিক্ষক সহজ পথ অবলম্বন করেন। ছাত্রগণ বুঝিতে পারুক বা নাই পারুক, ভয়-মৈত্রী প্রদর্শনে তাহাদের কতকগুলি পাঠ অভ্যাস করাইয়া দেন। বালকগণ শিক্ষকের তাড়নায় মহাক্লেশে অগত্যা বিদ্যার ভার মস্তকোপরি উঠাইয়া লয়। কিন্তু যে ভার তাহারা বহন করে তাহার মধ্যে তাহাদের নিজের সম্পত্তি কিছুই নাই, তাহারা কেবল পরের বোঝা বহিতেছে এই চিন্তায় এবং বোঝার গুরুভারে তাহারা ক্রমে অস্থির-চিত্ত হইয়া বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে যৎপরোনাস্তি বিরাগযুক্ত হয় এবং কতক্ষণে অবকাশ পাইয়া বোঝাটি নিক্ষেপ করিয়া শ্রান্তি দূর করিবেক এই চিন্তায় ফিরিতে থাকে। অবশেষে কার্য্যেও তাহাদের ইচ্ছা ফলবতী হয়। কিছুদিন গত হইলে অভ্যস্ত পাঠ সকল এককালীন তাহাদের স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হয়। জ্ঞানার্জ্জনের যে স্বাভাবিক ইচ্ছা শিশু মাত্রেরই অন্তঃকরণে নিয়ত উদয় হইয়া থাকে তাহা এই রূপ অস্বাভাবিক শিক্ষাবিধানে একেবারে নিস্তেজ হইয়া যায়। আর উদ্ধতস্বভাব শাসনাসহিষ্ণু বালকগণের মধ্যে অনেকেই এই সময়ে পুস্তক-ভার মস্তক হইতে নিক্ষেপ করিয়া সরস্বতীর নিকট হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইয়া থাকে। বাল্যকালে যাহাদের এতদ্দেশীয় পাঠশালার শিক্ষা ও শাসন-প্রণালীর অধীন হইতে হইয়াছিল তাঁহারা উপরোক্ত কথার প্রামাণিকতা-পক্ষে অবশ্যই অনুমোদন করিবেন। অল্পবয়স্ক বালকগণের উন্নতির পরীক্ষা করিতে হইলে তাহারা কতগুলি পুস্তক পাঠ করিয়াছে তাহা না দেখিয়া, পুস্তক পাঠে তাহাদের কি পর্য্যন্ত অভিনিবেশ হইয়াছে, কি পর্য্যন্ত তাহাদের জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রতি আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহ জন্মিয়াছে, কি পর্য্যন্ত তাহারা নিজ বুদ্ধি পরিচালনা করিয়া অভ্যস্ত বিষয়ের প্রকৃত ও পরিষ্কার জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহাদের বিবেক, মেধা, চিন্তা ও একাগ্রতা কি পর্য্যন্ত তেজস্বী হইয়াছে, তাহাদের পরিদর্শন-শক্তির কতদূর উদ্রেক হইয়াছে, যাহা শিক্ষা করিয়াছে তাহার মূলতত্ত্ব কিপর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারিয়াছে এবং সাধারণরূপে তাহাদের চিত্তোৎকর্ষ কি পর্য্যন্ত হইয়াছে, এই সকল বিষয় দেখা কর্ত্তব্য।

যাঁহারা মনে করেন শিশুর মনকে কুম্ভকার-হস্তস্থিত মৃৎপিণ্ডের ন্যায় ইচ্ছানুরূপ গড়িয়া লওয়া যায়, তাঁহারা বাস্তবিক মনস্তত্ত্ব বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। শিশুর মন একটি নির্দ্দিষ্ট স্বাভাবিক নিয়মানুসারে ক্রমে ক্রমে বিকসিত ও পরিণত হইয়া থাকে। যে কোন কারণে হউক সেই স্বাভাবিক চিত্তোন্মেষের প্রতিরোধ হইলেই মানসিক উন্নতির ব্যাঘাত হইবেক।

চিত্তবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশুগণের জ্ঞান লাভ করিবার স্বাভাবিক আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা কেবল সতৃষ্ণ নয়নে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে। কোন নূতন

বস্তু দেখিলে কি পর্য্যন্ত না তাহারা আগ্রহান্বিত হয়,চতুষ্পার্শ্বের বস্তু সকলের পরিচয় লাভ করিবার নিমিত্ত তৎসম্বন্ধে কত অসংখ্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। এই প্রথম শিক্ষার সময়ে তাহাদের সেই স্বাভাবিক চিত্তোদ্বেগ চরিতার্থ না করিয়া পিতা মাতাগণ শিশুগণকে ক, খ, শিখাইবার এবং পুস্তক পাঠে মনঃসংযোগ করাইবার নিমিত্ত মহা ব্যস্ত হইয়া থাকেন। এই একটি বিষম ভ্রান্তি। চতুষ্পার্শ্বস্থ চেতনাচেতন বস্তু সকলের স্বাভাবিক অবস্থা ও গুণাগুণের পরিচয় লাভ জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রথম সোপান। যাহাতে শিশুগণ এই সকল বস্তুর পরিচয় বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়া স্মরণ রাখিতে পারে তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই বস্তুশিক্ষার সঙ্গে পরিদর্শন-শক্তির উদ্রেক হইতে আরম্ভ হয়। এই পরিদর্শন শক্তির উত্তেজনা ও পুষ্টিসাধন করাই শিক্ষাবিধানের দ্বিতীয় মূল-সূত্র। এই শক্তি যে পরিমাণে তেজস্বী হয় সেই পরিমাণে মনুষ্য কার্য্যদক্ষতা এবং বিজ্ঞতা লাভ করেন। এই শক্তির প্রভাবেই বিজ্ঞানবিষয়ে, সমাজতত্ত্ব বিষয়ে এবং সামান্যত সকল বিদ্যাবিষয়ে নানাবিধ নূতন নূতন আবিষ্কার হইয়াছে। বয়োবৃদ্ধি-সহকারে ও ভূয়োদর্শনে এই পরিদর্শন-শক্তির পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক স্থলে বিদ্যালয়ের অস্বাভাবিক শিক্ষাপ্রণালীর প্রভাবে বালকগণের চিত্ত নিয়ত পুস্তক পাঠাভ্যাসে রত থাকায় বাহ্য বস্তু সকলের পরিদর্শনের স্বাভাবিক স্পৃহা মন্দীভূত হইয়া যায়। চিত্তের এই অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। কিন্তু শিক্ষকগণের তাড়নায় বালকগণের সকল যত্ন, সকল আয়াস, সকল চিন্তা পুস্তকাধ্যয়নে ও শব্দ শিক্ষায় আকৃষ্ট হওয়ায় অন্য সকল দিকেই অন্তঃকরণ উদাম-শূন্য হইয়া যায়; এই প্রকারে অনেকের অল্প বয়সে আন্তরিক কৌতূহল এত অধিক হ্রাস হইয়া যাইতে দেখা গিয়াছে যে তাহাদের চক্ষের উপরে নূতন কোন জন্তু বা কোন বস্তু উপস্থিত করিয়া দিলে তৎসম্বন্ধে দুই চারিটি সামান্য প্রশ্ন করিয়াই ক্ষান্ত হয়, আর কিছুই জানিতে তাহাদের ইচ্ছা হয় না। ইহা জানা আবশ্যক যে, বাহ্য বিষয়-সকলের প্রতি দৃষ্টি না থাকিলে এবং তাহাদের গুণাগুণ ও পরস্পর-সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য করিতে না পারিলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হইবার উপায় নাই। বাস্তবিক সেই সকল বিষয়ের পরোক্ষ জ্ঞানই পুস্তকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। একারণ যে ব্যক্তি নিজ পরিদর্শন শক্তিকে যে পরিমাণে চালনা করিবেক সেই পরিমাণে সে গ্রন্থোল্লিখিত বিষয় সকলের জ্ঞান সুস্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেক। অতএব যাহাতে এই পরিদর্শন-শক্তি বলবতী হয় তদ্বিষয়ে শিক্ষকগণের যত্ন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

শিক্ষাবিধানের আর একটি মূল-সূত্র এই—বালকগণকে যেমন স্বতঃ-প্রবৃত্তি-সহকারে বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে প্রবৃত্ত করিতে হইবেক সেই রূপ শিক্ষাটি তাহাদের মনোরম ও আহ্লাদ-জনক হওয়া চাই। প্রকৃত

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি সকলের পরিচালনা হেতু একটি অপূর্ব্ব চিত্ত-প্রফুল্লতা জন্মে। সেই প্রফুল্লতা যে পর্য্যন্ত থাকে সে পর্য্যন্ত মন উৎসাহের সহিত জ্ঞান-শিক্ষার পথে গমন করে। তখন শিক্ষকের উত্তেজনা বা উৎসাহের প্রয়োজন হয় না, তখন শিক্ষা-বিষয়ে কোন শ্রমই কষ্টকর বোধ হয় না, এবং উৎসাহ ও একাগ্রতার আধিক্য হেতু জ্ঞাতব্য বিষয়টি সত্বরে স্বল্পায়াসে ও সর্ব্বতোভাবে আয়ত্ত হইয়া আইসে। কিন্তু সেই প্রফুল্লতা বিরহিত হইয়া শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে গেলে মনোবৃত্তি সকল সহজে আপনা হইতে উত্তেজিত হয় না, শিক্ষার বিষয়ে মনঃসংযোগ হয় না, চিত্তের একাগ্রতা জন্মে না, যাহা পাঠ বা অভ্যাস করা যায় তাহা অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হয় না। যদি চেষ্টা করিয়া মনঃসংযোগ করা যায় তাহা হইলে মন শীঘ্র শ্রান্ত ও অলস হইয়া পড়ে। এই জন্য বালকদিগকে শিক্ষা দিবার সময়ে তাহাদের চিত্ত-প্রসাদ যাহাতে সংরক্ষিত হয়, যাহাতে তাহারা প্রফুল্ল চিত্তে শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয় এই প্রকার কৌশলে শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য।

প্রকৃতির ক্রোড়ে শিশুগণ কি প্রকারে শিক্ষা লাভ করে তাহা অভিনিবেশপূর্ব্বক দেখিলেই উপরোক্ত শিক্ষা-প্রণালীর মূলসূত্র সকল কতদূর প্রামাণিক, যুক্তিযুক্ত ও হিত-জনক তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইবেক। শিশুর শিক্ষা প্রকৃত পক্ষে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই আরম্ভ হয়। তখন প্রকৃতি দেবী স্বয়ং শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। মনুষ্য-প্রদত্ত শিক্ষা আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্বে অল্পে অল্পে অবলীলাক্রমে অথচ সমূহ আন্তরিক চেষ্টা-সহকারে শিশু যে কত বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে তাহা অনুধাবন করিলে বিস্ময়যুক্ত হইতে হয়। বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্বে শিশুগণ মাতৃভাষা কেমন আশ্চর্য্য কৌশলে শিখিয়া লয়। নূতন বস্তু ধরিতে, নূতন দৃশ্য দেখিতে, নূতন শব্দ শুনিতে শিশুগণ কেমন একান্ত আগ্রহ ও উৎসুকা প্রকাশ করে। সেই আগ্রহাতিশয্যই তাহাদের শিক্ষা বিষয়ে একমাত্র প্রবল উত্তেজনা। কেহ তাহাদের চেষ্টা করিতে বলে না, কেহ শিখিতে কহে না, কিন্তু অন্তর হইতে তাহাদের যেন কেহ উত্তেজিত করিয়া দিতেছে এবং তাহারা উৎসাহের সহিত, আনন্দের সহিত আবশ্যক অভ্যাসগুলি ক্রীড়াচ্ছলে অনবরত যত্ন সহকারে শিক্ষা করিতে থাকে। ক্ষুদ্র শিশুগণ নিকটে যাহা পায় তাহাই ধরিতে যায়, কোন দ্রব্য হস্তে পাইলে তাহা মুখে দেয়, ভূমিতে নিক্ষেপ করে, এবং টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে এবং এই রূপ করিতে পারিলেই পরমানন্দ লাভ করে। এই রূপে সর্ব্বদাই সে ব্যস্ত সমস্ত থাকিতে চাহে, এক দণ্ড তাহাকে স্থিরভাবে রাখা বিষম দায় হইয়া উঠে। শিশু কিসের জন্য এতাধিক ব্যস্ত সমস্ত, মাতা তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে দুষ্ট দুরন্ত বলিয়া দমন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রবৃত্তির উত্তেজনার

নিকট কোন শাসনই প্রবল হইতে পারে না। প্রকৃতি দেবীর এই রূপ শিক্ষাপ্রণালী; এই প্রণালীর যতই অনুসরণ করিতে পারা যাইবেক ততই আমাদিগের শিক্ষাপ্রণালী ফলবান ও মঙ্গলজনক হইবেক।

ক্রমশঃ

ত—

ঝান্‌সীর রাণী।

আমরা এক দিন মনে করিয়াছিলাম যে, সহস্র বর্ষব্যাপী দাসত্বের নিপীড়নে রাজপুতদিগের বীর্য্য-বহ্নি নিভিয়া গিয়াছে ও মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহাদের দেশানুরাগ ও রণকৌশল ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে দিন বিদ্রোহের ঝটিকার মধ্যে দেখিয়াছি কত বীর পুরুষ উৎসাহে প্রজ্বলিত হইয়া স্বকার্য্য-সাধনের জন্য সেই গোলমালের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে যুঝা-যুঝি করিয়া বেড়াইয়াছেন। তখন বুঝিলাম যে, বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে যে সকল গুণ নিদ্রিত ভাবে অবস্থিতি করে, এক একটা বিপ্লবে সেই সকল গুণ জাগ্রত হইয়া উঠে। সিপাহি যুদ্ধের সময় অনেক রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় বীর তাঁহাদের বীর্য্য অযথা পথে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, একথা স্বীকার করিলেও মানিতে হইবে যে, তাঁহারা যথার্থ বীর ছিলেন। তাঁতিয়া টোপী ও কুমারসিংহ ক্ষুদ্র দুইটি বিদ্রোহী মাত্র নহেন, ইতিহাস লিখিতে হইলে পৃথিবীর মহা মহা বীরের নামের পার্শ্বে তাঁহাদের নাম লিখা উচিত; যে অশীতি বর্ষীয় অশ্বারোহী কুমারসিংহ লোল-জ্ঞ রজ্জুতে বাঁধিয়া দুই হস্তে কৃপাণ লইয়া হাইলণ্ডের সৈন্যদলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন, যে তাঁতিয়া টোপী কতকগুলি বিক্ষিপ্ত সৈন্যদল লইয়া যথোচিত অস্ত্র নাই, আহার নাই, অর্থ নাই, অথচ ভারতবর্ষে বিদেশীয় শাসন বিচলিতপ্রায় করিয়াছিলেন, যদিও তাঁহাদের কার্য্য লইয়া গৌরব করিবার আমাদিগের অধিকার নাই তথাপি তাঁহাদের বীর্য্যের, উদ্যমের, জ্বলন্ত উৎসাহের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু ভারতবর্ষের কি দুর্ভাগ্য, এমন সকল বীরেরও জীবনী বিদেশীয়দের পক্ষপাতী ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে সংগ্রহ করিতে হয়।

সিপাহি যুদ্ধের সময় রাসেল টাইম্‌স্‌ পত্রে লিখেন যে, "তাঁতিয়াটোপী মধ্য ভারতবর্ষকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন; বড় বড় থানা ও ধনাগার লুঠ করিয়াছেন, অস্ত্রাগার শূন্য করিয়াছেন, বিক্ষিপ্ত সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়াছেন, বিপক্ষ-সৈন্য বলপূর্ব্বক তাঁহার সমুদয় অপহরণ করিয়া লইয়াছে, আবার যুদ্ধ করিয়াছেন, পরাজিত হইয়াছেন, পুনরায় ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের নিকট হইতে কামান লইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন, বিপক্ষ সৈন্যেরা পুনরায় তাহা অপহরণ করিয়া

লইয়াছে, আবার সংগ্রহ করিয়াছেন, আবার হারাইয়াছেন। তাঁহার গতি বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুত। সপ্তাহ ধরিয়া তিনি প্রত্যহ ২০।২৫ ক্রোশ ভ্রমণ করিয়াছেন, নর্ম্মদা এ পার হইতে ওপার, ওপার হইতে এপার ক্রমাগত পার হইয়াছেন। তিনি কখন আমাদের সৈন্য-শ্রেণীর মধ্য দিয়া, কখন পার্শ্ব দিয়া, কখন সম্মুখ দিয়া, সৈন্য লইয়া গিয়াছেন। পর্ব্বতের উপর দিয়া, নদী অতিক্রম করিয়া, শৈলপথে, উপত্যকায়, জলার মধ্য দিয়া, কখন সম্মুখে, কখন পশ্চাতে, কখন পার্শ্বে, কখন তির্য্যক্ ভাবে চলিয়াছেন। ডাক গাড়ির উপর পড়িয়া, চিঠি অপহরণ করিয়া, গ্রাম লুঠিয়া কখন বা সৈন্য চালনা করিতেছেন, কখন বা পরাজিত হইয়া পলাইতেছেন, অথচ কেহ তাঁহাকে ধরিতে ছুঁইতে পারিতেছে না।" এই অসামান্য বীর যখন পারোনের জঙ্গলের মধ্যে ঘুমাইতেছিলেন, তখন মানসিংহ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়াছিল। গুরুভার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া, সৈনিক বিচারালয়ে আহূত হইয়া তিনি ফাঁসি-কাষ্ঠে আরোহণ করিলেন। মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার প্রকৃতি নির্ভীক ও প্রশান্ত ছিল। তিনি বিচারের প্রার্থনা করেন নাই, তিনি বলিয়াছিলেন যে, "আমি ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের হস্তে মৃত্যু ভিন্ন অন্য কিছুই আশা করি না। কেবল এই মাত্র প্রার্থনা যে, আমার প্রাণ-দণ্ড যেন শীঘ্রই সমাধা হয়, ও আমার জন্য যেন আমার নির্দ্দোষী বন্দী পরিবারেরা কষ্ট ভোগ না করে।"

ইংরাজেরা যদি স্বার্থপর বণিক জাতি না হইতেন, যদি বীরত্বের প্রতি তাঁহাদের অকপট ভক্তি থাকিত, তবে হতভাগ্য বীরের এরূপ বন্দীভাবে অপরাধীর ন্যায় অপমানিত হইয়া মরিতে হইত না, তাহা হইলে তাঁহার প্রস্তর-মূর্ত্তি এত দিনে ইংলণ্ডের চিত্রশালায় শ্রদ্ধার সহিত রক্ষিত হইত। যে ঔদার্য্যের সহিত আলেক্জাণ্ডার পুরুরাজের ক্ষত্রিয়োচিত স্পর্দ্ধা মার্জ্জনা করিয়াছিলেন, সেই ঔদার্য্যের সহিত তাঁতিয়া টোপীকে ক্ষমা করিলে কি সভ্যতাভিমানী ইংরাজ জাতির পক্ষে আরো গৌরবের বিষয় হইত না? যাহা হউক্ ইংরাজেরা এই অসামান্য ভারতবর্ষীয় বীরের শোণিতে প্রতিহিংসারূপ পশু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিলেন।

আমরা সিপাহী যুদ্ধ সময়ের আরো অনেক বীরের নামোল্লেখ করিতে পারি, যাঁহারা ইউরোপে জন্ম গ্রহণ করিলে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, কবির সঙ্গীতে, প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তিতে, অভ্র-ভেদী স্মরণ-স্তম্ভে অমর হইয়া থাকিতেন। বৈদেশিকদের লিখিত ইতিহাসের এক প্রান্তে তাঁহাদের জীবনীর দুই এক ছত্র অনাদরে লিখিত রহিয়াছে, ক্রমে ক্রমে কালের স্রোতে তাহাও ধৌত হইয়া যাইবে এবং আমাদের ভবিষ্যবংশীয়দের নিকট তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত অজ্ঞাত থাকিবে।

শঙ্করপুরের রাণা বেণীমাধু লর্ড ক্লাইভের আগমনে নিজ দুর্গ পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার ধন সম্পত্তি অনুচর-বর্গ কামান ও

অন্তঃপুরচারিণী স্ত্রীলোকদিগকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যার বেগম ও বির্জিস্ কাদেরের সহিত যোগ দিলেন। তিনি তাঁহাদিগকেই আপনার অধিপতি বলিয়া জানিতেন, এই নিমিত্ত তাঁহাদিগকে রাজার ন্যায় মান্য করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তাঁহার রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে চাহিলেন, তাঁহাকে মৃত্যু-দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, তাঁহার ক্ষতি পুরণ করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং তাঁহার কষ্টের কারণ অনুসন্ধান করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু রাজ্ঞী সমুদয় প্রস্তাব তুচ্ছ করিয়া বেগম ও তাঁহার পুত্রের জন্য টেরাই প্রদেশে আশ্রয়হীন ও রাজ্যহীন হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বেণীমাধু জীবনের বিনিময়েও তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই এবং ইংরাজদের হস্তে কোন মতে আত্মসমর্পণ করেন নাই। রাজপুত বীর নহিলে আপনার প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য কয়জন লোক এরূপ ত্যাগস্বীকার করিতে পারে?

রয়ার রাজপুত অধিপতি নৃপৎসিং খড়্গ ছিলেন। তিনি যুদ্ধের সময় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, 'ঈশ্বর আমার একটি অঙ্গ লইয়াছেন, অবশিষ্ট অঙ্গগুলি আমার দেশের জন্য দান করিব।'

কিন্তু আমরা সর্ব্বাপেক্ষা বীরাঙ্গনা ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মী বাইকে ভক্তি পূর্ব্বক নমস্কার করি। তাঁহার যথার্থ ও বিস্তারিত ইতিহাস পাওয়া দুষ্কর, অনুসন্ধান করিয়া যাহা পাওয়া গেল তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠকদিগকে উপহার দিলাম।

লর্ড ড্যালহৌসি ঝান্সী রাজ্য ইংরাজশাসনভুক্ত করিলেন, এবং ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের জন্য অনুগ্রহ করিয়া উপজীবিকা স্বরূপ যৎসামান্য বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। এই স্বল্প বৃত্তি রাণীর সম্ভ্রম-রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না, এই নিমিত্ত তিনি প্রথমে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন, অবশেষে অগত্যা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইল। কিন্তু ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ইহাতেই ক্ষান্ত হইলেন না। লক্ষ্মী বাইয়ের মৃত স্বামীর যাহা কিছু ঋণ ছিল তাহা রাণীর জীবিকা হইতে পরিশোধ করিতে লাগিলেন। রাণী ইহাতে আপত্তি করিলেন, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হইল না। ইংরাজেরা তাঁহার রাজ্যে গো হত্যা আরম্ভ করিল, ইহাতে রাজ্ঞী ও নগরবাসীরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া ইহার বিরুদ্ধে আবেদন করিল কিন্তু তাহাও গ্রাহ্য হইল না।

এইরূপে রাজ্যহীনা, সম্পত্তিহীনা, অভিমানিনী রাজ্ঞী নিষ্ঠুর অপমানে মনে মনে প্রতিহিংসার অগ্নি পোষণ করিতে লাগিলেন এবং যেমন শুনিলেন কম্পানির সৈনিকেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, অমনি তাঁহার অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্য সুকুমার দেহ রণসজ্জায় সজ্জিত করিলেন। লক্ষ্মী বাই অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরের কিছু অধিক, তাঁহার দেহ যেমন বলিষ্ঠ মনও তেমনি দৃঢ় ছিল।

রাজ্ঞী অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন।

রাজ্য পালনের জটিল ব্যাপার সকল অতি সুন্দররূপে বুঝিতেন। ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ তাঁহাদের জাতিগত স্বভাব অনুসারে এই হতরাজ্য রাজ্ঞীর চরিত্রে নানাবিধ কলঙ্ক আরোপ করিলেন, কিন্তু এখনকার ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন যে, তাহার এক বর্ণও সত্য নহে।

ঝান্সী নগরী অতিশয় পরিপাটী পরিচ্ছন্ন, উহা দৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, এবং বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের কুঞ্জ ও সরোবরে সেই সকল প্রাচীরের চতুর্দ্দিক সুশোভিত ছিল। একটি উচ্চ শৈলের উপর দৃঢ়-দুর্গ-বদ্ধ রাজপ্রাসাদ দাঁড়াইয়া আছে। নগরীতে বাণিজ্য ব্যবসায়ের প্রাদুর্ভাব ছিল বলিয়া অনেক ইংরাজ অধিবাসী সেখানে বাস করিত। কাপ্তেন ডান্‌লপের হস্তে ঝান্সী নগরীর রক্ষা-ভার ছিল। ভারতবর্ষে যখন বিদ্রোহ জ্বলিয়া উঠিয়াছে তখন ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাকে সতর্ক হইতে পরামর্শ দেন, কিন্তু ঝান্সীর শান্ত অবস্থা দেখিয়া তিনি তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।

এই প্রশান্ত ঝান্সীরাজ্যে বিধবা রাজ্ঞী ও তাঁহার ভৃত্যবর্গের উত্তেজনায় ভিতরে ভিতরে একটি বিষম বিপ্লব ধূমায়িত হইতেছিল। সহসা একদিন শুক্ল আগ্নেয় গিরির ন্যায় নীরব ঝান্সী নগরীর মর্ম্মস্থল হইতে বিদ্রোহের অগ্নিস্রাব উদ্‌গীরিত হইল।

প্রকাশ্য দিবালোকে কাণ্টনমেণ্টের মধ্যে দুইটি ডাক বাঙ্গালা বিদ্রোহীরা দগ্ধ করিয়া ফেলিল, যেখানে বারুদ ও ধনাগার রক্ষিত ছিল, সেখান হইতে বিদ্রোহীদিগের বন্দুক-ধ্বনি শ্রুত হইল, এক দল সিপাহি ঐ দুর্গ অধিকার করিয়াছে, তাহারা উহা কোন মতে প্রত্যর্পণ করিতে চাহিল না। ইয়ুরোপীয়েরা আপনাপন পরিবার ও সম্পত্তি লইয়া নগরী-দুর্গে আশ্রয় লইল। ক্রমে ক্রমে সৈন্যেরা স্পষ্ট বিদ্রোহী হইয়া অধিকাংশ ইংরাজ সেনানায়কদিগকে নিহত করিল। বিদ্রোহীগণ দুর্গে উপস্থিত হইল।

ক্যাপটেন ডান্‌লপ্ হিন্দুসৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু তাহারা সেইখানেই তাঁহাকে বন্দুকে হত করিল। দুর্গস্থ সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মধ্যাহ্নে বিদ্রোহী-সৈন্যেরা দুর্গের নিম্ন অংশ অধিকার করিয়া লইল। পরাজিত ইংরাজ সেনারা বিদ্রোহী সেনাদের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিল, কিন্তু উন্মত্ত সৈন্যেরা তাহাদিগকে নিহত করিল। এই নিধন-কার্য্যে রাজ্ঞীর কোন হস্ত ছিল না, এমন কি এ সময়ে রাজ্ঞীর কোন অনুচরও উপস্থিত ছিল না। যখন রাজ্যে একটিও ইংরাজ অবশিষ্ট রহিল না তখন রাজ্ঞী এই অন্যায়কারী দিগকেও রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। এক্ষণে কথা উঠিল, কে রাজ্য অধিকার করিবে? রাজ্ঞী সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন; সদাশিব রাও নামে এক জন ঐ রাজ্যের প্রার্থী কুরারা দুর্গ অধিকার করিল। পরে রাজ্ঞীর সৈন্য কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া সিন্ধিয়া-রাজ্যে পলায়ন করিল। এই রূপে ইংরাজেরা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হত ও

তাড়িত হইলে পর ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে লক্ষ্মী বাই স্বত-সিংহাসনে পুনরায় আরোহণ করিলেন। কিছুকাল রাজত্ব করিয়া লক্ষ্মী বাই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ইংরাজ সৈন্যদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইংরাজ সেনানায়ক সার হিউ রোজ সৈন্যদল সমভিব্যাহারে ঝান্সী নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রস্তরময় নগর-প্রাচীরে ব্রিটিষ কামান গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিল। দুর্গস্থ লোকেরা আক্রমণ-প্রতিরোধের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। পুর-মহিলাগণ দুর্গ-প্রাকার হইতে কামান ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল এবং সৈন্যদের খাদ্যাদি বণ্টন করিতে লাগিল, এবং সশস্ত্র ফকিরগণ নিশান হস্তে লইয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

৩১শে মার্চ রাণী দেখিলেন, তাঁতিয়া টোপী ও বাণপুরের রাজা অল্পসংখ্যক সৈন্যদল লইয়া ইংরাজ শিবির-পার্শ্বে নিবেশ স্থাপন করিয়া সঙ্কেত-অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছেন। হর্ষধ্বনি ও তোপের শব্দে ঝান্সীদুর্গ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাহার পর দিন ইংরাজ-সৈন্যদের সহিত তাঁতিয়াটোপীর ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল, এই যুদ্ধে তাঁতিয়াটোপীর ১৫০০ সৈন্য হত হইল এবং তিনি পরাজিত হইয়া বেটোয়ার পর পারে পলায়ন করিলেন।

যুদ্ধে প্রত্যহ রাজীর ৫০। ৬০ জন করিয়া লোক মরিতে লাগিল। তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কামান গুলির মুখ বন্ধ করা হইয়াছে এবং ভাল ভাল গোলন্দাজেরা হত হইয়াছে।

ক্রমে ইংরাজ সৈন্যেরা গোলার আঘাতে নগর-প্রাচীর ভেদ করিল এবং প্রাসাদ ও নগরীর প্রধান প্রধান অংশ অধিকার করিল। প্রাসাদের মধ্যে ঘোরতর সম্মুখ-যুদ্ধ বাধিল। রাণীর শরীর-রক্ষকদের মধ্যে ৪০ জন অশ্বশালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। আহত সৈন্যেরা মুমূর্ষু অবস্থাতেও ভূতলে পড়িয়া অস্ত্র চালনা করিতে লাগিল। একে একে ৩৯ জন হত হইলে অবশিষ্ট এক জন বারুদে আগুন লাগাইয়া দিল, আপনি উড়িয়া গেল ও অনেক ইংরাজ সৈন্যও সেই সঙ্গে হত হইল।

রাত্রেই রাজ্ঞী কতকগুলি অনুচরের সহিত দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, শত্রুরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিল এবং আর একটু হইলেই তাঁহাকে ধরিতে সক্ষম হইত। লেপ্টনেণ্ট বাউকর অশ্বারোহী সৈন্যদলের সহিত ঝান্সী হইতে দশ ক্রোশ পর্য্যন্ত রাজ্ঞীর অনুসরণ করিয়াছিলেন। অবশেষে দেখিলেন অশ্বারোহী লক্ষ্মী বাই চারি জন অনুচরের সহিত গমন করিতেছেন; বহু সৈন্য-বেষ্টিত বাউকর এই চারি জন অশ্বারোহী কর্ত্তৃক এমন আহত হইলেন যে, আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। এই সময়ে তাঁতিয়াটোপী কতক গুলি সৈন্য লইয়া রাণীর রক্ষক হইলেন।

৪ঠা এপ্রিলে ইংরাজেরা সমস্ত ঝান্সী নগরী অধিকার করিয়া লইল। সৈন্যিকেরা নগরে দারুণ হত্যা আরম্ভ করিল, কিন্তু নগরবাসীরা কিছুতেই নত হইল না। পাঁচ

সহস্রেরও অধিক লোক ব্রিটিশ বেয়নেটে বিদ্ধ হইয়া নিহত হইল। নগরবাসীরা শত্রুহস্তে আত্ম সমর্পণ করা অপমান ভাবিয়া স্বহস্তে মরিতে লাগিল। অসভ্য ইংরাজ সৈনিকেরা স্ত্রীলোকদের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করিবে জানিয়া পৌরজনেরা স্বহস্তে স্ত্রী কন্যাগণকে বিনষ্ট করিয়া মরিতে লাগিল।

রাও সাহেব পেশোয়া বংশের শেষ বাজিরাওর দ্বিতীয় পোষ্য পুত্র। তিনি, তাঁতিয়া টোপী ও ঝান্সীরাণী বিক্ষিপ্ত সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া ব্রিটিশদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য কুঞ্চ নগরে সৈন্য স্থাপন করিলেন। অবিরল কামান বর্ষণ করিয়া হিউ রোজ তাঁহাদের তাড়াইয়া দিল। চারি ক্রোশ রাণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়না করিয়া সেনাপতি চারিবার ঘোড়ার উপর হইতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

অবশেষে লক্ষ্মী বাই কাল্পীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার এই শেষ অস্ত্রাগার রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন। মনে করিয়াছিলেন রাজপুতেরা যোগ দিবে, কিন্তু তাহারা দিল না। ব্রিটিশ সৈন্যেরা একত্র হইয়া আক্রমণ করিল, অদৃঢ় দুর্গ কাল্পীতে রাজ্ঞীর সৈন্য আর তিষ্ঠিতে পারিল না।

কুঞ্চের পরাজয়ের পর তাঁতিয়াটোপী যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন কেহ জানিতে পারিল না। তিনি এখন গোয়ালিয়রের রাজার প্রচ্ছন্ন ভাবে ইংরাজদের মিত্ররাজা সিন্ধিয়াকে সিংহাসনচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। তাঁতিয়াটোপী অধিবাসীদিগকে উত্তেজিত করিতে অনেকটা কৃত কার্য্য হইলে পর রাজ্ঞীকে সংবাদ দিলেন। রাজ্ঞী গোপালপুর হইতে রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহারা রাজার সহিত শত্রুতা করিতে যাইতেছেন না, তবে কিছু অর্থ ও খাদ্যাদি পাইলেই তাঁহারা দক্ষিণে চলিয়া যাইবেন, রাজা তাঁহাদের যেন বাধা না দেন, কারণ বাধা দেওয়া অনর্থক। গোয়ালিয়রের লোকেরা ইংরাজ-বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের নিকট হইতে দুই শত আহ্বান-পত্র পাইয়াছেন। কিন্তু ইংরাজ-ভক্ত সিন্ধিয়া তাহাতে অসম্মত হইলেন।

রাও ও রাণী দৃঢ়স্বরে তাঁহাদের অনুচরদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমরা বোধ হয় নাগরিকদের নিকট হইতে কোন বাধা প্রাপ্ত হইব না, যদি বা পাই তবে তোমাদের ইচ্ছা হয়ত পলাইও, কিন্তু আমরা মরিতে প্রস্তুত হইয়াছি।"

১লা জুনে সিন্ধিয়া ৮০০০ লোক ও ২৪টি কামান লইয়া বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার সৈন্যদল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। সিন্ধিয়া তাঁহার শরীর-রক্ষকদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইলেন কিন্তু তাহারা হত ও আহত হইল। সিন্ধিয়া অশ্বারোহণে আগ্রার দিকে পলায়ন করিলেন। মহারাণীর মাতা "ওজ্জারাজা," সিন্ধিয়া বিদ্রোহীদের হস্তে বন্দী হইয়াছেন মনে করিয়া, কৃপাণ লইয়া অশ্বারোহণে তাঁহাকে মুক্ত করিতে গেলেন; অবশেষে সিন্ধিয়া পলায়ন করিয়াছেন শুনিয়া নিবৃত্ত হইলেন। ঝান্সীরাজ্ঞীর সৈন্যগণ সিন্ধিয়ার

রাজকোষ হস্তগত করিল, এবং তাহা হইতে রাণী সৈন্যদের ছয় মাসের বেতন চুকাইয়া দিলেন ও নগরবাসীদিগকে পুরস্কার দানে সন্তুষ্ট করিলেন। কিন্তু তাঁতিয়াটোপী ও রাজ্ঞী দুর্গরক্ষার কিছুমাত্র আয়োজন করেন নাই; তাঁহারা প্রকাশ্য ক্ষেত্রেই সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন; সমুদায় বন্দোবস্ত রাণী একাকীই সম্পন্ন করিতেছিলেন। তিনি সৈনিকের বেশ পরিয়া, যে রৌদ্রে ইংরাজ-সেনাপতি চারিবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, সেই রৌদ্রে অপরিশ্রান্ত ভাবে মুহূর্ত্ত বিশ্রাম না করিয়া অশ্বারোহণে এখানে ওখানে "পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন।

সার্ হিউ রোজ্ যখন শুনিলেন যে, গোয়ালিয়ার শত্রু হস্তগত হইয়াছে, তখন সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া রাজ্ঞী-সৈন্যের দুর্ব্বল ভাগ আক্রমণ করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। সেই যুদ্ধের দারুণ বিপ্লবের মধ্যে রাজ্ঞী অসি-হস্তে ইতস্ততঃ অশ্বচালনা করিতেছেন। রাজ্ঞীর সৈন্যরা ভঙ্গ দিল; বিপক্ষ সৈন্যদের গুলিতে রাজ্ঞী অত্যন্ত আহত হইলেন। তাঁহার অশ্ব সম্মুখে একটি খাত দেখিয়া কোন মতে উহা উল্লঙ্ঘন করিতে চাহিল না; লক্ষ্মী বাইয়ের স্কন্ধে বিপক্ষের তলবারের আঘাত লাগিল, তথাপি তিনি অশ্বপরিচালনা করিলেন। তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী ভগিনীর মস্তকে তলবারের আঘাত লাগিল এবং উভয়ে পাশাপাশি রণক্ষেত্রে পতিত হইলেন। এই ভগিনী যুদ্ধের সময়ে কোন ক্রমে রাজ্ঞীর পার্শ্ব পরিত্যাগ করেন নাই, অবিশ্রান্ত তাঁহারি সহযোগিতা করিয়া আসিয়াছেন। কেহ কেহ বলে যে, তিনি রাজ্ঞীর ভগিনী নহেন, তিনি তাঁহার স্বামীর উপপত্নী ছিলেন।

ইংরাজী ইতিহাস হইতে আমরা রাজ্ঞীর এইটুকু জীবনী সংগ্রহ করিয়াছি। আমরা নিজে তাঁহার যেরূপ ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। ভ—

ভানুসিংহের কবিতা।

বিহাগড়া——

গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশি বাজে
বিসরি ত্রাস লোক লাজে
সজনি! আও আও লো।
পিনহ চারু নীল বাস
হৃদয়ে প্রণয় কুসুম রাশ
হরিণ নেত্রে বিমল হাস
কুঞ্জ বনমে যাও লো॥

ঢালে কুসুম সুরভ-ভার
ঢালে বিহগ সুরব-সার
ঢালে ইন্দু অমৃত-ধার
বিমল রজত ভাতিরে।
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে
অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে
ফুটল সজনি পুঞ্জে পুঞ্জে
বকুল যূথি জাতিরে॥

দেখলো সখি শ্যাম রায়
নয়নে প্রেম উথল যায়
মধুর বদন অমৃত সদন
চন্দ্রমায় নিন্দিছে।

আও আও সজনী-বৃন্দ
হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ
শ্যামকো পদারবিন্দ—
ভানুসিংহ বন্দিছে॥

প্রাচীন ভারতের শিল্প।

একটি পুরাতন সংস্কৃত শব্দ আছে "বাসায়নিক।" যাঁহারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন আদিম কালে তাঁহাদিগকে "বাসায়নিক" বলিত। আদ্যকালের সরল-বুদ্ধি মনুষ্যেরা প্রথমে বাসায়নিক ছিলেন না। ক্রমে কাল-পরিবর্ত্তনে যখন তাঁহারা বাসায়নিক হইলেন, তখন তাঁহাদের বাসোপযোগী বিবিধ বস্তুর আবশ্যক হইল। এই বাসায়নিক কালেই ভারতবর্ষে শিল্প-প্রচারের সূত্রপাত হয়। সেই কাল হইতে ভারতবাসীদিগের দ্বারা শিল্পের যেরূপ উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তাহার একটা স্থূল বিবরণ ভারতী-পাঠকগণের নেত্রগোচর করিব, এই প্রতিজ্ঞায় আমরা ৪র্থ সংখ্যক ভারতীতে কাল-সাধন-শিল্প-ঘটিত কিঞ্চিৎ বিবরণ বিবৃত করিয়াছি, এক্ষণে তাহার শেষাংশ ব্যক্ত করিতেছি।

ঋজুবুদ্ধি পুরাতন মানবেরা যে নৈসর্গিক ঘটনা বা ক্রিয়া অবলম্বন করিয়া খণ্ড কাল সকল অবধারণ করিতেন, বর্ণোচ্চারণ-ঘটিত তদীয় উপায়টি বর্ণনা করা হইয়াছে। এক্ষণে শ্বাস-প্রশ্বাস-ঘটিত দ্বিতীয় উপায়ের বিবরণ ব্যক্ত করিতেছি।

নাসা-যন্ত্রের দুইটি ছিদ্র। শ্বাসপতন এই দুই ছিদ্র দ্বারাই হয় বটে, কিন্তু যুগপৎ উভয় ছিদ্র দ্বারা তুল্যরূপে শ্বাস পতন হয় না। আদিম মানবেরা দেখিলেন যে, কি জাগ্রৎ কি স্বপ্ন, কি দিবা কি রাত্রি, সকল কালে ও সকল অবস্থাতেই শ্বাস-পতন হয়। মনুষ্য যদি শ্রম, ব্যায়াম প্রভৃতি শ্বাস-ক্রিয়ার উত্তেজক কোন কার্য্য না করে, স্থির ভাবে থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক শ্বাস পতনের ব্যবধান কাল তুল্য থাকে। আর ইহাও তাঁহারা অনুভব করিয়া দেখিয়াছেন যে, একবারে উভয় নাসারন্ধ্র হইতে শ্বাস পতন হয় না। একটি বন্ধ থাকে, একটি দিয়া শ্বাস নির্গত হয়। সেটি পরিবর্ত্তিত হয়, অন্যটি ক্রিয়াবান্ হয়। এই দুইটি স্বাভাবিক ঘটনা হইতে তাঁহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দুইটি অসাধারণ ফল আহরণ করিয়াছিলেন। সকল অবস্থায় ও সকল কালে শ্বাসপতনের অবিচ্ছিন্নতা, এতদ্দ্বারা একরূপ কাল নির্ণয়, আর নাসারন্ধ্রের পরিবর্ত্তন অনুসারে আর এক প্রকার কাল নির্ণয়। নাসারন্ধ্রের পরিবর্ত্তন অনুসারে যে কাল নির্ণয় হয়, তাহা একটি স্থূল কাল। এই স্থূল কালটি কতকগুলি কালের সূক্ষ্মতম অংশ-সমষ্টি। যথা দণ্ড ও মুহূর্ত্তাদি।

শ্বাস-পতনের দ্বার পরিবর্ত্তন।—বিধাতার কি অনির্ব্বচনীয় বিধান! এই দ্বার-পরিবর্ত্তনও নিয়মিত রূপে হইবে, কদাচিৎ নিয়ম ভঙ্গ হইবে না। পুরাকালের লোকেরা ইহার সন্ধান পাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, এক মুহূর্ত্ত অন্তর শ্বাস পতনের দ্বার পরিবর্ত্তন হয়। যে মুহূর্ত্তে নাসিকার যে রন্ধ্রে শ্বাসক্রিয়া চলিতে থাকে সেই মুহূর্ত্তে অন্য রন্ধ্রটি বিশ্রাম করিতে থাকে। পূর্ব্বকালের মানবেরা এই নিয়ম অবলম্বন করিয়া মুহূর্ত্তাদি কাল নির্ণয় করিতেন। দিবা রাত্রে ত্রিংশৎ মুহূর্ত্ত, অতএব যে মুহূর্ত্তে যে নাসিকায় শ্বাস বহিবে, তাহা তাঁহারা দৃঢ় সিদ্ধান্তে আবদ্ধ রাখিতেন। শ্বাস পতন ও নাসিকা রন্ধ্রের পরস্পর যেরূপ সম্বন্ধ, তাহা তাঁহাদের বিশেষ পরিচিত ছিল, যখন তখন তাঁহারা বলিতে পারিতেন যে, এই অমুক মুহূর্ত্ত।*

অবিচ্ছেদে শ্বাসক্রিয়া—এই স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার লইয়া তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম কালের অবধারণ করিতেন। যথা—

"ষষ্টিশ্বাসৈরহোরাত্রং
ষট্প্রাণা নাড়িকা মতা।
ষষ্টি নাড্যা হ্যহোরাত্রম্।"
"একবিংশতি সাহস্রং
ষট্ শতাধিক মীশ্বর!"

* বোধ হয় কোন অনুসন্ধায়ী পুরুষ ভ্রমণাদি রহিত হইয়া স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিয়া শ্বাস প্রশ্বাস গণনা করিয়াছিলেন। তাহাতে নিশ্চয় হয় এক অহোরাত্রে ২১৬০০ একবিংশতি সহস্র ছয় শত শ্বাস হয়। অধিক বা ন্যূন হয় না। সুতরাং উহাকে ভাগ করিয়া দণ্ডাদিতে আনয়ন করিয়া তত্তাবতের ব্যবহার করিতেন।

পতন উৎপতন-রূপ প্রাণ-ক্রিয়া ৬০ বার হইতে যে কাল লাগে, সেই কাল-প্রবাহের নাম প্রাণ। ছয় প্রাণ পরিমিত কালে এক দণ্ড। ইহার ৬০ দণ্ডে এক অহোরাত্র।

এই নিয়ম আয়ত্ত থাকিলে দণ্ডাদি প্রভৃতি সূক্ষ্ম কাল অনায়াসে জানিতে পারা যায় কিন্তু এতৎপক্ষে অনেক বিঘ্ন আছে। শ্বাস প্রশ্বাসের কদাচিৎ শীঘ্রতা কদাচিৎ বিলম্ব দৃষ্ট হয়। ভ্রমণ, ব্যায়াম, প্রভৃতি পরিশ্রম-কালে শ্বাসের শীঘ্রতা জন্মে এবং তাহার সন্ধিস্থলে বিলম্ব জন্মে। এই নিমিত্ত যাঁহারা শ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা কাল নির্ণয় করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া বর্জ্জিত আছে। বিশেষ বিশেষ দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়া বর্জ্জিত হইয়া তাঁহারা স্বাভাবিক শ্বাসের গতি রক্ষার অভ্যাস করিবেন, এইরূপ বিধি আছে।

* "প্রাণগতিঃ শ্বাসঃ স মুহূর্ত্তাৎপরিবর্ত্ততে" এই মুহূর্ত্ত যে কতটুকু কালের নাম, তাহা এস্থলে নিশ্চিত রূপে ব্যক্ত করিতে পারিলাম না। কারণ গ্রন্থকারেরা কখন এক দণ্ডকে মুহূর্ত্ত বলিতেছেন, আবার কখন দুই দণ্ডকেও মুহূর্ত্ত বলিতেছেন। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, শ্বাসপথের পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু তাহা যে কত সময় অন্তর তাহা দেখা হয় নাই। পরন্তু একটি রন্ধ্র যে এক বারে নিষ্ক্রিয় থাকে, এরূপ অনুভব হয় না, তবে এক ছিদ্রে যখন শ্বাস ক্রিয়ার আধিক্য থাকে, তৎকালে অন্য ছিদ্রে তৎক্রিয়ার বিশেষ ন্যূনতা থাকে বটে। বস্তুতঃ গ্রন্থকারেরা ঐ আধিক্য অনুসারে একটি বন্ধ থাকে অন্যটি ক্রিয়াবান থাকে এইরূপ বলিয়াছেন সংশয় নাই।

অভ্যাসের মহিমা আশ্চর্য্য! যাঁহারা গুরুর নিকট উহার কৌশল শিক্ষা করিয়া অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় প্রাণগতি দ্বারা কাল নির্ণয় করিলে অধিক ব্যতিক্রম হয় না।

প্রাচীন কালের কথিত সিদ্ধান্ত অনুসারে ইংরাজী ২৪ ঘণ্টায় যদি ২১৬০০ বার প্রাণ ক্রিয়া হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক ঘণ্টায় ৯০০ বার হইবে। বাঙ্গালা সার্দ্ধদ্বিতয় (২॥০) দণ্ডে ইংরাজী এক ঘণ্টা। সুতরাং উহাকে ২॥০ ভাগ করিয়া বাঙ্গালা এক দণ্ডে ও ইংরাজী ২৪ মিনিটের মধ্যে স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস ৩৬০ বার হয় বলিতে হইবে। তন্মধ্যে ১৮০ পতন এবং ১৮০ বার উৎপতন। "৩৬০" ইহাকে ২৪ ভাগ করিয়া লইলে ইংরাজি প্রত্যেক মিনিটে সুস্থ অবস্থাপন্ন মনুষ্যের শ্বাসোচ্ছ্বাস ১৫ বার হয়। ৮ বার পতন ও ৭ বার উৎপতন। অথবা ৭ বার পতন আর ৮ বার উৎপতন। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইচ্ছা হইলে পাঠকগণও পরীক্ষা করিতে পারেন যে, একটি মিনিটে উক্ত সংখ্যাধিক শ্বাসোচ্ছ্বাস সমাধা হয় না। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ২। ৩ সেকেণ্ডের অতিরিক্ত ব্যতিক্রম হয় নাই।

প্রাচীন ভারতবর্ষীয়গণের এতদ্রূপ অনুসন্ধান ছিল। তাঁহাদের এতাদৃশ সন্ধিৎসা ছিল বলিয়া তাঁহাদের পরবর্ত্তী পুত্র পৌত্রগণ সমধিক উন্নতির সোপানে পদার্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে কএক প্রকার প্রাচীন কাল নির্ণয়ের প্রথা বর্ণন করা হইল, তদতিরিক্ত আরও দুই চারিটি আছে। যথা—রক্ত সঞ্চলন বা নাড়ীর গতি, নাক্ষত্রিক উদয়াস্ত ইত্যাদি সমস্ত প্রায় এই রূপ, সুতরাং তাহা আর বিস্তার করিলাম না। এক্ষণে মধ্যকালে কাল নির্ণয় প্রথা, যাহাতে শিল্পসংযোগ আছে, তাহাই বিশদ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সে সকল বিশদ করিতে হইলে ভারতে জ্যোতিঃশাস্ত্রের আবির্ভাব নির্ণয় করিতে হয়। এজন্য আপাততঃ এই স্থানেই প্রস্তাব শেষ করিলাম, ভবিষ্যতে "ভারতে জ্যোতিঃশাস্ত্রের আবির্ভাব" সংক্ষেপে নির্ণয় করিয়া কালজ্ঞান সাধন শিল্প গুলি ব্যক্ত করিব।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

(১) শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু বিরচিত—সৃষ্টি।

(২) শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ বিরচিত—সাংখ্যদর্শন।

চতুর্থ সংখ্যা পত্রিকার ১৫৩ পৃষ্ঠার পর।

এতাবৎ কাল প্রকৃত প্রস্তাবের কিপর্য্যন্ত মীমাংসা হইল, অগ্রে তাহার একটি চুম্বক প্রদর্শন করি; তাহার পর অবরোহ-প্রণালীতে রীতিমত হস্তক্ষেপ করিব। প্রথম, আরোহ-প্রণালী অনুসারে স্থূল ভূত-সঙ্ঘাত হইতে সূক্ষ্ম ভূতে উপনীত হইলাম; দ্বিতীয়, তাহাই যে চরম সূক্ষ্ম এমন নহে—সূক্ষ্মেরও সূক্ষ্ম আছে এইরূপ স্থির করিলাম।

কেননা ভৌতিক পদার্থ সহস্র-সূক্ষ্ম হইলেও তাহা আপেক্ষিক, তাহার এক পরমাণু আর এক পরমাণুকে অপেক্ষা করে, এবং উভয়ই সূক্ষ্মতর মধ্যস্থ বিশেষকে অপেক্ষা করে। একটি মধ্যস্থ-পদার্থকে আমরা জানি যে, তাহা সূর্য্য হইতে প্রসারিত হইয়া, বায়ু রাশি ভেদ করিয়া, পৃথিবীর জলস্থল ভেদ করিয়া তিষ্ঠিতেছে;—কে? না যে-পদার্থের কম্পন-দ্বারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ে আলোক-বোধের উৎপত্তি হয়। আলোক-জনন সেই সূক্ষ্ম পদার্থে—সেই সূক্ষ্ম সূত্রে—সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সকলই গ্রথিত রহিয়াছে। তারাকর্ষণই হউক, যোগাকর্ষণই হউক, চুম্বকাকর্ষণই হউক, সকলই ঐরূপ কোন না কোন সূক্ষ্ম মধ্যস্থ-পদার্থকে অপেক্ষা করে। কেন-না আকর্ষণাধীন দুই দুই বস্তুর মধ্যে তৃতীয় কোন সূক্ষ্ম বস্তু না থাকিলে উক্ত বস্তু-দ্বয়ের একটি হইতে অন্যটিতে আকর্ষণ-ক্রিয়া প্রবাহিত হইতে পারে না। এ বিষয়টি বেদান্তবাগীশ মহাশয় তাঁহার সাংখ্য দর্শনে অতি সুন্দররূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। পাঠকের উপকারার্থে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করি। "বল দেখি শক্তি-পদার্থটি কি? স্বতন্ত্র? কি কাহারও অনুগত? বিচার করিতে গেলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, শক্তি, * রূপ-প্রভৃতির ন্যায় সেই সেই বস্তুর অধীন, অর্থাৎ গুণ-পদার্থ। গুণ, কোন ক্রমেই আপনার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্যত্র সঙ্গত হয় না সুতরাং শক্তিও আশ্রয়-চ্যুত হইয়া দূরে প্রস্থিত হয় না। বিশেষতঃ দ্রব্য ভিন্ন অন্য পদার্থে ক্রিয়া জন্মে না। ক্রিয়া না জন্মিলেও বস্তুর চলন হয় না। যদি শক্তি-ক্ষেত্রে ক্রিয়া বা চলন না হয়, তবে সে দূরস্থ পদার্থের সহিত কিরূপে সংযুক্ত হইবে? মনে কর, অগ্নির দাহিকা-শক্তি আছে জলের শৈত্য-গুণ আছে পুষ্পের সৌরভ আছে। কিন্তু দাহিকা-শক্তি, শৈত্য গুণ, সৌরভ, ইহারা কি অগ্নি জল ও পুষ্প পরিত্যাগ করিয়া যায়? কখনই না। তবে যে আমরা দূর হইতে তাপ বা স্ফুলিঙ্গ, শৈত্য বা সৌরভ আসিতে দেখি, তাহা কেবল গুণ বা শক্তি নহে, সকলই আপন আপন আশ্রয়-দ্রব্যের পরমাণু-সহযোগেই আইসে।" উপরে যাহা উদ্ধৃত করা হইল তাহার কিয়দংশ বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাতে প্রমাণের কিছুমাত্র ব্যাঘাত জন্মে নাই। তাপ-গুণ কেবল অগ্নিতে আছে জলেতে নাই এ কথা ঠিক নহে—কিন্তু তাহাতে আইসে যায় না। শূন্যকে আশ্রয় করিয়া কোন ক্রিয়া চলিতে পারে না, এটি যথার্থ কথা। বায়ু-পদার্থ অগ্নি পদার্থ হইতে (অর্থাৎ উত্তপ্ত এবং জ্বলন্ত বস্তু যাহা কিছু তাহা হইতে) ভিন্ন বটে কিন্তু এত ভিন্ন নয় যে, অগ্নির তাপ গুণ বায়ুতে সংক্রমিত হইতে পারে না। চাই মানো যে, বায়ু অগ্নি জল স্থল সমুদায়ের ভিতর দিয়া তাপ-বাহক কোন একটি সূক্ষ্ম মধ্যস্থ বস্তু

* চলিত ভাষায় আমরা কেবল দ্রব্যকেই পদার্থ বলিয়া থাকি, কিন্তু নৈয়ায়িক ভাষায় দ্রব্য, গুণ ক্রিয়া প্রভৃতির প্রত্যেকেই পদার্থ; এমন কি অভাবকেও পদার্থের মধ্যে ধরা হইয়াছে।

বিতত রহিয়াছে; চাই মানো যে, জল স্থল বায়ু পরস্পর এরূপ ছোঁয়াছুঁয়ি করিয়া আছে যে, একের উত্তাপ অপরে-সংক্রমিত হইতে পারে—যাহাই মানো না কেন—ইহা সুনিশ্চিত যে, শূন্য আশ্রয় করিয়া গতি, ক্রিয়া, শক্তি, গুণ, ইহার কিছুই থাকিতে পারে না। অতএব আকর্ষণাধীন বস্তুদ্বয়ের মধ্যে আকর্ষণ-ক্রিয়ার একটা সঞ্চার-ভূমি বর্ত্তমান থাকা চাই, সূক্ষ্ম মধ্যস্থ একটি বর্ত্তমান থাকা চাই; আবার সেই সূক্ষ্ম-মধ্যস্থটি যদি ভৌতিক পদার্থ হয়, তবে তাহারও পরমাণুগণের মধ্যে আকর্ষণ রহিয়াছে মানিতে হয়; সুতরাং সেই আকর্ষণ-ক্রিয়া-সাহক সূক্ষ্মতর মধ্যস্থ-একটি তাহারও মূলে বর্ত্তমান থাকা চাই।

সকল ভৌতিক বস্তুই ছিদ্রালু (porous); পরমাণু-গণ পরস্পর ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া আছে সত্য, কিন্তু ছোঁয়াছুঁয়ি করিয়া নাই; তাহাদের মধ্যে একটু না একটু ব্যবধান আছেই আছে। বল-পূর্ব্বক সেই ব্যবধান কমাইতে গেলেই বিক্ষেপ শক্তি তাহার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং ভৌতিক-বস্তুর ছিদ্র-সকল আকর্ষণ এবং বিক্ষেপ-শক্তির বাহক কোন না কোন সূক্ষ্ম মধ্যস্থ দ্বারা পরিপূরিত, ইহাতে আর ভুল নাই। এবং সেই সূক্ষ্ম বস্তুর ছিদ্র-সকলও সূক্ষ্মতর বস্তু দ্বারা পরিপূরিত। মনে কর যেন ঐরূপ করিয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোন এক উচ্চ সোপানে উপনীত হইয়াছ; কিন্তু তাহা যদি ভৌতিক বস্তু হয়, তবে তাহার এক পরমাণু আর এক পরমাণুকে অপেক্ষা করে এবং উভয়ই মধ্যস্থ বিশেষকে অপেক্ষা করে;—ইহার উপরে যাইবার কোন কথা নাই তখন সে বিস্তুকেও আপেক্ষিক বলিয়া মানিতে হইতেছে। কিন্তু যদি কোন বস্তুকে এত সূক্ষ্ম মনে কর যে, তাহার ছিদ্র নাই, পরমাণু নাই, আবরণ নাই, তবে তাহা আর ভৌতিক বস্তু রহিল না, তাহা আপেক্ষিক বস্তুও রহিল না, তাহা অখণ্ড এবং স্বয়ং-সিদ্ধ। আপেক্ষিক বস্তু স্বতঃ থাকিতে পারে না, নিরালম্ব বস্তুর আশ্রয়ে তাহাকে থাকিতেই হইবে। যাহা নিরালম্ব তাহার অংশ ছিদ্র বা আবরণ কিছুই থাকিতে পারে না। কেননা যাহার অংশ আছে তাহা যোজক বস্তুকে অপেক্ষা করে; যাহার আবরণ আছে তাহা আবরণ-কারী বস্তুকে অপেক্ষা করে; যাহার ছিদ্র আছে তাহা ব্যবধান-কারী বস্তুকে অপেক্ষা করে। দ্বিতীয় কোন কিছুকেই অপেক্ষা করে না যে, তাহাকেই আমরা নিরালম্ব বলি; সুতরাং তাহা নিরংশ অনুপহিত এবং নীরন্ধ্র। অতএব ইহা স্থির হইল যে ভৌতিক জগৎ, অংশ আবরণ এবং ছিদ্র-বিহীন এক নিরালম্ব বস্তুকে আশ্রয় করিয়া স্থিতি করিতেছে। জীবাত্মাও অখণ্ড অর্থাৎ নিরংশ কিন্তু তাহার আবরণ আছে—সীমা আছে—তাহা আপেক্ষিক সত্য—এটি যেন মনে থাকে। অনুপহিত অখণ্ড বস্তু এবং আপেক্ষিক বস্তু উভয়ের মধ্যে যে কি প্রভেদ তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি; তাহা এই,—আপেক্ষিক বস্তুতে সত্যও আছে সত্যের অভাবও আছে, অনুপহিত অখণ্ড বস্তুতে সত্যই কেবল আছে

সত্যের অভাব অণুমাত্রও নাই; অনুপহিত অখণ্ড বস্তুতে কোন প্রকার অভাবাত্মক উপাধি মূলেই বর্ত্তিতে পারে না, সে বস্তু পরিপূর্ণ সত্য। দেহাদি-উপহিত অখণ্ড বস্তু যে জীবাত্মা, তিনি জড় অপেক্ষা সত্য-পূর্ণ; নিরালম্ব অখণ্ড-বস্তু, জীবাত্মা অপেক্ষাও অসীম গুণে সত্য-পূর্ণ ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি; এই জন্য তিনি আত্মারও আত্মা পরমাত্মা শব্দে উক্ত হইয়া থাকেন। জড় বস্তু অপেক্ষা আত্মার সহিত তাঁহার অধিক সাদৃশ্য-বোধে আমরা তাঁহাকে বস্তু না বলিয়া—বলি তিনি পূর্ণ পুরুষ। কেননা পুরুষ শব্দে কেবল যে বস্তু বুঝায় এমন নহে, কিন্তু জড় অপেক্ষা দ্বিগুণ সত্যশালী, সুতরাং পূর্ণতার নিকটবর্ত্তী, উচ্চ মূলোর বস্তু বুঝায়—আত্মা বুঝায়।

পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত এই পর্য্যন্ত; এক্ষণে অবরোহ-প্রণালী দোহন করিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং প্রকরণ যৎকিঞ্চিৎ যাহা আমাদের বোধ গম্য হয় তাহাই প্রদর্শন করি।

কম্‌ট বলেন আপেক্ষিক লইয়াই যাহা কিছু আমাদের প্রয়োজন, তাহার ও-দিকে আর কিছু থাকে থাকুক, না থাকে না থাকুক, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র ইষ্টাপত্তি নাই। স্পেন্সর বলেন যে, আপেক্ষিক সত্যের মূলে অসীম নিরালম্ব সত্য, আছে, ইহা সুনিশ্চিত, কিন্তু তাহা আমাদের জ্ঞানের আয়ত্তাধীন নহে। স্পেন্সরের উপর আর একটু অধিক আমরা এই বলিতে চাই যে, অসীম সত্য আমাদের জ্ঞানের আয়ত্তাধীন নহেন তথাপি আমরা যেমন তাঁহার অস্তিত্ব ধ্রুবরূপে উপলব্ধি করিতে পারি, তেমনি আমরা আর একটি বিষয়েরও সন্ধান পাইতে পারি;—কি? না আত্মা হইতে জড়ের দিক্ অসীম সত্যের দিক্ নহে, পরন্তু তাহার বিপরীত দিক্ যে, জড় হইতে আত্মার দিক্, তাহাই অসীম সত্যের দিক্। আমরা গম্য স্থানের অন্ত না পাই—দিক্ নির্ণয় করিয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইতে পারি। আরোহ অবরোহ যেমন দুই প্রণালী, জড় হইতে আত্মা এবং আত্মা হইতে জড় তেমনি দুই দিক্। পূর্ব্বোক্ত দিক্‌ই অসীম সত্যের দিক্। ইহার প্রমাণ যাহা বারান্তরে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে এই রূপ স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, আপেক্ষিক সত্য যত কিছু তাবতের মূলে এক অদ্বিতীয় অখণ্ড পরিপূর্ণ অসীম নিরবলম্ব জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা বর্ত্তমান। পরমাত্মার সহিত জগৎসৃষ্টির কিরূপ সম্বন্ধ তাহাই এক্ষণে নিরূপণ করা যাইতেছে।

আরোহ-প্রণালী অনুসরণ করিয়া যত ঊর্দ্ধে উঠা যায় ততই জগতের আদিম অবস্থার ভাব উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সে ভাব ভেদ-রাহিতা। জলে স্থলে বায়ুতে অগ্নিতে যে প্রভেদ তাহা আধুনিক। জগতের প্রথমাবস্থায় সর্ব্বত্রই একাকার ভাব ছিল। সেরূপ একাকার ভাব সৃষ্টি-অভিব্যক্তির পূর্ব্ব-ভাব; কেননা ভিন্নতা না থাকিলে বিশেষ কোন কিছুর অভিব্যক্তি হইতে পারে না। শ্বেত বর্ণ কাগজে ভিন্ন-বর্ণের

অক্ষরই ফুটে, শ্বেত বর্ণের অক্ষর ফুটে না। অভিব্যক্তির পক্ষে ভিন্নতাও যেমন চাই সমতাও তেমনি চাই। যদি সমান কালো বর্ণ বা অন্য কোন বর্ণ এক ঠাঁই জোড়া-গাঁথা না হয় তাহা হইলেও তাহার অভিব্যক্তি সম্ভবে না। শ্বেতবর্ণ হইতে, ভিন্ন কেবল নয় কিন্তু, সমভিন্ন (অর্থাৎ সমান মাত্রায় ভিন্ন) বর্ণ-নিচয়ের সমষ্টি ব্যতিরেকে, শ্বেত নয় এমন কোনও বর্ণের অভিব্যক্তি সম্ভবে না। ক—খ এই রেখা যদি আত্যন্তিক ক্ষুদ্র হয় তবে তাহা প্রকাশ পাইতে পারে না। সম-কৃষ্ণবর্ণ কিয়দংশ স্থানে পুঞ্জীভূত না হইলে কৃষ্ণবর্ণ ক—খ রেখা ব্যক্ত হইতে পারে না। সঙ্গীতের সা রে গা মা কাহারো অবিদিত নাই;—কতক মাত্রা সময় ব্যাপিয়া সা উচ্চারণ করিলে তবে তাহা স্বর-বিশেষ বলিয়া প্রকাশ পায়। পূর্ব্বে যেরূপ শব্দ শ্রুত হইতেছিল অথবা নিঃশব্দতা অনুভূত হইতেছিল তাহা হইতে সমভিন্ন (সমান মাত্রায় ভিন্ন) স্বর বিশেষের সমষ্টি হইতে (যথা সা আ আ আ ইহার সমষ্টি হইতে) সা এই স্বর উৎপন্ন হয়। অতএব বিশেষ কোন কিছুর প্রকাশের জন্য প্রথম চাই ভিন্নতা, পরে চাই সমান-মাত্রায় ভিন্ন অনেকের সমতা, পরে চাই সেই সমভিন্ন অনেকের সমষ্টি। এই তিনটি না হইলেই নয়।

সর্ব্বাদিম অব্যক্ত একাকার ভাব—সৃষ্টির পূর্ব্ব ভাব—কিরূপ? প্রকাশ পাইতেছে এ ভাব নহে—ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভবিষ্যতে প্রকাশ পাইতে পারে এই ভাবই জগৎসৃষ্টির পূর্ব্ব ভাব। অত জটিলতায় কাজ কি—শুদ্ধ কেবল দিক্ উল্টাইলেই পাওয়া যায় যে, আপেক্ষিক সত্যের সম্বন্ধে মূল সত্য যখন অদ্বৈত পূর্ণ এবং নিরবলম্ব স্বতন্ত্র, তখন তাঁহার সম্বন্ধে জগৎ বহুধা বিচিত্র অপূর্ণ এবং আশ্রিত হইলেই ত।

যে বিষয় যত গভীর যত উৎকৃষ্ট তাহার আবির্ভাব ততই কাল-সাপেক্ষ। জগৎ যেরূপ অতলস্পর্শ "গভীর রচনা", তাহার প্রকাশও সেইরূপ অনন্ত-কাল ব্যাপী। কবি যদি অন্তঃকরণের সকল ভাব এককালেই প্রকাশ করিতে যান, তাহা হইলে সে ভাব ভাব মাত্রই রহিয়া যায়, আবির্ভাবের সম্ভাবনা থাকে না। কবি আপনার মনের ভাব আপাততঃ অপ্রকাশ রাখিয়া ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিলে তবেই তাহা কাব্যরূপে আবির্ভূত হয়। প্রকাশ হইয়াছে, অপ্রকাশ রহিয়াছে, এবং অপ্রকাশের মধ্য হইতে প্রকাশ হইবার উপক্রম হইতেছে, এই তিন অবস্থার উপর ভর করিয়া সমুদায় প্রকৃতি গম্যপথে অগ্রসর হইতেছে। ইহা দেখিয়াই বোধ হয় সাংখ্যদর্শন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জগতের মূল উপাদান তিনটি মাত্র—একটি প্রকাশক, আর একটি প্রকাশের বাধাজনক, আর একটি চালক। প্রকাশক যেটি তাহার নাম সত্ত্ব গুণ, বাধক যেটি তাহার নাম তমোগুণ, চালক যেটি (অর্থাৎ প্রকাশ হইতে অপ্রকাশে এবং অপ্রকাশ হইতে প্রকাশে লইয়া যায় যেটি) তাহার নাম রজোগুণ।

আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, সাংখ্য

দর্শন চলিত-অর্থেই গুণ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা নহে; গুণ-শব্দে আত্মার বন্ধন বুঝিতে হইবে ইহাই সাংখ্যদর্শনের অভিমত। প্রকাশ-ধর্ম্মী চলত্ব-ধর্ম্মী এবং আবরণ-ধর্ম্মী বস্তুত্রয়ই গুণত্রয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঐ মূল-বস্তু-তিনটির সম্যাবস্থাই প্রকৃতি। বৈষম্যাবস্থাই জগৎ।

বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রত্যেক আলোকচ্ছটা সাতটি উপচ্ছটার সাম্যাবস্থা। সেই সাতটির মধ্যে তিনটি বিশুদ্ধ, তদ্ব্যতীত আর যে চারিটি তাহাদের প্রত্যেকে উক্ত তিনটির ভিতরকার কোন একটির সহিত অপর কোনটির সম্মিশ্র-বিশেষ। অতএব সূক্ষ্ম ধরিতে গেলে এই রূপ দাঁড়ায় যে, প্রত্যেক আলোকছটা ঐ বিশুদ্ধ উপচ্ছটা-তিনটির সাম্যাবস্থা। তিনটির মধ্যে একটি রক্ত বর্ণ, একটি পীতবর্ণ, অপরটি নীলবর্ণ। পীতবর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল, রক্তবর্ণ মধ্য বিধ উজ্জ্বল, নীলবর্ণ অনুজ্জ্বল।

পীতবর্ণকে মনে কর সত্ত্বগুণ, রক্তবর্ণকে রজোগুণ, নীলবর্ণকে তমোগুণ।

ন্যূনাধিক মাত্রায় তিন মূল বর্ণের সম্মিশ্র হইতে আর আর সমুদায় বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতিজাত বস্তু সকলকে মনে কর যেন সেই মিশ্রবর্ণ। প্রকৃতিজাত বস্তু মাত্রই ন্যূনাধিক পরিমাণে সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ এই তিন গুণের সম্মিশ্র। সাংখ্যদর্শনের নিরীশ্বরতা বাদ দিয়া তাঁহার উপরিউক্ত মত যদি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে এই রূপ দাঁড়ায় যে সৃষ্টির পূর্ব্বে বহুল-বিচিত্র মিশ্র বস্তু সমুদায়, কিম্বা তাহাদের মূল-গত সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই আদি-বস্তু-তিনটি, সাম্যাবস্থায় অবস্থিত ছিল—মূল-প্রকৃতি রূপে ঈশ্বরের শক্তিতে তন্মাত্রীভূত ছিল—তাহাদের বহুত্ব একত্বে কেন্দ্রীভূত ছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় প্রকৃতি ত্রিগুণ-সাম্য হইতে ত্রিগুণ-বৈষম্যে পরিণত হইয়া—অব্যক্ত ছিল ক্রমে ক্রমে ব্যক্ত হইল।

আলোকের উপমা এখনো শেষ হয় নাই। আলোকের উপচ্ছটা-তিনটির মধ্যে পীতবর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল, রক্তবর্ণ মধ্যবিধ উজ্জ্বল, এবং নীলবর্ণ অনুজ্জ্বল। ইহার ভাবান্তর এই যে, মূল যে উজ্জ্বল আলোকছটা—পীতবর্ণে তাহার সাদৃশ্য, রক্তবর্ণে তাহার অপভ্রংশ এবং নীলবর্ণে তাহার বৈপরীত্য লক্ষিত হইয়া থাকে। এ যেমন—তেমনি বলা যাইতে পারে যে, সত্ত্বগুণ ঈশ্বরের সদৃশ-আবির্ভাব, রজোগুণ কলুষিত আবির্ভাব, তমোগুণ বিসদৃশ আবির্ভাব। অতএব ঈশ্বরের নিকট-সাদৃশ্য দূর-সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যই গুণ-ত্রয়-ভেদের পরিমাপক। তাৎপর্য্য এই যে, ঐশ্বরিক ভাবের প্রকাশক, বাধক, এবং সংক্রামক তিন প্রকার বস্তুই জগতে আছে। ইহার কারণ এই যে ভিন্নতা না থাকিলে কোন কিছুর অভিব্যক্তি সম্ভবে না। ঈশ্বর যদি সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ হন, তবে তিনি ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পায় না। ঈশ্বরের সে স্বপ্রকাশ ভাবও আছেই, তদ্ভিন্ন আর একটি যে প্রকাশ—জগৎ-প্রকাশ—তাহাও তাঁহারই প্রকাশ, কিন্তু তাহা বাধা-যুক্ত প্রকাশ;—

তাহা তাঁহার স্বরূপাভাব নহে তাহা আবির্ভাব, কেননা তাহাতে তাঁহার প্রকাশও আছে, প্রকাশের বাধাও আছে। সুতরাং প্রকাশক, বাধক এবং দুয়ের মধ্যস্থ এই তিনের সংঘাত ভিন্ন জগতের অভিব্যক্তি সম্ভবে না।

আমরা দেশ কালের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে তৎসংক্রান্ত নানা প্রকার বিভিন্নতা দেখিতে পাই। প্রথম, দেশ হইতে কালের বিভিন্নতা; দ্বিতীয়, অসীম দেশ-কাল হইতে সসীম দেশ-কালের বিভিন্নতা; তৃতীয়, দেশকাল হইতে দেশকালান্তরের বিভিন্নতা; চতুর্থ, বর্ত্তমান-কাল হইতে ভূত-ভবিষ্যতের বিভিন্নতা; পঞ্চম, দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং বেধের বিভিন্নতা। সৃষ্টি আলোচনার সময়—দেশ কালের অতীত পরমাত্মার সহিত দেশকালের অন্তঃপাতী জগতের সম্বন্ধ আলোচনার সময়—তিনটি মাত্র মূল বিভিন্নতা সাংখ্যকারের মনে হইয়াছিল। কি? না ত্রিগুণের পরস্পর বিভিন্নতা, ত্রিগুণ-সাম্য হইতে ত্রিগুণ-বৈষম্যের বিভিন্নতা, এবং আত্মা হইতে ত্রিগুণের বিভিন্নতা। সাংখ্য-দর্শন ঈশ্বর-বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই, দুই একটি কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা না বলারই মধ্যে। ঈশ্বরের সহিত ত্রিগুণের ভিন্নতা কিরূপ এবিষয়ে নিরীশ্বর সাংখ্য কিছুই বলেন নাই বটে কিন্তু সেশ্বর সাংখ্য পাতঞ্জল তাহা বলিতে ত্রুটি করেন নাই। পাতঞ্জল বলিয়াছেন "ক্লেশ-কর্ম্মবিপাকাশয়ৈর্ অপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।" অবিদ্যামূলক যে ক্লেশ এবং কর্ম্মফল-পরিপাকের আধার যে সংস্কারাত্মক বাসনা-সমূহ তাহা হইতে নির্লিপ্ত পুরুষ বিশেষই ঈশ্বর। সাংখ্য মতে আত্মামাত্রই নির্গুণ কিন্তু ত্রিগুণের সংসর্গদোষে জীবাত্মা নির্গুণ হইয়াও সগুণ; সাধন-বিশেষ-দ্বারা ত্রিগুণের সঙ্গ-ত্যাগ করিতে পারিলেই তবে তিনি আপনার স্বরূপ লাভ করেন—নিস্ত্রৈগুণ্য লাভ করেন—আপনি যাহা তাহাই হন, যতক্ষণ তাহা না হ'ন ততক্ষণ আপনি যাহা নহেন তাহাই আপনাকে মনে করেন—সুখদুঃখ মোহ-পাশে বদ্ধ মনে করেন—এই রূপ বন্ধন-সংস্কারই জীবাত্মার বন্ধন, এবং তাহা হইতে মুক্তিই জীবাত্মার মুক্তি—সাংখ্যের এই প্রকার মত। কি উপায়ে জীব মুক্তিলাভ করেন? না সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ-সাধন দ্বারা। (পাতঞ্জল বলেন কিন্তু ঈশ্বরেতে নিত্য কালই সত্ত্ব-গুণের উৎকর্ষ রহিয়াছে—তাহাতে সাধনের অপেক্ষা নাই; "তস্য চ তথাবিধম্ ঐশ্বর্য্যম্ অনাদেঃ সত্ত্বোৎকর্ষাৎ।"

ঈশ্বর-সম্বন্ধে পাতঞ্জলের মনোগত অভিপ্রায় এইরূপ; সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণ জীবাত্মাকেই বন্ধন করিতে পারে; পরমাত্মাকে নহে। কেহ এইরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, পরমাত্মাতে যদি সত্ত্বগুণ (প্রকাশক বস্তু) না থাকে তবে "তিনি স্বপ্রকাশ" এ কথা কিরূপে রক্ষা পাইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, সত্ত্বগুণ পরমাত্মাকে প্রকাশ করিবে কি—পরমাত্মার প্রকাশ দ্বারাই সত্ত্বগুণ অনুপ্রকাশিত হইতেছে—সত্ত্বগুণ পরমাত্মার প্রকাশের অনুপ্রকাশ মাত্র। যে-প্রকাশ

বিরোধী বস্তু দ্বারা বাধা পাইতে পারে তাহাই সত্ত্বগুণের প্রকাশ। দৈর্ঘ প্রস্থ বেধের ন্যায় সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণ পরস্পরাপেক্ষ অর্থাৎ বস্তু বিশেষে দৈর্ঘ-প্রস্থ বেধের যেমন ন্যূনাধিক্য দেখা যায় তেমনি বস্তু বিশেষে গুণ-তিনটির ন্যূনাধিক্য হইতে পারে, কিন্তু কোন একটি গুণ মূলেই নাই এরূপ হইতে পারে না। এক খণ্ড স্বর্ণকে যদি দৈর্ঘে বাড়াও, তবে তাহার প্রস্থ এবং বেধ কমিয়া যাইবে; প্রস্থে বাড়াও, দৈর্ঘ এবং বেধ কমিয়া যাইবে; বেধে বাড়াও, দৈর্ঘ এবং প্রস্থ কমিয়া যাইবে; কিন্তু সহস্র কমিলেও তিনের কোনটি আদবেই নাই এরূপ হইতে পারিবে না। এই কাগজটির বেধ এত অল্প যে তাহা মনে ধারণা করাই সুকঠিন, কিন্তু তাহা আছে-যে তাহাতে আর সংশয় নাই। যেমন দৈর্ঘ-বেধ-বিহীন প্রস্থ থাকিতে পারে না, প্রস্থ-বেধ-বিহীন দৈর্ঘ থাকিতে পারে না, দৈর্ঘ-প্রস্থ-বিহীন বেধ থাকিতে পারে না, সেইরূপ কোন বস্তুতে সত্ত্বরজো-বিহীন তমঃ, অথবা তমোরজোবিহীন সত্ত্ব, অথবা সত্ত্ব-তমো-বিহীন রজঃ একাকী থাকিতে পারে না। সত্ত্ব-রজস্তমো-গুণ এইরূপ আপেক্ষিক। কিন্তু ঈশ্বরের যে স্বপ্রকাশ মহিমা তাহা প্রাকৃতিক সত্ত্ব-গুণের ন্যায় আপেক্ষিক নহে, তাহা বাধা-গ্রস্ত নহে; এ জন্য যদি ইচ্ছা কর তবে তাহাকে শুদ্ধসত্ত্ব বলিতে পার, কেবল এইটি মনে রাখিও যে, তাহা সত্ত্বরজস্তমোগুণের ভিতরকার বাধা-যুক্ত সত্ত্বগুণ নহে, প্রকৃতির ভিতরকার সত্ত্বগুণ নহে, রজস্তমোঽপেক্ষ সত্ত্বগুণ নহে—অর্থাৎ তাহাকে সত্ত্বগুণ না বলিলেই ভাল হয়। কেননা যাঁহার প্রকাশেতে করিয়া সত্ত্বগুণ অনুপ্রকাশিত হয়, তাঁহাকে সত্ত্বগুণ বলিলে ভ্রমোৎপত্তির একটি পথ খুলিয়া রাখা হয়। পাতঞ্জল যে বলিয়াছেন ঈশ্বরেতে সত্ত্বগুণ ঐকান্তিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, তাহা রজস্তমো কর্তৃক কিছুমাত্র বাধা গ্রস্ত নহে, সুতরাং তাহা প্রাকৃতিক সত্ত্বগুণ হইতে ভিন্ন। ইতিপূর্ব্বে যাহা একবার বলিয়াছি তাহা আবার বলি; পীতবর্ণ উপছটা যেমন মূল ছটার সদৃশ আবির্ভাব, রক্তবর্ণ কলুষিত আবির্ভাব, নীলবর্ণ বিসদৃশ আবির্ভাব; সেইরূপ সত্ত্ব-গুণ ঐশী শক্তির সদৃশ-আবির্ভাব, রজোগুণ কলুষিত আবির্ভাব, এবং তমোগুণ বিসদৃশ আবির্ভাব। বিভিন্নতা ব্যতিরেকে জগতের অভিব্যক্তি সম্ভবে না; ত্রিগুণের বিভিন্নতাই আর আর সমুদায় বিভিন্নতার মূলে বর্তমান আছে। সত্ত্বগুণ ঈশ্বরের সদৃশ আবির্ভাব হইলেও তাহা আবির্ভাব মাত্র, ছায়া মাত্র—সুতরাং ঈশ্বরের স্বপ্রকাশ মহিমা হইতে তাহা ভিন্ন। পরমাত্মার যে স্বপ্রকাশভাব তাহা ত্রিগুণাতীত।

অতঃপর ত্রিগুণাত্মক জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং ক্রম কিরূপ তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

ভারতবর্ষীয় ইংরাজ।

ইংরাজেরা এদেশ জয় করিয়া শতাব্দীর অধিক কাল আমাদের উপর রাজত্ব করিতেছে কিন্তু এদেশীয়দিগের সহিত এখনও তাহাদের সদ্ভাবের কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। ইহা যেমন আক্ষেপের বিষয় তেমনি অনিবার্য্য ঘটনা বলিতে হইবে। আমাদের দেশের যে কোন ব্যক্তি ব্রিটিষ-সিংহকে তাহার নিজ গহ্বরে দর্শন করিয়াছে সেই তাহার মহান্ উদার ভাব দেখিয়া বিমোহিত হয় কিন্তু সেই সিংহ যখন বিদেশে আসিয়া বিচরণ করে তখন তাহার তর্জ্জন-গর্জ্জনকারী বিকট মূর্ত্তি দর্শন করিয়া লোক-সকল শশব্যস্ত হয়। যে ইংরাজ সেই ইংলণ্ডে, সেই ইংরাজ এই ভারতে—তবে তাহার অবস্থান্তর হইবার কারণ কি? শুধু আমরা নই—কিন্তু তাহাদের আপনাদের লোকেরাও এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া অনেক সময় বিস্ময়াপন্ন হয়। এদেশে এক জন ইংরাজ যে সকল ঘটনার মধ্যে নিপতিত হয় তাহা এরূপ বিসদৃশ—যে ইহার মধ্যে পড়িয়া কতক বৎসরের মধ্যেই তাহার প্রকৃত মহৎ ভাব অন্তর্হিত হয়; অথবা তাহাদিগের সমাজপ্রণালীর এরূপ শাসন যে তাহাতে সে বাধ্য হইয়া সভ্যতার আবরণে তাহার প্রকৃত নীচ ভাব স্বদেশে গোপন করিয়া রাখে; বা প্রকাশ করিবার অবসর পায় না—কিন্তু যখনি সে বিদেশে গিয়া স্বীয় সামাজিক বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তখনই সে নিজ মূর্ত্তি ধারণ করে—আঙ্গ্লো-ইণ্ডিয়ান নামে এক নূতন জীব হইয়া দাঁড়ায় এবং "এই বিড়াল বনে গেলেই বন বিড়াল হয়" এই প্রবাদটীর সত্যতা প্রকারান্তরে সপ্রমাণ করে।

যে কারণেই হউক, ইংলণ্ডবাসী ইংরাজের স্বভাব এক প্রকার—ভারতীয় ইংরাজের ভাব অন্য প্রকার বলিয়া আমাদের চক্ষে প্রতীয়মান হয়। বিলাতে গিয়া ইংরাজদের সঙ্গে সমানভাবে মিশিলে মেশা যায়। তাহাদের ভোজনালয়ে বসিয়া একত্রে আহারাদি কর—ক্রীড়াকাননে তাহাদের সহিত একত্র আমোদ আহ্লাদ কর—ইংরাজ-পরিবারে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার গৃহিণীগণের সহিত মন খুলিয়া আলাপ কর, সকলি সম্ভবে। কত আদরের সহিত তাহারা তোমাকে গ্রহণ করিবে—সখা বলিয়া তোমার প্রতি হস্ত প্রসারিত করিবে—অভ্যাগত বলিয়া আতিথ্য-সৎকারের ত্রুটি করিবে না। যিনি কোন ইংরাজ-পরিবার মধ্যে বাস করিয়া প্রাতঃকালে গৃহিণীর সহাস্য বদনে সুপ্রভাত অভিবাদন ও রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে সৌরাত্র অভিবাদনে অভিনন্দিত হইয়াছেন তিনি তাহা কখন বিস্মৃত হইতে পারেন না। ইংরাজ-স্ত্রী হইতে বিদেশীয়গণ যে সেবা শুশ্রূষা পান তাহাতে তাঁহাদের ইংলণ্ড-বাস প্রবাস বলিয়াই বোধ হয় না। ভারতবর্ষীয় মাত্রই সে দেশে সম্মানের

সহিত গৃহীত হয়—ভারতবর্ষীয় ধনাঢ্য ব্যক্তি তথায় যুবরাজ বলিয়া সমাদৃত হন।

ঐ এক ছবি—এদেশে দেখ আর এক চিত্র। সেই ইংরাজদের সহিত এদেশে আলাপ করিতে যাও দেখিবে তাহাদের আর সে ভাব নাই। তাহাদের গৃহদ্বার বন্ধ। হাস্যালাপের পরিবর্তে ভ্রুকুটি। তাহারা আপনাদের দলবল লইয়া যে ব্যূহ বন্ধন করে সাধ্য কি যে, এদেশীয় কোন ব্যক্তি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। তাহাদের রাত্রি আমাদের দিন—আমাদের দিন তাহাদের রাত্রি। তাহাদের আমোদ আহ্লাদ স্বতন্ত্র—আমোদ প্রমোদের স্থান স্বতন্ত্র। তাহাদের ক্লবে আমাদের প্রবেশের অধিকার নাই। ইংলণ্ডে গিয়া আমাদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি তাহাদের ধনাঢ্য কুলীনদিগের সহিত একাসনে উপবেশন করেন এখানে হয়ত তাঁহারা সামান্য ইংরাজ-সমাজ হইতেও পরিচ্যুত। তাহাদের গার্হস্থ্য-জীবনের সহিত এদেশীয়দিগের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা ইংরাজদের যাহা কিছু দেখিতে পাই তাহা কেবল কর্ম্ম ক্ষেত্রে। ইংরাজ বিচারাসনে—আমরা উকীল হইয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হই। ইংরাজ প্রভুপদে—আমরা দাস হইয়া তাঁহার সেবা করি। ইংরাজ শাসনকর্ত্তা—আমরা যোড়-হস্তে তাঁহার দরবারে উপস্থিত হই। মুসলমানদের রাজত্ব-কালে হিন্দু মুসলমানে পার্থক্য ছিল সন্দেহ নাই কিন্তু ক্রমে সে ভাব অনেক শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। মুসলমানদের আচার ব্যবহার হিন্দুদের আচার ব্যবহারে অনেক সৌসাদৃশ্য ছিল। মুসলমান রাজা হিন্দুমন্ত্রীর পরামর্শ লইতে সঙ্কুচিত হইতেন না। হিন্দুবীরকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। যেমন তাঁহাদের পরস্পর মধ্যে দ্বেষাগ্নি প্রজ্বলিত ছিল তেমনি সখ্য বন্ধনেরও নানা উপকরণ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ইংরাজ ও এদেশীয়দের সম্বন্ধ অন্য প্রকার—তাহাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাব বোধ হয় না যে কোন কালে বিদূরিত হইবে।

সে দিন আমার দুইটি মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর মধ্যে এবিষয়ে কথোপকথন হইতেছিল। একজন বলিলেন "ইংরাজেরা আমাদের দেশ সুশাসন করিতেছেন তাহা কি বোধবিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন? দেখ তাঁহারা না থাকিলে আমাদের কি দুর্দ্দশাই হইত। আমরা পরস্পর পরস্পরের উপর খড়্গাঘাত করিয়া দেশকে রক্তে প্লাবিত করিতাম—যাহার বল তাহারই রাজ্য—অধর্ম্মেরই জয়। রাজবিদ্রোহ, অরাজকতা—প্রজাপীড়ন—ঠগি ডাকাতি এই সকল সাঙ্ঘাতিক অমঙ্গল হইতে ভারতের অধঃপাতে যাইবার উপক্রম হইয়াছিল—ইংরাজ-তরবার ভারতভূমিকে এ সকল বিপত্তি হইতে উদ্ধার করিয়াছে। ইংরাজদের আগমনে এদেশে সুশৃঙ্খল রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছে—দস্যু তস্করের ভয়—বর্গীদিগের অত্যাচার, পিণ্ডারীগণের আক্রমণ ভয় বিদূরিত হইয়াছে। ধন প্রাণ সুরক্ষিত—পরিশ্রম স্বেচ্ছাধীন ও বন্ধন-শূন্য,

সুতরাং প্রত্যেকে আপন আপন শ্রমের ফল নির্ব্বিঘ্নে উপভোগ করিতেছে। বাণিজ্য-ব্যবসা বিস্তারে দেশের কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। কত জঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়াছে—কত মরুভূমি তুল্যস্থান আবাদ হইয়াছে। লৌহ-পথ ও বাষ্পপোতের দ্বারা চলাচলের সুগম হইয়াছে। প্রবাসস্থ বন্ধুগণের নিকট হইতে পত্রাদি পাইবার কেমন সুযোগ—আকাশের তড়িৎ পর্য্যন্ত একার্য্যে নিযুক্ত। আবার দেখ আমাদিগকে বিদ্যাদানে আমাদের রাজপুরুষের কেমন নিঃস্বার্থ যত্ন। আমাদের চক্ষু ফুটাইলে পাছে তাঁহাদের ভবিষ্যতে কোন হানি হয় ইহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তাঁহারা আমাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য কত শত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ধর্ম্মের উপর, সমাজের রীতি-নীতির উপর তাঁহারা হস্তক্ষেপে বিরত। বুদ্ধি ও চিন্তা-শক্তির উপর কোন শৃঙ্খল নাই। এ রাজ্যে বাস করিয়া মন খুলিয়া আপনাদের সুখ দুঃখ প্রকাশ করিতে পারিতেছি। সর্ব্বসাধারণের হিতজনক রাজ-নিয়ম-প্রভাবে প্রত্যেকে আপন মনের স্ফূর্ত্তিতে স্বচ্ছন্দে ইচ্ছামত কার্য্য করিতে ও জগতের হিতসাধনে নিযুক্ত হইতে পারিতেছে। আর কি চাও? এত উপকার প্রাপ্ত হইয়াও তোমরা ইংরাজ-রাজ্যের বিপক্ষে লেখনী চালনা করিতে ক্ষান্ত নহ? আর ইহাও যে করিতে পার সে কেবল ইংরাজ রাজ্যের অনুগ্রহে, তাঁহারা মনে করিলে মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত দেশীয় সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। অতএব এই সকল উপকার স্মরণ করিয়া আমাদের রাজপুরুষদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।"

আমার অপর বন্ধু উত্তর করিলেন—"এই সকল যুক্তি আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। বিদেশীয় রাজার প্রতি রাজ-ভক্তি উদয় হওয়া সহজ নহে। তবে যদি তাঁহারা স্বদেশীয় রাজার ন্যায় পিতৃ-ভাবে শাসন করেন, তবেই তাহা সম্ভব, নচেৎ নয়। দেখ এই বিদেশীয়দিগের দ্বারা ভারতের যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত হইতেছে কি না। বিলাতে এক গবর্ণমেণ্ট—এদেশে এক গবর্ণমেণ্ট—ওদিকে মন্ত্রীদল-পরিবেষ্টিত সেক্রেটরি অফ্‌ষ্টেট্, এদিকে রাজপ্রতিনিধি গবর্ণর জেনেরল, গবর্ণর, লেফটেনেণ্ট গবর্ণর, কমিসনর প্রভৃতি অধিপতিগণ আমাদের দেশ হইতে কত কোটি কোটি টাকা লুটিয়া লইতেছেন। বিদেশীয় সৈন্য-রক্ষার জন্য কত ব্যয় হইতেছে। রাজপুরুষদের ধর্ম্ম-যাজকগণ 'হীদেন' প্রজা-নিষ্পীড়িত ধনকোষ হইতে অবাধে অর্থ সংগ্রহ করিতে কিছুই মনে করেন না। কত দিক দিয়া ভারতের রক্ত শোষণ হইতেছে তাহার ঠিকানা নাই। পিণ্ডারীদের উপদ্রব নাই সত্য বটে কিন্তু প্রজাগণের দারিদ্র্য নিবন্ধন কষ্ট তেমনি প্রবল। কত প্রকার রাজস্বের সৃষ্টি হইতেছে তাহার সীমা নাই। আমাদের উপর যে ভূরি ভূরি আইন বর্ষণ হইতেছে তাহাতে আমাদের বাস্তবিক উপকার কি অপকার তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। সর্ব্বত্রই শুনা যায় যে, পূর্ব্বে আমাদের পরস্পর-ব্যবহারে যে সত্য ও সরলতা ছিল তাহা একালে আর

নাই। পূর্ব্বে আমাদের এক কথার যে মূল্য ছিল, এখনকার শত দলিল দস্তাবেজের সে মূল্য নাই। যে প্রদেশে ইংরাজি আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—ইংরাজি আইন প্রচলিত হইয়াছে সেখানেই কপটতা—কুটিলতা—জাল—মিথ্যাশপথ প্রশ্রয় পাইতেছে। চোর ডাকাতের ভয় নাই সত্য কিন্তু আমরা নিরস্ত্র ও আত্মসংরক্ষণে অসমর্থ হইয়া ক্রমেই বলবীর্য্যহীন নির্জ্জীব হইয়া পড়িতেছি। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতাপে আমাদের জাতীয় গৌরব হ্রাস হইতেছে। বিদেশীয় বাণিজ্য ব্যবসা বৃদ্ধি পাইতেছে বটে কিন্তু তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্রমে আমাদের দেশীয় ব্যবসায়ের লোপাপত্তি হইতেছে—কত কত দেশীয় শ্রমোপজীবির অন্ন মারা যাইতেছে। এ সকল সত্ত্বেও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরাজশাসনে আমাদের দেশের অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে—কিন্তু ইহাও বলিতে হইবে যে সে শাসন ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, প্রীতির উপর নহে। আমাদের সঙ্গে ইংরাজদের মমতা নাই। পূর্ব্বপশ্চিমের মধ্যে ভাবের কেমন অমিল। রাজা যখন বিদেশী—জেতৃ-বিজিতের মধ্যে যখন এত বিষয়ে অনৈক্য তখন আমাদের সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ কেবল স্বার্থ-সম্বন্ধ বলিয়াই প্রতীতি হয়। আমরা বলি ইংরাজেরা আমাদের জন্য যাহা করিতেছেন তাহা হয় দায়ে পড়িয়া নতুবা স্বার্থসাধন উদ্দেশে। তাঁহাদের রাজা—রাজ্যের সুশৃঙ্খলা আবশ্যক। তাঁহারা সভ্যজাতি—সভ্যতার অনুরোধে আমাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিতে হইতেছে। এদেশীয় লোকে শিক্ষিত না হইলে রাজকার্য্য চলিবে কি প্রকারে? তথাপি দেখা যাইতেছে তাঁহারা সহজে আমাদিগকে সমান অধিকার প্রদানে সম্মত নহেন। আমাদিগকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে সহজে তাঁহারা স্বীকৃত হন না। সিবিল সর্বিস সর্ব্ব সাধারণের জন্য মুক্ত কিন্তু সে কেবল নামমাত্র। সিবিল সর্বিসে প্রবেশের নিয়মাবলী এরূপ কল-কৌশলে সংরচিত যে এদেশীয়দের জন্য তাহার প্রবেশ-দ্বার অবরুদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সৈনিক দলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পথ আমাদের সম্বন্ধে একেবারেই রুদ্ধ। এই সকল দেখিয়া আমাদের মধ্যে অনেক কৃতবিদ্যও মনে করেন যে ইংরাজেরা মুখে যাহাই বলুন, তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা এই যে আমরা প্রভুদাসের সম্বন্ধ যেন কখন বিস্মৃত না হই। তাঁহাদের ইচ্ছা যে আমরা অনাবৃত পদে, গললগ্নীকৃত বস্ত্রে, সেলাম করিতে করিতে তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হই। এবিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, ভয় অপেক্ষা প্রীতির আকর্ষণী শক্তি অধিক। শস্ত্রের বলে ভারতের কোটি কোটি প্রজাপুঞ্জকে বশে রাখা সহজ নহে। দেশীয় বিদেশীয়দের মধ্যে যাহাতে প্রীতি ও একতা স্থাপিত হয় তাহাই স্থায়ী মঙ্গলের সোপান। আমরা চাই যে ইংরাজেরা আমাদের সহিত ভদ্র ব্যবহার করুন, এদেশীয়দিগকে আপনাদের সঙ্গে সমান অধিকার প্রদান করুন, কৃষ্ণ শ্বেত বর্ণের মধ্যে প্রভেদ যতদূর সাধ্য বিলুপ্ত করুন, এদেশীয়দের উপর কঠোর

বিচ্ছিন্নভাব না রাখিয়া তাহাদের সহিত সখ্য ও সমতা বন্ধন করুন, আমরা আর অধিক কিছু প্রার্থনা করি না। তাঁহারা যদি সদ্ভাবে আমাদের দিকে একপদ অগ্রসর হন, আমরা শতপদ অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত।"

তৎপরে তিনি আমাকে মধ্যস্থ মানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ত ভাই ইংরাজদের সঙ্গে অনেক মিশিয়াছ, তোমার মনে তাঁহাদের গুণাগুণ কিরূপ দাঁড়াইয়াছে?" আমি উত্তর করিলাম, মানুষ অপূর্ণ জীব—দোষ গুণ সকল-মানুষেরই আছে, ইংরাজদের চরিত্রও এনিয়মের বহির্ভূত নহে, কিন্তু আমার মনে হয় যে তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের এক্ষণকার অপেক্ষা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ হইলে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। আমি অনেক সময় মনে করিয়া দেখি এদেশীয় ইংরাজদের মধ্যে আমার কেহ বন্ধু আছে কি না? তাহাদের সঙ্গে আমি একত্র পান ভোজন করিয়াছি, ক্রীড়ালয়ে একত্রে ক্রীড়া করিয়াছি, কর্ম্ম কাজ-প্রসঙ্গে অনেক সময় মিলিত হইয়াছি, তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় আমার সর্ব্বদাই হইয়া থাকে কিন্তু কৈ, একজনকে এমন দেখিনা যাহাকে আপনার বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতে পারি, সখা বলিয়া যাহার নিকট আপনার মনের দ্বার মুক্ত করিতে পারি। একজন ভদ্র ইংরাজ আমার সম্মুখে হয়ত আমার স্বজাতির নিন্দা করিতে বিরত হইতে পারেন কিন্তু আমার পশ্চাতে কি করেন তাহা জানাই আছে। দেখা হইলে 'ভাল আছেন' বলিয়া অভিবাদন অথবা সময়ে সময়ে ভোজনের নিমন্ত্রণ অথবা ভদ্র রীতি-অনুসারে কথোপকথন ইহা অপেক্ষা অধিক অনুরাগ সঞ্চারের কোন সম্ভাবনা দেখি না। তবে অবশ্য বলিব যে কর্ত্তব্য জ্ঞান ইংরাজ-প্রকৃতির এক অসাধারণ গুণ। কর্ত্তব্যের অনুরোধে ইংরাজেরা সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত, সকল প্রকার ত্যাগস্বীকার করিতে তৎপর। আমার বন্ধু বলিলেন, "ইংরাজেরা আমাদের সঙ্গে ভাবে মিলিয়া চলিবে ইহা সম্ভবপর নহে। আমাদের আশা অতদূর উঠিতে সাহস করে না। তাহারা যে এদেশীয়দিগকে আপনাদের জাত-ভায়ের সঙ্গে সমান চক্ষে দেখিবে অথবা সমান অধিকার প্রদান করিবে এরূপ আশা দুরাশা মাত্র। আমরা আর অধিক কিছু চাই না, আমরা তাঁহাদের একটুকু ভদ্র ব্যবহারেই সন্তুষ্ট। নিতান্ত 'নিগার' বলিয়া আমাদিগকে ঘৃণা না করেন তাহা হইলেই যথেষ্ট। কিন্তু ততটুকু দাক্ষিণ্যভাবও দুর্লভ। দুঃখের কথা কি কহিব, সে দিন আমার কন্যার বিবাহোপলক্ষে কলেক্টর সাহেবের নিকট রাস্তা দিয়া বাদ্য বাজাইয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি আবশ্যকমত পরওয়ানা দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু আমি সমস্ত আয়োজন করিয়া সময়-কালে দেখি যে সাহেবের অনুতাপ উপস্থিত। তিনি পুলিষ-দূত কর্ত্তৃক বলিয়া পাঠাইলেন যে তাঁহার মাডামের শরীর ভাল নাই, টম্‌টম্ বাদ্য তাঁহার বাটীর নিকট দিয়া বাজাইয়া যাইবে ইহা তাঁহার সহ্য হইবে না, অতএব পরও

গানা-বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। বাদ্যের অভাবে বিবাহের উৎসব ভঙ্গ হইল ও আমার গৃহের স্ত্রীগণের হৃদয়ে কিরূপ আঘাত লাগিল তাহা বুঝিতেই পার। এক মিনিটের জন্য এই বাদ্য তাঁহার মাডামের শ্রুতিকর্কশ বোধ হইবে এই আশঙ্কায় সাহেব আমার সমুদয় কুল-কামিনীকে বিষাদে মগ্ন করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হইলেন না। এইরূপ স্বার্থপরতা দেখিয়া ইংরাজদের প্রতি আমাদের অশ্রদ্ধা হয়। তাঁহারা আমাদের রীতিনীতি এত অল্প জানেন ও সেই অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন সময়ে সময়ে এমত অদ্ভুত নিয়ম জারী করেন যে আমাদের বৃথা মনক্ষোভ জন্মানো ভিন্ন আর কিছুই তাহার উদ্দেশ্য বোধ হয় না। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ—এক পাদুকা লইয়া মধ্যে মধ্যে কত গোলযোগ উপস্থিত হয়। তাঁহারা ভদ্র সমাজে গেলে টুপি খুলিয়া যান, আমরা মস্তক আবৃত রাখি কিন্তু তাঁহারা মনে করেন যে বড়লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে অনাবৃত পদে যাওয়া আমাদের ভদ্ররীতি। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া এইক্ষণে তাঁহারা নিয়ম করিয়াছেন যে ইংরাজ-মণ্ডলে বুট পরিয়া যাইবার বাধা নাই কিন্তু দেশীয় পাদুকা ব্যবহার নিষিদ্ধ। জান ত পারসীরা কেমন রাজভক্ত, তাহাদের আপনাদের রাজ-ভক্তির কতই গৌরব করে! সে দিন পুনার গবর্ণরের এক দরবারে এক জন সম্ভ্রান্ত পারসী পুরোহিত উপস্থিত হন। গিয়া দেখেন প্রবেশের অনুমতি নাই—অপরাধের মধ্যে তিনি দেশীয় পাদুকা পরিয়া গিয়াছিলেন। দ্বারপাল-কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়া তিনি প্রাইবেট সেক্রেটরির নিকট বলিয়া পাঠান। তাহার উত্তর—দেশী জুতা পরিয়া যাইতে গবর্ণর সাহেবের হুকুম নাই!! অনেক কাকুতি মিনতিতে কিছুই ফলোদয় হইল না। একে পারসী, তাহাতে পারসী পুরোহিত, তিনি এ অপমান গ্রাহ্য না করিয়া রাজদ্বারে যাইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুর্দমনীয় রাজভক্তি কিছুতেই পরাজিত হইবার নহে, কি করেন, অবশেষে তাঁহার এক বন্ধুর নিকট হইতে এক জোড়া ইংরাজী বুট ধার করিয়া গবর্ণর সাহেবকে সেলাম করিয়া আসেন। আমরা ত ইংরাজদের পদানত প্রজা কিন্তু তাঁহারা এদেশীয় রাজা-রাজড়ার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে যেরূপ ব্যবহার করেন তাহা দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। যোধপুরের রাজাকে রাজদরবার হইতে কিরূপে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল তাহা তোমার মনে থাকিতে পারে। সে দিন এক মহারাষ্ট্র পত্রে আর একটী বিবরণ পাঠ করিলাম তাহা এই;—সম্প্রতি বোম্বায়ের গবর্ণর সাহেব কোল্হাপুর পরিদর্শন করিতে যান ও তদুপলক্ষে কোল্হাপুর মহারাজার প্রাসাদে এক দরবার হয়। মহারাজা ও দরবারে নিমন্ত্রিত সৈনিক ও অন্যান্য ভদ্র লোক আসন গ্রহণ করিলে দক্ষিণ মহারাষ্ট্র-সম্পর্কীয় জনৈক ইংরাজ সৈনিক পুরুষ দরবারে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র মহারাজা আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে বিনীত ভাবে সেলাম করেন। মহা-

রাজাকে উঠিতে দেখিয়া স্বয়ং গবর্ণর সাহেব ও সভাস্থ সকলে উঠিয়া দাঁড়ান ও মহারাজ সৈনিক কর্ম্মচারীকে বসাইয়া নিজে আসন গ্রহণ করিলে তবে তাঁহারা স্ব স্ব আসনে পুনর্ব্বার উপবিষ্ট হন। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া সভাস্থ সকলে ও নিজে গবর্ণর সাহেব পর্য্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। গবর্ণর সাহেব এই বিস্ময়জনক ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে মহারাজ উত্তর করিলেন যে, তিনি তাঁহার ইংরাজ গুরুদিগের নিকট হইতে এই উপদেশ পাইয়াছেন যে যখনি কোন ইংরাজ দেখিবে অমনি আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে সেলাম করিবে। ইংরাজদের এইরূপ ব্যবহারে আমরা চটিয়া যাই। বাস্তবিক ত আমরা চিরদিন পরাধীন পরাজিত জাতি, কিন্তু মৃতের উপর খড়্গাঘাতের প্রয়োজন কি? একটুকু বাহ্য ভদ্রতায় উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। বাস্তবিক তরবারির বলে আমাদের দেশ জিত হইয়াছে কিন্তু তাহা সর্ব্বদা আমাদের চক্ষের সামনে ধরিয়া রাখিবার আবশ্যক কি? বল অপেক্ষা প্রীতিতে রাজ্যের ভিত্তি নির্ম্মাণ করা অধিক শ্রেয়স্কর ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। শস্ত্র অপেক্ষা শাস্ত্রের বল অধিক সভ্য জাতিকে একথা বলা বাহুল্য। নূতন নূতন পদবী সৃষ্টিতে, রাজ-সভার বৃথা আড়ম্বরে, শস্ত্রের বলে, অথবা রাজ-নীতির কৌশলে যাহা না হয়, ইংরাজেরা দেশীয়দের প্রতি একটুকু আন্তরিক সদ্ভাব ও মমতা দেখাইয়া তাহা করিতে পারেন। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত লোকদিগের কষ্ট নিবারণে সাহায্যদানে, অথবা কোন দেশহিতকর কার্য্যে উৎসাহ প্রদান কিম্বা দেশীয় কোন মহাত্মার বিয়োগে শোকপ্রকাশ দ্বারা, ভারতের হৃদয়কে ইংরাজ রাজ্যের প্রতি তদপেক্ষা সহস্রগুণে আকৃষ্ট করিতে পারেন। কঠোর লৌহ শৃঙ্খল ক্ষণভঙ্গুর কিন্তু প্রেমের মোহন শৃঙ্খল ভগ্ন হইবার নহে। ইংরাজেরা যদি আমাদের প্রীতি আকর্ষণ করিতে চান ত আমাদের সঙ্গে সমান ভাবে—আপনার মত ব্যবহার করুন, কৃষ্ণবর্ণের জন্য এক নিয়ম, শ্বেত বর্ণের জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম, এ ভাব পরিত্যাগ করুণ। আমরা সকলেই সেই এক সাম্রাজ্ঞীর প্রজা, অতএব আমরা সকলে সদ্ভাবে মিলিয়া কার্য্য করিলে রাজ্যের যথার্থ গৌরব রক্ষা হয়।"

ক্রমশঃ শ্রীস—

বঙ্গসাহিত্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা গতবারে ষ্টুয়ার্ট মিলের সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া এবার সাহিত্যদর্পণকারের মতটি বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। সাহিত্য দর্পণকার বলেন যে "রসাত্মক বাক্যের নামই কাব্য"—এই 'রস' শব্দ ব্যবহারে তিনি ইংরাজ আলঙ্কারিকদের

অপেক্ষা কবিতার প্রকৃতি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। মিল্ বলেন যে "আমাদের হৃদয়ের ভাবগুলি যে সকল চিন্তা ও বাক্যের আকারে আপনা আপনি প্রকাশ হয় তাহার নামই কবিতা," এবং রবার্ট্‌সন্ বলেন যে "উচ্ছ্বসিত হৃদয় ভাবের ভাষার নামই কবিতা"—এইরূপ আরও অনেক আলঙ্কারিকদের মত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের লক্ষণের বিশেষ দোষ এই যে ঐ বাক্য বা ভাষাতে পাঠকের বা শ্রোতার মনে অনুরূপ ভাবের উদ্রেক হইল কি না সে বিষয়ে তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। যে কেহ যে কোন অবস্থায় পড়িয়া কাঁদিলেই যে তাহা শুনিয়া কোন শ্রোতার মনে করুণ রসের আবির্ভাব হইবেই হইবে এমন কোন নিশ্চয় নাই। আমরা দেখিয়াছি যে অনেকে আপনাদের শোক প্রকাশ করিতে গিয়া এমন বাক্য প্রয়োগ করে যে তাহাতে চক্ষে জল না আসিয়া মুখে হাসি আইসে। বিশেষতঃ আদিরসের স্থলে অনেকে অপরের মনে আদিরসের ভাব না আনিয়া বীভৎস রসের উদ্রেক করিয়া দেয়। সুতরাং ভাবোচ্ছ্বাসময় বাক্য হইলেই যে অন্যের হৃদয়ে সেই ভাবের তরঙ্গ উঠিবেই উঠিবে তাহা বলা যুক্তিসিদ্ধ নহে। কিন্তু সেইরূপ তরঙ্গ উঠাইতে না পারিলে ভাবোচ্ছ্বাসময় বাক্য মাত্রকেই কেহ কবিতা বলিতে স্বীকার করিবে না। বাল্মীকিকে আমরা কবি বলি কেন? না তাঁহার ভাবে আমরা উত্তেজিত হইয়া রামের প্রতি আমাদের যেমন ভক্তি হয়, রাবণের প্রতিও আবার তেমনি অশ্রদ্ধা উপস্থিত হয়। মিল্টনকে আমরা কবি বলি কেন? না তাঁহার নরক প্রদেশ সম্মুখে বিস্তারিত দেখিয়া আমরা ভীত হই, অবার তাঁহার ইদেন-উদ্যানের বর্ণনা পড়িয়া আমরা তেমনি উল্লসিত হই। বোধ হয় এ কথা বলাই বাহুল্য যে পাঠকের হৃদয়তন্ত্র যদি কবির হৃদয়ের সঙ্গে তালে তালে না নিনাদিত হয় তাহা হইলে কবির কবিত্বই আকাশ-কুসুমবৎ অলীক। এই যে লেখকের ও পাঠকের মধ্যে মমতা-ভাবটি, ইহা সাহিত্য-দর্পণকারের 'রস' শব্দেই নিহিত আছে। দ্রাক্ষাফলকে আমরা মিষ্ট বলিয়া থাকি, কেন না আস্বাদন করিয়া দেখিয়াছি যে উহা মিষ্ট; উহা যদি মিষ্ট না লাগিয়া কটু লাগিত তাহা হইলে দ্রাক্ষাফলকে আমরা কটুই বলিতাম। সত্যবটে যে দেশভেদে কালভেদে রুচিভেদ হয়, এমন কি, শারীরিক অবস্থা-ভেদেও রুচির বৈষম্য ঘটে। ইংলণ্ডের এমন এক সময় গিয়াছে যে সময়ে চিরশিশু শেলীর নামে সকলে কর্ণে হাত দিত—মিল্টনের প্যারাডাইজ্ লস্ট্ পুস্তকালয়ের নিভৃত প্রদেশে ধূলি ধূসরিত থাকিত—এমন কি, জ্বলন্ত সূর্য্যের ন্যায় মহাকবি সেক্‌স্‌পিয়ারও পিউরিট্যান্‌দের হস্তে কিছুকালের জন্য রাহুগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর সে কাল নাই, প্রকৃতিস্থ ইংলণ্ড এখন মিল্টনের নামে লোমাঞ্চ-কলেবর হয়, অভাগা শেলীর নামে এখন অশ্রুবিসর্জ্জন করে! এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে যদি দেশভেদে কালভেদে এরূপ রস-

অনুভূতির বৈষম্য ঘটে তাহা হইলে কোন্ রচনাটি যে প্রকৃত কবিতা আর কোনটিই বা নয় তাহা নিশ্চয় করিয়া কে বলিতে পারে? কে বলিতে পারে যে, যে সকল রসাত্মক কাব্য আমরা এক্ষণে "কিছুই নয়" বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতেছি—অন্য সময়ে আমরা তাহাকে প্রকৃত কবিতা নামের যোগ্য মনে করিব না; আবার এক্ষণে আমরা যে সকল কাব্যকে বাক্‌দেবীর পদ্মবনের এক একটি প্রকৃত পদ্ম ভাবিয়া অতি সন্তর্পণে হৃদয়ে ধরিতেছি, সময়ে সেই সকল কাব্যকেই আমরা পদ দ্বারা দলিত করিব না? তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সাহিত্যদর্পণকারের কথার সার্থকতা কি? যদি রস-অনুভূতিরই এত বৈলক্ষণ্য ঘটে তাহা হইলে কোন্ নিয়ম দ্বারা আমরা কবিতার প্রকৃতি নিরূপন করিব? পল্লিগ্রামস্থ এক জন বৃদ্ধ বলিবেন যে "দাশরথীর ছড়াগুলিই আমার পক্ষে প্রকৃত রসাত্মকং বাক্যং—মাইকেলের খিটিমিটি আমার ভাল লাগে না"—তখন সাহিত্যদর্পণকার কি উত্তর দিবেন? বাস্তবিক আমরা ন্যায় শাস্ত্রের কোন অধ্যায় ধরিয়াই তাহাকে বুঝাইতে পারিব না যে, মাইকেল একটি স্বর্গের কুসুম আর দাশরথী মর্ত্তের একটি মাছুষ মাত্র। তর্কের আড়ম্বর ওস্থলে কেবল প্রলাপে পরিণত হইবে। যেমন চীন-দেশীয় প্রণয়ীকে তাহার ক্ষুদ্রপদ প্রণয়িনীর বা ইংলণ্ডীয় প্রণয়ীকে তাহার কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ প্রণয়িনীর কদর্য্যতা বুঝাইয়া দেওয়া সুকঠিন, সেইরূপ দাশরথী-ভক্তকে তাহার পূজা কবির কদর্য্যতা বুঝাইয়া দেওয়া দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু ইহা আবার সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে, সৌন্দর্য্য বা মধুরতার একটি সর্ব্ববাদীসম্মত আদর্শ সকল প্রকৃতিস্থ হৃদয়ে বিরাজিত আছে, দেশভেদে কালভেদে সে আদর্শের ব্যভিচার হয় না। কোন্ সহৃদয় বা অহৃদয় মনুষ্য চন্দ্রের মধুরতা বা পদ্মের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারে না? কোন্ সহৃদয় বা অহৃদয় লোকের কাছে রুক্ষের মর্ম্মর শব্দ বা নদীর কুলুকুলুধ্বনি শ্রুতি-কঠোর বোধ হয়? চীন হইতে পিরু পর্য্যন্ত কোন্ সভ্য বা অসভ্য জাতির চক্ষে যুবতীর যৌবনছটা বা শিশুর শৈশব-লাবণ্য অপ্রীতিকর লাগে? জগতের সমস্ত লোকই বোধ হয় সমস্বরে উত্তর করিবে যে উহাদের কোনটিই কাহারো অসন্তোষকর নহে, এবং তাহার কারণ এই যে, দেশভেদে কালভেদে রুচির যতই বৈলক্ষণ্য হউক না কেন, সকল প্রকার আরোপিত বা উপার্জ্জিত সংস্কার পরিত্যাগ করিলে লোকের মনে যে সৌন্দর্য্য বা মধুরতার সর্ব্ববাদীসম্মত এবং অবিকৃত আদর্শ থাকে, সেই আদর্শই সকল সৌন্দর্য্য বা মধুরতার প্রকৃত নিকষ-স্বরূপ। সেই আদর্শ-অনুসারেই সেক্‌স্‌পিয়ার এবং কালিদাস কবিতা-কুঞ্জের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। প্রকৃতিস্থ-হৃদয়ে সেই আদর্শের মহিয়সী শক্তির প্রভাব বিদ্যমান আছে। সেই আদর্শ-অনুসারেই শ্লেগেল সেক্‌স্‌পিয়ারের সৌন্দর্য্য ও গেটে কালিদাসের মধুরতা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নানা প্রকার

বাহ্যিক ও আন্তরিক কারণ বশতঃ সেই আদর্শের বিকৃতভাব উপস্থিত হয়। রাজনীতি-সম্পর্কীয় মত-বৈষম্য ও দ্বিতীয় চার্লসের রাজ্যকালীন বিলাস-প্রিয়তা হেতু মিল্টনের প্রতি, এবং সামাজিক রীতিনীতি-ঘটিত কারণে শেলির প্রতি, তৎসাময়িক লোকদের বিরাগ, এমন কি, ধর্ম্মোন্মত্ততা ঘটিত কারণে সেকস্‌পিয়ারের প্রতি পিউরিটানদিগের শত্রুতা, তাহার দেদীপ্যমান সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এইরূপ কোথাও হিংসা, কোথাও মতভেদ, কোথাও মনের বিকৃত গঠন বশতঃ আমরা সেই সর্ব্ববাদী-সম্মত আদর্শের বিকার দেখিতে পাই। একজন বিরহিনী যেমন বলিয়াছিলেন "সে চন্দ্রের অপেক্ষা চঞ্চল আর কেহই নাই।" একজন গণিতবিদ্‌ও সেইরূপ বলিয়াছিলেন যে, প্যারাডাইস্ লস্ট্ তাঁহার পক্ষে অতি বিরক্তিকর, কেননা মিল্টন কিছুই প্রমাণ করিতে পারেন নাই। এইরূপ কারণ বশতঃই ভল্‌টেয়ার সেক্‌স্‌পিয়ারকে অসভ্য বলিয়াছেন ও জেফ্রি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ্‌কে অপোগণ্ড প্রলাপী কহিয়াছেন। এখন আমরা বলিতে পারি যে,এই সকল বাহুল্য কারণ না থাকিলে সর্ব্বহৃদয়ে বিরাজিত সেই সর্ব্ব-বাদী-সম্মত আদর্শের প্রভাবে দেশ কাল ও অবস্থার বিঘ্ন সকল তিরোহিত হইয়া সমস্ত জগৎ আলোকিত হইত এবং সাহিত্য-দর্পণকারের কথা পলকে প্রতিপন্ন হইত।

সাহিত্যদর্পণকারের কবিতার লক্ষণটী নিতান্ত সংক্ষেপে ব্যক্ত হওয়াতে সাহিত্য-মণ্ডলে একটি ঘোর ভ্রান্তি প্রচারিত হইয়াছে। সেই ভ্রান্তিটী এখনও ভঞ্জন না করিলে আর রক্ষা নাই। দর্পণকার নাকি বলেন যে "রসাত্মক বাক্যের নামই কাব্য" সুতরাং পুত্রশোক-বিহ্বলা রোরুদ্যমানা জননীর বিলাপ-বাক্যগুলিও কবিতা-নামে আখ্যাত হইতে পারে। কেননা নিতান্ত পাষাণ হৃদয়ও সে বিলাপ শুনিলে সহজেই দ্রব হইয়া যায়। এই হেতু কেহ কেহ মনে করেন যে, মাতার বিলাপ শুনিয়া যদি শ্রোতার মন দ্রব হয় তাহা হইলে অবিকল তাহা লিপি-বদ্ধ করিলেও পাঠকের মন দ্রব হইবে—সুতরাং লেখকেরও কবিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইবে। শুদ্ধ মাতার বিলাপ কেন, তাঁহারা মনে করেন যে, প্রকৃত জগতে যাহা আমাদের হৃদয়-তন্ত্রে আঘাত করে, লিখিত হইলেও তাহা সেইরূপে আঘাত করিবে। রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাস্যের মৃত্যু হইলে আমাদের দেশীয় একজন নাটককার কমলাকে এই বলিয়া বিলাপ করাইতেছেন—"রোহিত রে! ওরে আমার প্রাণের রোহিত রে! ওরে বাবা! ওরে বাবা! কি হলোরে—ওরে কেন তুই কথা ক'সনে? ওরে রোহিত রে!" স্বীকার করি, যদি আমরা সেই ঘোর অন্ধকারময়ী রজনীতে সেই ভয়াবহ শ্মশান-প্রান্তরে উপস্থিত থাকিতাম তাহা হইলে নিশ্চয়ই কমলার বিলাপে আমাদের হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত। এমন কি, কমলার অবস্থা স্বচক্ষে না দেখিয়াও যদি শুদ্ধ তাহার রোদন শুনিতে পাই-

তাম, তাহা হইলেও আমাদের হৃদয় শোকে অভিভূত হইত। কিন্তু নাটকে সেই বিলাপটি অবিকল প্রতিবিম্বিত হওয়াতে আমাদের হৃদয়ে যে কোন্ রস উদ্দীপিত হইতেছে তাহা বলা বাহুল্য। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, প্রকৃত মাতার প্রকৃত রোদন শুনিয়া কেনই বা আমরা কাতর হই, আর সেই রোদন পাঠ করিয়া কেনই বা আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না? ইহার উত্তর অতি সহজেই দেওয়া যায়। নাটক কিম্বা কাব্য কল্পনা-সাগরের তরঙ্গ, কল্পনা বিরহিত হইলে নাটকের নাটকত্ব ও কাব্যের কাব্যত্ব থাকে না। কল্পনা-প্রভাবে কালিদাস পুরা-যুগের দুষ্মন্ত ও শকুন্তলাকে কলিযুগে উজ্জয়িনী-নগরের এক প্রান্তে বসিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন—মালতীনদী-তীরস্থ সেই প্রশান্ত আশ্রম প্রদেশে তাঁহাদের সেই মধুর প্রেমালাপ শুনিতে পাইয়াছিলেন—মহর্ষি কণ্বের "হে সন্নিহিত তরুগণ"-সম্বলিত আর্ত্তনাদ শুনিয়া বিহ্বল হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে রাজা দুষ্মন্তের সহিত আশ্রম-বাসিনীর বিবাহ দিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। এখন শকুন্তলা পাঠ করিতে করিতে পাঠকের হৃদয়ও কল্পনা-স্রোতে উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে—পাঠকও ক্ষণকালের জন্য হেমকূট পর্ব্বতে উঠিয়া রাজা দুষ্মন্তের সঙ্গে সঙ্গে শকুন্তলার উদ্ধত সন্তানটীকে দেখিতে পায়—কল্পনা ক্রমে আরও বলবতী হইতে থাকে, পাঠক সেই হেমকূট পর্ব্বতের দৃশ্য ব্যতীত সমস্ত জগৎমণ্ডল একেবারে ভুলিয়া যায়—স্বচক্ষে সিংহ-শাবকটী দেখিতে পায়, স্বকর্ণে শুনিতে পায় দুষ্মন্ত বলিতেছেন "আহা! যাহার এই পুত্র সে ইহাকে ক্রোড়ে লইয়া যখন ইহার মৃদুমধুর আধ-আধ কথাগুলি শ্রবণ করে, তখন সেই পুণ্যবান ব্যক্তি কি অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হয়।"—পাঠকের হৃদয়ও কণ্টকিত হয়। কিন্তু পাঠক যদি ঐরূপ বিলাপ না শুনিয়া একজন আধুনিক কবির মতন দুষ্মন্তের মুখে শুনিতে পায়—

"যবে আধ' আধ' বোলে
বাবা বাবা ব'লে বাছা অমৃত ছড়ায় রে,
কি আনন্দে নাচে প্রাণ পিতাই তা জানেরে!"

তাহা হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যেই পাঠকের কল্পনা-মোহ, পাঠকের সুখস্বপ্ন ভগ্ন হইয়া যায়, কল্পনার দৃষ্টিপথ হইতে মুহূর্ত্ত-মধ্যে হেমকূট পর্ব্বত, সিংহশাবক, মুনিকন্যাগণ বিলীন হইয়া যায়, এবং তাহার পরিবর্ত্তে লেপ, কাঁথা, চুসিকাটি সম্মুখে প্রকাশ পায়, সুতরাং আকস্মিক ভাব-বিপর্য্যয়ে হাস্যরসের আবির্ভাব হয়। এখন দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃত জগতে যে কথাগুলিতে আমাদের মনে কোন রসের উদয় হয়, কবিতার জগতে অর্থাৎ কল্পনার জগতে তাহাতে বিপরীত ফল দর্শে। কবিতার জগতে প্রকৃতি ও কল্পনাকে এরূপ কৌশলে মিশ্রিত করিতে হইবে যে, সেই মিশ্রণ-প্রভাবে পাঠকের হৃদয়তন্ত্র কবির হৃদয়ের সহিত তালে তালে বাজিতে থাকিবে, এবং তাহা হইলে 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং' শ্লোকটির সার্থকতা প্রতিপন্ন হইবে। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাসের শোকে কমলা "ওরে

বাবারে" ইত্যাদি বলিয়া কাঁদিয়াছেন বটে, কিন্তু আর্থরের শোকে সেক্সপিয়ার কন্স্-ট্যান্স্‌কে ওরূপ করিয়া কাঁদান্ নাই, অথচ কন্স্ট্যান্স যখন বলিয়া উঠিলেন—

No, I defy all counsel, all redress,
But that which ends all counsel,
all redress
O amiable lovely
death
Misery's love,
O Come to me * * *
O that my tongue were in the
thunder's mouth,
with a passion would I
shake the world.
And rouse from sleep that fell
anatomy
Which cannot hear a lady's feeble
voice!
*
my boy, my Arthur,
my fair Son.
my joy, my food, my all
the world,
and my sor-
row's cure.

তখন কোন্ পাঠকের হৃদয় না শোকে দ্রবীভূত হইতে থাকে? এমন কি, সম্মুখস্থ একটি পদ্মফুলকে কল্পনার চক্ষে না দেখিলে কল্পনার প্রভাবে না বর্ণনা করিলে, কবির পদ্মবর্ণনার সহিত একজন উদ্ভিদ-বেত্তার পদ্মবর্ণনার কোন প্রভেদই থাকিতে পারে না। কিন্তু এইরূপ স্বভাব ও কল্পনার মিশ্র-উপাদানে "রসাত্মকং বাক্যং" রচনা করা অতিশয় সুকঠিন। যদি ঐ উভয়বিধ উপাদানে কিছুমাত্র বৈষম্য থাকে, তাহা হইলে তাহারা কখনই সমঞ্জসীভূতভাবে মিশ্রিত হইতে পারে না, এবং ঐ উভয়বিধ উপাদান সমঞ্জসীভূতভাবে মিশ্রিত না হইলে তাহাদের সংযোজনে যে কি এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি হয় তাহার একটি উদাহরণ আমরা দিতেছি। চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যখন গুপ্তভাবে গৃহ পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁহার জননী বিস্তর কাঁদিয়াছিলেন এবং সেই উপলক্ষে একজন "অসাধারণ কবিত্বশক্তি সম্পন্ন" কবি লিখিতেছেন

"ডাকেন জননী, নিমাই নিমাই,
প্রতিধ্বনি বলে, নাই নাই নাই,
ডাকিছেন যত, শোক-সিন্ধু তত
উথলিয়ে উঠে কোথা রে নিমাই!
গভীর নিশীথে দূর গ্রামান্তরে
সেই প্রতিধ্বনি যাই যাই করে,
ভাবেন জননী আসে গুণমণি
ডাকেন উৎসাহে হরিষ অন্তরে!"

প্রতিধ্বনির এরূপ বাক্‌চতুরতা দেখিয়া কে না বিস্ময়াপন্ন হইবে? কে না "নিমাই"-য়ের মায়ের দুঃখ ভুলিয়া প্রতিধ্বনিকে সাবাসী দিতে থাকিবে? এবং কার না বট্‌লর্ হুডিব্রাসের কথা সহজেই মনে পড়িবে?

Quoth he, O whither, wicked Bruin,
Art thou fled to my—Echo 'Ruin,'

Think'st thou 'will not be in the dish
Thou turnd'st thy back? (Quoth Echo) 'Pish'
To turn from those 'thou would'st overcome
Thus (Quoth Echo) 'mum!'

তবে বট্‌লরের সঙ্গে আর আমাদের কবির সঙ্গে প্রভেদ এই যে, বট্‌লর হাসাইব মনে করিয়া হাসাইয়াছেন, আর আমাদের কবিবর কাঁদাইব মনে করিয়া হাসাইয়া ফেলিয়াছেন—সুতরাং সাহিত্যদর্পণকারের মতে এ উভয়ের মধ্যে যে কে সুকবি তাহা বোধ হয় আর বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। কল্পনাময় ভাবের কথা দূরে থাক্, কল্পনার স্ফুলিঙ্গস্বরূপ একটি মাত্র কথাতেই কবিতার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধিত হইতে পারে।—'নির্ব্বাসিত সীতার' সীতা বনে বসিয়া এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন—

"বিনা দোষে বর্জ্জিলেন বিপিন মাঝার,
কোথা নাথ, কোথা প্রেম—সব ফক্কিকার!"

এই এক "ফক্কিকার" শব্দে বাক্‌দেবীর আদ্য শ্রাদ্ধ করা হইয়াছে—কিন্তু আবার "বিষবৃক্ষে" সূর্য্যমুখী দেহত্যাগ করিয়াছেন ভাবিয়া নগেন্দ্রনাথ যখন শ্রীশচন্দ্রের নিকট বিষণ্ণভাবে বসিলেন, শ্রীশচন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সূর্য্যমুখী কোথায়?" নগেন্দ্রনাথ স্বর্গ-নরক বিশ্বাস না করিয়াও আকাশপানে চাহিয়া বলিলেন "স্বর্গে!" এই একটি কথায় নগেন্দ্রনাথের শোকের গভীরতা পবিত্রতা ও মহান্‌ভাব এককালে জ্বলন্তরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে যে, সাহিত্য-দর্পণকারের মতে কোন কবিতা রচনা করিতে হইলে প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক কথাটির উপর পর্য্যন্ত দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

আমরা সাহিত্য-দর্পণকারের কথাগুলি অবলম্বন করিয়া আগামী বারে বঙ্গ-সাহিত্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

চ—

করুণা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মহেন্দ্র নরেন্দ্রদের দলে মিশিয়াছে বটে, কিন্তু এখনো মহেন্দ্রের আচার-ব্যবহারে এমন একটি মহত্ত্ব জড়িত ছিল যে, নরেন্দ্র তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতে সাহস করিত না, এমন কি সে থাকিলে নরেন্দ্র কেমন একটা অসুখ অনুভব করিত, সে চলিয়া গেলে কেমন একটু শান্তিলাভ করিত। অলক্ষিতভাবে নরেন্দ্রের মন মহেন্দ্রের মোহিনী শক্তির পদানত হইয়াছিল।

মহেন্দ্র বড় মৃদু-স্বভাব লোক, হাসিবার

সময় মুচকিয়া হাসে, কথা কহিবার সময় মৃদুস্বরে কথা কহে, আবার অধিক লোকজন থাকিলে মূলেই কথা কহে না, সে কাহারো কথায় সায় দিতে হইলে "হাঁ" বলিত বটে, কিন্তু সায় দিবার ইচ্ছা না থাকিলে হাঁও বলিত না, নাও বলিত না। এ-মহেন্দ্র নরেন্দ্রের মনের উপর যে অমন আধিপত্য স্থাপন করিবে তাহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় বটে।

মহেন্দ্রের সহিত গদাধরের বড় ভাব হইয়াছিল। ঘরে বসিয়া উভয়ে মিলিয়া দেশাচারের বিরুদ্ধে নিদারুণ কাল্পনিক সংগ্রাম করিতেন। স্বাধীন বিবাহ, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি প্রসঙ্গে মহেন্দ্র সংস্কারক মহাশয়ের সহিত উৎসাহের সহিত যোগ দিতেন কিন্তু বহুবিবাহ নিবারণ-প্রসঙ্গে তাঁহার তেমন উৎসাহ থাকিত না। এভাবের তাৎপর্য্য যদিও গদাধর বাবু বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু আমরা এক রকম বুঝিয়া লইয়াছি।

গদাধর ও স্বরূপের সঙ্গে মহেন্দ্রের যেমন বনিয়া গিয়াছিল, এমন নরেন্দ্র ও তাহার দলবলের সহিত হয় নাই। মহেন্দ্র ইহাদের নিকট ক্রমে তাহার দুই একটি করিয়া মনের কথা বলিতে লাগিল, অবশেষে মোহিনীর সহিত প্রণয়ের কথাটাও অবশিষ্ট রহিল না। এই প্রণয়ের কথাটা শুনিয়া স্বরূপবাবু অত্যন্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন মহেন্দ্র তাঁহার প্রণয়ের অন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছেন, অনেক দুঃখ করিয়া অনেক কবিতা লিখিলেন, এবং আপনাকে একজন উপন্যাস নাটকের নায়ক কল্পনা করিয়া মনে মনে একটু তৃপ্ত হইলেন।

গদাধর কোন প্রকারে মোহিনীর পারিবারিক অধীনতা-শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া তাহাকে মুক্ত বায়ুতে আনয়ন করিবার জন্য মহেন্দ্রকে অনুরোধ করিলেন। তিনি কহেন, গৃহ হইতে আমাদের স্বাধীনতা শিক্ষা করা উচিত, প্রথমে পারিবারিক-অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে শিখিলে ক্রমশ আমরা স্বাধীনতা-পথে অগ্রসর হইতে পারিব। ইংরাজী শাস্ত্রে লেখে "Charity begins at home" তেমনি গৃহ হইতে স্বাধীনতার সুরু। সংস্কারক মহাশয় নিজে বাল্যকাল হইতেই ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আসিতেছেন, বারো বৎসর বয়সে পিতার সহিত বিবাদ করিয়া তিনি গৃহ হইতে নিরুদ্দেশ হন, ষোল বৎসর বয়সে শিক্ষকের সহিত বিবাদ করিয়া ক্লাস ছাড়িয়া চলিয়া আসেন, কুড়ি বৎসর বয়সে তাঁহার স্ত্রীর সহিত মনান্তর হয়, এবং তাঁহাকে তাঁহার বাপের বাড়ি পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হন এবং এইরূপে স্বাধীনতার সোপানে সোপানে উঠিয়া সম্প্রতি ত্রিশ বৎসর বয়সে নিজে সমস্ত কুসংস্কার ও প্রেজুডিসের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া অসভ্য বঙ্গদেশের নির্দ্দয় দেশাচার-সমূহকে বক্তৃতার ঝটিকায় ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু গদাধরের সহিত মহেন্দ্রের মতের ঐক্য হইল না, এমন কি মহেন্দ্র মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হইল, গদাধর আর অধিক কিছু বলিল না, ভাবিল, আরো দিনকতক যাক্, তাহার পরে পুনরায় এই কথা তুলিব।

আরো দিনকতক গেল, মহেন্দ্র এখন নরেন্দ্রদের দলে সম্পূর্ণরূপে যোগ দিয়াছে। মহেন্দ্রের মনে আর মনুষ্যত্বের কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই, গদাধর আর একবার পূর্ব্বকার কথা পাড়িল, মহেন্দ্রের তাহাতে কোন আপত্তি হইল না।

মহেন্দ্রের নামে কলঙ্ক ক্রমে রাষ্ট্র হইতে লাগিল। কিন্তু মহেন্দ্রের হৃদয়ে এতটুকু লোক-লজ্জা অবশিষ্ট ছিল না যে, এই অপবাদে তাহার মন তিলমাত্র ব্যথিত হইতে পারে।

মহেন্দ্রের ভগিনী, পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়েরা ইহাতে কিছু কষ্ট পাইল বটে কিন্তু হতভাগিনী রজনীর হৃদয়ে যেমন আঘাত লাগিল এমন আর কাহারো নয়। যখন মহেন্দ্র মদ খাইয়া এলোমেলো বকিতে থাকে তখন রজনীর কি মর্ম্মান্তিক ইচ্ছা হয় যে, আর কেহ সেখানে না আসে। যখন মহেন্দ্র মাতাল অবস্থায় টলিতে টলিতে আইসে রজনী তাহাকে কোন ক্রমে ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেয়, তখন তাহার কতই না ভয় হয় পাছে আর কেহ দেখিতে পায়। অভাগিনী, মহেন্দ্রকে কোন কথা বলিতে, পরামর্শ দিতে বা বারণ করিতে সাহস করিত না, তাহার যতদূর সাধ্য কোন মতে মহেন্দ্রের দোষ আর কাহাকেও দেখিতে দিত না। মহেন্দ্রের অসম্বৃত অবস্থায় রজনীর ইচ্ছা করিত, তাহাকে বুক দিয়া ঢাকিয়া রাখে, যেন আর কেহ দেখিতে না পায়। কেহ তাহার সাক্ষাতে মহেন্দ্রের নিন্দা করিলে সে তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিত না, অন্তরালে গিয়া ক্রন্দন করা ভিন্ন তাহার আর কোন উপায় ছিল না। সে তাহার মহেন্দ্রের জন্য দেবতার কাছে কত প্রার্থনা করিয়াছে, কিন্তু মহেন্দ্র তাহার মত অবস্থায় রজনীর মরণ ভিন্ন কিছুই প্রার্থনা করে নাই। রজনী মনে মনে কহিত, রজনীর মরিতে কতক্ষণ, কিন্তু রজনী মরিলে তোমাকে কে দেখিবে?

এক দিন রাত্রি দুইটার সময় টলিতে টলিতে মহেন্দ্র ঘরে আসিয়া ভূমিতলে শুইয়া পড়িল। রজনী জাগিয়া জানলায় বসিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া বসিল। মহেন্দ্র তখন অচৈতন্য। রজনী ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে কতক্ষণের পর মহেন্দ্রের মাথা কোলে তুলিয়া লইল। আর কখন সে মহেন্দ্রের মাথা কোলে রাখে নাই; সাহসে বুক বাঁধিয়া আজ রাখিল। একটি পাখা লইয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল। ভোরের সময় মহেন্দ্র জাগিয়া উঠিল, পাখা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কহিল 'এখানে কি করিতেছ? ঘুমাওগে না!' রজনী ভয়ে থতমত খাইয়া উঠিয়া গেল। মহেন্দ্র আবার ঘুমাইয়া পড়িল। প্রভাতের রৌদ্র মুক্ত বাতায়ন দিয়া মহেন্দ্রের মুখের উপর পড়িল, রজনী আস্তে আস্তে জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

রজনী মহেন্দ্রকে যত্ন করিত, কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে করিতে সাহস করিত না; সে গোপনে মহেন্দ্রের খাবার গুছাইয়া দিত, বিছানা বিছাইয়া দিত, এবং সে অল্পস্বল্প যাহা কিছু মাসহারা পাইত, তাহা মহেন্দ্রের

খাদ্য ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য কিনিতেই ব্যয় করিত, কিন্তু এ সকল কথা কেহ জানিতে পাইত না। গ্রামের বালিকারা, প্রতিবেশিনীরা, এত লোক থাকিতে নির্দোষী রজনীরই প্রতি-কার্য্যে দোষারোপ করিত, এমন কি বাড়ির দাসীরাও মাঝে মাঝে তাহাকে দুই এক কথা শুনাইতে ত্রুটি করিত না, কিন্তু রজনী তাহাতে একটি কথাও কহিত না; যদি কহিতে পারিত তবে অত কথা শুনিতেও হইত না।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইবে, মেঘ করিয়াছে, একটু বাতাস নাই, গাছে গাছে পাতায় পাতায় হাজার হাজার জোনাকি পোকা মিট্ মিট্ করিতেছে। মোহিনীদের বাড়িতে একটি মানুষ আর জাগিয়া নাই, এমন সময়ে তাহাদের খিড়কির দরজা খুলিয়া দুই জন তাহাদের বাগানে প্রবেশ করিল। একজন বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া রহিল আর এক জন গৃহে প্রবেশ করিল। যিনি বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া রহিলেন তিনি গদাধর, যিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন তিনি মহেন্দ্র। দুই জনেরি অবস্থা বড় ভাল নহে, গদাধরের এমন বক্তৃতা করিবার ইচ্ছা হইতেছে যে তাহা বলিবার নহে, এবং মহেন্দ্রের পথের মধ্যে এমন শয়ন করিবার ইচ্ছা হইতেছে যে কি বলিব। ঘোরতর বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল, গদাধর দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিলেন, কিন্তু পরোপকারের জন্য কি কষ্ট না সহ্য করা যায়, এমন কি, এখনি যদি বজ্র পড়ে, গদাধর তাহা মাথায় করিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু এই কথাটা অনেকক্ষণ ভাবিয়া দেখিলেন যে, এখনি তাহাতে তিনি প্রস্তুত নহেন, বাঁচিয়া থাকিলে পৃথিবীর অনেক উপকার করিতে পারিবেন, বৃষ্টি বজ্রের সময় বৃক্ষতলে দাঁড়ানো ভালনয় জানিয়া একটি ফাঁকা জায়গায় গিয়া বসিলেন, বৃষ্টি দ্বিগুণ বেগে পড়িতে লাগিল।

এদিকে মহেন্দ্র পা টিপিয়া টিপিয়া মোহিনীর ঘরেরদিকে চলিল, যতই সাবধান হইয়া চলে ততই পস্ খস্ শব্দ হয়। ঘরের সম্মুখে গিয়া আস্তে আস্তে দরজায় ধাক্কা মারিল, ভিতর হইতে দিদিমা বলিয়া উঠিলেন "মোহিনী! দেখ্‌ত বিড়াল বুঝি! দিদিমার গলা শুনিয়া মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি সরিবার চেষ্টা দেখিলেন, সরিতে গিয়া এক রাশি হাঁড়ি-কলসির উপর গিয়া পড়িলেন, হাঁড়ির উপর কলসী পড়িল, কলসীর উপর হাঁড়ি পড়িল, এবং কলসী হাঁড়ি উভয়ের উপর মহেন্দ্র পড়িল, হাঁড়িতে কলসীতে, থালায় ঘটিতে দারুণ ঝন্ ঝন্ শব্দ বাধাইয়া দিল, এবং কলসী হইতে ঘড় ঘড় শব্দে জল গড়াইতে লাগিল, বাড়ির ঘরে ঘরে "কি হইল, কি হইল" শব্দ উপস্থিত হইল, মা উঠিলেন, পিসি উঠিলেন, দিদি উঠিলেন, খোকা কাঁদিয়া উঠিল, দিদি মা বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে পোড়ার মুখা বিড়ালের মরণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, মোহিনী প্রদীপ হস্তে বাহিরে আসিল, দেখিল মহেন্দ্র; তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া কহিল, "পালাও পালাও।" মহেন্দ্র পলাইবার উদ্যোগ করিল, ও মোহিনী তাড়াতাড়ি প্রদীপ নিভাইয়া ফেলিল।

দিদিমা চক্ষে কম দেখিতেন বটে, কিন্তু কাণে বড় ঠিক ছিলেন, মোহিনীর কথা শুনিতে পাইলেন, তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন, "কাহাকে পলাইতে বলিতেছিস্ মোহিনী?" দিদিমা অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু পলায়নের ধুপ্‌ধাপ্ শব্দ শুনিতে পাইলেন; দেখিতে দেখিতে বাড়িশুদ্ধ লোক জমা হইল।

মহেন্দ্র ত অন্য পথ দিয়া পলায়ন করিল। এদিকে গদাধর বাগানে বসিয়া ভিজিতেছেন, অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া একটু তন্দ্রা আসিতেই শুইয়া পড়িলেন, ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, যেন তিনি বক্তৃতা করিতেছেন, আর হাততালীর ধ্বনিতে সভা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে; সভায় গবর্ণর জেনেরাল উপস্থিত ছিলেন, তিনি বক্তৃতা-অন্তে পরম তুষ্ট হইয়া আপনি উঠিয়া যেকহ্যাণ্ড করিতে যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার পৃষ্ঠে দারুণ এক লাঠির আঘাত লাগিল, ধড়্‌ফড়িয়া উঠিলেন, একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "এখানে কি করিতেছিস্? কে তুই?" গদাধর জড়িত-স্বরে কহিলেন "দেশ ও সমাজ-সংস্কারের জন্য প্রাণ দেওয়া সকল মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য। ডাল ও ভাত সঞ্চয় করাই যাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য, তাহারা গলায় দড়ি দিয়া মরিলেও পৃথিবীর কোন অনিষ্ট হয় না। দেশ-সংস্কারের জন্য রাত্রি নাই, দিবা নাই, আপনার বাড়ি নাই, পরের বাড়ি নাই, সকল সময়ে সর্ব্বত্রেই কোন বাধা মানিবে না, কোন বিঘ্ন মানিবে না, কেবল ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে; যে না করে সে পশু, সে পশু, সে পশু! অতএব—" আর অধিক অগ্রসর হইতে হইল না, প্রহারের চোটে তাঁহার এমন অবস্থা হইল যে, আর অল্পক্ষণ থাকিলে শরীর-সংস্কারের আবশ্যকতা হইত। অতিশয় বাড়াবাড়ি দেখিয়া গদাধর বক্তৃতা ছন্দ পরিত্যাগ করিয়া গোঙ্গানি-ছন্দে তাঁহার মৃত পিতা, মাতা, কনষ্টেবল, পুলিস ও দেশের লোককে ডাকাডাকি আরম্ভ করিলেন। তাহারা বুঝিল যে, অধিক গোলযোগ করিলে তাহাদেরই বাড়ির নিন্দা হইবে, এই জন্য আস্তে আস্তে তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিল।

মোহিনীর উপরে তাহার বাড়িশুদ্ধ লোকের বড়ই সন্দেহ হইল। রাত্রে কে আসিয়াছিল, এবং কাহাকে সে পলাইতে কহিল, এই কথা বাহির করিয়া লইবার জন্য তাহার প্রতি দারুণ নিগ্রহ আরম্ভ হইল, কিন্তু সে কোনমতে কহিল না। কিন্তু এ কথা ছাপা থাকিবার নহে, মহেন্দ্র পলাইবার সময় তাহার চাদর ও জুতা ফেলিয়া আসিয়াছিল, তাহাতে সকলে বুঝিতে পারিল যে মহেন্দ্রেরই এই কায। এই ত পাড়াময় টীটী পড়িয়া গেল; পুকুরের ঘাটে, গ্রামের পথে, ঘরের দাওয়ায়, বৃদ্ধদের চণ্ডীমণ্ডপে এই এক কথারই আলোচনা হইতে লাগিল। মোহিনীর ঘর হইতে বাহির হওয়া দায় হইল, সকলেই তাহার পানে কটাক্ষ করিয়া কথা কয়; না

কহিলেও মনে হয় তাহারই কথা হইতেছে। পথে কাহারও হাস্য-মুখ দেখিলে তাহার মনে হইত তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই হাসি তামাসা চলিতেছে, অথচ মোহিনীর ইহাতে কোন দোষ ছিল না।

প্রাপ্ত গ্রন্থ।

১। ভারত-চিকিৎসা। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত। হোমিওপেথি কি, এবং উহার মূলে কোন সত্য আছে কি না, ইহা বুঝাইয়া দেয়, এরূপ গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র বাঙ্গালা ভাষায় একখানিও দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপ স্থলে কোন গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র আমাদের সেই অভাব পূরণ করিতে উদ্যত হইলে আমরা উহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকি। "ভারত চিকিৎসককেও" আমরা সেই ভাবে গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু "ভারত-চিকিৎসক" হইতে আমাদের অভাব কতদূর পূরণ হইবে বলিতে পারি না। আমরা ইহার ভূমিকা হইতে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু কোথাও "ভারত-চিকিৎসক"-প্রণেতাকে বিচক্ষণ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী লোক বলিয়া বোধ হয় না। প্রত্যুত তিনি তাঁহার প্রত্যেক প্রস্তাবে চিকিৎসা-শাস্ত্রে আপনার অনভিজ্ঞতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি হানিমানের জীবন বৃত্তান্ত বিষয়েও নিতান্ত অনভিজ্ঞ। শরচ্চন্দ্র বাবু "ভারত-চিকিৎসকের" ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, "প্রায় একশতাব্দী অতীত হইতে চলিল, হোমিওপেথির নিষ্ঠুর শত্রুগণের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া, ইহার বিখ্যাতনামা আবিষ্কর্ত্তা মহাত্মা হানিমান স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ানক কষ্ট সহ্য করতঃ অবশেষে জার্ম্মাণ রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন।" কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ১৭৫৫ খ্রীঃ অব্দে জার্ম্মাণ মহারাজ্যের অন্তর্গত কার-স্যাক্সনি প্রদেশস্থ মিসেন্ নামক একটি ক্ষুদ্র নগরে হানিমানের জন্ম হয়। ইনি উনবিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্বদেশীয় বিদ্যালয়ে যথোপযুক্ত বিদ্যা-শিক্ষা করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের অনুরোধে ১৭৭৫খ্রীঃঅব্দে প্রথমতঃ লিপ্‌জিগ্-নগরে উপনীত হন। পরে তথাকার পাঠ শেষ হইলে বিয়েনা নগরে আইসেন, এবং অবশেষে ১৭৭৯ খ্রীঃ অব্দে এর্‌ল্যাঙ্গেন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া চিকিৎসা-বিষয়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক নানাস্থান পরিভ্রমণ করেন। আট বৎসর কাল ক্রমান্বয়ে এলোপেথিক মতে চিকিৎসা করিয়া তিনি উহাতে হীনশ্রদ্ধা হইলেন। এবং অচিরকাল মধ্যে নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া রসায়ন-বিদ্যানুশীলনে নিযুক্ত হন। এইরূপ কিছুকাল গত হইলে তিনি ১৭৮৯ খ্রীঃ অব্দে পুনরায় লীপ্‌জিগ্ নগরে আসিয়া উপস্থিত হন।

এই সময় হইতেই তাঁহার মন আবার চিকিৎসাশাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনের দিকে ধাবিত হয়। অনন্তর তিনি বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা হোমিওপেথি-চিকিৎসার মূলসূত্র প্রাপ্ত হন। এবং আপন মত প্রচার করিবার মানসে প্রসিদ্ধ ডাক্তার হিউফ্‌লাণ্ড সাহেবের চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকায় ঐ সকল বিষয় প্রকাশ করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই কতকগুলি এলোপেথিক চিকিৎসক ও ঔষধবিক্রেতা (Apothicaries) তাঁহার পরম শত্রু হইয়া উঠে। ১৭৯০।৯১ হইতে ১৮২০।২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অবোধ শত্রুগণের মিথ্যা গ্লানির হস্ত এড়াইবার জন্য জার্ম্মান সাম্রাজ্যের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে প্রিন্স ফ্রেডেরিকের অনুগ্রহে এনহাল্ট কোথেন নামক স্থানে অবস্থিতি করেন। এই স্থানে থাকিতে থাকিতেই ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ইহার চারি বৎসর পরে ফরাসি দেশীয় একজন সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক রোগ প্রতীকারার্থ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। অনন্তর হানিমান তাঁহাকে অতিশয় যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করিয়া অল্প দিনের মধ্যে আরাম করিয়া তুলিলে, উক্ত স্ত্রীলোক তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পরিণয়পাশে বদ্ধ করেন ও অবশেষে ফরাশিস গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া স্বামী-সমভিব্যাহারে প্যারিশ নগরে উপনীত হন। হানিমান তদবধি এইখানেই চিকিৎসা করিয়া জীবনের শেষকাল সুখে অতিবাহিত করেন।

অতঃপর পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে হানিমান জার্ম্মান রাজ্যে জন্ম গ্রহণ করেন এবং চির-জীবন প্রায় ঐ খানেই থাকিয়া আপন মত প্রচার করিয়াছেন। কেবল শেষাবস্থায় দ্বিতীয়বার পরিণয় করিয়া স্ত্রীর অনুরোধে স্বদেশের আশা ত্যাগ করিয়া প্যারিশ নগরে উপনীত হন। কিন্তু ভারত-চিকিৎসকের পূর্ব্বোক্ত উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে, হানিমানকে কখনই জার্ম্মান বলিয়া বোধ হয় না। ভারত-চিকিৎসকের মধ্যে আর এক স্থলে "হোমিওপেথি কি" এই বিষয়টি বুঝাইতে গিয়া শরৎবাবু যেরূপ আপনার অনভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এমন আর কোথাও নহে। তিনি গ্রন্থ বিশেষকে অনুকরণ করিতে গিয়া এসম্বন্ধে তিন স্থলে তিন প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ১ম—"হোমিওপেথি সদৃশ-চিকিৎসা, যেমন বিষের ঔষধ বিষ।" ২য়—"যে জাতীয় বস্তু দ্বারা রোগোৎপত্তি হয়, পীড়িত ব্যক্তি, সদৃশ বস্তু সেবন দ্বারা রোগ হইতে মুক্ত হয়।" ৩য়—"যে বস্তু দ্বারা মনুষ্যের মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ জন্মে, সেই বস্তু সেবন দ্বারা আবার তাহার মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ আরোগ্য হয়।" শরৎবাবু এই তিনটিকেই হোমিওপেথি মতের পোষক মনে করিয়াছেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহাদের সহিত হোমিওপেথির কিছুমাত্র সৌসাদৃশ্য নাই। প্রত্যুত এই সকল মত ভ্রান্তি-জনক বলিয়াই বোধ হয়। সুতরাং পাঠকগণের পক্ষে শরৎবাবুর কৃত হোমিওপেথির ব্যাখ্যা পড়িয়া উহার যথার্থ

মর্ম্মাবগত হওয়া নিতান্ত দুরূহ। হোমিওপেথি মতের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই :—

সহজ শরীরে যে ঔষধ বা বিষবৎ দ্রব্য সেবন করিলে যে রোগ বা রোগের লক্ষণ উৎপন্ন হয়, সেই রোগ বা রোগের লক্ষণ অন্যকারণে উৎপন্ন হইলে সেই ঔষধই ব্যবস্থা। অর্থাৎ যে পারদ দ্রব্য ব্যবহার করিলে সহসা মনুষ্যের মুখ হইতে লালা বাহির হইতে থাকে, সেই পারদ-দ্রব্য পক্ষান্তরে উক্ত প্রকার রোগের ঔষধ। এই প্রণালীর চিকিৎসাকেই হোমিওপেথি-চিকিৎসা বলে। কিন্তু পারা খাইয়া রোগ জন্মিলে তাহাকে পুনরায় পারা খাওয়ান কখনই হোমিওপেথি চিকিৎসার উদ্দেশ্য নহে। অথচ শরৎবাবুর ব্যাখ্যা পড়িলে ঐরূপেই চিকিৎসা করিতে হয়।

এদিকে শরৎ বাবু "স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মন্তব্য" বলিয়া যে প্রস্তাবটি লিখিয়াছেন তাহাও ভ্রমশূন্য নহে। তিনি প্রথমেই Hygieneকে "শারীরবিদ্যা" বলিয়াছেন কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে Hygieneকে কখনই শারীর-বিদ্যা বলা যায় না। অধুনাতন লেখকেরা Physiologyকেই শারীরবিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। "স্বাস্থ্য-বিধানই" হাইজীনের প্রকৃত অনুবাদ।

Hygiene প্রস্তাবের মধ্যে লেখকের আর একটি দোষ এই যে, তিনি দুইস্থানে ইহার দুইরূপ অর্থ করিয়াছেন। একবার লিখিয়াছেন যে, "যে দর্শন-শাস্ত্রের যে শাখা পাঠ করিলে শরীর সুস্থ ও সবল থাকে, অকাল মৃত্যুর হস্ত এড়াইতে পারে, তাহাকেই শারীর-বিদ্যা কহে।" আবার লিখিয়াছেন যে "প্রকৃতপক্ষে হাইজীন্ বা শারীর বিদ্যার অর্থ শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহের অনুশীলন-বিষয়ক নিয়মাবলী।" কিন্তু পাঠকগণ এদুয়ের মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত অর্থ বলিয়া গ্রহণ করিবেন বলা যায় না।

আমরা পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবের মধ্য হইতে পাঠকগণের কৌতূহলোদ্দীপনার্থ আর কয়েকটি কৌতুকাবহ ও সগর্ব্ব উক্তি উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম।

"আমাদের এ সম্বন্ধে জ্ঞান ও সমর্থ নিতান্ত অসম্পূর্ণ হইলেও ইহাতে যে সমস্ত বিষয় লিখিত হইবে, তাহা অবগত হইলে পৃথিবীতে স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত হইতে পারিবে তাহা সন্দেহ করিতে পারি না।"

"প্রাচীন জ্যোতিদিগের ভাব ও ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া যেমন আবশ্যক, তাহাকে তদপেক্ষা অল্প আবশ্যক কোন মতে মনে করা যায় না।"

"কি কারণে রোগোৎপত্তি হয়, মুদ্রাযন্ত্র সকল, বিশেষতঃ চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় আলোচনা দ্বারাই লোকে সে সমস্ত অবগত হইতে পারে।"

"ভারত-চিকিৎসকের" ভূমিকায় শরৎবাবু "বহুকাল প্রচলিত, সাংঘাতিক চিকিৎসা-শাস্ত্রের মূলোৎপাটন" করিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে, "ভণ্ড প্রবঞ্চক মনুষ্যগণ মানবজাতির ব্যাধি নিরাকরণ-অভিপ্রায়ে যে

সমস্ত ভয়ানক যন্ত্রণার সৃষ্টি করিয়াছে, নির্দ্দয়-রাক্ষস-প্রকৃতি যম-কিঙ্করগণ অদ্যাপিও যাহা রক্ষা করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতেছে।" শরৎবাবুর মতে এলোপেথিকেরা সকলেই ভণ্ড ও প্রবঞ্চক এবং নির্দ্দয় ও রাক্ষস-প্রকৃতি যম-কিঙ্করের ন্যায়। এরূপ উক্তি চিকিৎসকের পক্ষে কতদূর সঙ্গত বলিতে পারি না। শরৎ বাবু যদি চিকিৎসা-শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত (History of medicine) পাঠ করিতেন, তাহা হইলে প্রাচীন চিকিৎসকদিগের উদ্দেশে তিনি কখনই ঐরূপ গুণবাচক শব্দ প্রয়োগ করিতে পারিতেন না।

শরৎবাবু 'পথ্য' বিষয়ক প্রস্তাবে যেরূপ অনধিকারচর্চ্চা করিয়াছেন, তাহাতে পাঠকগণের পক্ষে উহার মর্ম্মাবগত হওয়া সহজ নহে। আমরাও পুনঃপুনঃ পাঠ করিয়া লেখকের উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

এতদ্ভিন্ন "ভারত চিকিৎসকের" শেষ ভাগে শরৎবাবু যে দুইটি ঘৃণিত রোগের উল্লেখ করিয়া তাহাদের কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসাদি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা অধিকতর ক্ষুব্ধ হইলাম। কারণ, শারীরস্থানবিদ্যা (Anatomy) বিষয়ে তাঁহার ব্যুৎপত্তি না থাকায় তিনি অন্ধের ন্যায় যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে প্রকৃত চিকিৎসা-ব্যবসায়ী অথবা ইংরাজী চিকিৎসা-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত কেহই উহার অর্থগ্রাহী হইতে পারেন না। তিনি প্রমেহ নামক প্রস্তাবে রোগ নির্ব্বাচন-স্থলে লিখিয়াছেন যে "স্ত্রী এবং পুরুষ জাতির মূত্রযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও জননেন্দ্রিয়ের অতি সন্নিহিত স্থান কোন অজ্ঞাত বিষ সংস্পর্শ দ্বারা প্রদাহিত হইয়া তাহা হইতে পূঁজময় ক্লেদ নিঃসরণ হওয়াই প্রমেহ।" কিন্তু এতদ্দ্বারা কিছুই বুঝা যায় না। ইংরাজী চিকিৎসা-শাস্ত্র-অনুবাদকেরা কিড্‌নি (Kidney) নামক শরীরাভ্যন্তরস্থ দুইটি যন্ত্রকেই ঐ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু শরৎবাবু ভ্রমবশতঃ বহির্মূত্র-প্রণালী অর্থাৎ ইউরিথ্রার (Urethra) ঐ নাম দিয়াছেন। এ দিকে "জননেন্দ্রিয়ের অতি সন্নিহিত স্থান" বলিলে যে কত প্রকার স্থান বুঝাইতে পারে তাহা বলা যায় না।

তিনি "প্রমেহ শব্দের প্রকৃত অর্থ শুক্রক্ষরণ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। "গনোরিয়া" (Gonorhea) এই শব্দেরই ধাতুগত অর্থ শুক্রক্ষরণ। প্রমেহ শব্দের অর্থ স্বতন্ত্র।

আবার আর একস্থলে শরৎবাবু ইউরিথ্রা-নামক যন্ত্রকে মূত্রাধার বলিয়াছেন। কিন্তু লোকে ব্লাডার নামক যন্ত্রকেই সচরাচর মূত্রাধার বলিয়া থাকে।

প্রমেহ প্রস্তাবের দ্বিতীয় পাতে লিখিত আছে যে, 'এইরূপ হইবার কারণ পুরুষের মূত্রাধারে * স্পঞ্জের ন্যায় একপ্রকার শোষক পদার্থ আছে তাহা আটাবৎ রস বিশেষ দ্বারা সিক্ত হইলেই মূত্রযন্ত্র ঐরূপ সোজা

* Urethra.

হইয়া উঠে।' এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে,শরৎবাবু মূত্রাধারে যে স্পঞ্জের ন্যায় পদার্থের উল্লেখ করিতেছেন তাহা মূত্রাধারে নাই। কিন্তু ঐ তন্তু (tissue) মূত্রপ্রণালীর চতুর্দ্দিকে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত পরিবেষ্টন করিয়া থাকে। শরৎবাবু মৃতদেহ স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিলে অথবা কোন শারীরস্থান বিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিলে কখনই এরূপ ভ্রমে পতিত হইতেন না।

'সঙ্কুচিত মূত্র প্রণালী' নামক প্রস্তাবে শরৎবাবু মূত্রযন্ত্রে, শ্লৈষ্মিক এবং উপশ্লৈষ্মিক ঝিল্লী লইয়া যেরূপ গোলযোগ করিয়াছেন তাহা দেখিলে বোধ হয় যে তিনি যে ইংরাজী গ্রন্থ * হইতে ঐ সকল বিষয় অনুবাদ করিয়াছেন তাহা তিনি স্বয়ং বুঝেন না। শারীরস্থান-বিদ্যায় জ্ঞান না থাকাই ইহার মূল কারণ। এই জন্যই তিনি Prostate glandকে প্রষ্টাটিক চুঙ্গি, Submucus tissue শ্লৈষ্মিক পেশী এবং albuminous fluidকে ক্ষীরবৎ গাঢ় রস বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এই জন্যই তিনি বলেন যে 'আটাবৎ ক্লেদ নির্গত হইয়া অশ্বযুক্ত পেশী উৎপন্ন হয়।' এই শেষোক্ত কথাটি সর্ব্বাপেক্ষা অমূলক। এটি তাঁহার স্বকপোলকল্পিত বলিলেও বলা যায়। কারণ ইহা কোন চিকিৎসা-শাস্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায় না।

'শুক্রক্ষরণ' নামক ভারত-চিকিৎসকের শেষ প্রস্তাবটি নিতান্ত মন্দ নহে। কিন্তু শরৎবাবুর ইংরাজী শিক্ষার দোষে তিনি গ্রন্থ বিশেষ * হইতে অনুবাদ করিতে গিয়া নানা প্রকার ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

প্রথমতঃ রোগ নির্ব্বাচনের সময় irritability শব্দের অর্থ টাটানি করিয়াছেন। বস্তুতঃ irritability অর্থ উত্তেজন-প্রবণতা। অর্থাৎ যাহাতে কোন বস্তু সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠে।

এই 'রোগোৎপত্তির কারণ' বিষয়ক প্রস্তাবে লিখিয়াছেন যে 'শিশুগণ বিচারালয়ে স্ত্রী-পরিত্যাগরূপ মোকদ্দমা দৃষ্টে, এই বিষয় শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।' বাস্তবিক রডকের লিখিত পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবে ওরূপ কোন কথাই নাই। তবে তিনি বলেন যে যুবকেরা নানাস্থানে জঘন্য অভ্যাস শিক্ষা করে। তন্মধ্যে অসৎ পুস্তক পাঠ, অসদালাপ এবং সংবাদপত্র-লিখিত স্ত্রীপরিত্যাগ-বিষয়ক মোকদ্দমার সম্বাদ পাঠই ইহার প্রধান কারণ।

রডক্ সাহেবের গ্রন্থে লিখিত আছে যে "Very extensive correspondence and considerable private practice, have afforded us unusual opportunity of investigating this subject and prove to us that the evils of the above condition are widespread beyond the credibility of those who have not thoroughly investigated it." শরৎবাবু উহার অনুবাদে লিখিয়াছেন "বহু বিস্তৃত কথোপকথন ও মফঃসল চিকিৎসা দ্বারা আমরা এই অস্বাভাবিক

* Ruddock's Text Book.

* Ruddock's Text Book.

ক্রিয়ার বিস্তৃতি ও তাহার বিষময় ফল সম্বন্ধে এতদূর অনভিজ্ঞ হইয়াছি যে অন্যে তাহা কদাপি বিশ্বাস করিতে পারে না।"

ভারত-চিকিৎসক হইতে আমরা প্রথমে এই প্রস্তাবটি পড়িয়া ভাবিয়াছিলাম যে হয় ত শরৎ বাবু বহুদিন হইতে স্বয়ং এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া এতদূর বলিতে সাহসী হইয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি যে অন্যের লিখিত বিষয় আপনার বলিয়া লোকসমাজে প্রচার করেন, ইহা আমাদের স্বপ্নের অগোচর। যাহাই হউক, ভরসা করি শরৎ বাবু পুনরায় আমাদিগকে এরূপ বিষম সমস্যায় ফেলিবেন না।

উপসংহার-কালে, 'ভারত-চিকিৎসক' সম্বন্ধে আমরা আরও গুটিকতক কথা না বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না।

'ভারতচিকিৎসকের' মধ্যে উপক্রমণিকা বা ভূমিকা ভিন্ন,প্রায় সকল গুলিই অনুবাদ। এই অনুবাদগুলি আবার এতই দুর্বোধ্য যে, প্রত্যেক প্রস্তাবের টীকা না করিলে উহা বুঝা যায় না। উহার ভাষা বিশুদ্ধ নহে। উহার স্থানে স্থানে এরূপ ভুল আছে যাহা দেখিলে অনুবাদককে নিতান্ত অশিক্ষিত বলিয়া বোধ হয়। এতদ্ভিন্ন শরৎবাবু যে সকল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া এই মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়াছেন তাহাও তিনি উত্তমরূপ জানেন না। অতঃপর আমাদের পরামর্শ এই যে যদি শরৎবাবু যথার্থই দেশের মঙ্গলোদ্দেশে হোমিওপেথি-প্রচারে কৃতসংকল্প হইয়া থাকেন, যদি ধনোপার্জন তাঁহার মুখ্য অভিপ্রায় না হয়, তাহা হইলে তিনি যেন স্বয়ং সম্পাদকের ভার গ্রহণ না করেন। শিক্ষিত চিকিৎসা-ব্যবসায়ী লোকের সাহায্য-ব্যতীত এরূপ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা তাঁহার পক্ষে বিবেচনাসিদ্ধ হয় নাই। ভরসা করি তিনি আমাদের এই সকল উপদেশ-বাক্য অক্ষুব্ধ চিত্তে গ্রহণ করিবেন। আমরা তাঁহার লিখিত মাসিক পত্রিকা সম্বন্ধে একটিও অনুকূল বাক্য প্রয়োগ করিতে পরিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইলাম। গ্রন্থকারের ছিদ্রানুসন্ধান আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার ভ্রমসংশোধন করাই আমাদিগের অভিপ্রেত।

জাতীয় উদ্দীপনা—ঢাকা গিরীশযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৸৹ আনা মাত্র। সংগ্রাহকের নাম নাই। এই পুস্তকখানি কতকগুলি স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক সুন্দর কবিতার সংগ্রহ। গ্রন্থখানি পাইয়া আমরা অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছি। হেমচন্দ্র বাবুর ভারত-সঙ্গীতটি থাকিলেই পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইত।

সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিল—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিরচিত। ঈষ্টইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ৵৹ আনা। গ্রন্থকার স্ত্রী-বিয়োগে এই বিলাপ-কবিতাটি রচনা করিয়াছেন। এ পুস্তকের বাহুল্য সমালোচনা করিলে অকৃত্রিম শোকের অবমাননা করা হয়। যাহা হউক, তাঁহার সহিত আমরা সমতা প্রকাশ করিতেছি।

নিশীথে হিমাদ্রি-শিখরে—যোগেন্দ্র নাথসেন প্রণীত। বরিশাল সত্য-প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৵৹ আনা। এই ক্ষুদ্র কাব্য-

খানির রচয়িতা অল্পবয়স্ক। ইহা ভারতের বর্ত্তমান দুরবস্থাজনিত বিলাপ-প্রসঙ্গ। সপ্তদশ বর্ষীয় বালকের পক্ষে এই পুস্তকখানি প্রশংসনীয়।

ললিতা সুন্দরী—অধরলাল সেন বিরচিত। নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। এ কাব্যখানির স্থানে স্থানে মন্দ হয় নাই। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন, "ইহার সকল ভাব লেখকের মানস-প্রসূত নহে; মধ্যে মধ্যে অপরাপর ভাষার ভাবেরও অসদ্ভাব নাই, ঘটনাটি অনৈতিহাসিক, এবং রচনা-চাতুরীর অভিমান করে না।" যদিও আমরা "অভিমান করে না" এই ক্রিয়ার প্রকৃত কর্ত্তাটি খুঁজিয়া পাইলাম না, তবুও গ্রন্থকারের অকপটতাকে আমরা সাধুবাদ দিই।

মেনকা—ঐ—ঐ—মূল্য চারি আনা। এই গীতি-কাব্যখানি-সম্বন্ধে আমাদের অধিক কিছু বক্তব্য নাই। ইহা মূরের প্যারাডাইজ্ এণ্ড দি পেরীর স্বাধীন অনুবাদমাত্র। পূর্ব্ব গ্রন্থখানির অপেক্ষা ইহার রচনা-প্রণালী কিঞ্চিৎ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

নলিনী—ঐ—ঐ—মূল্য ছয় আনা।

"ভালবাসা, সুখ আশা তামাসার নয়।"

"সে প্রেম কোথায়?

ভালবেসে পরিশেষে কিবা সুখ হোল।

তামাসা ফুরিয়ে গেল—হৃদয় শ্মশান হোল

চক্রবাক্ চক্রবাকী কাঁদে উভরায়

বাজে "হায়, হায় হায়!"

এরূপ ভাব ও ভাষা-সম্বলিত শ্লোক-সমষ্টির বাহুল্য সমালোচনা গ্রন্থকারের অপ্রীতিকর হইবে জানিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

কুসুমকানন—ঐ—ঐ—গ্রন্থকারের প্রিয় কবি বায়রণ্ লিখিয়াছেন।—

"Oh Southey, Southey, in mercy spare,
A fourth, alas, is more than we can bear."

ছিন্ন লতিকা।

সাধের কাননে মোর, রোপন করিয়াছিনু
একটি লতিকা সখি অতিশয় যতনে,
প্রতিদিন দেখিতাম, কেমন সুন্দর ফুল
ফুটিয়াছে শত শত প্রসি হাসি আননে।
প্রতিদিন সযতনে, ঢালিয়া দিতাম জল
প্রতি দিন ফুল তুলে গাঁথিতাম মালিকা,
সোনার লতাটি-আহা বন করেছিল আলো,
সে লতা ছিঁড়িতে আছে, নিরদয় বালিকা?

কেমন বনের মাঝে, আছিল মনের সুখে
গাঁঠে গাঁঠে শিরে শিরে জড়াইয়া পাদপে।
প্রেমের সে আলিঙ্গনে, স্নিগ্ধ রেখেছিল তায়,
কোমল পল্লবদলে নিবারিয়া আতপে।
এত দিন ফুলে ফুলে, ছিল ঢল ঢল মুখ,
শুকায়ে গিয়াছে আজি সেই মোর লতিকা।
ছিন্ন-অবশেষ টুকু, এখনো জড়ানো বুকে
এ লতা ছিঁড়িতে আছে নিরদয় বালিকা?

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

(১) শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু বিরচিত—দৃষ্ট।

(২) শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ বিরচিত—সাংখ্য দর্শন

পঞ্চম সংখ্যা পত্রিকার ২১৬ পৃষ্ঠার পর।

আরোহ-প্রণালী কিরূপ আর অবরোহ-প্রণালীই বা কিরূপ, তাহার পরিচয় এক-প্রকার দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে উভয়ের মধ্যে কে কেমন প্রামাণিক, তাহা একবার প্রণিধান করিয়া দেখা যাক্।

এক আপেক্ষিক বস্তু, আর এক সূক্ষ্মতর আপেক্ষিক বস্তুকে অবলম্বন করিয়া আছে, তাহাও আবার ততোধিক সূক্ষ্মতর বস্তুকে অবলম্বন করিয়া আছে; এইরূপ করিয়া যতই চলা যায়, আরোহ-প্রণালী আপেক্ষিকের উর্দ্ধে কোনক্রমেই যাইতে পারে না।

আরোহ প্রণালীর প্রারম্ভে স্থূল-তম বিষয়, এবং তাহার উপসংহারে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বিষয়।

অবরোহ-প্রণালীর প্রারম্ভে সূক্ষ্মতম বিষয়, পরিণামে স্থূল হইতে স্থূলতর বিষয়।

স্থূল-তম বিষয়, যাহা আরোহ-প্রণালীর ভিত্তিমূল, তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি, এ কথা কেহই জিজ্ঞাসা করেন না,—সকলেই জানেন যে, প্রত্যক্ষই তাহার প্রমাণ। জিজ্ঞাসা কেবল এই যে, সূক্ষ্মতম বিষয়, যাহা অবরোহ প্রণালীর ভিত্তিমূল, তাহা ত প্রত্যক্ষের বিষয় নহে,—তাহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তর এই যে, স্থূলের পরাকাষ্ঠা যেমন আমরা জড় বস্তুতে প্রত্যক্ষ করি, সূক্ষ্মের পরাকাষ্ঠা সেইরূপ আমরা বিশুদ্ধ জ্ঞানেতে উপলব্ধি করি। স্থূলগুলি প্রত্যক্ষ করি ইন্দ্রিয়-দ্বারা, সূক্ষ্মতমটি (বিশুদ্ধ জ্ঞান) উপলব্ধি করি আত্মা দ্বারা।

একদিকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অপর দিকে আত্ম-প্রমাণ; প্রথমটি স্থূল-সত্যের প্রমাণ, দ্বিতীয়টি সূক্ষ্ম-সত্যের প্রমাণ। আমরা যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা একেবারেই স্থূল-বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি, সেইরূপ আত্মা দ্বারা একেবারেই সূক্ষ্মতম বস্তুকে উপলব্ধি করি। তাহা যদি না হইত, তবে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, তাহা হইতেও সূক্ষ্মতর এইরূপ করিয়া মনকে ক্রমাগতই ভ্রান্ত ক্লান্ত বিভ্রান্ত হইতে হইত, আর, কোথাও বিশ্রাম করিতে না পাইয়া অন্ধকার দেখিতে হইত। অন্ধকার দেখে না যে, তাহার কারণ শুদ্ধ কেবল আত্মার অন্তরতম জ্যোতি—বিশুদ্ধ জ্ঞান—প্রজ্ঞা।*

এ ধারে প্রত্যক্ষ, ওধারে প্রজ্ঞা, মধ্যে আরোহ অবরোহ এই দুই প্রণালী।

* ইংরাজীতে যাহাকে বলে Pure reason.

আরোহ প্রণালীর প্রারম্ভে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ শিরোধার্য্য করিয়াছি, অবরোহ প্রণালীর প্রারম্ভে বিশুদ্ধ জ্ঞান শিরোধার্য্য করিতেছি। প্রত্যক্ষ-বিষয় যেমন আপনা আপনি সপ্রমাণ, বিশুদ্ধ-জ্ঞানও সেইরূপ আপনা আপনি সপ্রমাণ। ইন্দ্রিয়-মনের যোগে প্রত্যক্ষ বিষয়ের উপলব্ধি হয়, আত্মার যোগে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উপলব্ধি হয়,—প্রজ্ঞার উপলব্ধি হয়। প্রজ্ঞা হইতে নীচে নাবিতে হইলে যুক্তি-সোপান অবলম্বন করিতে হয়, এবং প্রত্যক্ষ হইতে উপরে উঠিতে হইলে অনুমান-সোপান অবলম্বন করিতে হয়। প্রত্যক্ষ হইতে অনুমান-প্রবাহ ঊর্দ্ধগামী; প্রজ্ঞা-হইতে যুক্তি-প্রবাহ নিম্নগামী।

প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ না করিলে আরোহ-প্রণালী সম্ভবে না; প্রজ্ঞাকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ না করিলে অবরোহ-প্রণালী সম্ভবে না। প্রত্যক্ষকে যদি প্রমাণ না বল, তবে অনুমানকে প্রমাণ বলিতে পার না; প্রজ্ঞাকে যদি প্রমাণ না বল, তবে যুক্তিকে প্রমাণ বলিতে পার না।

প্রত্যক্ষ হইতে অনুমানে আরোহণ—ইহাই আরোহ প্রণালী; প্রজ্ঞা হইতে যুক্তিতে অবরোহণ—ইহাই অবরোহ প্রণালী। প্রত্যক্ষ যদি অসিদ্ধ হয়, তবে অনুমান অসিদ্ধ, আরোহ প্রণালী অসিদ্ধ, বিজ্ঞান-শাস্ত্র অসিদ্ধ। প্রজ্ঞা যদি অসিদ্ধ হয়, তবে যুক্তি অসিদ্ধ, অবরোহ প্রণালী অসিদ্ধ, দর্শনশাস্ত্র অসিদ্ধ। আরোহ-প্রণালীর ভিত্তিমূল যে প্রত্যক্ষ তাহারো আমরা প্রমাণ চাহি না, অবরোহ প্রণালীর ভিত্তিমূল যে প্রজ্ঞা, তাহারও আমরা প্রমাণ চাহি না, উভয়কেই আমরা শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া জ্ঞানপথে অগ্রসর হই। আমরা ভিত্তিমূলের আর ভিত্তিমূল চাহি না। যদি বল প্রত্যক্ষ যে প্রমাণ তাহার প্রমাণ কি? প্রজ্ঞা যে প্রমাণ তাহার প্রমাণ কি? তবে বল না কেন—প্রমাণ যে প্রমাণ তাহার প্রমাণ কি? ইহাকেই বলে তার্কিকতা।

প্রমাণ-বিষয়ে এত বাহুল্য করিয়া বলিবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন এই যে, অনেকে পরের কথা শুনিয়া আপনাকে এবং আপনার মূল পত্তন ভূমিকে একেবারেই উড়াইয়া দিয়া থাকেন। লৌকিক প্রবাদ আছে, কাকে কাণ উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে শুনিলে লোক-বিশেষ বলেন "তাই ত কি হইবে!" শুনিলেন যে, বৈজ্ঞানিকেরা আত্মার ভিত্তিমূলকে উড়াইয়া দিয়াছে, অমনি বলেন "তবে ত তাও আর নাই! তবে ত আত্মা নাই! বিশুদ্ধ জ্ঞান তবে ত আর টেকে না।" কাকে যে কাণ উড়াইয়া লইয়া যায় নাই, বিশুদ্ধ-জ্ঞানকে যে কেহ উড়াইয়া দিতে পারে না, এই সহজ বিষয়টি যাঁহার সহজে হৃদয়ঙ্গম না হয়, তাঁহার প্রজ্ঞা-শূন্য বিজ্ঞতা, তাঁহার চক্ষুবিহীন সূক্ষ্মদর্শিতা, তাঁহার শিরোনাস্তি শিরঃপীড়া সহজে আরোগ্য হইবার নহে! সহজ সত্যে ভ্রম পৌঁছিলে তাহার প্রতিবিধান করা সহজ আয়াসের কর্ম্ম নহে। বিশুদ্ধ জ্ঞান যে কতদূর প্রামাণিক, তাহা

একটু ঘোর ফের করিয়া না বলিলে তাহাদের বোধগম্য হইবে না।

প্রজ্ঞা সকল-যুক্তিরই প্রমাণ সাধন করে, সুতরাং প্রজ্ঞার প্রমাণ সাধন করিতে পারে এমন যুক্তি সম্ভবে না। প্রজ্ঞার প্রামাণিকতা প্রকারান্তরে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে তাহার একমাত্র উপায় এই যে, প্রজ্ঞা হইতে যে সকল যুক্তি দোহন করিয়া পাওয়া যায়, সেইগুলি কতদূর প্রামাণিক তাহাই অবধারণ করা।

যুক্তি কাহাকে বলে? না যোগ করা। প্রজ্ঞাকে বিষয়-বিশেষে যোগ করিবার (নৈয়ায়িক ভাষায় বলিতে হইলে ব্যাপক সত্তাকে ব্যাপ্য বিষয়েতে যোগ করিবার) পদ্ধতিকেই যুক্তি কহে। প্রজ্ঞার প্রয়োগ-পদ্ধতিকেই যুক্তি কহে। প্রজ্ঞা-মূলক যুক্তি কিরূপ তাহা নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি।

সকলেই অবগত আছেন যে, একটা গোলা ক হইতে খ য়ের দিকে (ক—খ) তাড়িত হইলে, তাহা যদি দ্বিতীয় কোন কিছু দ্বারা চালিত অথবা বাধিত না হয়, তবে তাহা সমান বেগে ক—খ এই সরল রেখায় ধাবিত হইবে। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, চালক অথবা বাধক বস্তুর অভাবে বেগের হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারে না; কেন পারে না? না যেহেতু কারণের অভাবে কার্য্য হইতে পারে না। কারণের অভাবে কার্য্য হইতে পারে না, এই যে একটি কথা, এটি প্রজ্ঞার কথা, বিশুদ্ধ জ্ঞানের কথা; চলন্ত গোলাটি ঐ প্রজ্ঞা-তত্ত্বটির অন্যথাচরণ করিতে পারে না। কার্য্যতঃ আমরা কোন বস্তুকে অনন্ত কাল নিরবচ্ছিন্ন সমান বেগে চলিতে দেখি নাই দেখিব না। সুতরাং উপরিউক্ত সত্যটির প্রত্যক্ষ প্রমাণ অসম্ভব; প্রজ্ঞা-মূলক যুক্তিই উহার একমাত্র প্রমাণ, তদ্ভিন্ন আর দ্বিতীয় প্রমাণ সম্ভবে না।

দ্বিতীয়তঃ প্রজ্ঞা মূলক যুক্তি দ্বারা ইহাও সমর্থিত হইতে পারে যে, গোলাটি ক হইতে খ-য়ের দিকে তাড়িত হইলে দ্বিতীয় কোন চালক অথবা কোন বাধক বস্তুর অভাবে ক—খ এই সরল রেখাতেই চলিবে, বক্র রেখাতে চলিবে না। যথাঃ—

(ক⌒খ) ক এবং খ য়ের মধ্যে একটি-বই সরল রেখা সম্ভবে না। কিন্তু ও-দুয়ের মধ্যে এই সমতল কাগজে ঐ দুটি (এবং তদ্ভিন্ন অসংখ্যটি) অবিকল সমান বক্ররেখা অঙ্কিত হইতে পারে। ক হইতে খয়ে পৌঁছিতে হইলে গোলাটির পক্ষে দুটি রেখাই ঠিক সমদূর, সম কোণ, সমবক্র, সর্ব্বপ্রকারেই সমান; সুতরাং একটিকে ছাড়িয়া অন্যটিতে যাইবার একেবারেই কারণাভাব; কারণাভাবে কার্য্য হইতে পারে না; সুতরাং গোলাটি বক্র-রেখা-দুটির কোনটিতেই চলিতে পারে না; সুতরাং তাহা সরল রেখাতে চলিবেই চলিবে। দেখ কারণাভাবে কার্য্য হয় না, এইমাত্র প্রজ্ঞা-বলেই আমরা স্থির-নিশ্চয় করিতে পারিতেছি যে, গোলাটি কথিত অবস্থায় সরল ভিন্ন বক্রপথে কখনই চলিবে না।

কম্‌টির মতে পরীক্ষাসাধ্য ভবিষ্যৎ-বাণী প্রামাণিকতার প্রধান একটি লক্ষণ। প্রজ্ঞার ভবিষ্যৎবাণী পরীক্ষার প্রয়োজন

রাখে না, অথচ তাহা কেমন নিশ্চিত উপরে ঐ ত দেখা গেল। একটা গোলা সমান বেগে সরল রেখায় অনন্ত কাল চলিবে, এ ব্যাপারটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে গেলে যুগযুগান্তরেও পরীক্ষার শেষ হইবে না। এখানে পরীক্ষা খই পাইতেছে না—ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। "কারণ ব্যতীত কার্য্য হইতে পারে না" শুদ্ধ কেবল এই স্বতঃসিদ্ধ মূল-তত্ত্বের বলে উপরের ঐ সিদ্ধান্তটি অকাট্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, প্রজ্ঞা-হইতে যুক্তিতে অবতরণ করিয়া যে সকল সত্য উপার্জ্জন করা যায়, তাহা প্রত্যক্ষের গোচর হয় হউক, না হয় না হউক, কোন অবস্থাতেই তাহার নিশ্চয়তা এক বিন্দুও এদিক ওদিক হইতে পারে না।

আনুমানিক-সত্য যত আছে, পরীক্ষাই তাহাদের সর্ব্বস্ব। পরীক্ষার সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয়,তাহাদের পক্ষে ততই ভাল—ততই তাহাদের মূল দৃঢ় হয়। সর্পের পদ কেহই আমরা দেখি নাই, অথচ আমরা সাহস করিয়া এরূপ বলিতে পারি না যে, সর্পের পদ কখনই সম্ভবে না। যদি কোন বন্ধুজনের মুখে শুনি যে, অমুক দেশে পদ-বিশিষ্ট সর্প দেখা দিয়াছে, তবে এই বলি "আশ্চর্য্য কি, হইলেও হইতে পারে।" কিন্তু যদি সেই ব্যক্তির মুখে শুনি যে, অমুক দেশে কারণ-বিহীন কার্য্য দেখা দিয়াছে, তবে আমরা তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত করি যে, লোকটির মস্তকে দোষ জন্মিয়াছে! সত্য বটে যে, ভারতবর্ষীয় এত লোকের মধ্যে কেহই আমরা সর্পের পদ একবারও দেখি নাই, তথাপি কোনও দেশে পদবিশিষ্ট সর্প আছে কি না, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে দোষ কিছুমাত্র নাই বরং গুণই আছে, কিন্তু বিনা-কারণে কার্য্য হইতে পারে কি না, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে যাওয়া বাতুল ভিন্ন আর কাহারো কর্ম্ম নহে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, প্রজ্ঞার প্রমাণ পরীক্ষাধীন নহে, প্রজ্ঞা স্বতঃসিদ্ধ।

প্রত্যক্ষ-গোচর স্থূল বিষয়েতে প্রজ্ঞার প্রয়োগ করিয়া, প্রজ্ঞার বল কার্য্যে কতদূর, তাহাও আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি;—এই দেখিয়াছি যে, গোলা-একটা জড়পিণ্ড বই নয়, অথচ তাহা দুই দিকের দুই বক্র পথ পরিত্যাগ করত সোজা পথ দিয়া ক হইতে খ-য়ে পৌঁছিতেছে। গোলাটা স্থূল, কিন্তু তাহার উপরি-উক্ত কার্য্যটী অতি সূক্ষ্ম। দুই দিকের কোন্ দিকে না হেলিয়া ঠিক্ মধ্যস্থ অবলম্বন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। পথ-টি যেমন সোজা, সোজা পথে চলা-টি তেমন সোজা নহে। ক এবং খ-য়ের মধ্যে অসংখ্যটি বাঁকা পথ, একটি মাত্র সোজা পথ। গোলাটা প্রতিমুহূর্ত্তে সেই সোজা পথটিই বাছিয়া লইতেছে। গোলাটা-কর্ত্তৃক এই যে সূক্ষ্ম কার্য্য একটি সম্পাদিত হইতেছে—স্থূলের মধ্যে এই যে একটি সূক্ষ্ম ব্যাপার দৃষ্ট হইতেছে—ইহার মূল কোথায়? প্রজ্ঞার এই যে বিধান যে—কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য হইবে না,

এইটিই উহার মূল, তাহার আর ভুল নাই; ইতিপূর্ব্বে তাহার প্রমাণ যথেষ্ট দেওয়া হইয়াছে।

এস্থলে এইটি যেন মনে থাকে যে, যদিও প্রজ্ঞার মূলতত্ত্ব-গুলিকে দেশকালে প্রয়োগ করিয়া দেখিলে সহজেই তাহার (প্রজ্ঞার) প্রামাণিকত্ব আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়, তথাপি প্রজ্ঞার প্রকৃত প্রমাণ যুক্তি হইতে পাওয়া যায় না—স্বতঃসিদ্ধতাই প্রজ্ঞার প্রকৃত প্রমাণ। দীপ-শিখা যেমন আপনাকে প্রকাশ করে, এবং তাহার কিরণ প্রবাহ যেমন অন্যকে প্রকাশ করে, প্রজ্ঞা সেইরূপ গোড়ায় আপনাকে প্রমাণ করে, এবং তাহার যুক্তিপ্রবাহ বিষয়ান্তর প্রমাণ করে। দীপের কিরণই দীপশিখাকে অপেক্ষা করে, যুক্তিই প্রজ্ঞাকে অপেক্ষা করে। প্রজ্ঞা প্রামাণিক বলিয়াই যুক্তি প্রামাণিক, ইহার উল্টা সম্ভবে না। বিশেষ একটি অভিব্যক্তি অথবা প্রত্যক্ষ ঘটনার উপরে প্রজ্ঞার প্রয়োগ যাহা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সেই-প্রজ্ঞার প্রয়োগ, যে-প্রজ্ঞার নিকট পৃথিবীও যা, সৌরজগৎও তাই, সৌরজগৎও যা, নাক্ষত্রিক জগৎও তাই, আতাফলও যা, দ্যুলোক ভূলোকও তাই। অতএব প্রজ্ঞা সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতম ব্যাপকতম এবং বলবত্তম প্রমাণ।

পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, আরোহ-প্রণালী অনুসরণ করিয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর তত্তোধিক সূক্ষ্মতর, এরূপ করিয়া চলিলে, যে জন্য চলা, তাহা সফল হয় না, ধ্রুব সত্যে পৌছান যায় না, সূক্ষ্মতমে পৌছান যায় না। আরোহ-প্রণালী যে-খানেই থামে সেইখানেই "এ নয় ইহা অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর" এই কথাটি স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পায়। মূলসত্য সম্বন্ধে আরোহ প্রণালী "ইহা নহে ইহা নহে" ইহাই ক্রমাগত বলিতে থাকে। ইহা যদি নহে তবে কি?—আরোহ প্রণালীর মুখে আর কথা নাই।

প্রজ্ঞা আপনার জ্যোতিতে আপনি প্রকাশ,—প্রজ্ঞা বলেন "আমিই সেই সূক্ষ্মতম সার্ব্বভৌমিক সার্ব্বকালিক মূলসত্য যাহা তুমি চাহিতেছ। আমা দ্বারাই সমস্তের সহিত প্রত্যেকের, পূর্ব্বের সহিত পশ্চাতের অনাদি নিয়মের সহিত অনন্ত ঘটনার যোগ রক্ষিত হইতেছে। আমিই সেই সূক্ষ্মতম যোগ-সূত্র যাহা আকাশের রোমে রোমে এবং কালের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে।" প্রজ্ঞা এক জনের আত্মাতে নহে, কিন্তু প্রতি জনের আত্মাতে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। আমরা প্রতিজনে যেমন একই সূর্য্য বাহিরে অবলোকন করি, সেইরূপ প্রতিজনে একই প্রজ্ঞা অন্তরে উপলব্ধি করি। চক্ষু যেমন কর্ণ হইতে ভিন্ন, এক জীবাত্মা তেমনি অন্য জীবাত্মা হইতে ভিন্ন। আবার, যে মন চক্ষুর অভ্যন্তরে থাকিয়া দেখিতেছে, সেই মনই কর্ণের অভ্যন্তরে থাকিয়া শুনিতেছে, এ যেমন, তেমনি যে প্রজ্ঞা এক জীবাত্মার অভ্যন্তরে থাকিয়া ধ্রুব সত্য প্রকাশ করিতেছে, সেই প্রজ্ঞা অন্য জীবাত্মার অভ্যন্তরে থাকিয়া ধ্রুব সত্য প্রকাশ করিতেছে। চক্ষেতে কর্ণেতে প্র-

ভেদ আছে কিন্তু চক্ষের ভিতরকার মনেতে (দ্রষ্টাতে) আর কর্ণের ভিতরকার মনেতে (শ্রোতাতে) কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। সেই রূপ আমাতে তোমাতে প্রভেদ আছে সত্য কিন্তু আমার ভিতরকার প্রজ্ঞাতে আর তোমার ভিতরকার প্রজ্ঞাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। চক্ষু ব্যবচ্ছেদে বা কর্ণ ব্যবচ্ছেদে যেমন মনের ব্যবচ্ছেদ হয় না, সেইরূপ শরীর ব্যবচ্ছেদে প্রজ্ঞার ব্যবচ্ছেদ হয় না; মনের অবস্থান্তরেও প্রজ্ঞার অবস্থান্তর হয় না। সকল ইন্দ্রিয়ই যেমন মন-হইতে চেতন পায়, সকল আত্মাই সেইরূপ প্রজ্ঞা হইতে জ্ঞান পাইতেছে। যুক্তি-কুশল পণ্ডিতগণ প্রজ্ঞাকে নানা বিষয়ে প্রয়োগ করিতে জানেন, অনভিজ্ঞ লোকে তাহা জানে না; তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ প্রজ্ঞাকে অস্থির মনো-বৃত্তি সকল হইতে বাছিয়া লইতে জানেন, অনভিজ্ঞ লোক তাহা জানে না, প্রজ্ঞাকে কেহ বা চিনিয়াছে কেহ বা চিনে নাই,—আছেন তিনি সর্ব্বত্র। প্রজ্ঞা সকল-প্রভেদ অগ্রাহ্য করিয়া, সকল বাধা অতিক্রম করিয়া, সকল ব্যবধান দূর করিয়া, সকল শূন্য পূর্ণ করিয়া সমান বলে সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান। আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে ঐ যে স্বপ্রকাশ জ্যোতিঃস্বরূপ প্রজ্ঞা, যাহাতে করিয়া সমুদায়ের সহিত প্রত্যেকের, কারণের সহিত কার্য্যের, অসীমের সহিত সসীমের যোগ রক্ষিত হইতেছে, তাহাতে-করিয়াই আমরা পরমাত্মাকে জানিতে পাই যে, তিনিই বিশুদ্ধ-জ্ঞান-স্বরূপ, তিনিই প্রজ্ঞান-ঘন, সমুদায়ের এবং প্রত্যেকের তিনিই অন্তরাত্মা তিনিই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা। এক্ষণে প্রজ্ঞামূলক যুক্তিকে সহায় করিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং প্রকরণ বিষয়ে যাহা আমাদের বলিবার আছে তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রথমে দেখিয়াছি যে, আপেক্ষিক সত্য মাত্রই অসীম নিরবলম্ব সত্যকে অপেক্ষা করে; তাহার পরে দেখিয়াছি যে, আত্মা হইতে জড়ের দিক্ অসীম সত্যের দিক্ নহে, জড় হইতে আত্মার দিক্‌ই অসীম সত্যের দিক্; এখন তদপেক্ষা আরও অধিক এই দেখিতেছি যে, আত্মা হইতে বিশুদ্ধ-জ্ঞানের দিক্ অসীম সত্যের দিক্। বিশুদ্ধ-জ্ঞান যাহা জীবাত্মাতে আছে, তাহা ব্যক্তি-নিষ্ঠ নহে, তাহা সত্য-নিষ্ঠ। ব্যক্তি-বিশেষ যখন অভ্যাসবশতঃ বা সংস্কার বশতঃ বা ভ্রমবশতঃ বা বাসনাবশতঃ কোন বিষয়কে সত্য বলিয়া জ্ঞান করে, তখনকার সেই যে জ্ঞান, তাহাই ব্যক্তিনিষ্ঠ; কিন্তু কোন বিশেষ ব্যক্তি নহে, পরন্তু সাধারণতঃ সকল ব্যক্তিই সমুদায় আত্মার সহিত যখন কোন বিষয়কে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া জ্ঞান করে, তখনকার সেই যে জ্ঞান তাহা ব্যক্তি-নিষ্ঠ নহে—তাহা সত্যনিষ্ঠ; কেননা তাহা ব্যক্তি-বিশেষের পরিবর্ত্তনশীল মনের গতির উপর নির্ভর করে না, তাহা অপরিবর্ত্তনীয় ধ্রুব সত্যের উপরেই নির্ভর করে। মূল-সত্য পরমাত্মাই প্রজ্ঞারূপে প্রতিজনের আত্মার অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন। আমাদের আত্মা মন-দ্বারা বিষয়ের সহিত

এবং প্রজ্ঞা-দ্বারা পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত রহিয়াছে। পরমাত্মা জীবাত্মাকে দেহবদ্ধ করিয়া পরিমিত করিয়াছেন, এবং আপনার প্রতি আকর্ষণ করিয়া উন্নত হইতে উন্নততর ধামে লইয়া যাইতেছেন; ইহাতেই আমরা বুঝিতেছি যে, জীবাত্মার মঙ্গলই সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য।

পরমাত্মার কিছুই অভাব নাই তিনি পরিপূর্ণ আনন্দ-স্বরূপ; অতএব ইহা হইতে পারে না যে, তিনি আপনার কোন অভাব মোচনার্থে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; ইহাই সঙ্গত যে আমারদের-সকলকার অভাব মোচনার্থেই তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে, জীবাত্মা, পরমাত্মার শক্তিতে তমোগীভূত ছিল, তখন জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না; স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অভাব এই যে তাহার ছিল, তাহা মোচন করা জগৎ সৃষ্টির একতম উদ্দেশ্য। পরমাত্মা যদি জীবাত্মার সকল অভাব এক মুহূর্ত্তেই পূরণ করেন, তিনি যদি তাহাকে এককালেই পূর্ণতা প্রদান করেন, তবে তাঁহাতে আর জীবাত্মাতে কিছুই আর প্রভেদ থাকে না; তাহা হইলে পরমাত্মা আপনিই প্রকাশ পান, তাঁহা হইতে ভিন্ন কিছুই আর প্রকাশ পায় না, জীবাত্মা আর প্রকাশ পায় না; তাহা হইলে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অভাব জীবাত্মার যেমন ছিল, তেমনিই থাকে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, জীবাত্মাকে পরিমিত করিয়া সৃষ্টি না করিলে, তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোন মতেই রক্ষা পাইতে পারে না। অতএব, পরমাত্মা, জীবাত্মাকে পরিমিত করিবার জন্যই যে পরিমিত করিয়াছেন তাহা নহে, জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সমর্থন করিবার জন্যই তাহাকে পরিমিত করিয়াছেন। পরমাত্মা এক দিকে জীবাত্মাকে পরিমিত করিয়া, স্বতন্ত্র অস্তিত্বের যে একটি অভাব তাহার ছিল, তাহা পূরণ করিয়াছেন; আর একদিকে তাহাকে অনন্ত উন্নতির যোগ্যতা প্রদান করিয়া অপূর্ণতা-নিবন্ধন তাহার যে একটি অভাব আছে, তাহাও পূরণ করিয়াছেন। জীবাত্মার অভাব পূরণ যতদূর করিতে হয়, পরমাত্মা তাহা করিয়াছেন। জগৎ সৃষ্টির একতম উদ্দেশ্য জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সমর্থন করা, অন্যতম উদ্দেশ্য জীবাত্মার অনন্ত উন্নতি সমর্থন করা। অতএব সংশয়ান্ধ ব্যক্তিগণের যাহাতে চক্ষু ফুটিবে তাহার মন্ত্র এই।—

"জীবাত্মন্, পরিমিত না হইলে তুমি হইতেই পারিতে না; অতএব হওয়া যদি মঙ্গল হয়, তবে সে মঙ্গলের জন্য পরমাত্মাকে ধন্যবাদ দেও। আর যদি পরিমিত-ভাবকে অমঙ্গল ভাবো, এবং অসীম-ভাবকে মঙ্গল ভাবো, তবে যিনি অসীম-উন্নতি-পথের দ্বার তোমার জন্য খুলিয়া রাখিয়াছেন, যিনি আপনার অসীম ভাবের আকর্ষণ দ্বারা তোমার পরিমিত ভাবের দোষ যত দূর খণ্ডন করিতে হয় তাহা করিয়াছেন, তাঁহাকে ধন্যবাদ দেও।" দেখ সৃষ্টির উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, শুদ্ধ কেবল জীবাত্মার মঙ্গল।

ভারতবর্ষীয় ইংরাজ।

* সংখ্যক পত্রিকার ২২৩ পৃষ্ঠার পর।

ইংরাজ ভক্ত গোবিন্দরাও বলিলেন:—"বিদেশীয় রাজা বলিয়া যাই বল, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরাজদের আগমনে আমাদের দেশ সুপ্তাবস্থা হইতে উত্থিত হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ব্রিটিষ ভারতবর্ষ ও দেশীয় রাজ্য এ উভয়ের অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখিলে তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। দেশীয় রাজ্যে রাজকার্য্যের কিরূপ বিশৃঙ্খলা, রাজার কিরূপ অত্যাচার, প্রজাগণের কি দুর্দ্দশা! ইংরাজরাজ্য কি তাহা অপেক্ষা শতগুণে উৎকৃষ্ট নহে? আমরা যদি আপনাদের রাজ্য আপনারা চালাইতে পারিতাম, তাহা হইলে ত কোন কথাই নাই। কিন্তু আমাদের মধ্যে ঐক্য কোথায়? জাতীয় বন্ধন কোথায়? আমরা আত্ম-সংরক্ষণে অক্ষম বলিয়াই ত ইংরাজেরা এ দেশ জয় করিয়াছে, নতুবা তাহাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইত না। আমাদের স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের ক্ষমতা নাই বলিয়াই বিদেশীয় রাজার শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। তোমার ভাবের ভাবুকগণ বিদেশীয় রাজ্যের প্রতি দোষারোপে তৎপর, কিন্তু তাহার বিনিময়ে কি পাইবে? স্বাধীন রাজ্য? জাতীয় গৌরব? না অরাজকতা, অন্যায় অত্যাচার, পরস্পর বিদ্বেষ, পরস্পর বিবাদ বিচ্ছেদ; ব্রিটিষ তরবারি এই সকল হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে—সুতরাং বিদেশীয় রাজ্য-রক্ষা-নিবন্ধন যে অধিক অর্থ ব্যয় ও আর আর কতক বিষয়ে ক্ষতি তাহা অবশ্য আমাদের দায়ে পড়িয়া স্বীকার করিতে হইতেছে। আমাদের সঙ্গে ইংরাজদের ভাবে মেলে না,—আমাদের পরস্পর মমতা নাই, কি করা যায়, তাহার কোন উপায়ান্তর নাই। যত দূর পারা যায় মন্দের মধ্য হইতে ভালটুকু বাছিয়া লইতে হইবে। যে পাশ্চাত্য জ্ঞানসূর্য্য উদয় হইয়াছে, তাহার আলোক যথাসাধ্য বিকীর্ণ কর। পাশ্চাত্য সভ্যতা হইতে যে স্বাধীনতার ভাব যে উন্নতির ভাব লাভ করা যায়, তাহা শিক্ষা করিয়া স্বজাতির উৎকর্ষ সাধনে নিয়োগ কর। সভ্য জাতিকে সভ্যতার অস্ত্রে বশ করিয়া যতদূর সাধ্য দেশের কল্যাণ সাধন কর। গতানুশোচনায় কি ফল? যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহার প্রতিরোধের চেষ্টা বৃথা। বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী শিক্ষা লাভ করিয়া দেশহিতকর কার্য্যে ব্রতী হও। স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করায় লাভ কি? ভারতের ভাগ্য নিন্দা করিয়া বৃথা আক্ষেপের প্রয়োজন কি?"

দেশানুরাগী দাদাজি ক্ষণ কাল স্তব্ধ থাকিয়া অধীর স্বরে উত্তর করিলেন—"আমাদের আর আছে কি? যাহা ছিল সকলই গিয়াছে। এক সময় ভারত স্বাধীন ছিল ও স্বতেজে পৃথিবীকে আলো-

কিত করিয়াছিল,—এখন সে পরাধীন। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সকলি গিয়াছে। তাহার সন্তানগণের আক্ষেপ ভিন্ন আর কি গতি? সে পথটুকুও কি বন্ধ করিতে চাও? বালকের বল ক্রন্দন—আমাদেরও তাই। আমরা ত নিরস্ত্র "নিঃসত্ত্ব-পরাণ" হইয়াছি। তুমি চাও যে, আমরা আপনাদের অবস্থা ভুলিয়া থাকি, কিন্তু তাহা পারি কৈ? তুমি বলিতেছ আমাদের জাতীয় বন্ধন নাই, জাতীয় ঐক্য নাই, সেটি কিসে হয় তাহা দেখিতে হইবে। ধনাঢ্য ব্যক্তির মোসাহেব হইয়া থাকিলে খাওয়া পরার কোন ভাবনা থাকে না সত্য বটে, কিন্তু সেই কি সুখের অবস্থা? স্বাধীন ভাবে শাকান্ন আহার করিয়া দিনপাত করা ভাল, পরাধীন হইয়া রাজপ্রসাদ উপভোগ করাও কষ্টকর, এ কি তুমি অস্বীকার করিতে পার? আমাদের দেশের যদি প্রকৃত স্থায়ী উন্নতি সাধন করিতে চাও, ত তাহা আমাদের স্বতেজে, নিজ বলে, আপনাদের মধ্য হইতেই করিতে হইবে। পরের উপর নির্ভর করিয়া তাহা সাধিত হইবে না। বিদেশীয় রাজা যতই প্রজাবৎসল হউন না কেন, সে রাজ্যের এক প্রধান দোষ এই যে, তাহাতে বাস করিয়া আমাদের আত্মনির্ভর, স্বাধীনতা, স্বাবলম্বন ক্রমেই শিথিল হইতে থাকে, জাতীয় ভাব ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া যায়। পরের অনুগ্রহের উপর সকল নির্ভর, আমরা আপনার জন্য কিছুই করিতে পারি না। গবর্ণমেণ্ট যাহা করিয়া দিবেন, তাহাতেই আমাদের নিস্তার। যদি দেশের কোন অমঙ্গল নিবারণ করিতে চাহি, কোন সামাজিক উৎকর্ষসাধন করিতে ইচ্ছা করি, তাহার জন্য গবর্ণমেণ্টের দ্বারে গিয়া বলি—ভিক্ষাং দেহি। ইহা অপেক্ষা কোন জাতির অধিক হীনাবস্থা আর কি হইতে পারে? ইংরাজদের রাজত্ব এত কাল রহিয়াছে, তাহার বিষ-ফল আমরা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি। আমরা সভ্যতার নামমাত্র গ্রহণ করিয়া বাহ্য আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তনের প্রতিই উন্মুখ রহিয়াছি। আহার পান বিষয়ে যথেচ্ছাচারই আমাদের সভ্যতার পরাকাষ্ঠা। পশ্চিমবাসীদের সহিত সংশ্রব হইয়া আমরা তাহাদের কতকগুলি বাহ্য আড়ম্বরেই মুগ্ধ থাকি। তাহাদের বাহ্য সভ্যতাই আমাদের দেহ মনকে আকর্ষণ করিতেছে। এক সভ্য জাতি অন্য এক দুর্ব্বল জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিলে যে সকল অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, আমাদের দেশে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এই আকর্ষণ-বলে এ দেশের যে সকল আধ্যাত্মিক উন্নত ভাব, তৎসমুদায় ক্রমে অস্তমিত হইতেছে। আমাদের জাতীয়তা ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে। পরাধীনতা-অন্ধকারে আমরা এরূপ আবৃত রহিয়াছি যে, কি ভাল কি মন্দ তাহা আমরা ইংরাজের চক্ষু দিয়াই দর্শন করি। আমরা মান মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরাজদের উপরেই তাকাইয়া থাকি। আমাদের দেশের কি উপযোগী ও প্রকৃত কল্যাণকর সে বিষয়ে আমরা বাস্তবিক অন্ধ। ইহা

অপেক্ষা অধিক দুরবস্থা আর কি হইতে পারে? বিদেশীয় রাজার স্বার্থ এই যে, প্রজাগণ নিঃসত্ত্ব ও দুর্ব্বল হইয়া তাহার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে শিখুক, প্রজারাও যদি সেই দিকেই ধাবিত হয়, তাহারা যদি সেই স্রোতের প্রতিকূলে সন্তরণ করিতে না চায়, তবে তাহাদের উদ্ধারের আর উপায় নাই। ইংরাজদের নিকট হইতে আমরা যে সকল উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার জন্য কৃতজ্ঞ হও, আমি 'না' বলিব না, কিন্তু ভাই, তাই বলিয়া তোমরা স্বজাতির প্রকৃত অবস্থা বিস্মৃত হইও না। রোগী যদি রোগের যাতনা অনুভব করিতে না পারিয়া আপনাকে সুস্থ মনে করিয়া কার্য্য করে, ত নিশ্চয় জেনো তাহার আসন্ন কাল উপস্থিত। জাতির পক্ষেও এই নিয়ম। তুমি ভাই যাই বল, আমি ত কখনই মনে করিতে পারি না যে, ইংরাজ-রাজ্যে আমাদের সুখের পরাকাষ্ঠা। রোগের উপর আবার বিস্ফোটক, একে পর-রাজ্য, তাহাতে আবার ইংরাজদের উদ্ধত স্বভাব, তাহাদের ও আমাদের মধ্যে ভাবের অমিল। তাহাদের জাতীয় স্বার্থপরতা, অনুদারতা, অহঙ্কার দেখিয়া আমাদের বিদ্বেষানল সততই প্রজ্বলিত থাকে। ইহা যেন মনে থাকে যে, আমাদের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে রাজার স্বার্থ এবং প্রজার স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী। সুতরাং রাজ-ভক্তির মূলেই কুঠারাঘাত। দেশীয় বাণিজ্য ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইলে মাঞ্চেস্টর হইতে হাহাকার উঠে। আমাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা প্রচার হইলে রাজপুরুষদের ভয় হয় পাছে আমরা তাহাদের সমকক্ষ হইতে সাহসী হই, পাছে তাঁহাদের অধিকৃত উচ্চ কর্ম্মস্থানগুলি অধিকার করিয়া লই। ইংরাজ-রাজা হইতে আমাদের ইষ্টানিষ্টের তুলনা করিলে বেশীর ভাগ কি দাঁড়ায়, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। এই সম্বন্ধে মহাত্মা সর টমস্ মন্‌রোর নিম্ন-লিখিত হৃদয়-ভেদী কথাগুলি আমাদের প্রণিধান যোগ্যঃ—

ব্রিটিষ্ রাজ্য হইতে এদেশীয় লোকদিগের লাভালাভ তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, লাভের ভাগ যত অধিক হওয়া উচিত তাহা হয় নাই। বাহিরের যুদ্ধ বিগ্রহ অথবা আভ্যন্তরীণ বিপ্লবাদি হইতে তাহারা সুরক্ষিত সন্দেহ নাই, তাহাদের ধন প্রাণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংরক্ষিত, কর্ত্তৃপুরুষদের দ্বারা তাহাদের বিনাপরাধে দণ্ড অথবা অর্থাপহরণের সম্ভাবনা নাই, আর তাহাদের করভারও অপেক্ষাকৃত লঘু। কিন্তু আর একদিকে দেখ, তাহাদের জন্য যে সকল আইন হইতেছে, তাহার রচনাতে তাহাদের কোন হস্ত নাই ও কনিষ্ঠ পদের কর্ম্মচারীদের যতদূর সম্ভবে তদ্ভিন্ন সেই সকল আইন জারী করিবারও তাহাদের অধিকার নাই। সিবিল অথবা সৈনিক বিভাগের উচ্চ পদবীতে আরোহণে তাহারা অসমর্থ। যাহারা দেশের প্রাচীন কর্ত্তা ও নেতা, তাহারা হীন পরাধীন জাতিরূপে, দাস ও অনুচররূপে সর্ব্বত্র পরিগণিত।

দেশীয়দিগকে ন্যায়াবহ রাজনিয়ম ও

শস্য করের সুফল প্রদানেই যথেষ্ট হইল তাহা নহে। তাহাদের জাতীয় স্বভাব উন্নত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু বিদেশীয় রাজার রাজ্যে তাহাদের অবনতির এত রাশি রাশি কারণ রহিয়াছে যে, অধঃপতন হইতে তাহাদিগকে তুলিয়া রাখা দুষ্কর। এক প্রাচীন উক্তি আছে, "He who loses liberty loses half his virtue" যে ব্যক্তি স্বাধীনতা হারাইয়াছে সে অর্দ্ধেক ধর্ম্ম হারাইয়াছে, ইহা যেমন প্রতিজনের পক্ষে তেমনি জাতির পক্ষেও খাটে। যে ব্যক্তির কিছুই সম্পত্তি নাই,সে যেমন কৃপা-পাত্র,যে জাতির সমুদয় সম্পত্তি পররাজ্যের অধীন, সে তদপেক্ষা ন্যূন নহে! ক্রীত-দাস যেমন স্বাধীন জীবের অধিকার হইতে বিচ্যুত, পরাজিত জাতি সেইরূপ জাতীয় অধিকার হইতে। সে অধিকার কি, না আপনাদের জন্য করস্থাপন, আপনাদের জন্য আইন-বন্ধন, স্বরাজ্যের রাজকার্য্য পরিচালন; 'ব্রিটিষ ভারতবর্ষ এই সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত। পররাজ্য সুখময় হইলেও স্বজাতীয় রাজার একাধিপত্য ততো-ধিক প্রার্থনীয়। যদি অধীনতাই স্বীকার করিতে হয়, ত বিদেশী অপেক্ষা দেশীয় রাজার আধিপত্য স্বীকার করা বিজিত জাতির অধিক গৌরবের বিষয়। রাজ্য প্রজাতন্ত্রই হউক আর সাম্রাজ্যই হউক, তাহাদের বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহার প্রজাগণ সর্ব্বদাই তৎপর থাকে। এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে গিয়া জাতীয় ভাব উত্তেজিত হয়, এবং এইরূপ সঙ্কট-স্থলে প্রজাগণ ঐ উভয়-বিধ রাজ্য রক্ষাতেই প্রাণপণে যত্নশীল হয়। বিদেশীয় রাজার অধীনতা স্বীকার করিলে যেমন জাতীয় ভাবের ও জাতীয় গৌরবের নাশ হয়, দেশীয় রাজার যদৃচ্ছ শাসনে তেমন হয় না। যখন জাতীয় ভাব বিনষ্ট হইল, তখন সমাজগত ব্যক্তিগত জীবনে যাহা কিছু মহৎ যাহা কিছু প্রশংসনীয়, সকলই সমূলে শুষ্ক হয়, এবং জাতীয় ভাবের অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বভাবেরও অধঃপাত হয়।"

আমার বন্ধুদ্বয় শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে যে-রূপ তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন,তদ্বিষয়ে আমি আর অধিক কিছু বলিব না। ভারতবর্ষীয় ইংরাজদের আচার ব্যবহার সমালোচনা করিতে মনস্থ করিয়াছি, এক্ষণে তাহাতেই প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

আংলো ইণ্ডিয়ানের প্রকৃত ভাব যদি দেখিতে চাও, ত মফস্বলের কোন এক নামাঙ্কিত নগরে তাহাদিগকে দর্শন কর। সেখানে হয় ত একদিকে ইউরোপীয় অথবা দেশীয় দুই এক সেনাদল প্রতিষ্ঠিত ও তৎসম্বন্ধে কয়েকজন সৈনিক পুরুষ অব-স্থিত আছে, অপর দিকে জজ কালেক্টর প্রভৃতি সিবিলিয়ান দল রাজত্ব করিতেছেন, একদিকে লালকোট, অন্যদিকে কালকোট। সেনাদলের মধ্যে লেফ্‌টেনণ্ট, কাপ্তেন, মেজর, লেফ্‌টেনণ্ট কর্ণেল, কর্ণেল ও সর্ব্বোচ্চ-শিখরে সৈন্যাধ্যক্ষ জেনেরল সাহেব বিরাজিত। তাঁহাদের মধ্যে অনে-কেই অবিবাহিত, অল্পসংখ্যক বাক্তি

সস্ত্রীক হইয়া রাজ্য ভোগ করেন। মিলিটরিদিগের মধ্যে সকলে নিজ নিজ বাটীতে আহারাদি করেন না। "মেস্" নামক তাঁহাদের সাধারণ ভোজনালয় প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইবে। যেখানে সৈনিক দলের আবাস, সেখানে এক কিম্বা একাধিক মেস্ প্রতিষ্ঠিত। যাঁহারা বিবাহিত তাঁহারা প্রায় নিজ নিজ বাটীতে আহারাদি করেন, তদ্ভিন্ন আর আর সকলে প্রায় প্রতিদিন মেসেই আহারাদি করিয়া থাকেন। ইহা সাধারণের মিলিবার স্থান। মধ্যে মধ্যে বাহিরের লোকদের নিমন্ত্রণ হয়। সেই নিমন্ত্রণ-রাত্রে অপেক্ষাকৃত অধিক সমারোহে ভোজাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়। মেস যেমন মিলিটারিদের জন্য, ক্লব তেমনি সর্ব্ব সাধারণ ইংরাজের জন্য প্রতিষ্ঠিত। কলিকাতা মাদ্রাজ বোম্বাই পুণা প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে ইংরাজদিগের সাধারণ-সম্মিলন স্থান এক একটি ক্লব দৃষ্ট হয়। মিলিটরি, সিবিলিয়ন ও ইংরাজদের মধ্যে আর আর বাছাগোছা লোক তাহার অঙ্গীভূত। এই সকল ক্লবে "নেটিব"দের প্রবেশের অধিকার নাই। ইংলণ্ডে গিয়া তুমি হয়ত বিক্‌টোরিয়া সাম্রাজ্ঞীর সহিত একাসনে বসিয়া আহার করিয়া আসিবে, কিন্তু এখানকার এক সামান্য ক্লবে তোমার প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ। এই সকল ক্লবে বাসের নিয়ম, গৃহ সজ্জা, আহারাদির পারিপাট্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, ভৃত্যদের কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া শতমুখে প্রশংসা করিতে হয়। আমরা বিলাতে যে এই সকল চাকচিক্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই তাহা আশ্চর্য্য নহে। এ দেশে আমাদের চক্ষে এ সকল সচরাচর পতিত হয় না বলিয়া আমরা এক প্রকার সুস্থির থাকি, ইংলণ্ডে গিয়া ইংরাজ-মহলে প্রবেশ করিয়া আমাদের মস্তক এরূপ ঘূর্ণিত হইয়া যায় যে, আপনারা আপনাকে স্থির রাখিতে পারি না। স্বদেশের প্রতি মমতা চলিয়া যায়, দেশীয়দিগের উপর অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া ঘৃণা জন্মে। যাহা ইংরাজী তাহাই সেব্য, যাহা দেশীয় তাহাই ত্যজ্য। হায়! ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের চক্ষু ফুটে, আমরা দেখিতে পাই যে, এ জাদুর রাজ্য আমাদের নহে, আমরা যে ইংরাজের পদধূলি লইতে যাই, তাহাদের পদাঘাত পাইয়া আমাদের অবশেষে চেতনা হয়।

এখানকার অধিকাংশ ইংরাজেরা কাজ কর্ম্মে সমস্ত দিবস ব্যস্ত থাকে। তাহাদের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয়ের বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে। যখন কোন ব্যক্তি কোন এক নূতন ষ্টেসনে বাস করিতে আসেন, তাঁহার উচিত যে, তিনি প্রথমে বাসন্দাদিগের বাটীতে গিয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বিশেষতঃ বিবাহিত লোকদের বাটী গিয়া মহিলাগণের সহিত পরিচিত হওয়া তাঁহার প্রধান কার্য্য। তিনি নিজে যদি অবিবাহিত হন, ত কোন ভদ্রস্ত্রী তাঁহার বাড়ী আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। তিনি যদি কোন পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করেন, ত তাঁহার নিকট হইতে প্রতিসাক্ষাৎকার প্রত্যাশা করেন,

যদি কোন পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তবে হয় পুরুষের নিকট হইতে প্রতিসাক্ষাৎকার, নয় গৃহিণীর নিকট হইতে ভোজনের নিমন্ত্রণ লাভ করেন। যদি বিবাহিত পুরুষ কোন এক ষ্টেসনে আসিয়া বাস করেন, ষ্টেসনবাসীদিগের কর্ত্তব্য যে, তাঁহার স্ত্রীর সহিত প্রথমে গিয়া সাক্ষাৎ করেন। এ নিয়মের ত্রুটি হইলে ইহাঁদের সহিত আলাপ পরিচয়ের সম্ভাবনা নাই। দস্তুরের বাহিরে ইংরাজেরা এক পা চলেন না। যদি কোন সাহেবকে জিজ্ঞাসা কর, অমুক লোকের সহিত আপনার পরিচয় আছে? হয় ত তাহার উত্তর করিবেন, সেত আমার স্ত্রীর সঙ্গে এখনো দেখা করিতে আসে নাই! এই সকল নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ করিবার সময় আপনার নামের এক কিম্বা একাধিক কার্ড্ পাঠাইয়া দিতে হয়। মেম সাহেবের যদি দেখা করিবার ইচ্ছা না থাকে ত বলিয়া পাঠান, মেম সাহেব ঘরে নাই। তোমার যদি কাহারো সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা না থাকে, অথচ নিয়ম রক্ষা করা চাই, ত গৃহস্বামী অথবা গৃহিণী ঘরে না থাকেন এমন সময় বুঝিয়া যাইতে হয়, ও তোমার নামের কার্ড্ রাখিয়া আইলেই যথেষ্ট। এই সকল সাক্ষাৎকার সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা সহজ নহে। কত প্রকার সাক্ষাৎকার ও তৎসম্বন্ধীয় বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে বলা যায় না। আগন্তুকের প্রথম সাক্ষাৎকার, ভোজন-নিমন্ত্রণ-বিনিময় সাক্ষাৎকার, বন্ধুতার সাক্ষাৎকার, শোক-সংজ্ঞাপক সাক্ষাৎকার, অভিনন্দন-সাক্ষাৎকার ইত্যাদি। কোন কোন সময় তুমি নিজে না গিয়া তোমার নামের কার্ড পাঠাইয়া দিলেও সাক্ষাৎকার সমাধা হইতে পারে। সাহেবেরা এইরূপে ভৃত্য-হস্তে কার্ড্ পাঠাইয়া কখন কখন দেশীয়দের সাক্ষাৎকারের প্রতিদান করিয়া থাকেন।

আহারের নিমন্ত্রণে ইংরাজদিগের সামাজিকতার বিশেষ পরিচয়। ভাল খাওয়া ও খাওয়ান ইংরাজ-জীবনের মধ্য বিন্দু। তাঁহাদের আমোদ প্রমোদ, দেখা সাক্ষাৎ, হাস্য পরিহাস, আলাপ পরিচয়ের স্থান ভোজনালয়। আমাদের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে আহার পানের নিয়ম নাই, তাঁহাদের মধ্যেও সেইরূপ; তবে জাতিভেদের নিয়মমাত্র ভিন্ন। জাতি-ভেদ-প্রথা যে, তাঁহাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল, তাহা তাঁহাদের পরস্পর পান ভোজনের নিয়মে বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। সামাজিক মান মর্য্যাদায় সমান সমান ভিন্ন তাঁহারা একত্রে পান আহার করেন না। আমাদের মধ্যে অনেকে ইংরাজী খানাপিনা আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু এমন মনে করিবেন না যে, আপনাদের সঙ্গে ইংরাজেরা একাসনে বসিয়া আহার করিতে সহজে সম্মত হইবেন। এমন কি, অনেক বড় হোটেলে দেশীয়দের প্রবেশের অধিকার নাই। আমার একজন পারসী বন্ধু বলিলেন যে, তিনি আপনার কয়েকটী বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া অমুক হোটেলে আহারের আয়োজন করিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া দেখেন যে, তাঁহাদের জন্য নির্ম্মিত

বিশ্রী গুদামের মত এক কোণের ঘরে আহার প্রস্তুত। তিনি হোটেল-কর্ত্তাকে ডাকাইয়া সাধারণ ভোজনালয়ে তাঁহাদের স্থান দিতে অনুরোধ করিলেও তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল না। অবশেষে তিনি প্রস্তুত খাদ্য সামগ্রী ফেলিয়া বুভুক্ষিত বন্ধুবান্ধবসহ অন্যত্র চলিয়া যান। সে যা হোক্ এখন ইংরাজদের ভোজনালয়ে প্রবেশ করা যাক্। ভোজনের নিমন্ত্রণে স্ত্রীপুরুষ বেশভূষা করিয়া একত্রিত হন। মিলিটরিদের মধ্যে কাহারো লাল, কাহারো অন্যরূপ জরির কাপড়, সিবিলিয়ানদের লাঙ্গুলবিশিষ্ট কাল বনাতের কোট, বিবিদের নানা প্রকার চিত্র বিচিত্র সাজ। ১৩ জন এক টেবিলে একত্র হওয়া অলক্ষণ বলিয়া ইংরাজদের এক সংস্কার আছে, তদ্ভিন্ন ঘর ও টেবিলের পরিমাণ বুঝিয়া নিমন্ত্রিতের সংখ্যা নিরূপিত হয়। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইলে ভৃত্য আসিয়া বলে খানা প্রস্তুত। পরক্ষণেই এক একজন সাহেব এক একজন বিবির হাতে হাত দিয়া খানার টেবিলে লইয়া আপনার পার্শ্ববর্ত্তী আসনে উপবেশন করাইয়া নিজে উপবিষ্ট হন। বসিবার সময় স্বামী স্ত্রী পাশাপাশী বসিতে না পারেন এই নিয়মটি রক্ষা করিয়া বসিতে হয়। কোন্ সাহেব কোন্ বিবিকে টেবিলে লইয়া যাইবেন তাহার নিয়ম আছে। অভ্যাগতের মধ্যে যিনি সকল অপেক্ষা বড় বিবি, তাঁহাকে গৃহস্বামী লইয়া যান—আর যিনি সকল অপেক্ষা বড় সাহেব তিনি গৃহিণীকে লইয়া যান। এইরূপে স্ত্রীপুরুষের মানমর্য্যাদা অনুসারে এক এক জন বিবি এক একজন সাহেবের হস্তে সমর্পিত হন। স্ত্রীলোকের মান তাঁহার স্বামীর পদের উপর অনেকটা নির্ভর। এইরূপ মর্য্যাদা রক্ষার ত্রুটি হইলে মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়, আর স্ত্রীপুরুষের যথাযোগ্য বিলি বন্দেজের ব্যতিক্রম না হয় তাহার প্রতি কর্ত্তা ও গৃহিণীর বিশেষ দৃষ্টি থাকে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে যথা স্থানে উপবেশন করাইতে একটু বিবেচনা আবশ্যক। যদি অভ্যাগতের মধ্যে কোন এক বিদ্বান্ কি সম্ভ্রান্ত উপস্থিত থাকেন, তবে যেখানে বসিয়া তিনি সকলের সঙ্গে কথা কহিতে ও আলাপ করিতে পারেন, এমন মধ্যস্থানে তাঁহাকে উপবেশন করাইতে হয়। দুইজন সমব্যবসায়ীকে পাশাপাশি বসান যুক্তিসঙ্গত নহে, কেননা তাঁহারা হয়ত আপনার কাজ-কর্ম্ম-সংক্রান্ত কথোপকথন করিয়াই কালহরণ করিবেন, তাহাতে অন্য কাহারো মনোরঞ্জন হইবার সম্ভাবনা নাই। আহারের সময় কিরূপে কাঁটা চামচা ধরিয়া আহার করিতে হয়, পরিবেশনের নিয়ম কি, কোন্ সময় কোন্ জিনিস খাইতে হয়, কোন্ সামগ্রীর সহিত কোন্ মদ্য পান করা বিধেয়, কিরূপ শব্দ পরিহার্য্য, কিরূপ ব্যবহার ভদ্র ও অভদ্র বলিয়া পরিগণিত এ সকল বিষয় বলিতে গেলে প্রস্তাব বাহুল্য হইয়া পড়ে, সুতরাং এ সকল বিষয়ে প্রবেশ করিলাম না। আহারান্তে স্ত্রীগণ আহারের টেবিল হইতে উঠিয়া সমীপবর্ত্তী উপবেশন গৃহে

আসন গ্রহণ করেন। বিবিরা উঠিয়া গেলে সাহেবগণ অবসর পাইয়া মনের সাধে পান ও পরস্পর আলাপাদি করিতে পারেন। কিন্তু ইহা বলিতে হইবে যে, ভদ্র সমাজে পানাতিশয্য এক্ষণে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। বিবিদের টেবিল হইতে অগ্রে উঠিয়া যাইবার নিয়ম কেবল ইংরাজ জাতির মধ্যে প্রচলিত—অন্যান্য ইউরোপীয়দিগের মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত নাই। তাঁহারা স্ত্রীসহবাস হইতে বঞ্চিত হইয়া টেবিলে বসিয়া আমোদ প্রমোদ করা নিতান্ত অসভ্যতার কার্য্য জ্ঞান করেন। ওদিকে বিবিরা পুরুষদের সহবাস হইতে পরিচ্যুত হইয়া কিরূপে আলাপাদি করেন, তাহা জানিতে অনেকের কৌতূহল হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের সে সকল গুপ্তকথা কি প্রকারে প্রকাশিত হইবে? সে স্ত্রীসভাতে কত কাপড়, কত গয়নার কথা, কত বিবাহের পরামর্শ, কত লোকের চরিত্র সমালোচন, কত পরাধিকার-চর্চ্চা উত্থাপিত হয় কে বলিতে পারে? এই বিষয়ে এক গ্রন্থ রচিত হইলে কত না জানি পুরুষদের শিক্ষোপযোগী বিষয় তাহাতে উপলব্ধি করা যায়?

পরচ্ছিদ্রান্বেষণ ইংরাজদের এক জাতীয় ধর্ম্ম, তাহার দৃষ্টান্ত অন্বেষণ করিলে অনেক পাওয়া যাইতে পারে। বড় বড় ষ্টেসনে সন্ধ্যার সময় সকলের যে মিলিবার স্থান তাহার নাম Scandal point (নিন্দালয়)। দিবসের কাজ কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া আংলো ইণ্ডিয়ান স্ত্রীপুরুষ এই স্থানে সম্মিলিত হইয়া আলাপাদি করেন। সাহেবেরা কেহ অশ্বপৃষ্ঠে কেহ পদব্রজে গাড়ীতে উপবিষ্ট এক একজন বিবির সহিত মধুরালাপে মগ্ন। মধ্যে মধ্যে বাঁশী ও বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইতেছে। "ঈশ্বর! রাণীকে রক্ষা করুন" এই তান উঠিলে জানা গেল যে, গৃহে যাইবার সময় হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন পরস্পর মিলিবার স্থান ক্রীড়ালয়। ইংরাজদের অধিকাংশ ক্রীড়া ব্যায়াম-সমন্বিত, আর যাহার সঙ্গে শারীরিক পরিশ্রমের যোগ নাই, উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য সে সকল ক্রীড়াতে বাজী রাখা হয়। হয় শারীরিক পরিশ্রম, নয় মানসিক উত্তেজনা এ দুয়ের এক না থাকিলে ক্রীড়া মনস্থ হয় না। cricket (গুলিডাণ্ডা) প্রভৃতি প্রথমের দৃষ্টান্ত, ঘোড়-দৌড়, তাস দ্বিতীয়ের উদাহরণ। ইংরাজদের জাতীয় খেলার মধ্যে প্রধান ক্রিকেট। তাহাদের দৃষ্টান্তে এক্ষণে পারসীরা এই খেলায় এরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে যে, তাহাদের সঙ্গে খেলিয়া ইংরাজদেরও অধোবদন হইতে হয়, ও এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, এক দল পারসী ক্রীড়ক ইংলণ্ডে জনবুলের সঙ্গে বাজী রাখিয়া খেলিতে যাইবে। ক্রিকেট আমাদের গুলি ডাণ্ডারই প্রকারান্তর খেলা। ইহা হইতে কোমলতর আর এক প্রকার ক্রীড়ার নাম ক্রোকে; ইহার বিশেষ গুণ এই যে, বিবিরাও ইহাতে যোগ দিতে পারেন। কিন্তু শারীরিক পরিশ্রমের তত উপযোগী নয় বলিয়া ক্রমে ইহার গৌরব হ্রাস হইয়া আসিতেছে। ব্যাড্‌মিন্‌টন নামক খেলা এক্ষণে ক্রোকের স্থান অধিকার করিয়াছে। পক্ষযুক্ত

খেচর গুলি, ডাণ্ডা দ্বারা আকাশে বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রতিপক্ষের ডাণ্ডা দ্বারা তাহা আহত হয়—এইরূপে ঘাত প্রতিঘাতে গোলা এদিক্ ওদিক্ চলাচল করিতে থাকে; যে পক্ষের লোক ধরিতে না পারে তাহাদের হয় হাত উঠিয়া যায়, কিম্বা প্রতিপক্ষকে এক পয়েণ্ট দিতে হয়। এইরূপ এক এক সংখ্যা লাভ করিয়া যে দল নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় আগে পৌঁছিতে পারে তাহাদের জিত। ইহাতে হার জিত যে পক্ষেরই হউক শারীরিক পরিশ্রম উভয় দলেরই সমান। আর এক রকম খেলা আছে, তাহার নাম skating rink। শীতকালে যখন কোন জলাশয়ের জল জমিয়া কঠিন হয়—তখন সেই বরফের উপর দিয়া চলাচল করার নাম স্কেটিং। শীত-প্রধান দেশে ইহা এক মহা আমোদ, কিন্তু এই উষ্ণ দেশে জল তরল ভাব সহজে পরিত্যাগ করে না সুতরাং এখানে স্কেটিং কিরূপে সম্ভবে? এই সমস্যা ভেদ করিয়া এই সকল দেশের জন্য স্থলস্কেটিং নামে এক নূতন ক্রীড়ার সৃষ্টি হইয়াছে। এক খণ্ড ভূমি পরিষ্কৃত ও পদার্থ বিশেষের সংযোগে বরফতুল্য মসৃণ চিক্কণ করিয়া এক প্রকার চক্রবিশিষ্ট পাদুকা পরিয়া তাহার উপর দিয়া সহজে চলিতে ফিরিতে পারা যায়। ইহাতে শরীরের ভার রক্ষা করিয়া চলা অনেক অভ্যাসের কর্ম্ম। অনভ্যস্তদিগকে অনেক সময় ধরণীতে লুণ্ঠিত হইয়া ভগ্নদেহতরী হইতে দেখা যায়। যাঁহারা ইহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন তাঁহারা যখন সহজে ভাবে হেলিয়া দুলিয়া নানা প্রকার চিত্র কাটিতে কাটিতে চলিয়া ফিরিয়া বেড়ান, তখন মনে হয় যেন তাঁহারা আকাশ-পথে বিচরণ করিতেছেন, দুঃখ হয় মানুষের কেনই বা পক্ষ হইল না—হইলে কি আরামে উড়িয়া বেড়ান যাইত। এখন যেন ধরণীর সহিত যুদ্ধ করিয়া আমাদিগকে প্রতিপদ অগ্রসর হইতে হয়। এই সকল ক্রীড়াস্থলে নিয়মিত সময়ে বিবি সাহেব একত্রিত হন। এই সকল ব্যায়াম-চর্চ্চার দৃষ্টান্ত যদি আমরা ইংরাজদের নিকট হইতে গ্রহণ করি ত বিস্তর উপকার হয় সন্দেহ নাই। আমরা মনে করি যে, বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ। বাল্যকালই ক্রীড়ার কাল; যুবক ক্রীড়ায় যোগ দিতে সঙ্কুচিত হন। ইংরাজদের এভাব নাই। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই খেলা ধূলায় শারীরিক শ্রম সাধন ও মনের আয়াস নিবৃত্তি করেন। আমাদের এরূপ ক্রীড়া অতি বিরল। শীতকালে অর্দ্ধক্রোশ পদচালনা বাবুদের ব্যায়ামের এক শেষ। বাবু নামের সঙ্গে সঙ্গে গদিতে হেলান দিয়া পান তামাক, গল্পসল্প, আমোদ করা, এই ভাবই মনে উদয় হয়। ইংরাজদের মধ্যে ব্যায়াম শিক্ষা শিক্ষার এক প্রধান অঙ্গ। অশ্বারোহণ, অস্ত্র-চালনা, ঘুসিমারা, সাঁতার, নাচ, পদচারণা এই সকল না শিখিলে ইংরাজ-ভদ্র-সমাজের উপযোগী শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। ইংরাজেরা যেখানেই একত্রিত হউক না কেন, তাহাদের বহির্দ্বার-ক্রীড়ার বিশেষ উৎসাহ দৃষ্ট হয়। আঙ্গ্লোইণ্ডিয়ানদের ক্রীড়ালয়ের নাম জিমখানা। এই জিমখানার কার্য্য বৎসরের মধ্যে

একবার সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এ উৎসব সপ্তাহ খানিক চলে। ইহাই তাহাদের জাতীয় দুর্গোৎসব। এ সময়ে তাহাদের উৎসাহের আর সীমা থাকে না। বাহিরের নানা স্থান হইতে নিমন্ত্রিত লোক জনের সমাগম হয় ও অতিথিসৎকার খানাপিনার ধূম লাগিয়া যায়। এই উপলক্ষে ঘোড়দৌড়, ক্রিকেট, ব্যাড্‌মিন্‌টন, নৃত্য গীত-অভিনয়, নানা প্রকার ক্রীড়াকলাপের আনন্দধ্বনি উঠিতে থাকে। নৃত্যশালায় ইহাদের যে আমোদ তাহার বর্ণনা কি করিব। নাচগৃহ ইন্দ্র-ভবনের ন্যায় আলোকিত ও সজ্জিত হয়—বিবিরা উৎকৃষ্ট মনোহর বেশে স্বর্গের পরি ও অপ্সরার ন্যায় সাজিয়া আসেন ও নিজ নিজ সহচরের সহিত নৃত্য ও প্রেমালাপে মগ্ন থাকিয়া সমস্ত রজনী যাপন করেন। মধ্যে একবার পান ভোজনে সকলের শ্রান্তি দূর হইলে নবীন উৎসাহসহকারে নৃত্য আরম্ভ হয় ও উষার সঙ্গে সঙ্গে মজলিস ভঙ্গ হয়। বর্ষার সময় যখন ষ্টেষন পূর্ণ থাকে, তখন আঙ্গ্লোইণ্ডিয়ানদের মধ্যে এই সকল আমোদের স্রোত বহিতে থাকে—বর্ষান্তে সিবিলিয়ানদের দল বাহিরে চলিয়া গেলে ষ্টেষন পূর্ব্ববৎ শান্তভাব ধারণ করে।

শরীরের জন্য জিমখানা—মনের জন্য এক এক পুস্তকালয় ও প্রতি রবিবার ঈশ্বরারাধনার জন্য এক ভজনালয়। কার্য্যালয়, ভজনালয়, ভোজনালয়, পুস্তকালয় ও জিমখানা—এই পঞ্চতীর্থে আঙ্গ্লো ইণ্ডিয়ানগণ তাহাদের প্রবাস যাপন করে।

ইংরাজেরা শীতপ্রধান দেশের লোক, অথচ এত উষ্ণদেশে তাঁহাদের প্রবাস, কিন্তু ভারতে তাঁহাদের বাসোপযোগী স্থান নাই এমত নহে। এ দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে জলবায়ু বিভিন্ন; কোথাও বায়ু অতি উষ্ণ, কোথাও বা সুরম্য, সুশীতল, স্বাস্থ্যকর। বোম্বাই অঞ্চলে দেখ। নিম্ন বোম্বাই সহর সমুদ্রের ধারে, কোন সময়েই গ্রীষ্মের আতিশয্য হয় না। মালাবার হিল প্রভৃতি সাগর তটস্থ স্থানে অবস্থিতি করিলে গ্রীষ্ম কাহাকে বলে প্রায়ই জানা যায় না। যদি কোন ব্যক্তি শীতকালে বোম্বাই, বর্ষা ঋতুতে পুণা ও গ্রীষ্মকালে কোন পর্ব্বত প্রদেশে বাস করিতে পারেন তবে তাঁহাকে গরমীর উপদ্রব কখনই সহ্য করিতে হয় না। ইংরাজদের মধ্যে যাঁহাদের সঙ্গতি ও সুবিধা আছে তাঁহারা বোম্বাই অঞ্চলে এইরূপে সুখে জীবনক্ষেপ করেন। আরাম (comfort) কাহাকে বলে, তাহা যেমন ইংরাজে বুঝে, আমাদের লোকেরা তাহার কিছুই অবগত নহে। ভাল খাওয়া, ভাল পরা, ভাল থাকা, এর কৌশল শিখিবার যদি আবশ্যক হয়, ত তাহাদের নিকট হইতে শিক্ষা কর। মালাবার হিলে তাহাদের বিবিধ সামগ্রী-সজ্জিত রুচিলতায় শোভমান বায়ু-সঞ্চার-যোগ্য গৃহাবলী দর্শন করিলে কে না তাহাদের বাস-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিবে। আঙ্গ্লোইণ্ডিয়ানগণ এদেশে যে অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহার অধিক ভাগই তাহাদের নিজ নিজ আহার পান শরীর সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্পাদনেই ব্যয়

হয়। আমরা এরূপ করাকে অপব্যয় মনে করি। তাহারা আপনার শরীর পোষণে যে অর্থ ব্যয় করে, তাহাতে আমাদের কত দুঃস্থ পরিবারের ভরণ পোষণ হয়। অবসর পাইলে ইংরাজেরা পর্ব্বতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে ত্রুটি করেন না। আমাদের দেশের উৎকৃষ্ট পার্ব্বত্য প্রদেশ ইংরাজদের বাসগৃহে পরিপূর্ণ। অবকাশ পাইলে তাঁহারা তথায় গিয়া বিশ্রাম করেন। হিমালয়, নীলগিরি, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি পর্ব্বতশ্রেণী আংলো ইণ্ডিয়ানদের আমোদধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত দেখা যায়; তাঁহাদের অভাবে এ সকল স্থান হয় ত দুর্গম বিজন বন হইয়া থাকিত। বোম্বায়ের এইরূপ দুই প্রধান সুগম সুরম্য পর্ব্বত-প্রদেশের নাম—মাথেরান ও মহাবলেশ্বর। মহাবলেশ্বর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৪০০০ ফীট উচ্চ ও শোভা সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। মহাবলেশ্বর হইতে প্রতাপগড় নামক পাহাড় দৃষ্ট হয়, সেখানে মহারাষ্ট্রাধিপতি শিবজী নবাব অফজুল খাঁকে প্রতারণা পূর্ব্বক বাঘনখ দ্বারা হত্যা করিয়াছিলেন। শিবজীর সিংহগড় প্রভৃতি অন্যান্য দুর্গম দুর্গও এক্ষণে সুরম্য বাসস্থলে পরিণত হইয়াছে। এই সকল পর্ব্বতধাম ইংরাজদের প্রিয় আবাসস্থান। ইহাদের জল বায়ু ফল ফুল তাহাদের স্বদেশ স্মরণ করাইয়া দেয়। যে সকল সাহেব কার্য্যের অনুরোধে নিজে এ সকল স্থানে আসিতে না পারেন, তাঁহারা অন্তত তাঁহাদের স্ত্রীদিগকে পাঠাইয়া দেন। কেহ কেহ আপনার জন্য এক এক গৃহ কিনিয়া রাখেন। এই সকল স্থানে ইংরাজদের সমাগমে এ দেশের বিশেষ লাভ এই যে, তাঁহাদের প্রসাদে অনেক দেশীয় শ্রম-জীবীর অন্ন লাভ হয়। যে কয় মাস তাঁহারা পর্ব্বতে বাস করেন, সে কয় মাস মুটে, মজুর ও অন্যান্য শ্রমজীবি গরীব লোক যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করে ও সম্বৎসরের মত উপজীবিকা করিয়া লইয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে থাকে, সন্দেহ নাই।

কোন জাতির আচার ব্যবহারের বিষয় লিখিতে হইলে তাহাদের উদ্বাহ-প্রণালী সর্ব্বাগ্রে বর্ণন করা আবশ্যক। আংলো ইণ্ডিয়ানদের অধিকাংশই অবিবাহিত। এ দেশে অবিবাহিতা কন্যা আসিলে তাঁহাকে অধিক কাল অনূঢ়া থাকিতে হয় না। যে সকল স্ত্রীলোকের ভাগ্যে স্বদেশে বর না জোটে, তাঁহারা এদেশে বিবাহার্থে আগমন করেন, ও শীঘ্রই তাহাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। আংলো ইণ্ডিয়ানদের বিবাহক্রিয়া তাঁহাদের মূল সমাজের নিয়ম অনুসারে সম্পন্ন হয়, এ দেশে ভিন্ন আকার ধারণ করে নাই। ইংরাজদের মধ্যে পিতামাতা বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন না। তাঁহাদের বিবাহ সংঘটনে কোন ঘটক বা মধ্যস্থের আবশ্যক হয় না। স্ত্রীরত্ন উপার্জ্জন করিতে যুবকদিগের স্বচেষ্টা ও স্বাবলম্বন প্রয়োজন। যুবতীগণের রূপগুণই বিবাহের দৌত্য কার্য্য সম্পাদন করে। পিতা মাতার মতে বিবাহ, আর স্বয়ম্বরসম্ভূত বিবাহ ইহার মধ্যে কোন্ প্রথাটি জন-সমাজের অধিক হিতকর,

তাহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ চলিতে পারে। ইংরাজদিগের উদ্বাহ-ক্রিয়ার তিন অঙ্ক, প্রথম সাধনা, দ্বিতীয় প্রস্তাব ও সম্মতি, তৃতীয় বিবাহ। আপনি দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করিতে গেলে পুরুষের সাধ্য-সাধনার প্রয়োজন ইহা বলা বাহুল্য। যুবকের যদি কোন স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি জন্মে, ত তাঁহার অভিলষিত যুবতীর চিত্তদুর্গ ভেদ করা তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। কিসে তাঁহার মনোরঞ্জন ও প্রণয়-আকর্ষণ করিতে পারেন, কায়মনোবাক্যে তাহারই যত্ন করিতে থাকেন। এইরূপ সাধ্য সাধনার নাম 'কোর্ট্ শিপ্'। যদি যুবতী নিতান্ত চঞ্চলা, বিলাসিনী ও প্রতারণা-পরায়ণা না হন, ত তাঁহার প্রেমাসক্ত যুবক অবশ্যই বুঝিতে পারেন, তাঁহার সাধনা সিদ্ধ হইবার কতদূর সম্ভাবনা। পরে তিনি অবসর বুঝিয়া প্রিয়ার নিকট আত্মনিবেদন করেন। পুরুষের নিকট স্ত্রীলোকের স্বীয় মনের ভাব প্রকাশ করিবার রীতি নাই। বিবাহের প্রস্তাব করা পুরুষের কার্য্য। পুরুষ বরপ্রার্থী—নারী বরদায়িনী। বিবাহের প্রস্তাব করায় একটু কৌশল ও চাতুর্য্য চাই। পুরুষ যদি সদ্বক্তা হন, যদি মনের কথা ভাল করিয়া বলিতে পারেন তিনি যদি রূপবান হন, ও হাব ভাব রূপ লাবণ্যে জয়লাভের আশা থাকে, ত তিনি নিজে যুবতীর নিকট গিয়া মুখেই প্রস্তাব করেন। হয়ত বলেন—"সুন্দরি! তুমি কি আমার হইবে? তোমার সুখের ভার কি আমার হস্তে সমর্পণ করিবে? তোমা ভিন্ন আমি আর কাহাকেও জানি না, আমার সমুদয় সুখ সমুদয় আশা ভরসা তোমার এক কথার উপর নির্ভর করিতেছে। আমাকে নিরাশা করিও না। বল তুমি আমার।" প্রিয়ার লজ্জাবনত রক্তিম মুখমণ্ডলে অনুকূল উত্তর পাঠ করিয়া যুবক আকাশের চন্দ্র হস্তে পান, তাঁহার জীবন এক নূতন রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠে। কিন্তু সকল সময়ে আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, প্রেম-রাজ্যেও এই নিয়ম।

যুবক আপনার প্রণয় ব্যক্ত করিবার মানসে প্রত্যূষে প্রিয়ার দ্বারে উপস্থিত। সমস্ত রাত্রি ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁহার নিদ্রা হয় নাই। কল্পনায় কত কি চিত্র করিতেছেন, তিনি আশা ভয়ে আন্দোলিত হইয়া প্রেয়সীর সম্মুখে উপবিষ্ট হইলেন। কামিনীর কথার ধরণে বোধ হইল যেন তিনি কিছু বিরক্ত।—

যুবক। কেন ভাই তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ? কেন বল দেখি আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার কর্‌ছ?

স্ত্রী। না, আর কিছু নয়। তা সময় নেই অসময় নেই এই কি দেখা করিবার সময়? সকালের দিকটা একটু ঘুম এসেছিল, এমন সময় ডাক পড়িল, আমি তাড়াতাড়ি করে উঠে কাপড় পরে নীচে আস্‌ছি কাজে কাজেই চট্‌তে হয়।

যুবক। চটই আর যাই কর, আমার উপর ঔদাস্য করো না। সুন্দরি! আমি তোমার প্রেমের ভিখারী, তোমার একটুক

ভালবাসার উপর আমার সমুদয় সুখ নির্ভর করছে।

এই বলিয়া যুবক রমনীর হস্ত ধারণ করিতে গেলেন। যুবতী তাঁহার হস্ত প্রক্ষেপ করিয়া একটু দূরে গিয়া বসিলেন ও তাঁহার প্রতি উগ্রভাবে দৃষ্টি করত বলিলেন—আর যাই কর—ভালবাসার কথা বলে আমাকে বিরক্ত করো না।

যুবক চারি দিক অন্ধকার দেখিলেন—জগৎ সংসার তাঁহার নিকট শ্মশানতুল্য প্রতিভাত হইল।

তবে কি এই তোমার শেষ কথা—ইহার আর কোন অন্যথা হইবে না?

রমনী। যদি ভালবাসা বল তবে তাই। তোমার প্রতি আমার কোন বিরক্তি কি মন্দ ভাব নাই।

যুবক নিরাশ হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। স্বদেশের প্রতি তাঁহার অনাস্থা জন্মিল—নিয়মিত কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলেন ও বিদেশে গিয়া নবজীবন আরম্ভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

পুরুষ যদি লজ্জাশীল হন—অসম্মতি-প্রকাশে নিতান্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া আপনাকে আপনি সামলাইতে পারিবেন না, তাঁহার যদি এইরূপ ভয় থাকে তবে লেখনীর আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যুবতী তাঁহার প্রণয়ীর প্রস্তাবে সম্মতি কি অসম্মতি যাহা হয় প্রকাশ করেন। সম্মতি পাইলে যুবক কামিনীর পিতা মাতার সম্মতি প্রার্থনা করেন। পিতা মাতার অনুমতি হইলে তিনি তাঁহার প্রেয়সীকে আপনার প্রেম-নিদর্শন নানা প্রকার উপহার প্রেরণ করেন। বহুমূল্য উপহার গ্রহণে যদি কোন আপত্তি থাকে—ত পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে তিনি প্রিয়ার প্রতি স্বীয় অনুরাগ প্রকাশ করিতে পারেন। প্রণয়ীর নিকট হইতে পুষ্প-উপহার গ্রহণে কোন বাধা নাই। অবিবাহিতা কুলকামিনীদিগের পর পুরুষের নিকট হইতে পুষ্পোপহার গ্রহণ করা বিহিত নহে। বিবাহের দিন স্থির করা কামিনীর অধিকার।

বিবাহের পূর্ব্বে এ বিবাহে কাহারো কোন আপত্তি আছে কি না জানিবার জন্য অনেক সময় এক ঘোষণা-পত্র প্রকাশিত হয়—তাহা উপর্য্যুপরি তিন রবিবার চর্চে পঠিত হইয়া থাকে।

অমুক অমুকের বিবাহ সম্বন্ধীয় ঘোষণা-পত্র প্রকাশ করিতেছি। যদি তোমাদের কাহারো এই উভয়ের বিবাহ বিষয়ে কোন আপত্তি থাকে, তাহা ব্যক্ত করিবে। এই প্রথমবারের (দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বারের) বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে।

বিবাহ-কালে কন্যার সহিত দুই জন হইতে বার জন সখী উপস্থিত থাকেন। কন্যার ভগিনীগণ অথবা বরের নিকট সম্পর্কীয় কয়েকটী স্ত্রী সখী-পদে নিযুক্ত হন। সখীগণ ও কন্যার পরিবারস্থ লোকেরা যাত্রীদলের প্রথম, কন্যা ও তাঁহার পিতা মাতা যাত্রীদলের শেষ, এইরূপে যাত্রীগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলেন। বর ও সখীগণ ভজনালয়ে প্রথম গিয়া কন্যার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন। কন্যা তাঁহার পিতার

হাত ধরিয়া বেদীর সম্মুখে উপস্থিত হন। কন্যা বরের বামপার্শ্বে দাঁড়ান ও বাম-হস্তের দস্তানা খুলিয়া লন—বর তাঁহার দক্ষিণ হস্তের দস্তানা মোচন করেন। পরে পুরোহিত বেদী হইতে বলেন।*

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ,আমরা ঈশ্বরের সমক্ষে, এই উপাসক-মণ্ডলীর সমক্ষে এই পুরুষ ও এই স্ত্রীকে পবিত্র উদ্বাহ-সূত্রে বদ্ধ করিবার জন্য এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। উদ্বাহ-সংস্কার বহুমানাস্পদ। মনুষ্যের নির্দ্দোষাবস্থায় ইহার সূত্রপাত। ঈশা ও তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে যে নিগূঢ় সম্বন্ধ, ইহা তাহার সংজ্ঞাপক। অতএব ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে হইলে অনবধানতা, অবিবেচনা ও যদৃচ্ছা পূর্ব্বক প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয় নহে। প্রজ্ঞাহীন পশুর ন্যায় মনুষ্যের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। বুদ্ধি পূর্ব্বক, বিবেচনা পূর্ব্বক, ভক্তির সহিত, নম্রভাবে, ঈশ্বরের উপর ভর রাখিয়া, কি উদ্দেশে উদ্বাহ-প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা স্মরণ রাখিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ, বিবাহের উদ্দেশ্য সন্তানোৎপত্তি,ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মপথে রাখিয়া সন্তানগণের প্রতিপালন ও শিক্ষাদান।

দ্বিতীয়তঃ, বিবাহের উদ্দেশ্য যাহাতে মানবসমাজে ব্যভিচার-দোষ প্রবেশ না করে। যাহারা ইন্দ্রিয়-সংযমে অক্ষম, তাহারা দার-পরিগ্রহ করিয়া খৃষ্ট-সমাজে আপনাদিগকে পবিত্র রাখিতে সমর্থ হয়।

তৃতীয়তঃ, বিবাহের উদ্দেশ্য, সুখ দুঃখ সম্পৎ বিপদে স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সহবাস লাভ,পরস্পর সাহায্যদান ও সন্তোষ সাধন। এই পবিত্র দাম্পত্য-ব্রতে ব্রতী হইবার মানসে এই দুই জন উপস্থিত হইয়াছেন। ইহাঁদের বিবাহে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে, ত এইবেলা প্রকাশ করুন, নতুবা ভবিষ্যতে যেন ইহার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা না বলেন।

যদি কাহারো কোন আপত্তি দর্শাইবার না থাকে, ত পুরোহিত বরকে সম্ভাষণ করিয়া বলিবেন।

তুমি কি এই স্ত্রীর সহিত ঈশ্বর-প্রণীত পবিত্র উদ্বাহ-সূত্রে বদ্ধ হইয়া ইহাঁকে পত্নী-রূপে গ্রহণ করিবে, তুমি কি ইহাকে ভাল বাসিবে, যত্ন করিবে, ইহাঁকে সুখী-করিতে তৎপর থাকিবে, রোগে অরোগে ইহাঁকে রক্ষা করিবে ও আর সকল পরিত্যাগ করিয়া যাবজ্জীবন ইহাঁর প্রতি অনুরক্ত থাকিবে?

বর উত্তর করিবেন, হাঁ থাকিব।

পরে কন্যাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিবেন,

তুমি কি এই পুরুষের সহিত ঈশ্বর প্রণীত পবিত্র উদ্বাহ-সূত্রে বদ্ধ হইয়া ইহাকে পতিত্বে বরণ করিবে? তুমি কি ইহাঁর বশে থাকিবে, ইহাঁর সেবা করিবে, ইহাঁকে ভাল বাসিবে, ভক্তি করিবে, রোগে অরোগে ইহাঁকে রক্ষা করিবে ও আর সকল পরিত্যাগ করিয়া যাবজ্জীবন ইহাঁরই প্রতি অনুরক্ত থাকিবে?

কন্যা উত্তর করিবেন, হাঁ থাকিব।

পরে পুরোহিত বলিবেন।

* English marriage Service.

এই পুরুষকে এই কন্যাদান কে করিতেছেন ?

তৎপরে পুরোহিত কন্যাকে তাঁহার পিতার হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া বরের দক্ষিণ হস্তে কন্যার বাম হস্ত যোগ করিয়া বরকে এইরূপ বলিতে বলিবেন।

আমি তোমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতেছি, ভালই হউক মন্দই হউক—সম্পদে বিপদে, রোগে অরোগে, অন্য হইতে আমি তোমারই থাকিব ও যতদিন বাঁচিয়া থাকি তোমাকে ভাল বাসিব ও যত্ন করিব, ইহাতে আমার সত্য বচন দিতেছি।

পরে তাঁহাদের হস্ত খুলিয়া লইবেন ও কন্যা তাঁহার দক্ষিণ হস্তে বরের বাম হস্ত ধারণ করিয়া পুরোহিতের পরেপরে বলিবেন।

আমি তোমাকে পতিত্বে বরণ করিতেছি। ভালই হউক মন্দই হউক, সম্পদে বিপদে, রোগে অরোগে, অন্য হইতে আমি তোমারই থাকিব ও যতদিন বাঁচিয়া থাকি তোমাকে ভাল বাসিয়া যত্ন ও সেবা করিব, ইহাতে আমার সত্যবচন দিতেছি।

তদনন্তর বর কন্যার বাম হস্তের চতুর্থ অঙ্গুলিতে এক অঙ্গুরীয় পরিধান করাইয়া সেই অঙ্গুরীয় স্পর্শ করত পুরোহিতের কথা মত বলিবেন।

এই অঙ্গুরীয়ের সহিত তোমাকে বিবাহ করিতেছি, আমার দেহের সহিত তোমার অর্চ্চনা করিতেছি, আমার ধন সম্পত্তি তোমাকে সমর্পণ করিতেছি।

পরে দম্পতী জানু পাতিয়া বসিলে পুরোহিত আশীর্ব্বাদ ও প্রার্থনা করিবেন ও প্রার্থনার পর দম্পতীর হস্তে হস্ত মিলাইয়া বলিবেন,

ঈশ্বর যাঁহাদের সংযুক্ত করিয়াছেন, কোন মনুষ্য যেন তাঁহাদের বিযুক্ত না করেন।

অনন্তর পুরোহিত সমাজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিবেন,

অমুক অমুক ঈশ্বরের সমক্ষে ও এই সমাজের সমক্ষে পবিত্র উদ্বাহে বদ্ধ হইয়া পরস্পরকে সত্য বচন দিয়াছেন ও অঙ্গুরীয় দান ও প্রতিগ্রহ দ্বারা ও হস্তে হস্ত যোগ করিয়া তদ্বিষয়ে আপনাদের মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষণে আমার বক্তব্য এই ইহাঁরা স্বামী স্ত্রী রূপে একত্রে সহবাস করুন। তৎপরে প্রার্থনা সঙ্গীত উপাসনা ও আশীর্ব্বাদে অনুষ্ঠান সমাপ্ত।

অনুষ্ঠানের পর দম্পতীকে রেজিষ্টরে নাম স্বাক্ষর করিতে হয়। তদনন্তর বর ও কন্যা এক গাড়ীতে বসিয়া কন্যার বাটী গমন করেন। বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া গৃহে প্রবেশ করেন। সেখানে সকলে মিলিত হইলে মধ্যাহ্ন-ভোজন মহা সমারোহে সম্পন্ন হয়। আহারান্তে বর-কন্যার স্বাস্থ্য ও কল্যাণ উদ্দেশে বক্তৃতা ও পানাদি সমাপন হইলে সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করেন। পিতামাতা কন্যা-ভার হইতে মুক্ত হইলেন। দম্পতী তাঁহাদের মধুচন্দ্র যাপন করিতে এক্ষণে বাহির হইলেন। ইংরাজদের অদ্ভুত প্রথানুসারে তাঁহাদের পশ্চাতে পুরাতন পাদুকা নিক্ষিপ্ত হইল। বিবাহের পালা সাঙ্গ হইল।

পাঠকের মধ্যে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বরকন্যার স্বাস্থ্য-উদ্দেশে বক্তৃতা ইহার অর্থ কি? কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে ভোজনের নিমন্ত্রণ হইলে ভোজনান্তে ব্যক্তি ও সম্প্রদায় বিশেষের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ উদ্দেশে সুরাপান ও বক্তৃতা করিবার রীতি ইংরাজদের মধ্যে প্রচলিত আছে। প্রথম গণ্ডূষ রাণীর স্বাস্থ্য উদ্দেশে পান করিতে হয়। সভাপতি বলিয়া উঠেন "মহাশয়েরা পাত্র পূর্ণ করুন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া যাঁহার রাজ্যে সূর্য্য কখন অস্তমিত হয় না, অন্যায় অত্যাচার স্থান পায় না, যাঁহার সুশাসনে শত্রুদলের গর্ব্ব খর্ব্ব ও প্রজাগণের সুখ সমৃদ্ধি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, যিনি আপনার পবিত্র চরিত্র ও অমায়িক প্রজাবাৎসল্যে সকলেরই প্রীতি ভক্তি আকর্ষণ করিতেছেন, তাঁহার প্রতি ইংরাজদিগের রাজভক্তি উদ্দীপন করিবার জন্য অধিক বাক্যব্যয় আবশ্যক করে না। সকলে জয় জয় শব্দে রাণীর স্বাস্থ্য উদ্দেশে পান করুন।" রাণীর পর যুবরাজ ও তাঁহার মহিষী, তৎপরে ক্রমান্বয়ে সৈন্যদল, নাবিকদল, পার্লমেণ্ট সভার সভ্যগণ, রাজমন্ত্রী, আচার্য্য, পুরোহিত, ন্যায়াধীশ ইত্যাদির, অবশেষে "মধুরেণ সমাপয়েৎ" এই বচন অনুসারে "মহিলাগণের" স্বাস্থ্য পানের প্রস্তাব করা হয়। এই বিষয়ের প্রস্তাবক যেমন উৎসাহের সহিত বক্তৃতা করেন, শ্রোতৃগণও তেমনি উৎসাহের সহিত তাহা অনুমোদন করত পান করেন। এই ভাবে বক্তৃতা হয়, যথা "সভাপতি ও মহোদয়গণ, আমার উপর যে ভার অর্পিত হইয়াছে, তাহা কষ্টের নহে, আনন্দের ভার।—তাহা এই যে, মহিলাগণের স্বাস্থ্যপানের প্রস্তাব করা, ইহা অপেক্ষা সুখকর, উৎসাহকর প্রস্তাব আর কি হইতে পারে? কিন্তু কোথায় সেই অতুল গুণ-নিধান অপ্রতিম-সৌন্দর্য্যখনি কামিনী-কুল, আর কোথায় আমার এই দুর্ব্বল নিস্তেজ বাক্য, কিরূপে তাঁহাদের বর্ণন করিব? যে সকল সদ্গুণে মানবপ্রকৃতি উন্নত ও অলঙ্কৃত হইয়াছে, তাহা স্ত্রীজাতিতেই প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। রমণীর কমনীয় জ্যোতি বিহীন হইলে পুরুষ-সমাজ কি নীরস, কি কঠোর হইয়া পড়ে। নারীগণই পুরুষদের সুখ সৌভাগ্যের একমাত্র সেতু। স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন, স্ত্রী ও শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই। শৈশব-কালে মাতার যে অকৃত্রিম স্নেহে ও যত্নে আমরা লালিত পালিত হই, ভগিনীর নিঃস্বার্থ ভালবাসা, পতিব্রতা সতীর পবিত্র প্রেম, যে প্রেম ও ভাল বাসা, কালে ক্ষয় হয় না, দূরে হ্রাস হয় না, সহস্র কলঙ্কেও যাহাকে কলঙ্কিত করিতে পারে না, তাহা কাহার না স্মরণ হইবে? যখন আমরা অনাহারে, অনিদ্রায় দুঃসহ যাতনা ভোগ করিয়া রোগশয্যায় শয়ান হই, তখন স্ত্রীলোকের সুকোমল স্পর্শ ভিন্ন কে আমাদের সেই বিষম তাপের উপশম করিতে পারে? সে সময়ে কাহার পদবিক্ষেপ এমন নিঃশব্দ? কাহার বাক্য এমন সান্ত্বনাবহ? কাহার হাস্য

এমন মধুর? কাহার অশ্রুজল এমন দুঃখ-নাশন? কাহার প্রার্থনা এমন ফলদায়ী? স্ত্রী ভিন্ন কে আমাদের জীবনপথের নিত্য সঙ্গী, সম দুঃখ-সুখ অচলা সখী? আমরা যেন আমোদে মত্ত হইয়া তাঁহাদের স্নেহ প্রেম ভুলিয়া না যাই। আইস দেখি তোমরা যে যোষিৎকুলের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ রহিয়াছ, তাহার কিরূপে প্রতিশোধ দাও

এই সকল উপলক্ষে স্ত্রীরা প্রায় উপস্থিত থাকেন না, কিন্তু তাঁহাদের প্রতিনিধি কোন ললনা-ভক্ত পুরুষ তাঁহার হইয়া প্রস্তাবককে সাধুবাদ করেন।

আংলো ইণ্ডিয়ানদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে আর অধিক বলিবার আবশ্যক করে না। যাহা বলা গেল তাহা অনেকেরই জানা কথা, আর অধিক বলিতে গেলে প্রস্তাব বাহুল্য হইয়া পড়ে। তবে এখনো আর একটি কথা বক্তব্য আছে, তাহা বলিয়াই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

ক্রমশঃ

:—

কবি-কাহিনী।

প্রথম সর্গ।

শুন কল্পনা বালা, ছিল কোন কবি
বিজন কুটীর-তলে। ছেলেবেলা হোতে
তোমার অমৃত-পানে আছিল মজিয়া।
তোমার বীণার ধ্বনি ঘুমায়ে ঘুমায়ে
শুনিত, দেখিত কত সুখের স্বপন।
একাকী আপন মনে সরল শিশুটি
তোমারি কমল-বনে করিত গো খেলা,
মনের কতকি গান গাহিত হরষে,
বনের কতকি ফুলে গাঁথিত মালিকা।
একাকী আপন মনে কাননে কাননে
সেথানে সেথানে শিশু করিত ভ্রমণ;
একাকী আপন মনে হাসিত কাঁদিত।
জননীর কোল হোতে পালাত ছুটিয়া,
প্রকৃতির কোলে গিয়া করিত সে খেলা,
ধরিত সে প্রজাপতি, তুলিত সে ফুল,
বসিত সে তরুতলে, শিশিরের ধারা
ধীরে ধীরে দেহে তার পড়িত ঝরিয়া।
বিজন কুলায়ে বসি গাহিত বিহঙ্গ,
হেথা হোথা উঁকি মারি দেখিত বালক,
কোথায় গাইছে পাখী। ফুলদলগুলি,
কামিনীর গাছ হোতে পড়িলে ঝরিয়া
ছড়ায়ে ছড়ায়ে তাহা করিত কি খেলা!
প্রফুল্ল উষার ভুবা অরুণ-কিরণে
বিমল সরসী যবে হোত তারাময়ী,
ধরিতে কিরণগুলি হইত অধীর।
যখনি গো নিশীথের শিশিরাশ্রু জলে
ফেলিতেন উষা দেবী সুরভি নিশ্বাস,
গাছপালা লতিকার পাতা নড়াইয়া,
ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিয়া ঘুমন্ত নদীর
যখনি গাহিত বায়ু বন্য-গান তার,

তখনি বালক-কবি ছুটিত প্রান্তরে,
দেখিত ধান্যের শিষ দুলিছে পবনে।
দেখিত একাকী বসি গাছের তলায়,
স্বর্ণময় জলদের সোপানে সোপানে
উঠিছেন উষাদেবী হাসিয়া হাসিয়া।
নিশা তারে ঝিল্লীরবে পাড়াইত ঘুম,
পূর্ণিমার চাঁদ তার মুখের উপরে
তরল জোছনা-ধারা দিতেন ঢালিয়া,
স্নেহময়ী মাতা যথা সুপ্ত শিশুটির
মুখ পানে চেয়ে চেয়ে করেন চুম্বন।
প্রভাতের সমীরণে, বিহঙ্গের গানে
উষা তার সুখ-নিদ্রা দিতেন ভাঙ্গায়ে।
এইরূপে কি একটি সঙ্গীতের মত,
তপনের স্বর্ণময়-কিরণে প্লাবিত
প্রভাতের একখানি মেঘের মতন,
নন্দন বনের কোন অপ্সরা-বালার
সুখময় ঘুমঘোরে স্বপনের মত
কবির বালক কাল হইল বিগত।

যৌবনে যখনি কবি করিল প্রবেশ,
প্রকৃতির গীতধ্বনি পাইল শুনিতে,
বুঝিল সে প্রকৃতির নীরব কবিতা।
প্রকৃতি আছিল তার সঙ্গিনীর মত।
নিজের মনের কথা যত কিছু ছিল,
কহিত প্রকৃতি দেবী তার কানে কানে;
প্রভাতের-সমীরণ যথা চুপি চুপি
কহে কুসুমের কানে মরম-বারতা।
নদীর মনের গান বালক যেমন
বুঝিত, এমন আর কেহ বুঝিত না।
বিহঙ্গ তাহার কাছে গাইত যেমন,
এমন কাহারো কাছে গাইত না আর।
তার কাছে সমীরণ যেমন বহিত
এমন কাহারো কাছে বহিত না আর।
যখনি রজনী-মুখ উজলিত শশী,
সুপ্ত বালিকার মত যখন বসুধা
সুখের স্বপন দেখি হাসিত নীরবে;
বসিয়া তটিনী তীরে দেখিত সে কবি,
স্নান করি জোছনায় উপরে হাসিছে
সুনীল আকাশ, হাসে নিম্নে স্রোতস্বিনী;
সহসা সমীরণের পাইয়া পরশ
দুয়েকটি ঢেউ কভু জাগিয়া উঠিছে;
ভাবিত নদীর পানে চাহিয়া চাহিয়া,
নিশাই কবিতা আর দিবাই বিজ্ঞান।
দিবসের আলোকে সকলি অনাবৃত,
সকলি রয়েছে খোলা চখের সমুখে,
ফুলের প্রত্যেক কাঁটা পাইবে দেখিতে।
দিবালোকে চাও যদি বনভূমি পানে,
কাঁটা খোচা কর্দ্দমাক্ত বীভৎস জঙ্গল
তোমার চখের পরে হবে প্রকাশিত;
দিবালোকে মনে হয় সমস্ত জগৎ
নিয়মের যন্ত্র-চক্রে ঘুরিছে ঘর্ঘরি।
কিন্তু কবি নিশাদেবী কি মোহন-মন্ত্র
পড়ি দেয় সমুদয় জগতের পরে,
সকলি দেখায় যেন রহস্যে পূরিত;
সমস্ত জগৎ যেন স্বপ্নের মতন;
ওই শুভ্র নদী-জলে চন্দ্রের আলোকে
পিছলিয়া চলিতেছে যেমন তরণী,
তেমনি সুনীল ওই আকাশ সলিলে
ভাসিয়া চলেছে যেন সমস্ত জগৎ;
সমস্ত ধরারে যেন দেখিয়া নিদ্রিত,
একাকী গম্ভীর-কবি নিশাদেবী ধীরে
তারকার ফুলমালা জড়ায়ে মাথায়,

জগতের গ্রন্থে কত লিখিছে কবিতা।
এইরূপে সেই কবি ভাবিত কতকি।
হৃদয় হইল তার সমুদ্রের মত,
সে সমুদ্রে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকার
প্রতিবিম্ব দিবানিশি পড়িত খেলিত,
সে সমুদ্র প্রণয়ের জোছনা পরশে
লঙ্ঘিয়া তীরের সীমা উঠিত উথলি,
সে সমুদ্র আছিল গো এমন বিস্তৃত
সমস্ত পৃথিবী দেবি, পারিত বেষ্টিতে
নিজ স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে। সে সিন্ধু হৃদয়ে
দুরন্ত শিশুর মত মুক্ত সমীরণ
হু হু করি দিবানিশি বেড়াত খেলিয়া।
নির্ঝরিণী, সিন্ধুবেলা, পর্ব্বত-গহ্বর,
সকলি কবির ছিল সাধের বসতি।
তার প্রতি তুমি এত ছিলে অনুকূল
কল্পনা! সকল ঠাঁই পাইত শুনিতে
তোমার বীণার ধ্বনি, কখনো শুনিত
প্রস্ফুটিত গোলাপের হৃদয়ে বসিয়া,
বীণা লয়ে বাজাইছ অস্ফুট কি গান।
কনক-কিরণময় উষার জলদে
একাকী পাখীর সাথে গাইতে কি গীত
তাই শুনি যেন তার ভাঙ্গিত গো ঘুম!
অনন্ত তারা-খচিত নিশীথ গগনে
বসিয়া গাইতে তুমি কি গম্ভীর-গান,
তাহাই শুনি যেন বিহ্বল হৃদয়ে
নীরবে আকাশ পানে রহিত চাহিয়া।
নীরব নিশীথে যবে একাকী রাখাল
সুদূর কুটীর-তলে বাজাইত বাঁশি,
তুমিও তাহার সাথে মিলাইতে ধ্বনি,
সে ধ্বনি পশিত তার প্রাণের ভিতর।
নিশার আঁধার-কোলে জগত যখন
দিবসের পরিশ্রমে পড়িত ঘুমায়ে,
তখন সে কবি উঠি তুষার-মণ্ডিত
সমুচ্চ পর্ব্বত-শিরে, গাইত একাকী
প্রকৃতি-বন্দনা-গান মেঘের মাঝারে।
সে গম্ভীর গান তার কেহ শুনিত না,
কেবল আকাশ-ব্যাপী স্তব্ধ তারকারা
এক দৃষ্টে মুখ পানে রহিত চাহিয়া।
কেবল, পর্ব্বত-শৃঙ্গ করিয়া আঁধার,
সরল পাদপ-রাজি নিস্তব্ধ গম্ভীর
ধীরে ধীরে শুনিত গো তাহার সে গান;
কেবল সুদূর-বনে দিগন্ত-বালার
হৃদয়ে সে গান পশি প্রতিধ্বনি রূপে
মৃদুতর হোয়ে পুন আসিত ফিরিয়া।
কেবল সুদূর শৃঙ্গে নির্ঝরিণী বালা
সে গম্ভীর গীতি সাথে কণ্ঠ মিশাইত,
নীরবে তটিনী যেত সমুখে বহিয়া,
নীরবে নিশীথ-বায়ু কাঁপাত পল্লব।
গম্ভীরে গাইত কবি "হে মহা প্রকৃতি,
কি সুন্দর, কি মহান্ মুখশ্রী তোমার,
শূন্য আকাশের পটে হে প্রকৃতি দেবি,
কি কবিতা লিখছ যে জ্বলন্ত অক্ষরে,
যতদিন রবে প্রাণ, পড়িয়া পড়িয়া
তবু ফুরাবে না, পড়া মিটিবেনা আশ।
শত শত গ্রহ তারা তোমার কটাক্ষে
কাঁপি উঠে থরথরি, তোমার নিশ্বাসে
ঝটিকা বহিয়া যায় বিশ্বচরাচরে।
কালের মহান্ পক্ষ করিয়া বিস্তার,
অনন্ত আকাশে থাকি হে আদি জননি,
শাবকের মত এই অসংখ্য জগৎ
তোমার পাখার ছায়ে করিছ পালন!
সমস্ত জগৎ যবে আছিল বালক,

দুরন্ত শিশুর মত অনন্ত আকাশে
করিত গো ছুটাছুটি না মানি শাসন,
স্তনদানে পুষ্ট কার তুমি তাহাদের
অলঙ্ঘ্য সখ্যের ডোরে দিলে গো বাঁধিয়া।
এ দৃঢ় বন্ধন যদি ছিঁড়ে একবার,
সেকি ভয়ানক কাণ্ড বাধে এ জগতে,
কক্ষচ্ছিন্ন কোটি কোটি সূর্য্য চন্দ্র তারা
অনন্ত আকাশময় বেড়ায় মাতিয়া,
মণ্ডলে মণ্ডলে ঠেকি লক্ষ সূর্য্য গ্রহ
চূর্ণ চূর্ণ হোয়ে পড়ে হেথায় হোথায়;
এমহান্ জগতের ভগ্ন অবশেষ
চূর্ণ নক্ষত্রের স্তূপ, খণ্ড খণ্ড গ্রহ
বিশৃঙ্খল হয়ে রহে অনন্ত আকাশে!
অনন্ত আকাশ আর অনন্ত সময়,
যা ভাবিতে পৃথিবীর কীট মানুষের
ক্ষুদ্র বুদ্ধি হোয়ে পড়ে ভয়ে সঙ্কুচিত,
তাহাই তোমার দেবি সাধের আবাস।
তোমার মুখের পানে চাহিতে হে দেবি,
ক্ষুদ্র মানবের এই স্পর্দ্ধিত জ্ঞানের
দুর্ব্বল নয়ন যায় নিমীলিত হয়ে।
হে জননি আমার এ হৃদয়ের মাঝে
অনন্ত-অতৃপ্তি-তৃষ্ণা জ্বলিছে সদাই,
তাই দেবি পৃথিবীর পরিমিত কিছু
পারে না গো জুড়াইতে হৃদয় আমার,
তাই ভাবিয়াছি আমি হে মহাপ্রকৃতি,
মজিয়া তোমার সাথে অনন্ত প্রণয়ে
জুড়াইব হৃদয়ের অনন্ত পিপাসা!
প্রকৃতি জননি ওগো, তোমার স্বরূপ
যতদূর জানিবারে ক্ষুদ্র মানবেরে
দিয়াছ গো অধিকার সদয় হইয়া,
ততদূর জানিবারে জীবন আমার
করেছি ক্ষেপণ, আর করিব ক্ষেপণ।
ভ্রমিতেছি পৃথিবীর কাননে কাননে;
বিহঙ্গও যতদূর পারেনা উড়িতে
সে পর্ব্বত শিখরেও গিয়াছি একাকী;
দিবাও পশেনি দেবি সে গিরিগহ্বরে,
সেখানে নির্ভয়ে আমি করেছি প্রবেশ!
যখন ঝটিকা ঝঞ্ঝা প্রচণ্ড সংগ্রামে
অটল পর্ব্বত চূড়া করেছে কম্পিত,
সুগম্ভীর অম্বুনিধি উন্মাদের মত
করিয়াছে ছুটাছুটি যাহার প্রতাপে,
তখন একাকী আমি পর্ব্বত-শিখরে
দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি সে ঘোর বিপ্লব,
মাথার উপর দিয়া সহস্র অশনি
সুবিকট অট্টহাসে গিয়াছে ছুটিয়া,
প্রকাণ্ড শিলার স্তূপ পদতল হোতে
পড়িয়াছে ঘর্ঘরিয়া উপত্যকা দেশে,
তুষার-সঙ্ঘাত-রাশি পড়েছে খসিয়া
শৃঙ্গ হোতে শৃঙ্গান্তরে উলটি পালটি।
অমানিশীথের কালে নীরব প্রান্তরে
বসিয়াছি, দেখিয়াছি চৌদিকে চাহিয়া,
সর্ব্বব্যাপী নিশীথের অন্ধকার গর্ভে
এখনো পৃথিবী যেন হতেছে সৃজিত।
স্বর্গের সহস্র আঁখি পৃথিবীর পরে
নীরবে রয়েছে চাহি পলকবিহীন,
স্নেহময়ী জননীর স্নেহ-আঁখি যথা
সুপ্ত বালকের পরে রহে বিকসিত।
এমন নীরবে বায়ু যেতেছে বহিয়া,
নীরবতা ঝাঁঝাঁ করি গাইছে কি গান,
মনে হয় স্তব্ধতার ঘুম পাড়াইছে।
কি সুন্দর রূপ তুমি দিয়াছ ধরায়
হাসি হাসি নিদ্রোত্থিতা বালিকার মত

আধ ঘুমে মুকুলিত হাসিমাখা আঁখি!
কি মন্ত্র শিখায়ে দেছ দক্ষিণ বাতাসে—
যেদিকে দক্ষিণ-বধূ ফেলেন নিশ্বাস,
সেদিকে ফুটিয়া উঠে কুসুম-মঞ্জরী,
সেদিকে গাহিয়া উঠে বিহঙ্গের দল,
সেদিকে বসন্ত-লক্ষ্মী উঠেন হাসিয়া!
কি হাসি হাসিতে জানে পূর্ণিমা-শর্ব্বরী,
সে হাসি দেখিয়া হাসে গম্ভীর পর্ব্বত,
সে হাসি দেখিয়া হেসে উথলে জলধি,
সে হাসি দেখিয়া হাসে দরিদ্র কুটীর!
হে প্রকৃতি দেবি তুমি মানুষের মন
কেমন বিচিত্র ভাবে রেখেছ পূরিয়া,
করুণা, প্রণয়, স্নেহ, সুন্দর শোভন
ন্যায়, ভক্তি, ধৈর্য্য আদি সমুচ্চ মহান্,
ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা আদি ভয়ানক ভাব,
নিরাশা মরুর মত দারুণ-বিষণ্ণ—
তেমনি আবার এই বাহির জগৎ
বিচিত্র বেশভূষায় করেছ সজ্জিত।
তোমার বিচিত্র কাব্য-উপবন হতে
তুলিয়া সুরভি ফুল গাঁথিয়া মালিকা,
তোমারি চরণ তলে দিব উপহার।"
এইরূপে সুনিস্তব্ধ নিশীথ-গগনে
প্রকৃতি-বন্দনা-গান গাইত সে কবি।

মেঘনাদ-বধ কাব্য।

(মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত।)

বাল্মীকি রামের চরিত্র-বর্ণনা কালে বলিয়াছেন "যম ও ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহার বল, বৃহস্পতির ন্যায় তাঁহার বুদ্ধি, পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার ধৈর্য্য।" * "ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও তিনি ক্ষুব্ধ হন না।" যখন কৈকেয়ী রামকে বনে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন, তখন "মহানুভব রাম কৈকেয়ীর এইরূপ কঠোর বাক্য শুনিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত ও শোকাবিষ্ট হইলেন না।" "চন্দ্রের যেমন হ্রাস, সেইরূপ রাজ্যনাশ তাঁহার স্বাভাবিক শোভাকে কিছুমাত্র মলিন করিতে পারিল না। জীবন্মুক্ত যেমন সুখে দুঃখে একই ভাবে থাকেন, তিনি তদ্রূপই রহিলেন; ফলতঃ ঐ সময়ে তাঁহার চিত্ত-বিকার কাহারই অণুমাত্র লক্ষিত হইল না।" "ঐ সময় দেবী কৌশল্যার অন্তঃপুরে অভিষেক-মহোৎসব প্রসঙ্গে নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ হইতেছিল। রাম তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াও এই বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন। জ্যোৎস্নাপূর্ণ শারদীয় শশধর যেমন আপনার নৈসর্গিক শোভা ত্যাগ করেন না; সেইরূপ তিনিও চিরপরিচিত হর্ষ পরিত্যাগ করিলেন না।" সাধারণ্যে রামের প্রজারঞ্জন, এবং বীরত্বের ন্যায় তাঁহার অটল ধৈর্য্যও প্রসিদ্ধ আছে। বাল্মীকি রামকে মনুষ্য-

* উদ্ধৃত গুলি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কৃত রামায়ণ হইতে।

চরিত্রের পূর্ণতা অর্পণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; তিনি তাঁহাকে কোমলতা ও বীরত্ব, দয়া ও ন্যায়, লঘুহৃদয়তা ও ধৈর্য্য প্রভৃতি সকল প্রকার গুণের সামঞ্জস্য-স্থল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা উপরি উক্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মেঘনাদ বধ কাব্যের রাম চরিত্র-সমালোচনা করিব, অথবা যদি মাইকেল রাম চরিত্র-চিত্রে আদিকবির অনুসরণ না করিয়া থাকেন, তবে তাহা কতদূর সঙ্গত হইয়াছে আলোচনা করিয়া দেখিব।

যখন প্রমীলার দূতী নৃমুণ্ডমালিনী রামের নিকট আসি, গদা বা মল্লযুদ্ধের প্রস্তাব করিতে গেলেন, তখন রঘুপতি উত্তর দেন যে,

"———শুন সুকেশিনী
বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে।
অরি মম রক্ষঃপতি, তোমরা সকলে
কুলবালা, কুলবধূ; কোন্ অপরাধে
বৈরিভাব আচরিব তোমাদের সাথে?"
ইত্যাদি—

তখন মনে করিলাম যে, রাম ভালই করিয়াছেন, তিনি বীর, বীরের মর্য্যাদা বুঝেন; অবলা স্ত্রীলোকদের সহিত অনর্থক বিবাদ করিতেও তাঁহার ইচ্ছা নাই। তখন ত জানিতাম না যে, রাম ভয়ে যুদ্ধ করিতে সাহস করেন নাই।

"দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে
রক্ষোবর! যুদ্ধসাধ ত্যজিনু তখনি।
মূঢ় যে ধাঁটায় সখে হেন বাঘিনীরে।"

এ রাম যে কি বলিয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন সেই এক সমস্যা!

প্রমীলা ত লঙ্কায় চলিয়া যাউন, কিন্তু রামের যে ভয় হইয়াছে তাহা আর কহিবার নয়।

তিনি বিভীষণকে ডাকিয়া কহিতেছেন—

"এবে কি করিব, কহ, রক্ষ-কুল মণি?
সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে,
কে রাখে এ মৃগ পালে?"

রামের কাঁদো কাঁদো স্বর যেন আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি। লক্ষ্মণ, দাদাকে একটু প্রবোধ দিলেন; রাম বিভীষণকে কহিলেন—

"কৃপা করি, রক্ষোবর, লক্ষ্মণেরে লয়ে,
দুয়ারে দুয়ারে সখে, দেখ সেনাগণে।
কোথায় কে জাগে আজি? মহাক্লান্ত সবে
বীরবাহু সহ রণে। ° ° °
* ° এ পশ্চিম দ্বারে
আপনি জাগিব আমি ধনুর্ব্বাণ হাতে!"

লক্ষ্মণ ষষ্ঠ সর্গে রামকে কহিলেন—

"মারি রাবনিরে, দেব, দেহ আজ্ঞা দাসে!"

রঘুনাথ উত্তর করিলেন—

"হায় রে কেমনে—
যে কৃতান্ত দূতে দূরে হেরি, ঊর্দ্ধশ্বাসে
ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ুবেগে
প্রাণ লয়ে; দেবনর ভস্ম যার তেজে
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্প বিবরে,
প্রাণাধিক? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।"
ইত্যাদি

লক্ষ্মণ বুঝাইলেন যে, দেবতারা যখন আমাদের প্রতি সদয়, তখন কিসের ভয়। বিভীষণ কহিলেন যে, লঙ্কার রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে স্বপ্নে কহিয়াছেন যে, তিনি শীঘ্রই

প্রস্থান করিবেন, অতএব ভয় করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু রাম কাঁদিয়া উঠিলেন—

"উত্তরিলা সীতানাথ সজল নয়নে ;
'স্মরিলে পূর্ব্বের কথা রক্ষকুলোত্তম
আকুল পরাণ কাঁদে। কেমনে ফেলিব
এ ভ্রাতৃ-রতনে আমি এ অতল জলে ?"
ইত্যাদি

কিছুতেই কিছু হইল না, রামের ভয় কিছুতেই ঘুচিল না, অবশেষে আকাশ-বাণী হইল।

"উচিত কি তব, কহ, হে বৈদেহীপতি,
সংশয়িতে দেব-বাক্য, দেবকুলপ্রিয়
তুমি ?"

অবশেষে আকাশে চাহিয়া দেখিলেন যে অজগরের সহিত একটা ময়ূর যুদ্ধ করিতেছে, কিন্তু যুদ্ধে অজগর জয়ী ও ময়ূর নিহত হইল। এতক্ষণে রাম শান্ত হইলেন, ও লক্ষ্মণকে যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত করিয়া দিলেন। লক্ষ্মণ যুদ্ধে যাইবার সময় রাম একবার দেবতার কাছে প্রার্থনা করিলেন, একবার বিভীষণকে কাতর ভাবে কহিলেন,

"সাবধানে যাও মিত্র। অমূল রতনে
রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে,
রথীবর !"

বিভীষণ কহিলেন, কোন ভয় নাই। ইন্দ্রজিৎ-শোকে অধীর হইয়া যখন রাবণ সৈন্য-সজ্জার আদেশ দিলেন, তখন রাক্ষস-সৈন্য-কোলাহল শুনিয়া রাম আপনার সৈন্যাধ্যক্ষ-গণকে ডাকাইয়া আনিলেন ও তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

"পুত্রশোকে আজি
বিকল রাক্ষসপতি সাজিছে সত্বরে ;
* * ** *
রাখগো রাঘবে আজি এ ঘোর বিপদে।
স্ববন্ধু-বান্ধব হীন বনবাসী আমি
ভাগ্য দোষে ; তোমরা হে রামের ভরসা
বিক্রম, প্রতাপ, রণে। *
কুল, মান প্রাণ মোর রাখ হে উদ্ধারি
রঘুবন্ধু, রঘুবধূ বন্ধা কারাগারে
রক্ষ-ছলে ! স্নেহ-পণে কিনিয়াছ রামে
তোমরা বাঁধে হে আজি কৃতজ্ঞতা পাশে
রঘুবংশে, দাক্ষিণাত্য দাক্ষিণ্য প্রকাশি !"
নীরবিলা রঘুনাথ সজল নয়নে।

এরূপ দুগ্ধপোষ্য বালকের ন্যায় কথায় কথায় সজল নয়নে বিষম ভীরুস্বভাব রাম বনের বানর গুলাকে লইয়া এত কাল লঙ্কায় তিষ্ঠিয়া আছে কিরূপে তাহাই ভাবিতেছি।

লক্ষ্মণের মৃত্যু হইলে রাম বিলাপ করিতে লাগিলেন, সে বিলাপ সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু বলিতে চাহি না, কেবল ইলিয়াড হইতে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বন্ধু পেট্রক্লসের মৃত্যুতে একিলিস যে বিলাপ করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠকেরা বুঝিয়া লইবেন যে কিরূপ বিলাপ বীরের উপযুক্ত। একিলিস তাঁহার দেবী-মাতা থেটিস্‌কে কহিতেছেন,

He, deeply groaning—"To this cureless grief.
Not even the Thunderer's favour brings relief.

Patroclus—Ah !—say, goddess, can I boast
A pleasure now ? revenge itself is lost ;
Patroclus, loved of all my martial train,
Beyond mankind, beyond myself, is slain !
'Tis not in fate the alternate now to give ;
Patroclus dead Achilles hates to live.
Let me revenge it on proud Hector's heart,
Let his last spirit smoke upon my dart ;
On these conditions will I breathe : till then,
I blush to walk among the race of men."
A flood of tears at this the goddess shed :
Ah then, I see thee dying, see thee dead !
When Hector falls, thou diest."—
"Let Hector die,
And let me fall ! (Achilles made reply)
Far lies Patroclus from his native plain !
He fell, and, falling, wish'd my aid in vain.
Ah then, since from this miserable day
I cast all hope of my return away ;
Since, unrevenged, a hundred ghosts demand
The fate of Hector from Achilles' hand ;
Since here, for brutal courage far renown'd,
I live an
ground,
(Others in council famed for nobler skill,
More useful to preserve, than I to kill)
Let me—But oh ! ye gracious powers above !
Wrath and revenge from men and gods remove :
Far, far too dear to every mortal breast,
Sweet to the soul, as honey to the taste :
Gathering like vapours of a noxious kind
Form fiery blood, and darkening all the mind.
Me Agamemnon urged to deadly hate ;
Tis past—I quell it ; I resign to fate.
Yes—I will meet the murderer of my friend ;
Or (if the gods ordain it) meet my end.
The stroke of fate the bravest cannot shun :
The great Alcides, Jove's unequal'd son,
To Juno's hate, at length resign'd his breath,
And sunk the victim of all-conquering death.

So shall Achilles fall ! stretch'd pale and dead,
No more the Grecian hope, or Trojan dread :
Let me, this into the fields,
And reap what glory life's short harvest yields.
Shall I not force some widow'd dame to tear
With frantic hands her hevel'd hair ?
Shall I not force her breast to heave with sighs,
And the soft tears to trickle from her eyes ?
Yes, I shall give the fair those mournful charms—
In vain you hold me—Hence ! my arms, my arms !—
Soon shall the sanguine torrent spread so wide,
That all shall know, Achilles swells the tide."

রাম লক্ষ্মণের ঔষধ আনিবার জন্য যম-পুরীতে গমন করিলেন। সেখানে বালীর সহিত দেখা হইল, বালী কহিলেন—

"———কি হেতু হেথা সশরীরে আজি,
রঘুকুল চূড়ামণি ? অন্যায় সমরে
সংহারিলে মোরে তুমি তুষিতে সুগ্রীবে ;
কিন্তু দূর কর ভয়, এ কৃতান্ত পুরে
নাহি জানি ক্রোধ মোরা, জিতেন্দ্রিয় সবে।"

পরে দশরথের নিকটে গেলেন ;

" হেরি দূরে পুত্রবরে রাজর্ষি, প্রসরি বাহুযুগ, (বক্ষঃস্থল আর্দ্র অশ্রু জলে) "

বালী যেমন দেহের সহিত ক্রোধ প্রভৃতি রিপু পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে সুখভোগ করিতেছেন, তেমনি দশরথ যদি পৃথিবীর অশ্রুজল পৃথিবীতেই রাখিয়া আসিতেন ত ভাল হইত। শরীর না থাকিলে অশ্রুজল থাকা অসম্ভব, আমরা তাহা কল্পনাও করিতে পারি না। এমনকি ইহার কিছু পরে রাম যখন দশরথের পদধূলি লইতে গেলেন, তখন তাঁহার পা-ই খুঁজিয়া পান নাই, এমন অশরীরী আত্মার বক্ষঃস্থল কিরূপে যে অশ্রুজলে আর্দ্র হইয়াছিল, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। যাহা হউক রামের আর অধিক কিছুই নাই। রামের সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিবার আছে। রাম যে কথায় কথায় " ভিখারী রাম " " ভিখারী রাম " করিয়াছেন, সেগুলি আমাদের ভাল লাগে না ; এইরূপে নিজের প্রতি পরের দয়া উদ্রেক করিবার চেষ্টা, অতিশয় হীনতা প্রকাশ করা মাত্র। একজন দরিদ্র বলিতে পারে " আমি ভিক্ষুক আমাকে সাহায্য কর।" একজন নিস্তেজ দুর্ব্বল বলিতে পারে, " আমি দুর্ব্বল, আমাকে রক্ষা কর। " কিন্তু তেজস্বী বীর সেরূপ বলিতে পারেন না ; তাহাতে আবার রাম ভিখারীও নহেন, তিনি নির্ব্বাসিত বনবাসী মাত্র।

" ভিখারী রাঘব, দূতি, বিদিত জগতে। "
" অমূল রতনে
রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে। "
" বাঁচাও করুণাময়, ভিখারী রাঘবে।"
ইত্যাদি

যাহা হউক, রামায়ণের নায়ক মহাবীর রাম, মেঘনাদবধকাব্যের কবি তাঁহার একি দুর্দ্দশা করিয়াছেন! তাঁহার চরিত্রে তিলমাত্র উন্নত-ভাব অর্পিত হয় নাই, এরূপ পরমুখাপেক্ষী ভীরু কোনকালে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই। বাল্যকাল হইতে রামের প্রতি আমাদের এরূপ মমতা আছে যে, প্রিয়ব্যক্তির মিথ্যা-অপবাদ শুনিলে যেরূপ কষ্ট হয়, মেঘনাদবধকাব্যে রামের কাহিনী পড়িলে সেইরূপ কষ্ট হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রামের চরিত্রে বীরত্ব ও কোমলত্ব সমানরূপে মিশ্রিত আছে। পৌরুষ এবং স্ত্রীত্ব উভয় একাধারে মিশ্রিত হইলে তবে পূর্ণ-মনুষ্য সৃজিত হয়, বাল্মীকি রামকে সেইরূপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মেঘনাদবধে রামের কোমলতা অংশটুকু অপর্য্যাপ্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু পাঠক, এমন একটি কথাও কি পাইয়াছেন, যাহাতে তাঁহাকে বীর বলিয়া মনে হয়? প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল বিভীষণের সহিত পরামর্শ করিয়াছেন, কেবল লক্ষ্মণের জন্য রোদন করিয়াছেন। ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে প্রেরণ করিবার সময় সংস্কৃত রামায়ণে রাম লক্ষ্মণকে কহিতেছেনঃ—

বৎস, সেই ভয়াবহ দুরাত্মার (ইন্দ্রজিতের) সমস্ত মায়া অবগত আছি। সেই রাক্ষসাধম দিব্য অস্ত্রধারী, এবং সংগ্রামে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণকেও বিসংজ্ঞ করিতে পারে। সে রথে আরোহণ পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে বিচরণ করে, এবং মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায় তাহার গতি কেহ জ্ঞাত হইতে পারে না। হে সত্যপরাক্রম অরিন্দম, বাণ দ্বারা সেই মহাবীর রাক্ষসকে বধ কর।

হে বৎস, সংগ্রামে দুর্দ্দম যে বীর বজ্রহস্তকেও পরাজিত করিয়াছে, হনুমান, জাম্বুবান ও ঋক্ষসৈন্য দ্বারা পরিবৃত হইয়া যাও—তাহাকে বিনাশ কর। বিভীষণ তাহার অধিষ্ঠিত স্থানের সমস্ত অবগত আছেন, তিনিও তোমার অনুগমন করিবেন।

মূল-রামায়ণে লক্ষ্মণের শক্তিশেল যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অনুবাদিত করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

ভুজগরাজের জিহ্বার ন্যায় প্রদীপ্ত-শক্তি রাবণ দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়া মহাবেগে লক্ষ্মণের বক্ষে নিপতিত হইল। লক্ষ্মণ এই দূরপ্রবিষ্ট শক্তি দ্বারা ভিন্নহৃদয় হইয়া ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সন্নিহিত রাম তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ভ্রাতৃস্নেহে বিষণ্ণ হইলেন ও মুহূর্ত্ত কাল সাশ্রুনেত্রে চিন্তা করিয়া ক্রোধে যুগান্তবহ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। "এখন বিষাদের সময় নয়" বলিয়া রাম রাবণ বধার্থ পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ মহাবীর অনবরত শর বর্ষণ পূর্ব্বক রাবণকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। শর-জালে আকাশ পূর্ণ হইল এবং রাবণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর রাম দেখিলেন, লক্ষ্মণ শক্তিবিদ্ধ হইয়া শোণিত-লিপ্ত-দেহে সসর্প-পর্ব্বতের

ন্যায় রণস্থলে পতিত আছেন। সুগ্রীব, অঙ্গদ ও হনুমান প্রভৃতি মহাবীরগণ লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থল হইতে বহুযত্নেও রাবণ নিক্ষিপ্ত শক্তি আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। পরে রাম ক্রুদ্ধ হইয়া দুই হস্তে ঐ ভয়াবহ শক্তি গ্রহণ ও উৎপাটন করিলেন। শক্তি উৎপাটন-কালে রাবণ তাঁহার প্রতি অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু মহাবীর রাম তাহা লক্ষ্য না করিয়া লক্ষ্মণকে উত্থাপন পূর্ব্বক হনুমান ও সুগ্রীবকে কহিলেন, দেখ, তোমরা লক্ষ্মণকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক এই স্থানে থাক এবং ইহাকে অপ্রমাদে রক্ষা কর। ইহা চিরপ্রার্থিত পরাক্রম প্রকাশের অবসর। ঐ সেই পাপাত্মা রাবণ, বর্ষার মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করত আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। হে সৈন্যগণ, আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর, আজ জগৎ অরাবণ বা অরাম হইবে। তোমরা কিছুতে ভীত হইও না। আমি সত্যই কহিতেছি এই দুরাত্মাকে নিহত করিয়া রাজ্যনাশ, বনবাস, দণ্ডকারণ্যে পর্য্যটন ও জানকীবিয়োগ এই সমস্ত ঘোরতর দুঃখ ও নরক-তুল্য-ক্লেশ নিশ্চয় বিস্মৃত হইব। আমি যাহার জন্য এই কপিসেনা আহরণ করিয়াছি, যাহার জন্য সুগ্রীবকে রাজা করিয়াছি, যাহার জন্য সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিলাম, সেই পাপ আজ আমার দৃষ্টিপথে উপস্থিত, তাহাকে আজ আমি সংহার করিব। এই পামর আজ দৃষ্টিবিষ ভীষণ-সর্পের দৃষ্টিতে পড়িয়াছে, কিছুতেই ইহার নিস্তার নাই। সৈন্যগণ, এক্ষণে তোমরা শৈলশিখরে উপবিষ্ট হইয়া আমাদের এই তুমুল সংগ্রাম প্রত্যক্ষ কর। আমি আজ এমন ভীষণ কার্য্য করিব যে, অদ্যকার যুদ্ধে গন্ধর্ব্বেরা, কিন্নরেরা, দেবরাজ ইন্দ্র, চরাচর সমস্ত লোক, স্বর্গের সমস্ত দেবতারা রামের রামত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া যতকাল পৃথিবী রহিবে ততকাল তাহা ঘোষণা করিতে থাকিবে।

এই বলিয়া মহাবীর রাম মেঘ হইতে জল-ধারার ন্যায় শরাসন হইতে অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাবণও তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। উভয়পক্ষের নিক্ষিপ্ত শর গতিপথে সঙ্ঘর্ষ প্রাপ্ত হওয়াতে একটী তুমুলশব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

এইত রামায়ণ হইতে লক্ষ্মণের পতন দৃষ্টে রামের অবস্থা বর্ণনা উদ্ধৃত করাগেল। এক্ষণে রামায়ণের অনুকরণ করিলে ভাল হইত কিনা, আমরা তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না, পাঠকেরা তাহা বিচার করিবেন।

ভঃ—

প্রাচীন-সিংহলের বাণিজ্য।

আজি নহে, কালি নহে, প্রাচীনতম কাল হইতেই সিংহল সভ্য-সমাজে পরিচিত, প্রাচীনতম কাল হইতেই তাহার সমৃদ্ধি-সৌরভ দিগন্তব্যাপ্ত। কত প্রাচীন কাল

হইতে আসিয়ার সভ্যসমাজ যে ইহার গুণ-গৌরব জ্ঞাত হইয়াছিল, আমরা তাহার কোন স্থির-প্রমাণ পাই না, তবে ইউরোপের কথা বলিতে পারি, আমরা তাহাই বলিতেছি। আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণ কালে তাঁহার সহচরদ্বয় নিয়ার্কস Nearchus ও অনেসিক্রিটস্ Onesicritus কর্ত্তৃক সিংহলের সমৃদ্ধি ও বাণিজ্য-ব্যাপার প্রথম গ্রীকগণ মধ্যে প্রচারিত হয়। তৎপরে প্লিনি, এরিয়ান, টলেমি, কস্‌মস্, নন্ন, মার্কোপলো, ভ্যালেণ্টাইন্, মণ্ডেভিল প্রভৃতি লেখকগণ দ্বারা ক্রমে ক্রমে উহা ইউরোপখণ্ডে আরো সুবিস্তৃতরূপে প্রখ্যাত হয়। আবার যখন সিংহল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইল, তত্ত্বান্বেষী ইংরাজ অমনি বদ্ধপরিকর হইয়া উহার অন্তঃপ্রদেশ গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং বহুতর সুদৃঢ় প্রমাণ পাইয়া তাঁহাদের মনে প্রতীতি হইল, যে, ইহার অবস্থা এরূপ ছিল না। চারিদিকেই প্রাচীন সভ্যতার ভগ্নাবশিষ্ট স্তূপাকারে থাকিয়া পূর্ব্ব-গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দেবালয়, গগনস্পর্শিনী সৌধমালা, ক্ষেত্রে জলপ্রদান-মানসে নির্ম্মিত খণ্ডপ্রস্তর-মণ্ডিত দূরব্যাপী বিশাল তড়াগরাজি অতীত-সাক্ষী ইতিহাস-পত্রের ন্যায় প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতেছে। * সিংহলের এই সকল বিস্ময়জনক পূর্ব্ব-গৌরব-ভগ্নাবশেষ দেখিবামাত্র তাঁহাদের মনোমধ্যে এই প্রশ্নের আবির্ভাব হইল যে, এ সকল কোন্ সময়ের নির্ম্মিত? কোন সময়ের প্রবল বাণিজ্য-স্রোত ইহাকে এরূপ ধনশালী করিয়াছিল? ইংরাজ, পূর্ব্বতন লেখকগণের নিকট যতটুকু জানিতে পারিয়াছে, আজি আমরা পাঠক-সমাজে তাহাই বিবৃত করিতেছি।

বাণিজ্যের বিষয় লিখিতে গেলে দেশের অবস্থান, প্রকৃতি ও উৎপন্নদ্রব্য বিষয়ে প্রয়োজনমত কিঞ্চিৎ লিখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সিংহলের অবস্থানের বিষয় সকলেই জানেন, উহা লিখা অনাবশ্যক। কেবল উহার প্রকৃতি ও উৎপন্নদ্রব্য বিষয়ে দুই একটী কথার আলোচনা করিয়া প্রস্তাবিত-প্রবন্ধে অগ্রসর হইব।

আমরা যাহাকে সিংহল বা লঙ্কাদ্বীপ * বলিয়া থাকি, ইংরাজেরা যাহাকে Ceylon বলিয়া থাকেন, প্রাচীন কালে বিদেশীয়েরা তাহাকে তাপ্রোবেন Taprobane † কহিত। ইহার অন্তঃপ্রদেশ অপ্রবেশনীয় ঘনবনাচ্ছাদিত পর্ব্বত-মালায় সমাকীর্ণ। তন্মধ্যে মালেল বা আদিম শৈলই Adam's Peak ‡ সর্ব্বোচ্চ; উহা দ্বীপের দক্ষিণ ভাগে অব-

* সিংহল দ্বীপ, এই নামের উৎপত্তি বিষয়ে Asiatic Res vol vii P 48 দেখ।

† Tap (দ্বীপ) এবং Ravan (রাবণ) এই দুই কথা হইতেই ঐ নামের উৎপত্তি। See Asiatic Res. vol. v. Page 39.

‡ সিংহলবাসীরা ইহাকে "মালেল" বলিয়া থাকে। খৃষ্টিয়ান প্রবাদ এই যে, Adam এবং Eve স্বর্গচ্যুত হইয়া শত বৎসর ধরিয়া এখানে অনুতাপাশ্রু বিসর্জ্জন করেন, এবং সেই অশ্রুজলে একটী হ্রদের উৎপত্তি। See The History of Ceylon by Philalethes P 11.

স্থিত। ইহার উত্তরভাগে ক্রমাগত সুবিস্তৃত ক্ষেত্র, তীর সকল সমতল। একদিকে আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূল ও আরব, একদিকে ভারতবর্ষ, আর একদিকে চীনোপকূল; আবার অপরপক্ষে ইহার বহুসংখ্যক বন্দরের* অসাধারণ-বাণিজ্য-সুগমতা, ইহাতে বোধ হয় যেন প্রকৃতি দক্ষিণে ইহাকে বাণিজ্যাধিষ্ঠাত্রী-দেবতার একটী লোকললাম আবাস-স্থান করিয়া দিয়াছেন।

তৃণকমলী হইতে আরিপা এবং মান্নার পর্য্যন্ত বিস্তৃত উত্তর-ভাগ বাণিজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। মান্নার আরিপা হইতে এক সঙ্কীর্ণ প্রণালী দ্বারা বিভিন্ন। এখানকার জল গভীর নহে; এইস্থল অতি প্রাচীন-কাল হইতে প্রবাল ও শংখের জন্য বিখ্যাত। বাণিজ্য-পোত গমনাগমন ও বহুলরূপে কৃষিচর্চ্চা প্রযুক্ত ইহা যে, দ্বীপের অন্যান্য-ভাগ অপেক্ষা অধিক জনশালী হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য নাই। ভগ্নাবশেষ দেখিয়া আজিও তাহা স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। এই স্থানের নিকটেই আমরা মানতন্ত্রী mantotti এবং কেন্দ্রমালী condromalee এই প্রাচীন সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগরীদ্বয়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাই। নক্স বলেন আরিপা নদী-গর্ভে সমুচ্চ স্তম্ভ, ও ভগ্নাট্টালিকার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। †

মানতন্ত্রীতে মানবহস্ত-গঠিত বহুসংখ্যক জল-সঞ্চয়-স্থান* আছে, তদ্দেশীয়েরা তাহাকে কাত্তোকার্‌ল্ cattocarle বলিয়া থাকে। উহারা পঞ্চাশৎ† বা ততোধিক মন্ত্র চাউল-উৎপাদনকারী ভূমিতে জল প্রদান করিতে পারে। এইখানেই আবার অণ্টোনাইনিসের সময়ের রোমীয় মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল।‡ ইহা প্রাচীন-সিংহলের বিপুল বাণিজ্যের আর একটী উদাহরণ।

কোন্ প্রাচীন সময়ে সিংহল, বাণিজ্যে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, একণে আমরা সেই প্রশ্নের মীমাংসা করি। হিন্দুস্থাপত্যের মহচ্চিহ্নস্বরূপ যে সকল দেবালয় দেখিয়া ইংরাজের মনে ঐরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল, তৎসমুদয়ই বৌদ্ধদিগের অভ্যুদয়কালিক। দেবালয় সকল দেখিয়াই তাহা স্পষ্ট প্রতীতি হয়,কেননা প্রায় সকল দেবালয়ের মধ্যেই বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।(১) বিখ্যাত দেবালয় নিডয়, সুবৃহৎ অট্টালিকা প্রভৃতি যে, দেশের ধন বৃদ্ধি বা বাণিজ্য বৃদ্ধির চিহ্ন, তাহা বলা

* তৃণকমলীর বন্দর ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

† Robert Knox, Historical Relation of the Isle of Ceylon; vol IV. chap 10.

* ইহাদের আকারাদি সম্বন্ধে A view of the agricultural, commercial and financial interest of Ceylon, by Aut Bertolacci বা Heeren's Historical Researches vol III P 435 দেখ।

† বিদেশীয়েরা উহাকে Giant's Tank বলিয়া থাকেন।

‡ See Heeren's Historical Researches. P. 436.

(১) John Davy's account of the Interior of Ceylon. P. 232.

বাহুল্য। আর ধর্ম্ম, বাণিজ্যের উপর সামান্য কার্য্য করে না, সকল দেশের ইতিহাসে তাহা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম যখন তাহার পতাকা লইয়া ভুবনবিজয় করিয়াছিল, তখন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পুণ্যনিকেতন সিংহল যে, বাণিজ্যে বিশেষ প্রাধান্য-লাভ করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাত অশোকের সময়ে; ইহার পূর্ব্বে চন্দ্রগুপ্ত বা তাঁহার পিতা নন্দর সময়ে, ভারতবর্ষ সুতরাং তৎসহচরী লঙ্কাও যে বাণিজ্যে বিলক্ষণ গৌরব ও মহত্ব লাভ করিয়াছিল, তাহা আমরা মিগাস্থিনিস্ ও আলেকজাণ্ডারের সহচরদ্বয়ের মুখে শুনিতে পাই। ঐ সহচরদ্বয়ের মধ্যে নিয়ার্কস বলেন যে, আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের অনেক পূর্ব্বে পারস্য-রাজত্ব-কালেও সিংহলের বাণিজ্য বিলক্ষণ প্রবল ছিল। ইহা অপেক্ষা আর প্রাচীন-সময়ে সিংহলের নাম শুনিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং এই সময় হইতে উহার বাণিজ্য বিষয় কতদূর জানিতে পারি দেখি; ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন লেখক এতদ্বিষয়ে কি বলেন, তদালোচনায় প্রবৃত্ত হই।

এই মাত্র বলিলাম, নিয়ার্কসের (Nearchus) মুখে শুনিতে পাই যে, আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের অনেক পূর্ব্বে পারস্য-রাজত্বকালেও সিংহলের বাণিজ্য বিলক্ষণ প্রবল ছিল। তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া যাইবার কালে পারস্য-উপসাগরে প্রবেশ করিয়া তিনি মকেটা (১) (এক্ষণে উহাকে মুমেন্দন কহে) নামক স্থানে বহুল পরিমাণে সিংহল-জাত দারু-চিনি ও অন্যান্য ভারতবর্ষীয় দ্রব্য সকল বিক্রীত হইতে দেখিয়াছিলেন। সে সকল দ্রব্য আবার তথা হইতে বাবিলোনিয়ায় বিক্রীত হইবার জন্য প্রেরিত হইত। এই লেখকের মুখে ভারতবর্ষীয় প্রবালেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। পারস্যাধিপত্য সময়ে যে, সিংহলজাত দ্রব্য সকল আরব, বাবিলন ও পারস্য দেশের বিপণী মণ্ডলীতে সাদরে গৃহীত ও বিক্রীত হইত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এক্ষণে আলেকজাণ্ডারের সময়। আলেকজাণ্ডারের সময়েও সিংহল কতদূর সুবিখ্যাত ছিল, ষ্ট্রাবো এবং প্লিনি তাহার সাক্ষী। প্লিনি বলেন "তাপ্রোবেন বহুকাল হইতে দ্বিতীয় পৃথিবী বলিয়া বিবেচিত হইত, এবং আণ্টিক্ থনিস্ (Antich thones) নামে কথিত হইত। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ কালে এই দ্বীপ আবিষ্কৃত হয়। তাঁহার যুদ্ধ-জাহাজাধ্যক্ষ অনেসিক্রিটস্ বলেন যে, ভারতবর্ষ অপেক্ষা এখানে অধিক পরিমাণে হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়। মিগাস্থিনিস বলেন যে, ইহা একটী নদী দ্বারা বিভক্ত, এবং ইহার অধিবাসীদিগকে পালিয়গনি Palaeogoni কহে। ভারতবর্ষ অপেক্ষা এখানে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ ও বড় বড় প্রবাল সমুৎপন্ন হয়। ইরাটস্থিনিসের Eratosthenes মতে

(২) See, foot note, Heeren's Historical Researches vol III P 463.

ইহার দৈর্ঘ্য সপ্তসহস্র ষ্টেডিয়া (১) এবং প্রস্থ পঞ্চ সহস্র ষ্টেডিয়া। ইহাতে নগর নাই, ইহা কেবল গ্রাম মালায় পূর্ণ; তাহার সংখ্যা সাত শতেরও অধিক, পূর্ব্বে ইহা প্রাসিয়াইদিগের রাজ্য (মগধ) (২) হইতে বিংশ দিবস পোত গমনের পথ বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু পরিশেষে দৃষ্ট হইল যে, ইহার অধিবাসীরা যে অল্পায়াস নির্ম্মিত পোতে (নীল নদীতে যেরূপ পোত ব্যবহৃত হইত) সচরাচর গমন করিয়া থাকে, তাহাতে এক সপ্তাহ সময় লাগে। মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রে মাঝে মাঝে স্বল্প গভীরতা দেখিতে পাওয়া যাওয়া যায়; কিন্তু এক এক প্রণালীতে এত গভীরতা আছে যে তথায় নঙ্গর স্থান পায় না। এই জন্য তাহারা অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগ সূক্ষ্ম করিয়া এক প্রকার জাহাজ নির্ম্মাণ করিত, যদ্দ্বারা একেবারেই ঐ গভীর প্রণালী দিয়া গতায়াত করিতে পারিত; তাহাদিগের আর অপ্রশস্ত, স্বল্প গভীর প্রণালী দিয়া যাইবার আবশ্যক হইত না। বায়ু-সঞ্চালনের সহিত পোত গমনাগমনের কিরূপ সুবিধা, তদ্দেশবাসীরা তাহা বিলক্ষণরূপে অবগত ছিল।" আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক নিয়ার্কস্ ও অনেসিক্রিটস্ ও তাঁহাদের পরবর্ত্তী মিগাস্থিনিস্, ডায়ামেকস্ প্রভৃতির কথা লইয়াই প্লিনি উহা বলিয়াছেন; ষ্ট্রাবোও তাঁহাদের কথামতে বহুবিধ বাণিজ্যদ্রব্য, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে আমদানীর জন্য কচ্ছপপৃষ্ঠ ও হস্তিদন্তের উল্লেখ করিয়া যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য-প্রমাণ সহিত বলিয়াছেন যে, এ সময়ে সিংহল এক বহুবিস্তৃত বাণিজ্য স্থান ছিল।

ক্রমশঃ :—

(১) একষ্টেডিয়ম্ ইংরাজী ৬০৬ ফিট নয় ইঞ্চ।

(২) মিগাস্থিনিস মগধবাসিদিগকে "প্রাসিয়াই" (Prasii) বলিতেন। See Lethbridge's History of India P.48.

বঙ্গ-সাহিত্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমরা কবিতা বিষয়ক তর্ক-তুফানে ভাসিতে ভাসিতে এতদূর আসিয়া পড়িয়াছি যে, রমেশচন্দ্র বাবু একেবারে আমাদের চক্ষুর অন্তরালে পড়িয়াছেন। কিন্তু আর না, এখন আমরা কূলে ফিরিলাম, এবং কূলে ফিরিয়া রমেশ বাবুকে সঙ্গে লইয়া আমরা এবার বঙ্গ-সাহিত্য-সমুদ্রে ঝাঁপ দিব; এবং ঝাঁপ দিয়া সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হইব। আমরা স্বীকার করি যে, আমাদের মন্থনীয় সমুদ্র অপার বা অতলস্পর্শ নহে।—বৌদ্ধসাহিত্যের মতন ইহার প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে হিন্দুধর্ম্ম-রূপ অচল-প্রতিষ্ঠ পর্ব্বতও বিকম্পিত হয় নাই এবং ফরাসি সাহিত্যের মতন ইহার অপ্রতিহত-মহাপ্লাবনে বিপুল

রাজ্যদেশও বিপ্লবস্থ হয় নাই—কিন্তু এ সাগর মন্থন করিলে যে, আমরা পরিশ্রমের প্রচুর পুরস্কার লাভ করিব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কতকগুলি সিদ্ধ-সত্যের বাহুল্য আলোচনায় এখন আর আবশ্যক নাই। এ কথা সকলেই জানেন যে, সংস্কৃতের অপভ্রংশে প্রাকৃত, প্রাকৃতের অপভ্রংশে বাঙ্গালা ভাষা সৃষ্ট হয়। এই ভাষার প্রথম-অবস্থায় ইহার সাহিত্যে হিন্দী ও ব্রজবুলি, পর অবস্থায় উর্দ্দু—তৎপরে দেশজ-শব্দ ও বাক্য, এবং পরিশেষে সংস্কৃত ও ইংরাজি ধরণ ধারণের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে সময় হইতে পাশ্চাত্য-আলোক আসিয়া বঙ্গদেশে বিকীর্ণ হইল, এবং ভাগীরথীর বক্ষে টেম্‌সের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, সে সময়ের কথা আমরা এখন কিছুই তুলিব না। কারণ, একালের সাহিত্যের সঙ্গে পুরাকালের সাহিত্যের এত প্রভেদ,—কেবল শরীরগত নহে মর্ম্মগত এত প্রভেদ যে, সমগ্র বঙ্গ-সাহিত্যকে এক মনে সমালোচনা করিতে গেলে আমরা ঘোর প্রমাদে পতিত হইব! সুতরাং আমরা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া মহাত্মা বিদ্যাসাগরের অভ্যুদয়ের সময়েই পুরাকালের সাহিত্য-সমালোচনা শেষ করিব। স্বীকার করি যে, এই অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেও পাশ্চাত্য-আলোক আসিয়া মহানগরীর স্থানে স্থানে প্রতিফলিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা এত স্বল্প ও সঙ্কীর্ণ ছিল যে, তাহা আমরা সচ্ছন্দে অগ্রাহ্য করিতে পারি।

পুরাকালের সমগ্র বঙ্গ-সাহিত্যের উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে ইহার যে একটি বিশেষত্ব লক্ষিত হয়, তাহা অন্য কোন দেশের সাহিত্যে লক্ষিত হয় না। ধর্ম্মানুরাগেই পুরাকালের বঙ্গসাহিত্যের জন্ম, ধর্ম্মানুরাগেই তাহা পরিপুষ্ট এবং ধর্ম্মানুরাগেই তাহা পরিণত হইয়া উঠে। বৈষ্ণবেরা তাহার জন্মদাতা ও প্রতিপালক, এবং শাক্তেরা তাহার চূড়ান্ত উৎকর্ষকারী। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস কৃষ্ণপ্রেমে অনুরক্ত হইয়া যে মধুর বংশীবাদন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা আবার জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের কণ্ঠে আসিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, ক্রমে সেই স্বরলহরী বঙ্গাকাশে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। একশতাব্দী গত না হইতে হইতেই সেই কৃষ্ণ-প্রেমানুরাগ নবদ্বীপে উন্মত্ততায় পরিণত হইল এবং চৈতন্য দেবের শিষ্য ও সহচরেরা সেই উন্মত্ততা সর্ব্বত্র প্রচার করিবার আশয়ে ভূরি ভূরি গ্রন্থ রচনা করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবেরা ক্রমে মুমূর্ষু হইয়া পড়িল এবং আপনাদের দলের দুএকটি কবিমাত্র সাহিত্য ক্ষেত্রে রাখিয়া শাক্ত-কবিদের হস্তেই তাহার সমস্ত ভার দিয়া আপনারা নিরস্ত হইলেন। সেই দুএকটি বৈষ্ণব-কবির মধ্যে কাশীরামদাসই সর্ব্বপ্রধান; কীর্ত্তিবাস ও কবিকঙ্কন, এবং তাঁহাদের পরবর্ত্তী রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র প্রভৃতি শাক্ত-কবিরা সে ক্ষেত্রের যে কতদূর উর্ব্বরতা ও শোভা সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা আর বলিতে পারা যায় না।

এই সকল মহাত্মাদিগের কবিতা-গুণে পৌরাণিক ইতিবৃত্তান্তসমূহ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই বিকীর্ণ হইয়া পড়িল, তাহার ওজস্বিতা ও বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইতে লাগিল। রামায়ণ ও মহাভারত আবালবৃদ্ধবনিতার ধর্ম্মচর্চ্চার সময়ে ধর্ম্মচর্চ্চার এবং বিশ্রামের সময় বিশ্রামের সহযোগিতা করিতে লাগিল। ক্রমে নূতন এক প্রকার কবির সম্প্রদায় উঠিল। তাঁহারা ঐসকল পূর্ব্বতন কবির উপর নির্ভর করিয়া কবিতাময় প্রশ্নোত্তরে চারিদিক আমোদিত করিতে লাগিলেন। কেন যে রমেশ বাবু সেই সকল কবিদের কথা যথোচিত সম্মানের সহিত তাঁহার পুস্তকে উল্লেখ করেন নাই, তাহা বলিতে পারি না। যদি বলেন যে, সে সকল কবিরা তাঁহাদের সঙ্গীতগুলি কোন গ্রন্থাকারে প্রচারিত করেন নাই, সেই জন্য সাহিত্যের ইতিবৃত্তে তাহাদের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে না; কিন্তু তাহা হইলে সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিবৃত্তে বেদের কথা বা গ্রীক-সাহিত্যের ইতিবৃত্তে হোমরের কথাও উল্লেখ করা যুক্তিসংগত নহে। যদি বলেন যে, সে সকল সঙ্গীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্গীত মাত্র, তাহা হইলে তিনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের এত বাহুল্য উল্লেখ করিলেন কেন? যদি বলেন যে, সে সকল সঙ্গীতে প্রকৃত কবিতা কিছুই নাই, তাহা হইলে তাঁহার মত আমরা গ্রহণ করিব না। আমরা যথাস্থানে দেখাইব যে, হরুঠাকুর বা রামবসুর সেই সেই সঙ্গীতগুলি আতশী কাচের ন্যায় প্রকৃত কবিতার জ্বলন্ত রশ্মীসমূহ যেরূপ সংহতভাবে প্রতিফলিত করিয়াছে, এমন আর সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

পুরাকালের বঙ্গসাহিত্য পাঠে দেখা যায় যে, বঙ্গ-সাহিত্যের বৈষ্ণব আদি কবিরা আদিরসটিকেই তাঁহাদের কল্পনাকাননের সকল পুষ্প দিয়াই সাজাইয়াছিলেন। কি বিদ্যাপতি, কি চণ্ডীদাস, কি তাঁহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী জ্ঞানদাস ও গোবিন্দ দাস সকলেই শ্রীকৃষ্ণের যৌবন-লীলা লইয়া সাহিত্য-সমাজে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। এবং আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, তাঁহারা সে বিষয়ে অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের কবিতা সমূহ যে কতদূর মধুর ও মিষ্ট, কত দূর স্বাভাবিক ও সুভাব সম্পন্ন তাহা সহজে বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বলিতে গেলে ইহাও বলা উচিত যে, সে সকল কবিতার গভীরতা নাই, তাহাদের মধ্যে কোনটিতেই একটি মহানভাবের আভাস মাত্রও নাই। সে সকল কবিতা পাঠ করিতে করিতে আমাদের শরীর লোমাঞ্চিত হইতে থাকে, নয়ন মুদিয়া আসিতে থাকে, এবং বসন্তবায়ু-বিকম্পিত সরসীর ন্যায় হৃদয় ঈষৎ বিকম্পিত হয় মাত্র, তাহা পাঠ করিলে হৃদয়ের শেষতল পর্য্যন্ত আলোড়িত হয় না, কিম্বা প্রণয়ের একটিও গভীরতম বিশ্বব্যাপী সত্য আমাদের মনে প্রতিভাত হয় না। তাঁহাদের কবিতা পাঠে এমন বোধ হয় না যে, প্রণয় আমাদের জীবন-

মালিকার মূলসূত্র এবং সংসার-সমুদ্রের ধ্রুব নক্ষত্র; বরং কেবল এইমাত্র বোধ হয় যে, প্রণয় আমাদের যৌবনকালের একটি উপাদেয় লীলাস্বরূপ। স্বীকার করি যে, এবিষয়ে তাঁহাদের পৌরাণিক আদর্শসমূহও নিতান্ত নির্দোষ নহে, কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, কবির শক্তি ও কল্পনা অনুসারে পৌরাণিক-আদর্শের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধিত হয়! পুরাণে কথিত আছে, যে সময় মহাদেব হিমালয়-শিখরে গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, সেই সময়ে দেবতাদিগের কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া কন্দর্প তাঁহার প্রতি সম্মোহন-বাণ সন্ধান করেন; সেই বাণে ব্যথিত হইয়া মহান্ যোগীবর যে কি করিলেন তাহা কালিদাস এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

ঈষৎ চঞ্চল হল তাপসের মন,
সবেমাত্র চন্দ্রোদয়ে সাগর যেমন,
বিম্বাধর উমামুখে তখন মহেশ
একেবারে ত্রিনয়ন করিলা নিবেশ।
* * * *
মুহূর্ত্তে ইন্দ্রিয়-ক্ষোভ করি নিবারণ,
দিগন্তের চারিধার, ফিরায়ে নয়ন তাঁর
দেখিতে লাগিলা কোথা বিকৃতি-কারণ।
* * * *
রুদ্র-ক্রোধানলে ভস্ম হইলে মদন,
(বজ্রপাতে দগ্ধ হয় পাদপ যেমন)
পরিহার করিবারে নারী-সন্নিধান,
অনুচর সহ শিব হৈলা অন্তর্ধান॥

কিন্তু ভারতচন্দ্র সেই পৌরাণিক ব্যাপারটি এইরূপে চিত্রিত করিয়াছেন—

মরিল মদন, তবু পঞ্চানন, মোহিত তাহার বাণে।
বিফল হইয়া, নারী তপসিয়া, ফিরেন সকল স্থানে।
কামে মত্ত হর, দেখিয়া অপ্সর, কিন্নরী দেবী সকল।
ধায় পলাইয়া, পশ্চাতে তাড়িয়া, ফিরেন শিব চঞ্চল।

আমরা এই জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে, কবির শক্তি-অনুসারে পুরাণের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধিত হইতে পারে। সুতরাং কৃষ্ণ-প্রেমের ব্যাপারটি যে স্বর্গীয়-বর্ণে রঞ্জিত হইতে পারে না, তাহা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাস তাহা করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের কর্ত্তৃক কৃষ্ণ-প্রেম যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আমরা একবার সমালোচনা করিয়া দেখিব। কৃষ্ণের বা রাধিকার দেবত্ব সম্পর্কে আমাদের এস্থলে কিছুই বক্তব্য নাই; তাঁহাদের প্রেমের আভ্যন্তরিক ভাবের ভিতর আমরা এস্থলে প্রবেশ করিব না।—কেবল বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতার মানুষিক নায়ক নায়িকার ভাবে আমরা কৃষ্ণ রাধিকার প্রণয় সম্পর্কে দুএকটি কথা বলিতে সাহসী হইব। এ কথা বলিতে আমরা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় ইন্দ্রিয়গত, অস্থিচর্ম্মগত, এবং পৃথিবী হইতেও পার্থিব। তিনি শত সহস্র বার "দেহি পদপল্লবমুদারং" বলিলেও তাঁহাকে কখন প্রকৃত প্রণয়ের আদর্শস্থল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব না। তিনি

দুষ্মন্ত বা পুরূরবা হইতে শত গুণে নিকৃষ্ট-এবং দেবতাপক্ষে কুমারসম্ভবের মহাদেবের সহিত তাঁহার নাম এক নিশ্বাসে উচ্চারিতও হইতে পারে না। আর রাধিকার প্রণয়?—আমরা স্বীকার করি যে, ইহাতে কতকটা পার্থিব মাধুর্য্য আছে, কিন্তু ইহাতে সীতার গভীরতা বা অপর্ণা উমার মহান ভাব বা রুক্মিণীর উদারতার আভাস মাত্র নাই। প্রথমেইত দেখিতে পাই যে, রাধিকা সখীগণ সঙ্গে যমুনায় জল আনিতে যান, আর শ্রীকৃষ্ণ পথমধ্যে কদম্বতলায় দাঁড়াইয়া মধুর বংশী বাজাইয়া তাঁহাদের মন হরণ করিতে চেষ্টা পান; ক্রমে সমস্ত ব্রজনারীগণ মধ্যে তিনি রাধিকার রূপে বিশেষ বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং সাত্বিকভাবে জর্জ্জরিত হইয়া এইরূপে মনোবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন—

অলখিতে হামে হেরি বিনোদিনী থোরি,
ঈষদ রজনী ভেল চান্দ উজোরি,
কুটিল কটাক্ষ ছটা পড়ি গেল,
মধুকর ডম্বর অম্বর ভেল।
আকুল করি গেও হামারি পরাণ।
কাহার রমণী কে উহা জান॥
লীলা কমলে ভ্রমরা কিয়ে বারি,
চমকি চলনি ধনী চকিত নেহারি॥
তে ভেল বেকত পয়োধর শোভা,
কনক কমল হেরি তাহে মনোলোভা॥
আধ লুকায়লি আধ উদাস।
কুচকুম্ভ কহি গেও আপনক আশ॥
বিদ্যাপতি কহে নব অনুরাগ,
গোপত মদন শর কাহে না লাগ॥

এদিকে শ্রীরাধিকাও ফাঁদে পড়িলেন এবং মনের আবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সহচরীগণকে বলিলেন—

কি পেখিনু যমুনার তীরে,
কালিয়া বরণ এক মানুষ আকার গো
বিকাইনু তার আঁখি ঠারে।
নিতি নিতি আসি যাই,হেন কভু দেখিনাই
কি খেনে দেখিনু আজ তারে।
গুরুয়া গরবকুল, নাশাইল কুলবতী,
কলঙ্ক চলিয়া আগে ফিরে।
কামের কামান জিনি, ভুরুর ভঙ্গিমা গো
হিয়ুলে বেড়িয়া দুটি আঁখি।
কালিয়া নয়ন-বাণ, মরমে হানিল গো,
কালাময় আমি সব দেখি॥
চিকন কালারূপে, আকুল করিল গো
ধরণে না যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া, মুখানি মাজিল গো,
যদু কহে কত সুধা দিয়া॥

ক্রমে বৃন্দা-দূতী আসিয়া প্রণয়ের সহায়তা করিলেন, এবং পরিশেষে রাধাকৃষ্ণের সম্মিলন হইল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাতেই পরিতৃপ্ত হইলেন না, চন্দ্রাবলীও তাঁহার সোহাগের সোহাগিনী হইলেন। এই প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বিতা-স্থলে শ্রীরাধার মানের ত আর অবধি থাকিবারই নহে, আবার সেই মান উপলক্ষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কখনও বিদেশিনী, কখনও নাপিতানী, কখন তপস্বিনী বেশ ধারণ পূর্ব্বক শ্রীরাধার কুঞ্জে অপরূপ লীলা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাধিকার মান কতদূর মর্ম্মগত, ও শ্রীকৃষ্ণের মানভঞ্জন কতদূর গভীর প্রণয়প্রসূত, তাহা

নিম্নে উদ্ধৃত পদাবলী হইতেই বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইবে—

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন

কিলাগি বদন, ঝাঁপসি সুন্দরি
হরল চেতন মোর।
মানিনি, আকুল হৃদয় মোর।
মদন বেদন, সহিতে না পারি
শরণ লইনু তোর॥
কিয়ে গিরিবর, কনয়া কটোর
তা দেখি লাগয়ে ধন্দ।
হিয়ার উপরে, শম্ভু পূজিত
বেড়িয়া বালকচন্দ॥
একর-কমলে পরশিতে চাহি
বিহি নহে যদি বামা।
তোহারি চরণে শরণ লইনু
সদয় হইবে রামা॥ ইত্যাদি, বিদ্যাপতি।

রাধিকাও এই বাক্‌চাতুরীতে গলিয়া গেলেন।

এই ছলে কিছুকাল ব্রজধামে প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলে রাধিকা বিচ্ছেদ-বেদনায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন—

কালি বলি কালা, গেলা মধুপুরে
সে কালের কত বাকি?
যৌবন সায়রে, সরিতেছে ভাঁটা
তাহারে কেমনে রাখি?
জোয়ারের পানি, নারীর যৌবন,
গেলে না ফিরিবে আর?
জীবন থাকিলে, বঁধুরে পাইব,
যৌবন মিলন ভার। ইত্যাদি চণ্ডীদাস।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং আবার বলিতেছি যে, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার ভিতরের ভাব বা উদ্দেশ্যের কথা আমরা কিছুই বলিতে চাহিনা, শ্রীকৃষ্ণের বা রাধার দেবত্ব বা অদেবত্বের সহিত আমাদের আপাততঃ কোন সম্পর্কই নাই, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিদের পদাবলীর নরলোকত্ব মানুষিক-নায়ক-নায়িকাভাবে আমরা তাঁহাদিগকে দেখিতে চেষ্টা করিতেছি। দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ ভাবে দেখিতে গেলে রাধাকৃষ্ণ-প্রেম যে নিতান্ত নিকৃষ্ট-পদবীগত তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয়। শুদ্ধমাত্র রূপ-লাবণ্যই যে প্রণয়ের প্রবর্ত্তক, অশেষ প্রকার লীলাই যে প্রণয়ের জীবন, বসন্ত এবং বর্ষাকালেই যে প্রণয়ের উৎকর্ষ, যৌবনেই যে প্রণয়ের সম্মান, দারুণ বিচ্ছেদের সময়েও—"নিতি নিতি মদন প্রহারই" যে প্রণয়ের দারুণ-বিচ্ছেদ যাতনা, সে প্রণয়ের গরিমা কীর্ত্তন করিতেও লজ্জা বোধ হয়।

স্বীকার করি, যে, এই প্রণয়ের প্রসঙ্গে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস চমৎকার কবিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং এই প্রণয়ের যতদূর মনোহর চিত্র চিত্রিত করা সম্ভব তাহাও তাঁহারা করিয়াছেন। প্রণয়ের অতৃপ্ত ভাব বিদ্যাপতি কি সুন্দর রচনা-প্রণালীতে বর্ণনা করিয়াছেন—

জনম অবধি হম, রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল, শ্রবণ হি শুননু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।

কত মধু যামিনী, রভস গোঁয়াইনু
না বুঝিনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ, হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

চণ্ডীদাস হইতে এক স্থল উদ্ধৃত করিতেছি—

সই, কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদনে ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে॥

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আরও অনেক কবি আছেন, আগামী বারে সংক্ষেপে তাঁহাদের বিষয় বলা যাইবে। এইমাত্র এখানে আমাদের বলা কর্ত্তব্য যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বঙ্গভাষার আদি কবি, তাঁহারা এখন হইতে প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গ দেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা যে উভয়েই সুকবি তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাসের আমরা বিশেষ প্রশংসা করি, কারণ বিদ্যাপতি কৃতবিদ্য ছিলেন, তিনি সংস্কৃত ভাষা হইতে অনেক রত্ন গ্রহণ করিয়া পদাবলী গ্রথিত করিয়াছিলেন, কিন্তু চণ্ডীদাস আপনার হৃদয় উৎস হইতে যাহা কিছু উৎসারিত হইয়াছে, তাহাই সুমধুর সরল ভাষায় বিন্যাস করিয়াছেন। বিদ্যাপতির কবিতাতে ছন্দঃপতন বা যতিঃপতন প্রায় হয় না চণ্ডীদাসের তাহা ভূয়োভূয় হইয়াছে, কিন্তু পিঞ্জররুদ্ধ শিক্ষিত পক্ষীর সুমিষ্ট গীত-ধ্বনির সহিত বন বিহঙ্গদের মধুর কাকলীর যেরূপ প্রভেদ, বিদ্যাপতির সুললিত পদাবলীর সহিত চণ্ডীদাসের মর্ম্ম-উচ্ছ্বসিত সঙ্গীত-উল্লাসের সেইরূপ প্রভেদ।

করুণা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মহেন্দ্র যখন বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলেন, তখনো অনেক রাত আছে। নেশা অনেক ক্ষণ ছুটিয়া গেছে। মহেন্দ্রের মনে এক্ষণে দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে। ঘৃণায়, লজ্জায়, বিরক্তিতে ম্রিয়মান হইয়া শুইয়া পড়িল। একে একে কতকি কথা মনে পড়িতে লাগিল; শৈশবের এক একটি স্মৃতি বজ্রের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইতে লাগিল। যৌবনের নবোন্মেষের সময় ভবিষ্যৎ-জীবনের কি মধুময় চিত্র তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল, কত মহান্ আশা, কত উদার কল্পনা তাঁহার উদ্দীপ্ত হৃদয়ের শিরায় শিরায় জড়িত বিজড়িত ছিল। যৌবনের সুখস্বপ্নে তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার নাম মাতৃভূমির ইতিহাসে গৌরবের অক্ষর-অক্ষরে লিখিত থাকিবে,

তাঁহার জীবন তাঁহার স্বদেশীয় ভ্রাতাদের আদর্শ-স্বরূপ হইবে এবং ভবিষ্যৎকাল আদরে তাঁহার যশ বক্ষে পোষণ করিতে থাকিবে। কিন্তু সে হৃদয়ের, সে আশার, সে কল্পনার আজ কি পরিণাম হইল? তাঁহার যশ কলঙ্কিত হইয়াছে, চরিত্র সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে, হৃদয় দারুণ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। কালি হইতে তাঁহাকে দেখিলে গ্রামের কুলবধূগণ সঙ্কোচে সরিয়া যাইবে, বন্ধুরা লজ্জায় নতশির হইবে, শত্রুদের অধর ঘৃণার হাস্যে কুটিল হইবে, বৃদ্ধেরা তাঁহার শৈশবের এই অনপেক্ষিত-পরিণামে দুঃখ করিবে, যুবকেরা অন্তরালে তাঁহার নামে তীব্র উপহাস বিদ্রূপ করিবে, সর্ব্বাপেক্ষা, তিনি যে নিরপরাধিনী বিধবার পবিত্র নামে কলঙ্ক আরোপ করিলেন, তাহার আর মুখ রাখিবার স্থান থাকিবে না। মহেন্দ্র মর্ম্মভেদী কষ্টে শয্যায় পড়িয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। মহেন্দ্রের রোদন দেখিয়া রজনীর কি কষ্ট হইতে লাগিল, রজনীই তাহা জানে; মনে মনে কহিল, "তোমার কি হইয়াছে বল; যদি আমার প্রাণ দিলেও তাহার প্রতিকার হয়, তবে আমি তাহাও দিব।" রজনী আর থাকিতে পারিল না, ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে মহেন্দ্রের কাছে আসিয়া বসিল; কত বার মনে করিল যে, পায়ে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিবে যে, কি হইয়াছে, কিন্তু সাহস করিয়া পারিল না, মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। মহেন্দ্র মনের আবেগে তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিয়া গেল; রজনী ভাবিল সে কাছে আসাতেই বুঝি মহেন্দ্র চলিয়া গেল। আর থাকিতে পারিল না, কাতর স্বরে কহিল, "আমি চলিয়া যাইতেছি, তুমি শোও!" মহেন্দ্র তাহার কিছুই উত্তর না দিয়া অন্য মনেচলিয়া গেল।

ধীরে ধীরে বাতায়নে গিয়া বসিল। তখন মেঘমুক্ত চতুর্থীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিতেছেন। বাতায়নের নিম্নে পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর ধারের পরস্পর-সংলগ্ন অন্ধকার নারিকেল-কুঞ্জের মস্তকে অস্ফুট জ্যোৎস্নার-রজত রেখা পড়িয়াছে। অস্ফুট জ্যোৎস্নায় পুষ্করিণী-তীরের ছায়াময় অন্ধকার গম্ভীরতর দেখাইতেছে। জ্যোৎস্নাময় গ্রাম যতদূর দেখা যাইতেছে, এমন শান্ত, এমন পবিত্র, এমন সুষুপ্ত, যে মনে হয় এখানে পাপ তাপ নাই, দুঃখ যন্ত্রণা নাই; এক স্নেহ হাস্যময় জননীর কোলে যেন কতকগুলি শিশু এক সঙ্গে ঘুমাইয়া রহিয়াছে। মহেন্দ্রের মন ঘোর উদাস হইয়া গিয়াছে। সে ভাবিল, "সকলেই কেমন ঘুমাইতেছে, কাহারও কোন দুঃখ নাই, কষ্ট নাই, কাল সকালে আবার নিশ্চিন্তভাবে উঠিবে, আপনার আপনার কাজকর্ম্ম করিবে, কেহ এমন কাজ করে নাই, যাহাতে পৃথিবী বিদীর্ণ হইলে সে মুখ লুকাইয়া বাঁচে, এমন কাজ করে নাই যাহাতে প্রতিমুহূর্ত্তে তীব্রতম অনুতাপে তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে শেল বিদ্ধ হয়। আমিও যদি এইরূপ নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইতে পারিতাম, নিশ্চিন্তভাবে জাগিতে পারিতাম! আমার যদি মনের মত বিবাহ

হইত, গৃহস্থের মত বিনাদুঃখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতাম, স্ত্রীকে কত ভাল বাসিতাম, সংসারের কত উপকার করিতাম, কেমন সহজে দিনের পর রাত্রি, রাত্রের পর দিন কাটিয়া যাইত, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ও সমস্ত দিন ঘুমাইয়া এই বিরক্তি-ময় জীবন বহন করিতে হইত না। আহা—কেমন জ্যোৎস্না, কেমন রাত্রি, কেমন পৃথিবী! আঁধার নারিকেলবৃক্ষগুলি মাথায় একটু একটু জ্যোৎস্না মাখিয়া অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া আছে; যেন তাহাদের বুকের ভিতর কি একটি কথা লুকান রহিয়াছে, তাহাদের আঁধার ছায়া আঁধার পুষ্করিণীর জলের মধ্যে নিদ্রিত।" মহেন্দ্র কত ক্ষণ দেখিতে লাগিল, দেখিয়া দেখিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, "আমার ভাগ্যে পৃথিবী ভাল করিয়া ভোগ করা হইল না।" মহেন্দ্র সেইরাত্রেই গৃহত্যাগ করিতে মনস্থ করিল, ভাবিল পৃথিবীতে যাহাকে ভাল বাসিয়াছে, সকলকেই ভুলিয়া যাইবে। ভাবিল সে এপর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন উপকার করিতে পারে নাই, কিন্তু এখন হইতে পরোপকারের জন্য তাহার স্বাধীন-জীবন উৎসর্গ করিবে। কিন্তু গৃহে রজনীকে একাকিনী ফেলিয়া গেলে সে নিরপরাধিনী যে কষ্ট পাইবে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কিসে হইবে? একথা ভাবিলে অনেকক্ষণ ভাবা যাইত, কিন্তু মহেন্দ্রের ভাবিতে ইচ্ছা হইল না, ভাবিল না।

মহেন্দ্র তাহার নিজ দোষের যত কিছু অপবাদ-যন্ত্রণা, সমুদয় অভাগিনী রজনীকে সহিতে দিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল। বায়ু স্তম্ভিত, গ্রাম-পথ আঁধার করিয়া দুইধারে হরু-শ্রেণী স্তব্ধ-গম্ভীর-বিষণ্ণ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সেই আঁধার-পথ দিয়া, ঝটিকাময়ী নিশীথিনীতে বায়ুতাড়িত ক্ষুদ্র এক খানি মেঘখণ্ডের ন্যায় মহেন্দ্র যেদিকে ইচ্ছা চলিতে লাগিলেন।

রজনী ভাবিল যে, সে কাছে আসাতেই বুঝি মহেন্দ্র অন্যত্র চলিয়া গেল; বাতায়নে বসিয়া জ্যোৎস্না-সুপ্ত পুষ্করিণীর জলের পানে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

করুণা ভাবে এ কি দায় হইল, নরেন্দ্র বাড়ি ফিরিয়া আসে না কেন? অধীর হইয়া বাড়ির পুরাতন চাকরানী ভবির কাছে গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, নরেন্দ্র কেন আসিতেছেন না। সে হাসিয়া কহিল, সে তাহার কি জানে? করুণা কহিল "না, তুই জানিস্।" ভবি কহিল, 'ওমা, আমি কি করিয়া বলিব?" করুণা কোন কথায় কর্ণপাত করিল না, ভবির বলিতেই হইবে, নরেন্দ্র কেন আসিতেছে না। কিন্তু অনেক পীড়াপীড়িতেও ভবির কাছে বিশেষ কোন উত্তর পাইল না। করুণা অতিশয় বিরক্ত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল ও প্রতিজ্ঞা করিল যে, যদি মঙ্গলবারের মধ্যে নরেন্দ্র না আসেন, তবে তাহার যতগুলি পুতুল আছে সব জলে ফেলিয়া দিবে। ভবি বুঝাইয়া

দিল যে, পুতুল ভাঙ্গিয়া ফেলিলেই যে, নরেন্দ্রের আসিবার বিশেষ কোন সুবিধা হইবে তাহা নহে, কিন্তু তাহার কথা শুনে কে? না আসিলে ভাঙ্গিয়া ফেলিবেই ফেলিবে।

বাস্তবিক নরেন্দ্র অনেক দিন দেশে আসে নাই, কিন্তু পাড়ার লোকেরা বাঁচিয়াছে, কারণ আজকাল নরেন্দ্র যখনি দেশে আসে, তখনই গোটা দুই তিন কুকুর এবং তদপেক্ষা বিরক্তিজনক গোটা দুই চার সঙ্গী তাহার সঙ্গে থাকে, তাহারা দুইতিন দিনের মধ্যে পাড়া শুদ্ধ বিব্রত করিয়া তুলে, আমাদের পণ্ডিত মহাশয় এই কুকুর গুলা দেখিলে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।

যাহা হউক্, পণ্ডিত মহাশয়ের বিবাহের কথাটা লইয়া পাড়ায় বড় হাসিতামাসা চলিতেছে, কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিশ বাইশ ছিলিম তামাকের ধুঁয়ায়,গোটাকতক নস্যের টিপে এবং নবগৃহিণীর অভিমান-কুঞ্চিত ভ্রূমেণ-নিক্ষিপ্ত দুই.একটি বিদ্যুতা লোকের আঘাতে সকল কথা তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দেন। নিধিরাম ব্যতীত পণ্ডিত-মহাশয়কে বাটী হইতে কেহ বাহির করিতে পারিত না। পণ্ডিতমহাশয় আজকাল একখানি দর্পণ ক্রয় করিয়াছেন, চসমাটি সোণা দিয়া বাঁধাইয়াছেন, দূরদেশ হইতে সূক্ষ্মসূত্র উপবীত আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহার পত্নী কাত্যায়নী পাড়ার মেয়েদের কাছে গল্প করিয়াছে যে, মিন্সা নাকি আজ কাল মৃদু হাসি হাসিয়া উদরে হাত বুলাইতে বুলাইতে রসিকতা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন, কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়ের নামে পূর্ব্বে কখন এরূপ কথা উঠে নাই। আমরা পণ্ডিত মহাশয়ের রসিকতার যে দুই একটা নিদর্শন পাইয়াছি তাহার মর্ম্মার্থ বুঝা আমাদের সাধ্য নহে; তাহার মধ্যে প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহঙ্কার, প্রমা, অবিদ্যা, রজ্জুতে সর্পভ্রম, পর্ব্বতোবহ্নিমান ধূমাৎ ইত্যাদি নানাবিধ দার্শনিক হাঙ্গামা আছে। পণ্ডিতমহাশয়ের বেদান্তসূত্র ও সাংখ্যের উপর মাকড়্সায় জাল বিস্তার করিয়াছে, আজকাল জয়দেবের গীতগোবিন্দ লইয়া পণ্ডিত মহাশয় ভাবে ভরপুর হইয়া আছেন। এইত গেল পণ্ডিত মহাশয়ের অবস্থা। আর আমাদের কাত্যায়নী ঠাকুরাণীটি দিন কতক আসিয়াই পাড়ার মেয়ে মহল একেবারে সরগরম করিয়া তুলিয়াছেন; তাঁহার মত গল্পগুজব করিতে পাড়ায় আর কাহারো সামর্থ্য নাই,হাত পা নাড়িয়া, চোক্ মুখ ঘুরাইয়া চতুর্দ্দশ ভুবনের সংবাদ দিতেন, একজন তাঁহার নিকট কলিকাতা সহরটা কি প্রকার, তাহারই সংবাদ লইতে গিয়াছিলেন, তিনি তাহাকে বুঝাইয়া দেন যে, সেখানে বড় বড় মাঠ, সায়েবরা চাস করে, রাস্তায় দুধার সিপাহি শান্তিরি গোরার পাহারা, ঘরে ঘরে গরু কাটে ইত্যাদি আরো অনেক সংবাদ দিয়াছিলেন, সকল কথা আবার মনেও নাই। কাত্যায়নীর পতিভক্তি অতিরিক্ত ছিল; এবং এই পতিভক্তি সংক্রান্ত নিন্দার কথা তাঁহার কাছে যত শুনিতে পাইবে এমন আর কাহারো কাছে নয়, পাড়ার সকল মেয়ের নাড়ীনক্ষত্র পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন; তাঁহার আর

একটি স্বভাব ছিল যে, তিনি ঘণ্টায় ঘণ্টায় সকলকে মনে করাইয়া দিতেন যে, মিছা মিছি পরের চর্চ্চা তাঁর কোনমতে ভাল লাগে না, আর বিন্দু, হারার মা ও বোসেদের বাড়ির বড় বৌ যেমন বিশ্বনিন্দুক এমন আর কেহ নয়। কিন্তু তাহাও বলি, কাত্যায়নী ঠাকুরাণীকে দেখিতে মন্দ ছিল না,তবে চলিবার,বলিবার,চাহিবার ভাবগুলি কেমন এক প্রকারের, তা' হউক্ গে, অমন এক এক জনের স্বাভাবিক হইয়া থাকে।

ভানুসিংহের কবিতা।

বাজাও রে মোহন বাঁশী!
সারা দিবসক, বিরহ দহন-দুখ,
মরমক তিয়াষ (১) নাশি।
স্নিগ্ধ (২) মন-ভেদন, বাঁশরি-বাদন
কঁহা শিখলিরে কান?
হানে থির থির, মরম অবশকর
লহু লহু (৩) মধুময় বাণ!
ধস ধস করতহ, উরহ (৪) বিয়াকুল
ঢল ঢল অবশ-নয়ান।
কত কত বরষক, বাত সোঁয়ারয় (৫)
অধীর করয় পরাণ॥
কত শত আশা, পুরল না বঁধু
কত সুখ করল পয়ান।
(৬) পহগো কত শত, পিরীত-যাতন
হিয়ে বিঁধাওল বাণ।
হৃদয় উদাসয়, নয়ন উছাসয়
দারুণ মধুময় গান।
সাধ যায় বঁধু, যমুনা বারিম
ডারিব দগধ-পরাণ॥

সাধ যায় পহু, রাখি চরণ তব
হৃদয় মাঝ হৃদয়েশ!
হৃদয় জুড়াওন, বদন-চন্দ্র তব
হেরব জীবন শেষ॥
সাধ যায় বঁধু, তোঁহার দেহ
মিলাওব দেহ মু মোর।
হরখে নিতি নিতি, চরণ পখালব (৭)
ডারয় লোচন-লোর (৮)॥
সাধ যায় বঁধু! দুঁহু দুঁহু মেলই
ইঁহসে (৯) করই পয়ান,
মেঘ মেঘ পর, হরখে ভরনিব,
দুঁহু মিলি করইব গান॥
সাধ যায় ইহ, চাঁদম কিরণে,
বসন্ত বায়ু সুশীতে,
কুসুম পরিমলে, প্রাণ মিশায়ব,
বাঁশিক সুমধুর গীতে॥
প্রাণ ভৈরবে (১০) মঝু (১১) বেণু গীতময়
রাধাময় তব বেণু।
জয় জয় মাধব, জয় জয় রাধা
চরণে প্রণমে ভানু॥

(১) তৃষা
(২) হৃদয়
(৩) লঘু
(৪) বক্ষ
(৫) স্মরণ করাইয়া দেয়
(৬) প্রভু
(৭) প্রক্ষালিত করিব
(৮) জল
(৯) এখান হইতে
(১০) হইবে (১১) আমার

ভারতবর্ষীয় ইংরাজ।

ইংরাজদের আচার ব্যবহারে ভাল মন্দ মিশ্রিত আছে। তাহা কতক আমাদের জাতীয় ভাবের ও দেশের উপযোগী, কতক অনুপযোগী। এস্থলে বক্তব্য এই যে, ভালর সঙ্গে সঙ্গে যেন আমরা মন্দটা গ্রহণ না করি। যদি অনুকরণ করাই আবশ্যক হয় তবে দেখিয়া শুনিয়া বিবেচনা খাটাইয়া যেন অনুকরণ করি। এমন মনে করিও না যে, ইংরাজী রীতি-নীতি অবলম্বন করিলে ইংরাজ-সমাজে সমাদৃত হইবে। বরং তাহাতে তোমার একুল ওকুল দুকুল যাইবারই সম্ভাবনা। এই প্রসঙ্গে আমার একটা কথা মনে পড়িল। আমার বিলাত-ফেরতা এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধু দেশীয়-বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজী পরিচ্ছদ পরিধান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার এক ইংরাজ নাচ-মজলিসে নিমন্ত্রণ হয়। তিনি কি কাপড় পরিয়া যাইবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না। পরে এই সকল মজলিসে ইংরাজেরা যে লাঙ্গুল-বিশিষ্ট কোট ব্যবহার করে, তাহার অনুরূপ কোট পরিয়া যাওয়াই ধার্য্য হইল। একজন দরজিকে ডাকাইয়া কোট ফতুই প্রভৃতি তাঁহার মনের মত পোষাক প্রস্তুত করিয়া সং সাজিয়া গিয়া উপস্থিত। আমি তাঁহাকে ইংরাজদের পরিহিত পরিচ্ছদের সঙ্গে তাঁহার কাপড়ের তুলনা করিয়া দেখাইয়া দিলাম যে, তাহার সঙ্গে ইহার অনেক অমিল—ইহা দেখিয়া তিনি কিছু অপ্রতিভ হইলেন। ইহা অপেক্ষা তাঁহার নিজের মহারাষ্ট্র-বেশে তাঁহাকে শতগুণ মানাইত ও এরূপ মনঃক্ষুণ্ণ হইতে হইত না। বিদেশীয় রীতির অনুকরণ করিতে গিয়া আমাদের অনেক স্থলে এই বিপদে পড়িতে হয়। ভারতকুলবালা যদি গৌন ও পেটিকোট ব্যবহার করেন, তবে তাঁহাদের পদে পদে অপদস্থ হইতে হয় সন্দেহ নাই। বিবির সাজ-সাজিতে হইলে কাল-সহকারে যে ফ্যাসানের পরিবর্ত্তন হয়, তাহার উপর বিশেষ লক্ষ্য না রাখিলে সভ্য-সমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে, এটী যেন তাঁহাদের মনে থাকে।

প্যারিসে কখন্ কোন্ নূতন 'ফ্যাসনের' সৃষ্টি হইল—কোন্ পুরাতন 'ফ্যাসন' উঠিয়া গেল—আজিকার ধরণ 'ক্রিনলীন' কি মার্জ্জনী গৌণ, হে বিবিয়ানা-পরায়ণা ভারত-কুল-ললনা, এসকল নিগূঢ় তত্ত্বের প্রতি উদাসীন থাকিও না। ফ্যাসনের ব্যাকরণ যেন তোমার কণ্ঠস্থ থাকে—ফ্যাসনের স্রোতের সঙ্গে তোমায় সাঁতার দিতে হইবে—নতুবা বিলাত-সমাজে উপহাসাস্পদ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কিন্তু সৎপরামর্শ গ্রহণ কর ত ও পথে যাইও না।

ইংরাজ ও দেশীয়দের মধ্যে যে বিচ্ছিন্ন ভাব, তাহা প্রকৃতিতে এরূপ বদ্ধমূল যে, বোধ হয় না তাহা কোন কালে অপনীত হইবে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে

গেলে অনেক গুলি কারণ উপলব্ধি হয়।

প্রথমতঃ ইংরাজদের সহিত আমাদের জেতৃজিত সম্বন্ধ। তাঁহারা রাজার জাতি—আমরা পরাজিত প্রজার জাতি। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণ বর্ণের মধ্যে যে পরস্পর বিদ্বেষ ভাব, তাহা পৃথিবীর সকল স্থানেই দৃষ্ট হয়। যুদ্ধেই হউক—বসতির জন্যই হউক—বাণিজ্য ব্যবসার উদ্দেশেই হউক—যে কোন কারণে এই দুই জাতি একত্রিত হয়—শ্বেতাঙ্গ পুরুষ আপনার শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিতে ত্রুটি করেন না। তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ ভ্রাতার সহিত আপনার সামাজিক সম্মিলনের পথ আটে ঘাটে বন্ধ করিয়া রাখেন। বৈদিক কালে আর্য্য ও দস্যুদের মধ্যে এই কারণেই বিশেষ বিদ্বেষ লক্ষিত হয়। এই বর্ণ-ভেদের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ ও ভারতবাসীদিগের মধ্যে ভাষা, ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার বিষয়ে সম্পূর্ণ বিভিন্নতা। এই জাতিগত বৈষম্য হইতে বিদ্বেষ ভাব উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক। এ ভাব যে কোন কালে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইবে তাহার কোন চিহ্ন দেখা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ ইংরাজেরা এদেশে চারি দিনের যাত্রী; কতক দিন বাস করিয়া টাকা করিয়া স্বদেশে চলিয়া যান। ইউরোপ ও এদেশের মধ্যে যাতায়াতের এক্ষণে যেরূপ সুবিধা হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষের উপর ইংরাজদের টান থাকিবার অল্পই সম্ভাবনা। পূর্ব্বে এক এক জন ইংরাজের দেশীয়দের উপর সময়ে সময়ে বিলক্ষণ মমতা দেখা যাইত—তাহার কারণ এই, তাঁহারা ভারতবর্ষে অধিক কাল বাস করিয়া এদেশকে স্বদেশতুল্য জ্ঞান করিতেন কিন্তু এক্ষণে আর সে ভাব নাই। ইংরাজেরা এখানে প্রবাসীর মত থাকিয়া চলিয়া যান। দেশ-ভ্রমণে দুই চারি দিনের জন্য যাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় তাহার সহিত বিশেষ সখ্যতা সচরাচর ঘটে না। "নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে সুখে, প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন।" বিশেষতঃ ইংরাজদের যেরূপ স্বভাব তাহাতে তাঁহারা বিদেশীয়দের প্রিয়পাত্র কখনই হইতে পারেন না। ইংরাজেরা যখন বিদেশে ভ্রমণ করেন তখন তাঁহাদের 'ঘনবুল' ভাব সকলেরই অপ্রীতিকর হইয়া উঠে। স্বকীয় রীতি-নীতি হইতে যাহা ভিন্ন তাহা ইংরাজের চক্ষে নিতান্ত ঘৃণাস্পদ। তাঁহার সেই 'রোষ্টবীফ' ও বিয়র মদ্য ভিন্ন পারিসের উৎকৃষ্ট হোটেলেও তৃপ্তি হয় না। ইংরাজেরা পৃথিবী জুড়িয়া আপনাদের রাজত্ব বিস্তার করিতেছেন কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ দ্বীপোচিত ক্ষুদ্রভাব পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন জাতির সঙ্গে মিশিতে পারেন না, তাঁহাদের স্বভাবই এরূপ নয়। ইংরাজ ও ইউরোপীয় অন্যান্য জাতির মধ্যে যখন এমন অমিল তখন এদেশীয়দের ত কথাই নাই। ইউরোপে ভাষা রীতি নীতি আচার ব্যবহারে অনেক সাদৃশ্য আছে, কিন্তু এখানে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আগা গোড়া সকল বিষয়েই অমিল। আমাদের বর্ণ রীতি নীতি সকলই ভিন্ন। এমন সাধারণ ঐক্য-স্থল

নাই যাহার উপর পরস্পরের প্রীতি সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হইতে পারে। যে যাহাকে দেখিতে পারে না, তাহার চলন বাঁকা, ইংরাজ ও দেশীয় মধ্যে এই রূপ সম্বন্ধ। ইংরাজ এদেশকে কখনই আপনার বলিয়া মনে করিতে পারেন না। ইহার জল বায়ু তাঁহার সহ্য হয় না, ইচ্ছা করিলেও এদেশে অধিক কাল বাস করিতে অক্ষম। পিতা-মাতা, পুত্র কন্যাকে অল্প বয়সেই আপনাদের ভারতগৃহ হইতে বিযুক্ত করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। মাতা ভারত হইতে ইংলণ্ডে, ইংলণ্ড হইতে ভারতে যাতায়াত করিয়া জীবন যাপন করেন। স্বামীকেও নিতান্ত একলাটি রাখিতে পারেন না—সন্তানগণেরও মধ্যে মধ্যে তত্ত্বাবধান আবশ্যক। পিতাও হয়ত অনতিকাল বিলম্বে 'লিবর' রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার স্ত্রী পুত্র পরিবারের সহিত গিয়া মিলিত হন। এদেশে তাঁহারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে আসেন, অর্থ সঞ্চয় করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন। এ দেশ কর্ম্ম-ক্ষেত্র, স্বদেশ ভোগালয়—এ দেশে আয়, সে দেশে ব্যয়—শরীর এখানে, মন ওখানে—সুতরাং দেশীয় ও ইংরাজ মধ্যে প্রণয়-বন্ধন কি রূপে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে?

আমি বলিয়াছি ইংরাজেরা যেখানেই যাক, তাহাদের জাতীয় ক্ষুদ্র ভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না। এ দেশে তাহাদের আচার ব্যবহারে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যৎকালে নিদাঘ তাপের আতিশয্যে সমস্ত প্রাণী আকুল, মনুষ্যেরা ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে, তখন ইংরাজেরা তাহাদের বনাতের কোট পাণ্টুলুন পরিধান করিয়া গ্রীষ্মের কষ্ট দ্বিগুণিত করে। প্রখর রৌদ্রের সময় তাহারা মহা সাজ গজ্জা করিয়া পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে বাহির হয়। এ দেশে সকল ঋতুতে বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে বিশুদ্ধ সুশীতল বায়ু সেবনের সময় প্রাতঃকাল ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত; কিন্তু রাত্রের খানা-পিনা নৃত্য-গীত আমোদ-প্রমোদে রাত্রি জাগরণ করিয়া উষার সঙ্গে সঙ্গে গাত্রোত্থান করা কিরূপে সম্ভবে? আবার এ দেশে প্রচুর আমিষ ভক্ষণ, সুরাপান শরীরের উপযোগী নহে, ইহা সকলেই স্বীকার করিবে। ভারতবাসীদের অনেকেই নিরামিষাশী, উদ্ভিদ্-ভোজী, কোন কোন জাতির তণ্ডুলমাত্র জীবনের একমাত্র অবলম্বন; এই রূপ মিতাহার এ দেশে স্বাস্থ্য রক্ষার প্রধান উপায়; কিন্তু ইংরাজদের আহারের রীতি দেখিলে বোধ হয় না যে, তাঁহারা উষ্ণ দেশে বাস করিতেছেন। প্রাতঃকালে ৬টা ৭টার সময় চা, রুটি, মাখন, ডিমসিদ্ধ প্রভৃতি 'ছোটা হাজরি'—৯টা ১০টার সময় মদ্য মাংস সমেত 'বড়া হাজরি'—২টার সময় ঠাণ্ডা গরম মাংস মিষ্টান্নের ফলারের টিফিন— ৪টা ৫টার সময় চা বিস্কিট ইত্যাদি—৭।৮টার সময় মদ্য মাংসের ভূরি ভোজন, সময় বিশেষে মধ্যরাত্রির সপর—এই ত তাহাদের পানাহারের নিয়ম, পানীয় মধ্যে ব্রাণ্ডি আর সোডা সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইহার অর্থ জনৈক ফরাসি পরিব্রাজক Count Goblet D'Almeida

এইরূপ করেন যে, আরম্ভে অল্প ব্রাণ্ডি অধিক সোডা ও শেষে অধিক ব্রাণ্ডি অল্প সোডা। ইহার আর এক নাম 'Peg' পুঁটি অর্থাৎ জীবনের অবলম্বন। এই রূপ অপর্য্যাপ্ত আহার-পানে যে তাহাদের স্বাভাবিক বলিষ্ঠ সুস্থ শরীর 'লীবর' ও অন্যান্য পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া তাহাদিগকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য স্বদেশে যাইতে বাধ্য করে, তাহাতে বিচিত্র কি? কেমন করিয়া এত দিন টিকিয়া থাকে এই আশ্চর্য্য?

তৃতীয়তঃ জাতিতে জাতিতে সখ্য-বন্ধন হইবার পূর্ব্বে আচার ব্যবহারের কতকটা মিল চাই, কিন্তু তাহার কিছুই নাই। তাহারাও যেমন আমাদিগকে দূরে রাখিতে চায়, আমরাও তেমনি তাহাদের হইতে দূরে থাকিতে চাই, তাহারা আমাদিগকে পরাজিত জাতি বলিয়া অবজ্ঞা করে, আমরাও তাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করি। অতএব আমাদের পরস্পর সদ্ভাবের সঞ্চার কোথা হইতে হইবে।

চতুর্থতঃ ইংরাজের স্বভাবই কতকটা সামাজিকতার বিরোধী। শুদ্ধ আমাদের সম্বন্ধে কেন—তাহাদের আপনাদের মধ্যেও পরস্পরের ব্যবহারে এই পার্থক্য-প্রকাশ পায়। ইংরাজেরা আমাদের জাতিভেদ-প্রথা অনিষ্টকর বলিয়া বর্ণন করে, কিন্তু ইংরাজ-সমাজে বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় ইংরাজ-সমাজে যে জাতিভেদ বিলক্ষণ প্রবল, পদে পদে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তাহাদের জাতিভেদ ধন ও পদ মর্য্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত, আমাদের জাতিভেদ বংশ-মর্য্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত। একজন নীচ বংশোদ্ভব কমিসনর হয়ত আপনা হইতে উচ্চকুল-জাত সহকারী কমিসনরের সহিত একত্রে ভোজন করিতে সম্মত হইবেন না। চিহ্নিত পদস্থ কর্ম্মচারী ও অচিহ্নিত পদস্থ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যে সামাজিক স্বতন্ত্রতা তাহা ত জানাই আছে। অচিহ্নিত পদের লোকেরা রূপে গুণে কুলে শীলে যেমনই হউন না কেন, তাঁহাদের হেয় জ্ঞান করা চিহ্নিত পদারূঢ় কর্ম্মচারীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কলেক্টর সহকারী কলেক্টরের সহিত সমকক্ষ হইয়া চলিবেন, কেন না তাঁহারা উভয়েই চিহ্নিত দলের লোক, কিন্তু অচিহ্নিত ডেপুটির সহিত তাঁহার স্বতন্ত্র ব্যবহার।

ইংরাজ ও আমাদের মধ্যে সহজ ভাবে দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় হইবার আর এক প্রতিবন্ধক এই যে, তাঁহাদের হাতে কর্ম্মচারী নিয়োগের সমস্ত ভার অর্পিত। আমাদের মধ্যে অনেকে কেবল কর্ম্ম-প্রার্থী হইয়া ইংরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। আমাদের সম্বন্ধে তাঁহারা এই দাতা ও প্রার্থীর ভাব ভুলিতে পারেন না। দেশীয় কোন ভদ্র লোক যে নিঃস্বার্থ ভাবে আলাপ করিবার মানসে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন, ইহা সহজে তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন না। তাঁহার সাক্ষাৎকারে কোন না কোন স্বার্থ-লাভ অভিসন্ধি থাকিবে, ইহা তাঁহারা আগে থাকিতে স্থির করিয়া লন। সুতরাং তাঁহারা আমাদের সকলেরই নিকট হইতে 'সেলাম' প্রত্যাশা করেন, স্বাধীন ভাবে তাঁহাদের সহিত দেখা ক-

রিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র, কেন না তাহার কোন প্রতিদান নাই।

তুমি একজন সাহেবের বাটীতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কর, তিনি কি কখন তোমার বাটীতে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন? এরূপ প্রত্যাশা বৃথা। ঘরাও রকমে সাহেবদের সহিত আলাপ পরিচয় হয়, ইহা যদিও অনেক কারণে প্রার্থনীয়, কিন্তু সম্ভবপর নহে। আমরা গৃহে কিরূপে বাস করি, আমাদের আন্তরিক ভাব কি, আমাদের গার্হস্থ্য প্রণালী রীতি নীতি কিরূপ, সমস্ত জীবন ভারতবর্ষে কাটাইয়া কোন ইংরাজ তাহা জানিতে পারেন কি না সন্দেহ। যখনি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়, তখনি আমরা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া মনের শোক দুঃখ সম্বরণ করিয়া সহাস্যবদনে তাঁহাদিগকে দর্শন দিই। আমাদের প্রকৃত অবস্থা তাঁহাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত, আমাদের গৃহদ্বার তাঁহাদের প্রতি রুদ্ধ। আমরা ভিক্ষুক হইয়া তাঁহাদের দ্বারে উপস্থিত হই, তাঁহারা দাতা হইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-উপহার প্রত্যাশা করেন।

যুবরাজ যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন তখন তিনি ইংরাজ ও এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে বিদ্বেষভাব দর্শন করিয়া বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এভাব যে কিসে বিদূরিত হইবে, তাহার উপায় আবিষ্কার করা সহজ নহে। দুই পক্ষেরই কিছু কিছু দোষ, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। দুই পক্ষের লোকেরা কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার না করিলে সদ্ভাব সঞ্চারের সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ ইংরাজেরা রাজার জাতি, তাঁহারা অল্প প্রয়াসেই আমাদের সদ্ভাব আকর্ষণ করিতে পারেন। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, কোটি কোটি প্রজা-পুঞ্জের সহিত এই ভারতবর্ষ জয় করিয়া সেই সকল প্রজাকে সুখী করা ও তাহাদের প্রীতি আকর্ষণ করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রজা-রঞ্জন রাজার প্রধান ধর্ম্ম। তাঁহারা যদি একপদ অগ্রসর হইয়া আসেন আমরা সহস্র পদ অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের নিকট যাইতে প্রস্তুত। আমাদের যদি কোন বিষয়ে দোষ থাকে ত তাঁহারা ক্ষমাদৃষ্টিতে দেখুন, কেন না "শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা।" তাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধিতে আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের উচিত যে, আমাদের হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যান। যদি কখন এমন সময় আসে যে, তাঁহাদিগকে এ দেশ ছাড়িয়া যাইতে হয়, তখন তাঁহারা গৌরবের সহিত বলিতে পারিবেন যে, আমরা তোমাদিগকে শিক্ষিত ও স্বাধীন করিয়া দিয়াছি, এখন তোমরা আপনাদিগকে আপনারা রক্ষা কর। তখন তাঁহারা কোটি কোটি লোকের আশীর্ব্বাদের পাত্র হইবেন। এমন সময় উপস্থিত হইলে আমরা সদ্ভাবের সহিত পরস্পর বিযুক্ত হইব ও তাঁহাদের রাজত্ব-কালে যে বহুবিধ উপকার লাভ করিয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট চিরকাল ঋণজালে বদ্ধ থাকিব। ভারতের সহিত ইংলণ্ডের যোগ ঈশ্বর মঙ্গলেরই জন্য বিধান করিয়াছেন, কিন্তু ইহা হইতে যত শুভ ফল

প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার জন্য উভয় জাতিরই যত্ন ও চেষ্টার আবশ্যক। ইংরাজেরা আমাদিগকে অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারে। তাহারাও আমাদের নিকট অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারে। বিশেষতঃ ইংরাজমহিলা আমাদের স্ত্রীগণ হইতে অনেক বিষয়ে শিক্ষা পাইতে পারেন। কিন্তু এ দেশীয় ইংরাজ মহিলারা কোন বিষয়ে আমাদিগের স্ত্রীগণের আদর্শ হইতে পারেন না। এ দেশে ইংরাজদের গার্হস্থ্য বিধানের আমরা কিছুই দেখিতে পাই না। যদি এ দেশীয়দিগের সহিত তাঁহাদের মমতা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদের সময় কাটাইবার জন্য বৃথা আমোদ অন্বেষণ করিতে হইত না, কিন্তু এক্ষণে কি দেখা যায়? ইংরাজ রমণীগণ কিরূপে সময়ক্ষেপ করেন? স্বামী সমস্ত দিবস কাজ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া সুখালাপে বঞ্চিত ও শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে প্রত্যাগমন করেন। স্ত্রী একাকিনী সময়ের ভার বহন করিতে থাকেন। সমস্ত দিনের মধ্যে ঘরের বাহির হইবার উপায় নাই। সন্তানগণ ১৫ বৎসর বয়ঃক্রমে শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়, তিনি তাঁহার সন্তান হইতেও বিযুক্ত। বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস হয়ত তিনি স্বামী হইতে দূরে কোন পর্ব্বত প্রদেশে বাস করেন, স্বামী সত্ত্বেও তাঁহাদের বৈধব্য-যন্ত্রণা* ভোগ করিতে হয়। কোন বিশেষ জন-হিতকর কার্য্য হস্তে নাই যে, তাহাতে মনোনিবেশ করিয়া সুখী হইবেন। স্বামীর অগাধ ধন-কোষ তাঁহার হস্তে রহিয়াছে, এমন কোন ভোগের সামগ্রী নাই যাহা তাঁহার দুষ্প্রাপ্য; ইচ্ছামত আপনার সমুদয় প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারেন, অথচ তিনি সুখী নহেন। যে গরীব প্রজাপুঞ্জ দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত, তাহাদের অস্তিত্বের প্রতিও তিনি সন্দিহান। এই অবস্থায় তিনি যে আমাদের মহিলাগণের আদর্শ ও উপদেষ্ট্রী হইবেন এরূপ আশা করা বৃথা।

ইংরাজ ও ভারতবর্ষীয়দের সম্বন্ধে পূর্ব্বোল্লিখিত ফরাসিস্ পরিব্রাজক আপনার সদ্য-প্রণীত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত L'Inde et Himalaya গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করি।

"আমার ভারতবর্ষে অবস্থিতি কালে অনেক ইংরাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কি দেখিয়া তোমার সকল অপেক্ষা আশ্চর্য্য বোধ হইল? আমি ইহার উত্তরে বলিতে পারিতাম, এ দেশে তোমাদের দেখিয়া, বিশেষতঃ তোমরা এখানে এত দিন টিঁকিয়া রহিয়াছ তাহা দেখিয়া। বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ কথা সামান্য প্রশংসার কথা নয়, কেন না ৬০,০০০ বের অনধিক ইউরোপীয় সৈন্য দ্বারা বশীভূত ২৫ কোটি হিন্দুর উপর যে দুর্দ্ধর্ষ অটল রাজত্ব স্থাপন, ইহাতে শুদ্ধ প্রজাগণের অসাধারণ সহিষ্ণুতা প্রকাশ পায় তাহা নহে, কিন্তু ইহা হইতে ইংরাজদিগের প্রভাবশালী অথচ বিচক্ষণ শাসনপ্রণালী উপলব্ধি করা যাইতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে এই রূপ জয়লাভের উপযোগী যে সকল গুণ,

* এই রূপ বিধবাকে ইংরাজিতে grass widow কহে।

এমন কি যে সকল দোষ থাকা আবশ্যক তাহা তাহাদের আছে। মুনীতি রক্ষা করিতে গিয়া আসল-কাজে-ভুলিয়া-না যাওয়া কার্য্যদক্ষতা; একাধিপত্যও থাকিবে অথচ তাহা যথেচ্ছাচারে পরিণত হইতে পারিবে না, এরূপ রাজনীতি-কুশলতা; শাসন সম্বন্ধে কঠোর ন্যায় রক্ষা ও সত্যপালন; বিজাতীয় ধর্ম্মের প্রতি চিরাভ্যস্ত সদয়দর্শিতা; দ্রুতগতি না হউক স্থায়ী উন্নতির নিদানভূত আমূল সংস্কারের বশবর্ত্তিতা; প্রজাগণের কল্যাণ-সাধনে মনের সহিত যত্ন করেন এতটুকু ধর্ম্মজ্ঞান; প্রজাগণের অজস্র তোষামোদ ও আভ্যন্তরিক অসন্তোষ এ উভয়কেই উপেক্ষা করিতে পারেন এতটুকু অহঙ্কার; এই সকল গুণে ভারতবর্ষের উপর অটল রাজ্য স্থাপন বিদেশীয় রাজার যতদূর সাধ্যায়ত্ত, ইংরাজেরা তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। ভারতবর্ষের জল বায়ু ইউরোপীয় প্রকৃতির অনুপযুক্ত বলিয়া এ দেশ তাঁহাদের স্থায়ী বসতির উপযুক্ত স্থান নহে; সুতরাং তাঁহাদিগকে স্বদেশ হইতে নিত্য নূতন নূতন লোক আনাইয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, ইহাতে রাজা প্রজার পার্থক্যভাব দূরীভূত হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল জাতি ভারতের উপর আধিপত্য স্থাপনান্তর দুর্গতিগ্রস্ত হইয়াছে তদনুরূপ দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ পাইবার ইহা এক প্রধান কারণ বলিতে হইবে। এই কারণে রক্ষণশীলতা ও শাসনানুরাগরূপ স্বর্গীয় অগ্নি ইংরাজদের হৃদয়ে নিরন্তর প্রজ্বলিত দেখা যায়।"

"যে প্রভু তাঁহার আজ্ঞাধীন ভৃত্যকে তাহার নিজের ইচ্ছা-বিরুদ্ধে সুখী করিতে চাহেন, সে প্রভু কখন ভৃত্যের প্রিয় পাত্র হইতে পারেন না। যে জাতি চিরন্তন প্রথানুসারে সহজ ও অকৃত্রিম শাসনের অভ্যাসাধীন, তাহাদের মধ্যে কঠোর ও কৃত্রিম শাসন-প্রণালী প্রচলিত করিতে যে সঙ্ঘর্ষণ উপস্থিত হয়, তাহা ত ইংরাজদিগের জনসাধারণের নিকট অপ্রীতিভাজন হইবার এক কারণ, কিন্তু তাহা ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে পাইবে যে, ইংরাজদের এমন কিছুই গুণ নাই যাহাতে তাহারা পরাজিত জাতির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। তাহারা তাহাদের উচ্চতর সভ্যতার গুণে ভারতের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর বটে, কিন্তু তজ্জনিত অহঙ্কার প্রকাশেও তাহারা নিরস্ত নহে। ইংরাজেরা স্থায়ী কিন্তু ভদ্র নহে, ইহা সকলেরই মুখে শুনা যায়। কলিকাতা, বোম্বাই সিংহল যেখানেই হউক, যখনি শিক্ষিত ও স্বাধীনতা-প্রিয় দেশীয় ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিয়াছি, আর তাহারা আমাকে বিদেশী জানিয়া অসঙ্কোচে আমার নিকট তাহাদের মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছে, তখনি ঐরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়াছি। উচ্চপদস্থ দেশীয়দের সহিত ইংরাজেরা যেরূপ ব্যবহার করে, তাহা আমাদের দেশে একজন সামান্য ভৃত্য কি গাড়োয়ানও সহ্য করিয়া থাকিতে পারে না। কাজ কর্ম্মের সম্বন্ধে ইংরাজেরা দেশীয়দের সহিত সাধু ও ভদ্র ব্যবহারে সচরাচর ত্রুটি করে না বটে, কিন্তু ভারতবর্ষবাসীদিগের সহিত ঘরাও

ভাবে মিলিতে তাহারা কোন ক্রমেই সম্মত নহে। তাহারা আপনাদের সমাজ-দুর্গ দেশীয়দিগের আক্রমণ হইতে প্রাণপণে রক্ষা করে ও সাধ্যমতে দেশীয়দের সংস্রব হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করে—এমন কি বাষ্প শকটে ভ্রমণ-কালীন ইউরোপীয় ও দেশীয়দের এক গাড়ীতে একত্রে উপবেশন, ইহাও দুর্লভ-দর্শন। বোধ হয় যেন ইংরাজেরা দেশীয় সমাজে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত করিয়া আপনাদের এক নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছেন। সে সম্প্রদায় পূর্ব্বতন প্রথানুযায়ী ধর্ম্ম-সংস্কারের উপর স্থাপিত নহে, কিন্তু বিভেদ ও জাত্যভিমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজয়ী ও পরাজিত জাতির ভদ্র কুলের মধ্যে আদান প্রদানের পথ একেবারে অবরুদ্ধ—এরূপ উদাহরণ ইতিহাসে আর কোথাও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। মিশ্র ফিরিঙ্গিজাতি, ইউরোপীয় ও দেশীয় রক্তের সম্মিশ্রণে যাহাদের উৎপত্তি, তাহারা কোথায় এই উভয় জাতির সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদের একতা সম্পাদন করিবে, না উভয় জাতিরই সমাজ হইতে তাহারা বহিষ্কৃত। যে দিকে নেত্রপাত করি, এ দুই জাতির মধ্যে মমতা বা সামাজিক ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় একতা দৃষ্টি-গোচর হয় না। বঙ্গের অনধিক ইউরোপীয় কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত এই দুই শত পঞ্চাশ কোটি আসিয়াবাসী যখন আপনাদের বল ও অধিকার বিষয়ে চেতনা লাভ করিবে, তখন যে কিরূপে ইংরাজ-রাজ্য রক্ষিত হইবে বলা যায় না। একমাত্র ভরসা এই যে ইংরাজেরা যে গুরুতর শিক্ষা কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন ও যাহা তাঁহাদেরই দ্বারা সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা, তাঁহারা যেন তাহার পরিপক্কতা সাধন করিবার সময় পান; তাঁহাদের রাজ্য যেন অকালে বিনাশ প্রাপ্ত না হয়।"

শ্রীস——

বঙ্গে সমাজ-বিপ্লব।

বিশৃঙ্খলা অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারে না। প্রাকৃতিক ঘটনায় এক একটা যে বিপ্লব-বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকল প্রকৃতির কার্য্য-শৃঙ্খলারই একটি অঙ্গ। বিপ্লব-বিশৃঙ্খলার অর্থই এই যে, এখন যে অবস্থা আছে ইহা এখনকার সময়ের উপযোগী নহে, ইহা পরিবর্ত্তিত না হইলে সমূহ অনিষ্ট হইবে। বর্ত্তমানে যখনই বিপ্লব দেখিব, তখনই জানিব যে, ভূতকালের যে ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছি, তাহা জীর্ণ বা অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতে পুনঃসংস্কার হইবে। যেখানকার বায়ু লঘু হইয়া যাইবে,

সেইখানেই চারিদিক হইতে বায়ুর স্রোত আসিয়া একটি ঝটিকা বাধিবে বটে, কিন্তু তাহার ফল এই হইবে যে, বায়ু পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। মনুষ্যের সামাজিক-রাজ্যেও সেইরূপ এক এক সময় ঝঞ্ঝা ঝটিকা বহিতে থাকে, তখন সকলেই ভয় করেন যে, বুঝি সমাজের সমুদয় শৃঙ্খলা উলট্‌পালট্‌ হইয়া যায়। কিন্তু তাঁহাদের ভয় করিবার কোন কারণ নাই; তাঁহারা যদি ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইতেন, ত দেখিতেন যে, জীর্ণ সমাজের কতক কতক ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আবার দৃঢ়তর উপাদানে নূতন সমাজ নির্ম্মিত হইয়াছে। রাজপুরুষের একাধিপত্য অনেক দিন ইউরোপখণ্ডে চলিয়া আসিতেছিল, হয়ত ততদিন প্রয়োজন ছিল, কিন্তু যখনি সে সময় অতীত হইয়া গেল, অমনি একটা বিপ্লব বাধিল; দারুণ রক্তপাত, অরাজকতা, অত্যাচার উপস্থিত হইল, কিন্তু পরিণামে তাহা হইতে অশুভ ফল উৎপন্ন হইল না। অসভ্য অবস্থায় অসাধারণ পরাক্রমশালী প্রভুর প্রয়োজন ছিল, নচেৎ তখনকার দুর্দ্দান্ত লোকেরা যুক্তিতে বা সুনিষ্ট ব্যবহারে বশ হইত না, কিন্তু সে অবস্থা চলিয়া গেলে সে নিয়ম খাটিল না। এক কথায় বলিতে গেলে বিপ্লব আপাততঃ অতিশয় বিকটাকার বোধ হইলেও পরিণামে তাহা হইতে অনেক শুভ ফল উৎপন্ন হয়। যখনে যখন দারুণ মড়ক হইয়াছিল, তখন যে অগ্নিদাহ হয়, তাহা হইতে যদিও অনেক অনিষ্ট ঘটিয়াছিল, কিন্তু মড়কের বীজ দগ্ধ হইয়া গুরুতর অনিষ্ট নিরাকৃত হয়।

বঙ্গদেশের প্রাচীন লোকেরা সভয়ে দেখিতেছেন, যে, নূতন বংশের অভ্যুত্থানশীল যুবকদের মধ্যে অতিশয় বিপ্লব চলিতেছে। তাঁহারা ভাবিতেছেন, কলির সন্ধ্যাকাল বুঝি উপস্থিত হইয়াছে; কেহ কাহাকে মানে না, সকলেই স্ব স্ব প্রধান, স্বদেশ-সম্বন্ধে-অভিজ্ঞ বৃদ্ধদের কাছে তাহারা পরামর্শ চায় না, বিদেশের সর্ব্ববিদ্যাভিমানী গ্রন্থকারের কথাই তাহাদের বেদবাক্য, প্রাচীন প্রথার অনুসরণ করিতে নিতান্ত বিমুখ, এবং ভালই হউক্‌ আর মন্দই হউক্‌ তাহা লঙ্ঘন করিতে পারিলে আপনাকে মহাবীর বলিয়া মনে করেন, সকলেই মনে করেন, আমারই উপর বিধাতা এই অসভ্য বঙ্গ দেশের সংস্কারের ভার অর্পণ করিয়াছেন, আমার কথাতেই সকলে চলিবে, আমি কাহারো কথায় চলিব না, এবং যাঁহারা একবার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পদার্পণ করেন বা তথা হইতে নির্গত হন, তাঁহারা দেশের লোকের রুচির, জ্ঞানের, সভ্যতার দোষ ধরিয়া বেড়ান, তাঁহারা মনে করেন সকল বিষয়েই আমার অধিকার আছে, এই জন্য তিনি বুঝুন বা না বুঝুন সকল কথা লইয়াই তোলাপাড়া করিয়া থাকেন। যাহা হউক, আমাদের এই নব্য বংশ এখনো বৃদ্ধদের শাসনে আছেন, কিন্তু যখন এই প্রাচীনবংশ লোপ পাইবেক, তখন এই যথেচ্ছাচারী শত শত শিক্ষিত লোক কি গোলযোগ বাধাইবেন কে বলিতে পারে।

এই সকল ভাবিয়া অনেকে ভয় পাইতেও পারেন, কিন্তু আমরা বলি এ বিপ্লব চিরকাল থাকিবে না। নিদ্রোন্মীলিত নয়নে নূতন জ্ঞানের আলোক লাগিয়া বঙ্গবাসীরা অন্ধ হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা দিগ্বিদিক্ শূন্য হইয়া কি করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। যখন এই আলোক তাঁহাদের চক্ষে সহিয়া যাইবে, তখন আবার তাঁহারা চারিদিক স্পষ্টতর দেখিতে পাইবেন এবং দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিতে পারিবেন। তাঁহারা পারিবারিক সুখের বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলাকেই স্বাতন্ত্র্য মনে করেন, যথেচ্ছাচারিতাকেই স্বাধীনতা বলিয়া আলিঙ্গন করেন ও স্বদেশকে ঘৃণা করাকেই সার্ব্বভৌমিক ভাব মনে করেন। এ অবস্থা যে চিরকাল থাকিবে আমরা সে ভয় করি না, কিন্তু একটি বিষয়ে আমাদের ভয় হয়। এখন এই যে একটি সম্পূর্ণ নূতন ভাবস্রোত বহিতেছে, ইহাতে যাহা কিছু সময়ের অনুপযোগী তাহা ভাঙ্গিয়া যাইবে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে যাহা উপযোগী তাহাও ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, বা যাহা অনুপযোগী তাহাও নূতন ভাসিয়া আসিতে পারে, এই বিষয়ে আমাদের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য; সহস্র সহস্র বৎসরে যাহা গঠিত হয়, তাহা ভাঙ্গিয়া গেলে গড়িতে কত পরিশ্রম করিতে হইবে এবং সহস্র বৎসরে যাহার ভার-বহনে আমরা সমর্থ হইব, এখনই তাহা স্কন্ধে লইলে চাপা পড়িয়া মরিতে হইবে।

বঙ্গদেশের সামাজিক-বিপ্লব যে চিরকাল তিষ্ঠিতে পারিবে না, এখনি তাহার প্রমাণ পাইতেছি। আমাদের দেশের যুবকেরা যখন প্রথম ইংরাজি শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তখন যাহা কিছু দেশীয় তাহারই উপর তাঁহাদের আন্তরিক ঘৃণা ছিল ও যাহা কিছু বিদেশীয় তাহারই উপর তাঁহাদের অতিশয় অনুরাগ জন্মিয়াছিল; এমন কি, বিদেশীয় পানাহার চলিত হওয়াও তাঁহারা বঙ্গদেশের সভ্যতার একটি মুখ্য অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন; কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সে ভাব অপনীত হইতেছে। এখন দেশীয় কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির উপর আমাদের অনুরাগ জন্মিতেছে ও বিদেশীয় অনেক আচার ব্যবহারকে আমরা তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছি। আমাদের দেশীয় কোন লোক বিদেশীয়ের ছদ্মবেশ পরিয়া আসিলে আমরা তাহাকে ঘৃণা করি। কিছু দিন আগে কেবল ভাঙ্গ্ ভাঙ্গ্ শব্দ পড়িয়া গিয়াছিল, এখন সকলে রাখ্ রাখ্ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছেন।

এখন সমাজে তিন দল উত্থিত হইয়াছেন। যাঁহারা আমূল-সংস্কার-প্রিয় তাঁহারা সকলি ভাঙ্গিতে চান। যাঁহারা আমূল-রক্ষণ-প্রিয় তাঁহারা সকলি রাখিতে চান। যাঁহারা রক্ষণ-সংস্কার-প্রিয় তাঁহারা যাহা ভাল তাহাই রাখিতে চান, যাহা মন্দ তাহাই ভাঙ্গিতে চান। এইরূপে উপরি-উক্ত দুইটি শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে এবং শেষোক্ত শক্তির উত্তেজনায় সমাজ ঠিক উন্নতির সরল-পথে চলিতেছে।

উন্নতির পথ মধ্যবর্ত্তী, উন্নতির পথ একঝোঁকা নহে। কেন্দ্রাতিগ এবং কেন্দ্রানুগ শক্তি দুই দিক হইতে কোন বস্তুর উপর

কার্য্য করিলে তাহা মধ্য-পথ আশ্রয় করে, আমূল-রক্ষণ-প্রিয় ও আমূল-সংস্কার-প্রিয় এই দুই শক্তি আমাদের সমাজের উপর কার্য্য করাতে সমাজ উন্নতির মধ্যবর্ত্তী পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে আবার রক্ষণ-সংস্কার-প্রিয় উত্তেজনা করাতে সমাজ দ্বিগুণ-সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে। যাঁহারা আমূল-রক্ষণ-প্রিয় তাঁহারা উন্নতি শীল নাম ধারণ করিতে পারেন না; যাঁহারা আমূল-সংস্কার-প্রিয় তাঁহারাও উন্নতিশীল নহেন, যাঁহারা রক্ষণ-সংস্কার-প্রিয় তাঁহারাই প্রকৃত উন্নতি শীল। কিন্তু ইহাঁদের কাহাকেও সমাজ হইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে না। আমূল-রক্ষণ-প্রিয় মনে করিতেছেন, আমূল-উন্নতি-প্রিয় সমাজকে অবনতির দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, আবার আমূল-উন্নতি-প্রিয় মনে করিতেছেন যে, আমূল-রক্ষণ-প্রিয় সমাজকে অবনতির গহ্বর হইতে উদ্ধার করিতে বাধা দিতেছেন, আবার রক্ষণ-সংস্কার শীল মনে করিতেছেন যে, আমূল-রক্ষণ-প্রিয় ও আমূল-সংস্কার-প্রিয় উভয়ে মিলিয়া সমাজের দারুণ অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাঁরা কেহই সমাজের উন্নতি-পথের কণ্টক নহেন। তবে আমূল-সংস্কার ও আমূল-উন্নতি-প্রিয় উভয়ে ভ্রান্ত পথ আশ্রয় করিয়া সমাজের উন্নতির সাহায্য করিতেছেন, ও রক্ষণ-সংস্কার-প্রিয় প্রকৃত পথ আশ্রয় করিয়া সমাজের উন্নতি সাধন করিতেছেন। যখন যুবকেরা নূতন বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হন, যখন তাঁহাদের উন্নতির ইচ্ছা আছে কিন্তু অভিজ্ঞতা নাই, যখন তাঁহারা উন্নতির কতকগুলি মূল সূত্র শিখিয়াছেন কিন্তু দেশ কাল পাত্রে প্রয়োগ করিতে শিখেন নাই, যখন তাঁহারা মনে করেন যে বলিষ্ঠ ব্যক্তির খাদ্য ও রোগীর পথ্য একই, যখন তাঁহারা মনে করেন যে, ইংলণ্ডের বোঝা বাঙ্গালার স্কন্ধের উপযোগী, তখন তাঁহারা বঙ্গদেশকে একেবারে ইংলণ্ড করিতে চান, ভাগীরথীকে টেম্‌স করিতে চান্, বাঙ্গালীকে ফিরাঙ্গী করিতে চান্। কিন্তু যখন তাঁহারা সংসারে প্রবিষ্ট হন, তখন ক্রমশঃ শান্ত ও শীতল হইয়া আসেন ও রক্ষণ-শীলতার প্রতি একটু একটু করিয়া ঝুঁকিতে থাকেন। আবার তখনকার নব্য বংশ সমাজের আগাগোড়া ভাঙ্গিবার জন্য গদা উদ্যত করেন। এইরূপে রক্ষণ-শীল ও সংস্কার-শীল চিরকালই সমাজে জাগ্রত থাকে, না থাকিলে সমাজের দারুণ অনিষ্ট হয়। যখন ভারতবর্ষে উন্নতির মধ্যাহ্ন কাল, তখন ধীরে ধীরে কতকগুলি নূতন দর্শন ও নূতন দল নির্ম্মিত হইতে লাগিল, এবং তাহাদের প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম উত্থিত হইয়া সমাজে একটি ঘোরতর বিপ্লব বাধাইয়া দিল। পৌরাণিক ঋষিরা ভুল বুঝিলেন, তাঁহারা মনে করিলেন এরূপ বিপ্লব অনিষ্ট-জনক। অমনি পুরাণে, সংহিতায় ও অন্যান্য নানা প্রকারে সমাজের হস্তপদ অষ্টপৃষ্ঠে বন্ধন করিয়া ফেলিলেন এবং ভবিষ্যতে এরূপ বিপ্লব না বাধে তাহার নানা উপায় করিয়া রাখিলেন। সমাজের স্বাস্থ্য নষ্ট হইল এবং সমাজ ক্রমশই অবনতির অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

সংস্কার-শীলতার অভাবে ও রক্ষণ-শীলতার বাড়াবাড়িতেই হিন্দু সমাজ নির্জ্জীব হইয়া পড়িল।

বঙ্গদেশের এই সামাজিক বিপ্লব আমাদের ত শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে হয়; যে উপায়েই হউক্ এই যে, বহু কাল-ব্যাপী নিরুদ্যমের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে এবং শিক্ষিত লোকেরা নব-উদ্যমে কার্য্য করিবার ক্ষেত্র অন্বেষণ করিতেছেন ইহা ত মঙ্গলেরই চিহ্ন। যেমন যুদ্ধ বিপ্লবের অনুষ্ঠানে জাতির শারীরিক বল বর্দ্ধিত হয়, সেই রূপ মানসিক বিপ্লবে মনের বল বাড়িবার কথা। আর অধিক দিন নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে সমস্ত বাঙ্গালী জাতি নির্জ্জীব হইয়া পড়িত। এখন যে রূপ ভাঙ্গা গড়া ও চারিদিক হইতে উপাদান সংগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে বোধ হয়, অল্প দিনের মধ্যে এই বাঙ্গলার সমাজ নূতন দৃঢ়তর ভিত্তিতে স্থাপিত হইবে।

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

ইতি-পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, আত্মার নম্রতাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য, এক্ষণে সৃষ্টির প্রকরণ-পদ্ধতি কিরূপ তাহার প্রতি মনঃসংযোগ করা যাইতেছে।

বিশুদ্ধ-জ্ঞানের অভ্যন্তরে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়, এই দুই বিরোধী পক্ষের বিরোধ-ভঞ্জন দেখিতে পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ জ্ঞানের গোড়ার কথা এই—যিনি জানিতেছেন তাঁহাকে জানা। এরূপ স্থলে যিনি জ্ঞাতা তিনিই জ্ঞানের বিষয়, ইহা অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞেয়ভাব জ্ঞাতৃভাবের বিরোধী সত্ত্বেও বিশুদ্ধ-জ্ঞানেতে সে বিরোধ স্থান পাইতে পারে না। জ্ঞাতা যে আপনি, এবং জ্ঞাত যে আপনি, উভয়ের মধ্যে ভেদ-রাহিত্যই বিশুদ্ধ জ্ঞানের লক্ষণ।

জ্ঞানের জ্ঞাতাও সে, জ্ঞানের জ্ঞেয়ও সে, এটি জ্ঞানের ভিতরকার কথা। জ্ঞানমাত্রই জ্ঞানরূপে আপনার নিকট প্রকাশ পায়;—প্রকাশ যখন পায়, তখন তাহা জ্ঞেয় নয় ত আর কি? আবার যখন তাহারই জ্ঞানেরই কাছে জ্ঞান প্রকাশ পায়, তখন তাহা জ্ঞাতা নয় ত আর কি? অতএব জ্ঞানের অভ্যন্তরে জ্ঞাত যে আপনি, এবং জ্ঞাতা যে আপনি, এ দুয়ের ঐক্য অবশ্যম্ভাবী। দীর্ঘ-প্রস্থ-বেধ এই ত্রিবিধ আয়তনের সংহত-ভাব যেমন আকাশ-মাত্রেরই ধর্ম্ম, তেমনি জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয় এই ত্রিবিধ ভাবের সংহত-ভাব চেতন-পদার্থ-মাত্রেরই ধর্ম্ম।

বিশুদ্ধ-জ্ঞানের জ্ঞাতা-আপনি এবং জ্ঞাত-

আপনি এই দুই বিরোধী পক্ষকে পরস্পর হইতে পৃথক করিয়া দেখিলে এই রূপ দাঁড়ায় যে, ইহাও যে বস্তু উহাও সেই বস্তু—তবে কি না প্রকারান্তরে। প্রকারান্তর কাহাকে বলে তাহার একটি উদাহরণ দিই;—ভাবের স্থায়িত্বও যা', অভাবের অস্থায়িত্বও তা'; কিন্তু অভাবের অস্থায়িত্ব ক্রিয়াসাপেক্ষ—চেষ্টা করিয়া অভাব মোচন করিতে হয়, ভাবের স্থায়িত্ব আপনা-আপনি আছে, দুয়ের মধ্যে এইরূপ প্রকার-ভেদ দৃষ্ট হইতেছে। ভাবের প্রভাব দ্বারা অভাবের যে অভাব, তাহাকে বলে আবির্ভাব; অর্থাৎ পূর্ব্বে ছিল না, ভাব-প্রভাবে এখন হইল, এরূপ যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, সকলই আবির্ভাব। ভাবও যা', আবির্ভাবও তাই,—প্রকারান্তরে। জ্ঞানের প্রতি প্রণিধান করিয়া দেখিলে; জ্ঞাতৃপক্ষে জ্ঞানের ভাব, এবং জ্ঞাতপক্ষে জ্ঞানের আবির্ভাব উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ-জ্ঞানের জ্ঞাতৃপক্ষই পরমাত্মা, জ্ঞাত পক্ষই আত্মানাত্ম-ময় জগৎ। জ্ঞাতৃজ্ঞেয় এ দুই বিরোধী পক্ষের মধ্যে যে বস্তুতঃ কোন বিরোধ নাই, জীবাত্মাই তাহার প্রমাণ-স্থল। জ্ঞেয়-পক্ষের মধ্য হইতে জ্ঞাতৃ-পক্ষ উদ্ভাসিত হইয়া—সেই জ্ঞেয়পক্ষের সহিত নহে কিন্তু—মূল জ্ঞাতৃ-পক্ষের সহিত আপনার মিল সপ্রমাণ করিতেছে; শস্য উৎপন্ন হইয়া, বৃক্ষের সহিত নহে, কিন্তু বীজের সহিত আপনার মিল সপ্রমাণ করিতেছে। জীবাত্মা, পরমাত্মার বিরোধীপক্ষ নহে, পরন্তু বিরোধী পক্ষের (জড়ত্বের) বিরোধী পক্ষ;—জীবাত্মা, বিরোধের ভঞ্জন-স্বরূপ। একদিকে মূল-জ্ঞাতৃ-পক্ষের অপরিবর্ত্তনীয় স্বপ্রকাশ ভাব; অন্যদিকে, জ্ঞেয়পক্ষের মধ্যে (জগতের মধ্যে) জ্ঞাতৃপক্ষের ক্রমশঃপ্রকাশ্য অনন্ত পরিণাম কি না চেতন ভাবের উত্তরোত্তর অনন্ত পরিস্ফুটন; দুয়ের মধ্যে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই,—ভেদ যাহা, তাহা প্রকার-ভেদ মাত্র। মূলে যে পূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান আছে, জগতে অনন্ত কাল অভাবের অভাব হইলে, তাহাই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে, নূতন কিছুই হইবে না। জ্ঞাতৃ-পক্ষের, একদিকে, পূর্ণপ্রভাব; জ্ঞেয় পক্ষের, অন্যদিকে, অভাবের ক্রমশই অভাব; এ দুয়ের মধ্যে বর্ত্তমানে—প্রতি বর্ত্তমান ক্ষণে—আকাশ-পাতাল প্রভেদ, কিন্তু অনন্ত ভবিষ্যৎ কাল ধরিতে গেলে কিছুই প্রভেদ নাই। জ্ঞেয়পক্ষে আপাততঃ জ্ঞাতৃপক্ষের বিরোধ;—কিন্তু সে বিরোধের ক্রমশই ভঞ্জন হইতেছে—ক্রমশই জ্ঞেয় পক্ষের মধ্যে জ্ঞান সংক্রমিত হইয়া তাহাকে জ্ঞাতৃ-পক্ষের প্রতিচ্ছবি করিয়া তুলিতেছে; মূলের ভাব (জ্ঞাতৃভাব) যাহা জগতের (জ্ঞেয়ভাবের) অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, ক্রমশই তাহা উত্তরোত্তর অভিব্যক্ত হইতেছে—ইহা দেখিলে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় ভাবের পরস্পর বিরোধকে আর বিরোধ বলিয়াই মনে হয় না।

জ্ঞেয়পক্ষের মধ্যে জ্ঞাতৃপক্ষের পূর্ণ-প্রভাব যাহা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা

আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখিতে না পাইলাম নেই, মনদ্বারা দেখিতে পাই তাহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমরা চক্ষু-শ্রবণাদি বিশেষ বিশেষ বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা আবির্ভাব দেখি,—চক্ষুশ্রোত্র-ব্যাপী সাধারণ ইন্দ্রিয় যে মন, তাহা দ্বারা ভাব দেখি। চক্ষু দ্বারা আমরা জ্যোৎস্নাকে উজ্জ্বল দেখি—রসনা দ্বারা নহে; রসনা দ্বারা দ্রব্য-বিশেষের মধুর আস্বাদ গ্রহণ করি—চক্ষু দ্বারা নহে; আবার, চক্ষু এবং রসনার মধ্যে ঐ যে প্রভেদ, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া মন-দ্বারা জ্যোৎস্নাকে মধুর বলিয়াও অবধারণ করি। মন দেখে, শোনে, আস্বাদন করে, ঘ্রাণ করে, স্পর্শ করে, সকল ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য একা করিয়া থাকে। মনেতে যখন রসনা এবং চক্ষুর এপ্রকার অভেদ ভাব, তখন জ্যোৎস্নাকে মধুর বলিতে পারে এরূপ অধিকার তাহার সম্পূর্ণই আছে বলিতে হইবে। চক্ষু দ্বারা আমরা দেখি জ্যোৎস্না উজ্জ্বল; মনোদ্বারা দেখি জ্যোৎস্না মধুর; চক্ষু দ্বারা আবির্ভাব দেখি, মনোদ্বারা ভাব দেখি।

জ্ঞাতৃপক্ষ হইতে জ্ঞেয়-পক্ষের বহিষ্কার—ভাব হইতে আবির্ভাবের বহিষ্কার—সৃষ্টির এই যে প্রথম পদ্ধতি, ইহাকে বলে অনুলোম পদ্ধতি। আবির্ভাবের মধ্য-হইতে ভাবের উদ্ধার—সৃষ্টির এই যে দ্বিতীয় পদ্ধতি, ইহাকে বলে প্রতিলোম পদ্ধতি। ও দুই পদ্ধতি এইরূপ;—

আদিতে প্রজ্ঞা (বিশুদ্ধ জ্ঞান) শুদ্ধসত্যে পরিপূর্ণ; প্রজ্ঞাতে অনিশ্চিত কিছুই নাই, সকলই সুনিশ্চিত। প্রজ্ঞার সত্য ধ্রুব-সত্য। প্রজ্ঞা কোন ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষ অবলম্বন করে না, সুনিশ্চিত ধ্রুব সত্যের পক্ষে ভর দিয়া অপরাজিত বলে স্থিতি করে। প্রজ্ঞা পরমাত্মাতে স্বপ্রকাশ ভাবে এবং জগতে ক্রমশ-প্রকাশ্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

আবার এই দেখিতে পাই যে, ধ্রুব সত্যের প্রতি প্রজ্ঞার যেমন একটি টান আছে, তেমনি আপনার আপনার প্রতি আমাদের একটি টান আছে; প্রতি জনের আপনার আপনার প্রতি এই যে একটি টান, ইহাই সাংখ্য শাস্ত্রে অহঙ্কার শব্দে উক্ত হইয়াছে। প্রজ্ঞা এবং অহঙ্কার এ দুয়ের মধ্যে ভাব এবং আবির্ভাবের সম্বন্ধ। ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, যেখানে চক্ষু হউক কর্ণ হউক বিশেষ কোন ইন্দ্রিয়, সেই খানেই আবির্ভাব দেখা দেয়, এবং চক্ষু-শ্রোত্রব্যাপী সাধারণ ইন্দ্রিয় যে মন, সেই খানেই ভাব দেখা দেয়। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া ইহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে যে, সর্ব্বসাধারণ-ব্যাপী যে প্রজ্ঞা তাহাই ভাব-স্বরূপ, এবং বিশেষ-বিশেষ জীবের যে বিশেষ বিশেষ অহংভাব তাহা তাহার (প্রজ্ঞার) আবির্ভাব-স্বরূপ।

প্রজ্ঞার আবির্ভাব যেমন অহংভাব (অহংকার), সেইরূপ অহংভাবের আবির্ভাব, ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যেকে। কেননা অহংভাব বিশেষ-বিশেষ ইন্দ্রিয়ের সাধারণ ঐক্য স্থল।

মন সকল-ইন্দ্রিয়ের প্রতিনিধি-স্বরূপ;

এ জন্য বাহুল্যে না গিয়া মনকেই সর্ব্বেন্দ্রিয় বলিয়া ধরা যাউক।

সকল কুড়াইয়া এইরূপ পাওয়া যায় যে, অহংরূপী জীব একদিকে প্রজ্ঞা দ্বারা পরমাত্মার সহিত এবং অন্যদিকে মন দ্বারা বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

প্রজ্ঞা, পরমাত্মা-হইতে ভিন্নরূপে, আবির্ভূত হইবার জন্য অহংভাবের প্রয়োজন; অহংভাব, প্রজ্ঞা হইতে ভিন্নরূপে আবির্ভূত হইবার জন্য ইন্দ্রিয়, মন এবং বিষয়ের প্রয়োজন। তাই সাংখ্য দর্শন বলেন যে, ভোগসাধক ইন্দ্রিয় মন এবং ভোগ্য বিষয়ের মূল উপাদান-স্বরূপ সূক্ষ্ম আদি-ভূত, উভয়ই অহংভাবের আবির্ভাব স্বরূপ।

ইন্দ্রিয়-মন-রূপ শৃঙ্খল দ্বারা অহংভাবকে বিষয়েতে বদ্ধ করিয়া তাহার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি সাধন করা সৃষ্টির একতম উদ্দেশ্য; ইহার যে প্রকরণ, তাহার নাম অনুলোম পদ্ধতি।

তাহার পর প্রজ্ঞার সংক্রমণ-দ্বারা পরমাত্মার ভাবের ভাবুক করিয়া উত্তরোত্তর তাহার (অহংরূপী জীবের) মুক্তিসাধন করা সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য; ইহার যে প্রকরণ, তাহাকে বলে প্রতিলোম পদ্ধতি।

অণ্ডের অভ্যন্তরে যেমন জীব, জীবের ইন্দ্রিয়-গণ, এবং তাহার ভোগসামগ্রী, একীভূত হইয়া স্থিতি করে; তেমনি প্রজ্ঞার অভ্যন্তরে অহংভাব, অহংভাবের বহিঃস্ফূর্ত্তি স্বরূপ ইন্দ্রিয়-মন, এবং তাহার ভোগ-সামগ্রীর মূল উপাদান-স্বরূপ সূক্ষ্মভূত, এ তিনটি প্রথমে একীভূত অবস্থায় অবস্থিত ছিল। তখন—অহংভাবের মধ্যে ইন্দ্রিয় মনের মধ্যে ভোগসামগ্রীর মধ্যে ভেদের অভিব্যক্তি হয় নাই—সৃষ্টির সেই প্রাগবস্থা। তাহার পর, তিনই অভিব্যক্তি হইতে উত্তরোত্তর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইতে লাগিল। যাহা দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া যুগযুগান্তর পরে ইন্দ্রিয়-সহকৃত-অহংভাব ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইবে, সেই আদিভূত, আদি অন্ন, এত সূক্ষ্ম যে, তাহাকে আকাশ বলা হইয়া থাকে।

আবির্ভাবের বহিষ্করণ এবং ভাবের আকর্ষণ, এ দুইটি ব্যাপার ইতিপূর্ব্বে যাহা প্রজ্ঞাতে দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা সৃষ্টির সর্ব্বত্রই কোন না কোন রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। আকাশজাতীয় অতীব সূক্ষ্ম যে একটি লাসক * পদার্থ, যাহার নর্ত্তন দ্বারা আলোক বোধের উৎপত্তি হয়, তাহাতে যে ঘাত প্রতিঘাত চলিতে-থাকে তাহাও সেই বহিষ্করণ এবং আকর্ষণ; গ্রহগণের কেন্দ্রাতিগ (Centrifugal) এবং কেন্দ্রানুগ (Centripetal) ভাব যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও সেই বহিষ্করণ এবং আকর্ষণ; উদ্ভিদের শাখা-প্রশাখা

* Elastic এই ইংরাজী শব্দের গঠন দৃষ্টে বোধ হয় যে, লস-ধাতুই উহার মূল। লাস শব্দে নৃত্য বুঝায়; ঘাত-প্রতিঘাতে তরঙ্গের ন্যায় নর্ত্তন-ক্ষম—এই, বোধ হয়, Elastic শব্দের অর্থ। লাসক শব্দেও ঐ অর্থ বুঝায়। স্থিতিস্থাপকতা বলিয়া যে একটা শব্দ নূতন সৃষ্ট হইয়াছে তাহাতে প্রথমতঃ শব্দাড়ম্বর দ্বিতীয়তঃ অর্থের ঘোরফের দেখিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে লাসকতা শব্দ ব্যবহার করা শ্রেয় বোধ করিতেছি।

বিস্তার এবং তাহাদের সকলের মধ্যে প্রাণের টান যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও সেই বহিষ্করণ এবং আকর্ষণ; জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকাশ এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পর ব্যথার-ব্যথিত্ব-রূপ মনের টান যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও সেই বহিষ্করণ এবং আকর্ষণ; পরমাত্মা হইতে আত্মার বিচ্ছেদ, এবং তাঁহার প্রতি আত্মার আন্তরিক টান যাহা রহিয়াছে, তাহাও সেই বহিষ্করণ এবং আকর্ষণ। পরমাত্মা আপনার আবির্ভাবকে আপনা-হইতে পৃথক্ করিয়া প্রকাশ করিতেছেন এবং উত্তরোত্তর আপনার সদৃশ করিয়া গঠিয়া তুলিতেছেন,—সামান্যতঃ ইহাই সৃষ্টি-প্রকরণ। তিনি যে এইরূপ করিতেছেন, ইহা তিনি আপনার অসীম প্রেম-প্রভাবে অনায়াসেই করিতেছেন,—তাঁহার মঙ্গল-ইচ্ছাময় অধিষ্ঠানই সৃষ্টির একমাত্র প্রবর্ত্তক। পরমাত্মা সমস্ত জগৎ চালাইতেছেন অথচ তিনি একপদও চলেন না, তিনি সকল কার্য্যই করিতেছেন অথচ তিনি কোন কার্য্যই করেন না—সৃষ্টির এই যে একটি আশ্চর্য্য-ভাব, ইহার একটি ভৌতিক উদাহরণ দিতেছি;—

সূর্য্য যেমন পৃথিবীকে আকর্ষণ করে পৃথিবীও সেইরূপ সূর্য্যকে আকর্ষণ করে; কিন্তু সূর্য্যকে পৃথিবী এত অল্প চলায় যে, তাহা না চলাইবারই মধ্যে। সূর্য্য যদি অসীম হইত তাহা হইলে পৃথিবী আদবেই সূর্য্যকে চলাইতে পারিত না। তাহা হইলে সূর্য্যের অধিষ্ঠানই সূর্য্যের চলন-স্বরূপ হইত। পরমাত্মার অধিষ্ঠান-মাত্রই পরমাত্মার চলন-ক্রিয়া, পরমাত্মার নিষ্ক্রিয়-ভাবই তাঁহার সক্রিয় ভাব, পরমাত্মার অটল প্রভাবই সমস্ত জগতের নিয়ামক এবং পরিচালক। পরমাত্মা অটলমঙ্গল ইচ্ছারূপে স্থিতি করিতেছেন, এই ভাবের আকর্ষণেই সমুদায় জগৎ তাঁহার অভিমুখে তালমান-লয়ে পর্য্যুত্থান করিতেছে। পরমাত্মাতে প্রেমের এমনি অসীম প্রগাঢ়তা যে, তিনি বাহিরে অদৃশ্য অথচ তাঁহার প্রেম ভিতরে ভিতরে সকল বস্তুতেই কোন না কোন রূপে জানান্ দিতেছে,—সকলেই পথ চিনিয়া চিনিয়া তাঁহার নিকট প্রত্যাগমন করিতেছে। পরমাত্মার প্রতি জগতের এই যে আকর্ষণ ইহাই প্রতিলোম পদ্ধতি। অনুলোম এবং প্রতিলোম পদ্ধতির বিশেষ বিশেষ সোপান যেরূপ সৃষ্টিতে দৃষ্টিগোচর হয় তাহা পরে প্রদর্শন করা যাইতেছে।

বাঙ্গালীর আশা ও নৈরাশ্য

সভ্যতার প্রথম অবস্থায় ধনের আবশ্যক। যত দিন মনুষ্য আহারান্বেষণে ব্যস্ত থাকে, তত দিন তাহারা জ্ঞান অর্জ্জনে যত্নশীল থাকে না। উর্ব্বর দেশেই সভ্যতার

প্রথম অঙ্কুর নিঃসৃত হয়। ভারতবর্ষ, ইটালি ও গ্রীস দেশের উর্ব্বর ক্ষেত্রেই আর্য্যেরা আসিয়া জীবিকা ও সভ্যতা সহজে উপার্জ্জন করেন। অভাবের উৎপীড়ন হইতে অবসর পাইলেই জ্ঞানের দিকে মনুষ্যের নেত্র পড়ে। এইরূপে অবসর-প্রাপ্ত ব্যক্তির অনুসন্ধিৎসুনেত্রের সম্মুখে জ্ঞানের দ্বার ক্রমশঃ উন্মুক্ত হইতে থাকে। এই জন্য আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রাহ্মণদের কোন কার্য্য ছিল না, জ্ঞানানুশীলনের উপযোগী বৃক্ষ-লতা-বেষ্টিত তপোবনে তাঁহাদের বাস ছিল; তাঁহারাই ত ভারতবর্ষে কবিতার সৃষ্টি করিয়াছেন, দর্শনের উন্নতি করিয়াছেন, বিজ্ঞানের অনুসন্ধান করিয়াছেন, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছেন, ভাষা ও ব্যাকরণের পূর্ণ-সংস্কার করিয়াছেন। অতএব সভ্যতার প্রথম অবস্থায় অবসর আবশ্যক করে, অবসর পাইবার জন্য ধন আবশ্যক, ও ধন উপার্জ্জনের জন্য উর্ব্বর ভূমির আবশ্যক।

উর্ব্বর ভূমিই যদি সভ্যতার প্রথম কারণ হয়, তবে বঙ্গদেশ সে বিষয়ে সৌভাগ্যশালী, এই আশ্বাসে মুগ্ধ হইয়া আমরা মনে করিতে পারি যে, বঙ্গদেশ এক কালে সভ্যতার উচ্চ-শিখরে আরোহণ করিতে পারিবে। ভারতবর্ষের ধ্বংসাবশিষ্ট সভ্যতার ভিত্তির উপর ইউরোপীয় সভ্যতার গৃহ নির্ম্মিত হইলে সে কি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দৃশ্য হইবে! ইউরোপের স্বাধীনতা-প্রধান ভাব ও ভারতবর্ষের মঙ্গল-প্রধান ভাব, পূর্ব্বদেশীয় গম্ভীর ভাব ও পশ্চিম দেশীয় তৎপর ভাব, ইউরোপের অর্জ্জনশীলতা ও ভারতবর্ষের রক্ষণ-শীলতা, পূর্ব্বদেশের কল্পনা ও পশ্চিমের কার্য্যকরী বুদ্ধি উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য হইয়া কি পূর্ণ চরিত্র গঠিত হইবে। ইউরোপীয় ভাষার তেজ ও আমাদের ভাষার কোমলতা, ইউরোপীয় ভাষার সংক্ষিপ্ততা ও আমাদের ভাষার গাম্ভীর্য্য, ইউরোপীয় ভাষার প্রাঞ্জলতা ও আমাদের ভাষার অলঙ্কার-প্রাচুর্য্য উভয়ে মিশ্রিত হইয়া আমাদের ভাষার কি উন্নতি হইবে! ইউরোপীয় ইতিহাস ও আমাদের কাব্য উভয়ে মিশিয়া আমাদের সাহিত্যের কি উন্নতি হইবে! ইউরোপের শিল্প বিজ্ঞান ও আমাদের দর্শন উভয়ে মিলিয়া আমাদের জ্ঞানের কি উন্নতি হইবে! এই সকল কল্পনা করিলে আমরা ভবিষ্যতের সুদূর সীমায় বঙ্গদেশীয় সভ্যতার অস্পষ্ট ছায়া দেখিতে পাই। মনে হয়, ঐ সভ্যতার উচ্চ শিখরে থাকিয়া যখন পৃথিবীর কোন অধীনতায় ক্লিষ্ট অত্যাচারে নিপীড়িত জাতির কাতর ক্রন্দন শুনিতে পাইব, তখন, স্বাধীনতা ও সাম্যের বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া তাহাদের অধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া দিব। আমরা নিজে শতাব্দী হইতে শতাব্দী পর্য্যন্ত অধীনতার অন্ধকার-কারাগৃহে অশ্রু-মোচন করিয়া আসিয়াছি, আমরা সেই কাতর জাতির মর্ম্মের বেদনা যেমন বুঝিব তেমন কে বুঝিবে? অসভ্যতার অন্ধকারে পৃথিবীর যে সকল দেশ নিদ্রিত আছে, তাহাদের ঘুম ভাঙ্গাইতে আমরা দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিব। বিজ্ঞান দর্শন কাব্য পড়িবার জন্য দেশ বিদেশের লোক আমা-

দের ভাষা শিক্ষা করিবে! আমাদের দেশ হইতে জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে এই দেশের বিশ্ববিদ্যালয় দেশ বিদেশের লোকে পূর্ণ হইবে। বঙ্গের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের অলিখিত পৃষ্ঠায় এই সকল ঘটনা লিখিত হইবে, ইহা আমরা কল্পনা করিয়া লইতেছি সত্য, কিন্তু পাঠকেরা ইহা নিতান্ত অসম্ভব বোধ করিবেন না। প্রকাণ্ড সমুদ্রের কোন্ এক প্রান্তে কতকগুলি বালুকণা জমিয়া ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র যে একটি তুষারাবৃত অনুর্ব্বর দ্বীপ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্ব-নিবাসীদের আকাশই অম্বর ছিল, পশুবৎ ব্যবহার ছিল, তরুকোটর বাসস্থান ছিল, নর-রক্ত-লোলুপ ড্রুইডগণ পুরোহিত ছিল, আজ তাহাদেরই পুত্র পৌত্রগণ কোথা হইতে তাড়িয়া ফুঁড়িয়া অসভ্যদের সভ্য করিবেন বলিয়া মহা গোলযোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাও যদি সম্ভব হইল, পতিত ইটালী ও গ্রীসও যদি পুনরায় জাগিয়া উঠিল, তবে যে নূতন জাতি আজ নব উদ্যমে জন্মিয়া উঠিতেছে, নবজীবনে সঞ্জীবিত হইতেছে, নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইতেছে, সে যে সভ্যতার চরম শিখরে না উঠিয়া বিশ্রাম করিবে না, তাহাতে অসম্ভব কি আছে? সভ্যতা পৃথিবীতে স্তরে স্তরে নির্ম্মিত হইতে থাকে, একেবারে প্রচুর পরিমাণে সভ্যতা কখন পৃথিবীতে জন্মিতে পারে না। ক্রমই প্রকৃতির নিয়ম। সভ্যতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী আগিয়া ভারতবর্ষ, গ্রীস ও ইটালীতে এক স্তর সভ্যতা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল দেশ হইতে দেবী চলিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু এক স্তর সভ্যতা সেখানে এখনো অবশিষ্ট আছে। তিনি এখন ফ্রান্স জর্ম্মনি প্রভৃতি দেশে সভ্যতা নির্ম্মাণ করিতেছেন এবং কিছুদিন পরে সেখানেও পদচিহ্ন রাখিয়া আবার আমেরিকা, রুসিয়া, জাপান মাড়াইয়া পুনরায় সেই প্রাচীন ভারতবর্ষের পূর্ব্ব দিকে উদিত হইবেন, তাহাতে অসম্ভব কিছুই নাই। সভ্যতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এইরূপে পৃথিবীময় পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং স্তরে স্তরে পৃথিবীতে পূর্ণ সভ্যতা নির্ম্মাণ করিতেছেন। ভবিষ্যতের একদিন আমরা কল্পনা-চক্ষে দেখিতেছি, যে দিন আমাদের দীপ্যমান সভ্যতার সম্মুখে ক্রমে ক্রমে ফ্রান্স, জর্ম্মনি, ইংলণ্ডের সভ্যতা নিবিয়া যাইবে। এ কথা অবিশ্বাস করিবার নহে। অনন্ত কাল-সমুদ্রে কত ঘটনা-তরঙ্গ উঠিবে ও পড়িবে, আর আমাদের এই বঙ্গদেশ, এই লক্ষ লক্ষ অধিবাসী চিরকালই যে অধীনতার অন্ধকারে নির্জ্জীব ভাবে ঝিমাইবে, তাহা আমরা কল্পনা করিতেও পারি না। আমরা ইউরোপের সঞ্চিত সভ্যতা অনায়াসে অর্জ্জন করিয়া লইতেছি, নিউটন যতখানি মাথা খুরাইয়া পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বুঝিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে আমাদের নিউটনের একপঞ্চদশ-অংশও ভাবিতে হয় না। ইয়ুরোপ যখন বৃদ্ধ ও ক্লান্ত হইয়া যাইবেন, তখন তাঁহার সঞ্চিত সভ্যতা অর্জ্জন করিয়া লইয়া আমরা আবার নব উদ্যমে অধিকতর সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিব। যে জাতি নব উদ্যমে উঠিতে আরম্ভ করে, তাহারাই ক্রমে সভ্যতার উচ্চ-শিখরে আরোহণ করে।

কি অল্প কালের মধ্যে আমাদের বঙ্গদেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। বঙ্গ ভাষায় গদ্য এই সেদিনও নির্ম্মিত হইয়াছে; যত-দিন ভাষার উন্নতি না হয়, ততদিন জাতির উন্নতি হয় না, অথবা জাতির উন্নতির চিহ্নই ভাষার উন্নতি। যাঁহারা প্রায় বাঙ্গলা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহারা আজিও বর্ত্তমান আছেন। বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য এই অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে আশ্চর্য্য উন্নত হইয়াছে। এত দ্রুত ও এত অল্প কালের মধ্যে বোধ হয় কোন ভাষারই উন্নতি হয় নাই। এই উন্নতি-স্রোত যদি দারুণ প্রতিঘাত না পায় তবে কখনো থামিবে না। বাঙ্গা-লীদের এই অর্দ্ধশতাব্দীর উন্নতি, ইহার মধ্যে তাহাদের উদ্যম কত বাড়িয়া উঠিয়াছে, অধীনতার অনুৎসাহের মধ্যে এতদূর আশা করা যায় না। স্কট্‌লণ্ডে গিয়া তাহারা কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছে, লণ্ডনে গিয়া সেখানকার বিজ্ঞান-আচার্য্য উপাধি আহ-রণ করিতেছে, অঙ্ক বিদ্যা শিখিতেছে, জর্ম্মনীতে নিজের মত প্রচার করিতেছে, রুসিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের আ-সন অধিকার করিতেছে, সমস্ত ভারত-বর্ষে রাজনৈতিক ঐক্যতা স্থাপনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, সাহস পূর্ব্বক কত সামাজিক শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে, সফল হউক বা না হউক, গবর্ণমেণ্টের কুনি-য়মের বিরুদ্ধে সাহস পূর্ব্বক স্বীয় মত প্রকাশ করিতেছে, আমেরিকায় শিক্ষা পাইবার জন্য কত যুবক উদ্যত হইয়াছেন, এবং আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব যে, তাহারা পোত-নির্ম্মাণবিদ্যা, যন্ত্র-বিদ্যা এবং ইংরা-জেরা যদি যুদ্ধ শিক্ষা না দেন, তবে ফ্রান্সে গিয়া, জর্ম্মনিতে গিয়া যুদ্ধ শি-খিয়া আসিবে, ইহা নিশ্চয়ই। গবর্ণ-মেণ্টের অধীনে কার্য্য জুটিতেছে না, সুতরাং জীবিকার অভাবে বিদেশে গিয়া অর্থের নিমিত্তেও বিদ্যা শিখিবে, বাণিজ্যের উন্নতি হইবে, এখনি আমাদের দেশীয় লোকের বাণিজ্যের দিকে মন পড়িয়াছে, অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে অধীনতার সীমাবদ্ধ-ক্ষেত্রে এত দূর উন্নতি কোন্ জাতি করি-য়াছে জানি না।

পাঠকেরা জিজ্ঞাসা করিবেন যে আমরা পূর্ব্বে বলিলাম সভ্যতার প্রথম অবস্থায় অর্থের আবশ্যক করে, তবে এখন কেন বলিতেছি যে, অর্থাভাবও বাঙ্গালী-দের জ্ঞান উপার্জ্জনের প্রধান প্রবর্ত্তক? স্বাধীনসভ্যতার নিমিত্ত প্রথম অবস্থায় নিশ্চয়ই অর্থ আবশ্যক, আমাদের যদি ভাবিয়া চিন্তিয়া নিজের মস্তিষ্ক হইতে এই সভ্যতা গঠিত করিতে হইত, তবে নিশ্চয়ই অবসর নহিলে পারিতাম না, অপরে আমাদের জ্ঞান গিলাইয়া দিতেছে, ইহার জন্য অধিক অর্থ আবশ্যক করে না, আমরা নূতন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্ক্রিয়া করিতে পারিব না; নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিতে পারিব না, সুতরাং আমরা একটি জাতীয় মহত্ব উপার্জ্জন করিতে পারিব না। পৃথিবীতে এখন সভ্যতা গঠিত হইতেছে, এই গঠন-কার্য্যে আমরা কোন সাহায্য করিতে পারিব কি না সন্দেহস্থল, তবে

গঠিত হইলে জাতিসাধারণের সহিত তাহা আমরা ভোগ করিতে পারিব। আমাদের গঠন-শক্তি নানা বাহ্য কারণ হইতে ব্যাঘাত পাইতেছে। প্রথম দারিদ্র্য, দ্বিতীয় জলবায়ু।

আমাদের দেশ উর্ব্বর সত্য, কিন্তু অনেক কারণে দারিদ্র্য প্রশ্রয় পাইতেছে। সাধারণ লোকদের মধ্যে সমান রূপে ধন বিভক্ত হইলেই দেশ ধনী হয়। দেশীয় কৃষকেরা যাহা উৎপন্ন করে তাহার সমস্ত লাভ মহাজন প্রভৃতিরাই ভোগ করে, তাহাদের কেবল জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী কিছু অবশিষ্ট থাকে, তদধিক সঞ্চয় করিবার কোন উপায় নাই. দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইতেছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিখিবার জন্য অনেকে ধন এবং তদপেক্ষা বহুমূল্য স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছেন, কিন্তু শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ধন উপার্জ্জন করিবার কোন উপায় দেখিতেছেন না। দেশের মৃত্তিকা ক্রমশঃ অনুর্ব্বর হইয়া যাইতেছে, এক স্থানে ক্রমাগত একই শস্য জন্মিলে মৃত্তিকার তেজ নষ্ট হইয়া যায়। প্রাচীন লোকেরা বলেন, এখনকার খাদ্য-সামগ্রী ক্রমশঃ বিস্বাদ হইয়া যাইতেছে; তাহার কারণ, মৃত্তিকা ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া যাইতেছে। এই দারিদ্র্যের জ্বালায় অস্থির হইয়া লোকে এক বিন্দু অন্য বিষয় ভাবিবার সময় পাইবে কোথায়? যদিই বা ক্রমে আমরা ধনী হই, তাহা হইলেও কি আমাদের দেশ জ্ঞান উপার্জ্জন বিষয়ে সকল দেশের অগ্রগণ্য হইতে পারে, তাহাতেও সন্দেহ আছে। আমাদের জল বায়ু এমন অতেজস্কর, যে নিবাসীদের মন একেবারে উৎসাহশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। কোন একটি কার্য্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগা এদেশে কাহারো সাধ্য নহে। যদি বা কোন কৃত্রিম উপায়ে একবার উৎসাহ উদ্দীপ্ত করা যায়, তথাপি অধিক দিন তাহা স্থায়ী হয় না, অল্প দিনের মধ্যে শিথিল হইয়া যায়। দেশের আর্দ্র বায়ু স্বাস্থ্যের এত বিঘ্নজনক যে, তাহাতে অনেক অনিষ্ট হইতেছে। খর্ব্বাকার রুগ্ন শীর্ণ কতকগুলি লোকের কাছে কত দূর আশা করা যায়? শারীরিক বলের অভাবে তাহাদের মনের মহত্ত্ব জন্মিবে কোথা হইতে? তাহারা অত্যাচারের অভাবে শিশু ও অবলার ন্যায় ক্রন্দন করিতে পারে; পুরুষের মত, বীরের মত অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারে না। আধ ঘণ্টা কঠিন বিষয় চিন্তা করিলে মাথা ঘুরিয়া যাইবে, দুই চারিটি চিন্তা-সাধ্য পুস্তক লিখিলে মাথার পীড়া হইবে। তবে এখন নূতন বৈজ্ঞানিকসত্য আবিষ্কার করিবে কি করিয়া? যাঁহারা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত, তাঁহারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানান্বেষণে ব্যস্ত থাকেন, কত রাত্রি নিদ্রাহীননেত্রে তারকার দিকে চাহিয়া থাকেন, কত দিবস আহার ত্যাগ করিয়া সূর্য্য গ্রহণের প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। এ সকল কি আমাদের দেশের দৃষ্টি অভাবে চসমা-চক্ষু, রাত্রি জাগরণে অজীর্ণ-রোগী, বিশ্রাম অভাবে রুগ্ন-দেহ, জল বায়ুর দোষে শীর্ণ-ধাতু বিএএমের কর্ম্ম? বাঙ্গালা দেশ হইতে উঠিয়া না গেলে আমাদের নিস্তার নাই। ভারতবর্ষের

অন্য কোন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিলেই তবে আমাদের রক্ষা, নহিলে কতক গুলি অপচাজ্ঞান গিলিয়া গিলিয়া বিকৃত-মস্তিষ্ক, বিলাতী প্রভুদের বুট জুতার আঘাত সহিয়া সহিয়া হীন-প্রকৃতি, দিন রাত্রি পরিশ্রম করিয়া করিয়া রুগ্ন দেহ ও সাহেবি সভ্যতার সহিত নানাবিধ অভাব আমদানি হওয়াতে দরিদ্র হইয়া মরিতে হইবে।

আমাদের জ্ঞান অর্জ্জনের যে সকল বাধা জন্মিয়াছে, তাহা নিরাকৃত করিবার কি কোন উপায় নাই? আমাদের কত খানি উন্নতির আশা আছে দুই একটি কারণে তাহা যে নষ্ট হইবে ইহা ত সহ্য হয় না। প্রথম বিঘ্ন দারিদ্র্য, এই দারিদ্র্য কি কখনো চিরকাল তিষ্ঠিতে পারে? ইহা অসম্ভব যে একটি সমগ্র জাতি একেবারে না খাইয়া মরিবে, অথবা অভাবের উৎপীড়ন সহিয়াও স্থির হইয়া থাকিবে। ইংলণ্ড দেশটি কিছু উর্ব্বর নহে তবে তাহারা ধনী হইল কি করিয়া? ভাবিয়া দেখিতে গেলে অভাবই তাহাদের ধনী করিয়াছে। নিজের দেশে জীবিকার সংস্থান করিতে না পারিয়া তাহারা দেশ বিদেশে গিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। যেখানে অভাব সেখানেই একটি না একটি উপায় আছে। আমাদের দেশে স্বাধীন বাণিজ্য-প্রচার আরম্ভ হইয়াছে, ক্রমশঃ যে তাহার উন্নতি হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? গবর্ণমেণ্ট যদি বিঘ্ন না দেন, তবে বাঙ্গালীরা নিশ্চয়ই বাণিজ্যের উন্নতি করিতে পারিবে। ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতিরা অত্যন্ত বাণিজ্য-প্রিয়, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার-অভাবে তাহাদের অনেক বাধা পড়িতেছে, কিন্তু শিক্ষিত ও স্বভাব-চতুর বাঙ্গালীরা নদীবহুল ও সমুদ্রতীরস্থ বঙ্গদেশে এ বিষয়ে শীঘ্রই উন্নতি লাভ করিবে। অর্থ উপার্জ্জিত হইলে জ্ঞান উপার্জ্জনের অনেক সুবিধা হইবে। কিন্তু ইংরাজদের কিছু অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছে; অর্থ জ্ঞানের সহায়তা করে বটে, কিন্তু অতিরিক্ত হইলেই আবার জ্ঞানের শত্রুতাচরণ করে; বিলাস মনকে এমন নিস্তেজ করিয়া ফেলে যে জ্ঞানের শ্রমসাধ্য আলোচনায় অক্ষম হইয়া পড়ে। ইংলণ্ডে বিলাস-স্রোত যেরূপ অপ্রতিহত প্রভাবে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে ইংলণ্ডের সভ্যতা যে শীঘ্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবে তাহার সম্ভাবনা দেখিতেছি। বিলাসের শীতল ছায়ায় লালিত পালিত হইয়া এখন সেখানে কেহ যুদ্ধ প্রভৃতি গোলযোগে প্রবৃত্ত হইতে চাহিতেছে না। ক্রমেই তাহারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া পড়িবে। আমাদের দেশে অর্থ অধিক উপার্জ্জিত হইলে বিলাস-বৃদ্ধির অধিকতর সম্ভাবনা, কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। উত্থান-পতন-শীল কালের তরঙ্গে কত কি গঠিত হইবে ও কত কি বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে, তাহা নিঃসংশয়ে স্থির করা সাধ্যাতীত। ভবিষ্যতের অন্ধকারময় পথে কি কি ঘটনা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে তাহা দেখা অতিশয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কর্ম্ম। কিন্তু এখনকারমত আমাদের অর্থ নহিলে চলিতেছে না, এবং শীঘ্রই যে অর্থ উপার্জ্জিত হইবে তাহার সম্ভাবনা দেখিতেছি।

এক হিসাবে আমাদের অভাব অত্যন্ত উপকারী। অভাব না থাকিলে দেশের বাহিরে যাইবার প্রয়োজন হয় না, এবং একটি প্রদেশের ক্ষুদ্র সীমায় জ্ঞানও সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। বাণিজ্য দ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে দেশ বিদেশ হইতে জ্ঞানও আহৃত হয়। এইরূপে নানা দেশের ধন লইয়া দেশ ধনশালী হয় এবং নানা জাতির জ্ঞান লইয়া জাতিও জ্ঞানশালী হয়। এই জন্য বলিতেছি যে, দারিদ্র্য প্রবল ও গবর্ণমেণ্ট অনুদার হইয়া আমাদের দেশের মূলে অনিষ্ট হইতেছে না, বরং তাহা দূরবর্ত্তী মঙ্গলকে আহ্বান করিতেছে।

এক্ষণে একটি কথা উঠিতে পারে যে, নানা বাহ্য কারণে ও জল বায়ুর প্রভাবে বাঙ্গালীদের এরূপ স্বভাব হইয়া গিয়াছে যে, বরং তাহারা না খাইয়া মরিবে, তথাপি পরিশ্রম করিয়া তাহা নিরাকরণ করিবে না, তবে অভাবে তাহাদের কি উপকার হইবে? কিন্তু বিদ্যা যতই প্রচার হইবে, ততই সে সকল বাধা দূর হইবে। কর্ত্তব্য-জ্ঞানে মনের এমন বল জন্মে যে, বাহিরের অনেক বাধা তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। এখন দেখা যাইতেছে যে, শিক্ষিতদের মধ্যে অনেকের বাণিজ্যের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে বাণিজ্য বহুল রূপে প্রচারিত হইলে জন-সাধারণ শীঘ্রই তাঁহাদের অনুগামী হইবে।

আমাদের উন্নতির দ্বিতীয় বাধা জল বায়ু ভাবিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীতি হইবে যে, আমাদের দেশের জল বায়ু কিছু এত মন্দ নহে যে, তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার কোন উপায় নাই। আমাদের দেশে পরিশ্রম করিলেই বল সঞ্চয় করিতে পারা যায়। পল্লীগ্রামের শ্রমশীল কৃষকেরা ত দুর্ব্বল নহে। আমাদের মনে উদ্যম জন্মিয়া উঠিয়াছে, কেবল দুর্ব্বল শরীর তাহার বাধা দিতেছে; কিন্তু এদেশীয় কৃষকদের ন্যায় যদি বল লাভ করা যায় তাহা হইলে আমাদের শরীর আমাদের মনকে সাহায্য করিবে। কর্ত্তব্য জ্ঞান ও শিক্ষা-বলে বলীয়ান হইয়া শ্রমসাধ্য বিষয়ের প্রতি আমাদের অরুচি অন্তর্হিত হইবে। মন বৃদ্ধ হইয়া গেলেই শরীর বৃদ্ধ হয়, আমাদের দেশে অল্প-বয়সেই মহা বিজ্ঞ রকমের চাল চুল প্রকাশ পাইতে থাকে। যতদিন নাচিয়া হাসিয়া, ক্রীড়া করিয়া কাটাইয়া দেওয়া যায়, ততদিন মনে বার্দ্ধক্যের মরিচা পড়িতে পারে না। যাহা হউক আমাদের দেশের উন্নতির পক্ষে যে দুইটি বাধা বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহা নষ্ট করিবার তেমনি দুইটি অমোঘ উপায় আছে,—ব্যবসায় ও ব্যায়াম।

স্বাস্থ্য।

যাহাতে রাত্রিতে মাতা ও সন্তান সুখে নিদ্রা যাইতে পারে, তাহার উপায় বিধান করা উভয়ের স্বাস্থ্যের জন্য নিতান্ত আবশ্যক। রাত্রিতে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিলে উভয়েরই অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা।

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির যেরূপ নিয়মিত সময়ে আহার করিবার ইচ্ছা হয়, সন্তানেরও সেইরূপ হইয়া থাকে। যদি কেহ বিষয় কর্ম্মের অনুরোধে রাত্রি দুই প্রহরের সময় প্রত্যহ আহার করেন এবং রাত্রিশেষে চা খান, তাহা হইলে কর্ম্মে ব্যাপৃত না থাকিলেও অভ্যাস বশতঃ সেই ব্যক্তির ঐ দুই সময়ে যথানিয়মে খাইতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় আহারাদির পর শয়ন করিয়া সমস্ত রাত্রি নিদ্রায় অভিভূত থাকে ও পর দিবস প্রাতে গাত্রোত্থান করে, সে কখনই অধিক রাত্রিতে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া জাগিয়া উঠে না। অভ্যাসের নিয়মই এই। বিশেষতঃ প্রকৃতির নিয়মানুসারে সুস্থকায় ব্যক্তির নিদ্রাবস্থায় কখন ক্ষুধার উদ্রেক হয় না।

অধিক বয়স্কের প্রতি যখন প্রকৃতি এতদূর অনুকূল, তখন তিনি প্রসূতি ও সন্তানকে কেন নিগ্রহ করিবেন। কেনই বা তাহারা নিদ্রাসুখে বঞ্চিত হইবে। যদি বঞ্চিত হয়, সে বুঝিবার দোষে। অনেকে মনে করেন যে, দিবসের ন্যায় রাত্রিতে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সন্তানকে দুধ না খাওয়াইলে অনাহারে উহার মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। বস্তুত তাহা নহে। অভ্যাস করাইলে বালক রাত্রিতে দুই ঘণ্টা অন্তর কেন, প্রতি ঘণ্টায় জাগরিত হইয়া দুগ্ধের জন্য কাঁদিতে পারে। সেইরূপ প্রথম হইতে অভ্যাস করাইলে সেই বালকই রাত্রিতে একবারও না উঠিয়া সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে থাকে। আর যদি প্রথম দুই এক দিন কোন কারণ বশত কাঁদিয়া উঠে এবং তৃষ্ণাতুর হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত রূপ চিনি পানা দিবা মাত্র পুনরায় ঘুমাইয়া পড়ে। না দিলেও ক্ষণকাল কাঁদিয়া আবার নিস্তব্ধ হয়। এইরূপে ধৈর্য্য অবলম্বন করিলে, যে সন্তান সমস্ত রাত্রি স্তনপান করিত, সেও ক্রমে ক্রমে দুগ্ধ না খাইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু এরূপ অভ্যাস সহজে সম্পন্ন হয় না। কিন্তু যাহার ঐরূপ অভ্যাস হয় নাই তাহাকে অনায়াসেই সমস্ত রাত্রি রাখা যায়।

রাত্রিকালে স্তনপান-দোষে অনেক সন্তান অল্পকাল মধ্যে অসুস্থ বা রুগ্ন হইয়া পড়ে। রাত্রিতে স্তনপান কেবল অভ্যাসের ফল মাত্র। ইহা কখনই প্রকৃতি-নিয়মিত নহে। এতদ্দ্বারা প্রথমতঃ সন্তানের পেটের অসুখ হয়, ক্রমে সন্তান রুগ্ন ও শীর্ণ-কলেবর হইতে থাকে এবং পরিশেষে উহার জীবন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়।

বালকেরা যেরূপ নিয়মিত সময়ে আহার করে, ক্রোড়স্থ শিশুসন্তানকেও সেইরূপ নিয়ম করিয়া যথাকালে ও মাত্রায় আহার দেওয়া উচিত। বালকেরা অসময়ে বা কোন জিনিস দেখিবামাত্র খাইতে চাহিলে তাহা দেওয়া বিশেষ অনিষ্টকর।

নিয়মিত সময়ে স্তনপান করাইলে বালক নিঃশেষে স্তনের দুগ্ধ পান করিতে পারে। এদেশে আর একটি কুপ্রথা এই যে সন্তান কাঁদিলেই মাতা তাহাকে স্তনপান করান। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে অনেক সময়ে সন্তান অন্য কারণেও কাঁদিয়া থাকে। অতএব স্তনপান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত এই নিয়মটি প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। ইহা সকলের পক্ষে উপযুক্ত না হইলেও হইতে পারে কিন্তু চেষ্টা করিলে অনেকেই তদনুসারে চলিতে পারেন।

রাত্রি ৯॥। ১০ টার সময় সন্তান স্তন্য পান করিলে পর জননী শিশুটিকে লইয়া শয়ন করিবেন ও একবারে ৫ টার সময় উঠিয়া তাহাকে স্তন দিবেন। ইতিমধ্যে সন্তান কাঁদিয়া উঠিলে তাহার গাত্র-বস্ত্র বা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। অথবা যদি উহার ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক দেখেন, তবে এক ঝিনুক শীতল জল দিলেই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু কখন যেন উহার মুখে স্তন না দেন। পাঁচটা বাজিলেই সন্তানকে স্তন পান করাইবেন। তাহার পর বেলা নয়টার সময় ছেলেকে পুনরায় স্তন দিতে হইবে। নটার পর হইতে চারি ঘণ্টা অন্তর এক একবার স্তন্যপান করাইলেই সন্তানের ক্ষুধা শান্তি হইতে পারে।

৩। যে প্রসূতির শরীর সুস্থ ও সবল তাহারই পুত্রকে স্তনপান করাইবার ভার গ্রহণ করা উচিত। মাতার এই ভার পরের হস্তে সমর্পণ করা অতি নিষ্ঠুরের কাজ। নিতান্ত প্রয়োজন হইলেই মাতাকে এইরূপ অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করিতে হয়। ইংরাজদের সম্ভ্রান্ত লোকের পুরন্ধ্রী সকল সন্তানকে স্তন দেওয়া নীচ কার্য্য বলিয়া মনে করেন। লিপসিকের একজন সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বলেন যে জননী মাত্রেরই স্বহস্তে সন্তান-প্রতিপালন-ভার গ্রহণ করা উচিত। ইহাতে গৌরব ভিন্ন অপমানের বিষয় কিছুই নাই। যে মাতা সৌন্দর্য্য ও যৌবন-সুলভ কমনীয়তার হানি হইবে মনে করিয়া সন্তানকে স্তন দিতে বিরত হন, তাঁহারাই অচিরে স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ঐ সকল বিষয়ে বঞ্চিত হন। বস্তুত প্রসবের পর মাতৃস্তনে দুগ্ধ সঞ্চার হওয়া প্রকৃতি-নিয়মিত কার্য্য। সচরাচর এই দুগ্ধ প্রচুর পরিমাণেই মাতৃস্তনে পাওয়া যায়। এসময়ে উহা সন্তানকে না দিয়া যদি ঔষধ বা অন্য কোন অস্বাভাবিক উপায়ে বন্ধ করা হয়, তাহা হইলে মাতার সমূহ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এমন কি ইহাতে রক্তস্রাব প্রদর-রোগ শিরঃপীড়া জ্বর পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। অতএব প্রসূতি মাত্রেরই এবিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। এবং যাহাতে ছয় মাস পর্য্যন্ত দুগ্ধ নিঃসরণ হইতে পারে তাহার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য।

স্ত্রীলোকের গর্ভাশয় ও স্তন পর্য্যায়ক্রমে

কার্য্য করিবে, ইহাই প্রকৃতির উদ্দেশ্য। গর্ভাবস্থায় স্তনদ্বয়ে কিছুদিন পর্য্যন্ত কোন কার্য্যই থাকে না। তখন গর্ভাশয়ই সন্তানকে পোষণ করিতে থাকে। প্রসবের পর ঐ দুই অঙ্গের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, অর্থাৎ স্তনদ্বয় জরায়ুর ভার গ্রহণ করে। ইহার ব্যভিচারে সন্তান ও মাতা উভয়েরই অনিষ্ট হয়।

ঘঃ—

ভারতী-বন্দনা।

প্রথম কবি।—

আজিকে তোমার মানস সরসে
কি শোভা হয়েছে,—মা
অরুণ বরণ চরণ পরশে
কমল কানন, হরষে কেমন
ফুটিয়ে রয়েছে,—মা!
নীরবে চরণে উথলে সরসী,
নীরবে কমল, করে টল মল
নীরবে বহিছে বায়।
মিলি কত রাগ, মিলিয়ে রাগিণী,
আকাশ হইতে করে গীত-ধ্বনি,
শুনিয়ে সে গীত আকাশ-পাতাল
হোয়েছে অবশ প্রায়,
শুনিয়ে সে গীত, হোয়েছে মোহিত
শিলাময় হিমগিরি,
পাখীরা গিয়েছে গাইতে ভুলিয়া
সরসীর বুক উঠিছে দুলিয়া
ক্রমশঃ ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিছে
তান-লয় ধীরি ধীরি;
তুমি গো জননি, রয়েছ দাঁড়ায়ে
সে গীত ধারার মাঝে,
বিমল জোছনা-ধারার মাঝারে
চাঁদটি যেমন সাজে।
দশ দিশে দিশে, ফুটিয়া পড়েছে
বিমল দেহের জ্যোতি,
মালতী ফুলের পরিমল সম
শীতল মৃদুল অতি।
আলুলিত চুলে কুসুমের মালা
সুকুমার করে মৃণালের বালা
লীলা-শতদল ধরি,
ফুল-ছাঁচে ঢালা কোমল শরীরে
ফুলের ভূষণ পরি।
দশ দিশি দিশি, উঠে গীত ধ্বনি,
দশ দিশি ফুটে দেহের জ্যোতি
দশ দিশি ছুটে ফুল-পরিমল
মধুর মৃদুল শীতল অতি।
নব দিবাকর ম্লান সুধাকর
চাহিয়া মুখের পানে,
জলদ আসনে দেব বালাগণ
মোহিত বীণার তানে।

আজিকে তোমার মানস-সরসে
কি শোভা হোয়েছে-মা !—
রূপের ছটায় আকাশ পাতাল
পূরিয়া রয়েছে-মা !—
যেদিকে তোমার পড়েছে জননি,
সুহাস কমল-নয়ন দুটি
উঠেছে উজলি' সেদিক অমনি,
সেদিকে পাপিয়া, উঠিছে গাহিয়া
সেদিকে কুসুম উঠিছে ফুটি !
এস মা আজিকে ভারতে তোমার,
পূজিব তোমার চরণ দুটি !
বহুদিন পরে, ভারত অধরে
সুখময় হাসি উঠুক্ ফুটি !
আজি কবিদের মানসে মানসে
পড়ুক্ তোমার হাসি,
হৃদয়ে হৃদয়ে উঠুক্ ফুটিয়া
ভকতি-কমল-রাশি !
নমিয়া ভারতী-জননী চরণে
সঁপিয়া ভকতি-কুসুম-মালা,
দশ দিশি দিশি প্রতিধ্বনি তুলি
হুলুধ্বনি দিক্ দিকের বালা !
চরণ-কমলে অমল কমল
আঁচল ভরিয়া ঢালিয়া দিক্ !
শত শত হৃদে তব বীণাধ্বনি
জাগায়ে তুলুক শত প্রতিধ্বনি,
সে ধ্বনি শুনিয়া কবির হৃদয়ে
ফুটিয়া উঠিবে শতেক কুসুম
গাহিয়া উঠিবে শতেক পিক !

দ্বিতীয় কবি।—

কেনগো ভারতে আজি, আসিবে ভারতী দেবি
আছে কি এ শ্মশানের মাঝে ?
কোমল কমল রাজি, তোমার আসন মাতা
হেথায় কি তোমারে গো সাজে ?
কিদিয়ে আমরা আর, পূজিব চরণ তব,
কোথা পাব মানস-কমল,
বল গো কমলাসনা, কোথায় দাঁড়াবে তুমি
এ শ্মশানে নাই হেন স্থল !
আঁধার আকাশ দিয়া, উচ্ছ্বসিয়া যায় বায়ু
শিবাদল করিছে রোদন,
গগন জলদে অঙ্গ, গুমরিয়া গুমরিয়া
থেকে থেকে করিছে গর্জ্জন।
ক্ষণেক আলেয়া আলো, ছলনা করিয়া আঁখি
পলকে মিশায় প্রকাশিয়া,
যেন রে রাক্ষস ঘোর, সর্ব্বগ্রাসী অন্ধকার
উঠিতেছে হাসিয়া হাসিয়া।
মাঝে মাঝে চিতানল, নীরবে নীরবে জ্বলি,
ভস্ম হোয়ে নিভিছে আবার,
আকাশেতে চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই তারা নাই,
চারি দিকে—আঁধার—আঁধার !—
এ মহা-শ্মশান মাঝে, যদি গো বাজাও বীণা,
কি ভীষণ শুনাবে সে ধ্বনি !
ঘুম ভাঙ্গাইল বলি, গাঢ়নিদ্র অন্ধকার
ভ্রুকুটিয়া উঠিবে অমনি !
সে শব্দে চেতনা পেয়ে, নিদ্রোত্থিত রোগী সম,
চারি দিক কাঁদিয়া উঠিবে,
পেচকের, বাদুড়ের, শিবার অশিব ধ্বনি
একস্বরে চৌদিকে ছুটিবে।
বল দেখি বীণাপাণি, কমলবাসিনি ওগো
ডাকি হেথা তোমারে কি বলি,
থাক তুমি থাক সুখে, কোমল-কমল-বুকে
মানসের সরসী উজলি !
এক দিন ছিল দেবি, ভারতে আসিতে তুমি,

শত কবি উঠিত গাইয়া,
সহস্র ভারতবাসী করিত তোমার স্তব
সমস্বরে আকাশ ছাইয়া!
সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি, বেড়াইত খেলাইয়া
হিমাদ্রির গুহায় গুহায়,
ভারত সমুদ্র বক্ষে, সহস্র তরঙ্গ উঠি
মিশাইত কণ্ঠস্বর তায়।
বাল্মীকির বীণাধ্বনি, ব্যাসের ভেরী-নিনাদ
ঋষিদের আরণ্যক গান,
শুনিতে শুনিতে তুমি, ভারতের বক্ষে আসি
কেমন হইতে অধিষ্ঠান!
কালিদাস ভাব-মুগ্ধ, কুহকিনী বাঁশি লয়ে
বাজাতেন কি মোহন গীত,
তটিনী ধরিত তান, কুঞ্জে কুঞ্জে পাখী গুলি
গাইত গো তাহার সহিত!
হা দেবি সে দিন নাই, কাজ কি আসিয়া তবে?
যে বন হোয়েছে শুষ্ক মরু—
সেখানে বসন্ত এলে, আর কি ডাকিবে পাখী
মুঞ্জরিবে শুষ্ক যত তরু?
তোমারে দেখিলে দেবি, সে দিনের যত কথা
একে একে জেগে উঠে মনে,
কি আঘাত লাগে প্রাণে, বুক যেন ফেটে যায়
মর্ম্মভেদী-স্মৃতির দংশনে?
থাক্ থাক্ ও সকল, মরমের কথা গুলি
মরমেই ঘুমাক্ নীরবে—
প্রতিধ্বনিও যেথা, সাড়া নাহি দেয় কভু
সে অরণ্যে কাঁদিয়া কি হবে?

তৃতীয় কবি।—

ওগো বীণাপাণি, কমলবাসিনি
দেখিছ না তুমি চেয়ে?
ভারতের মুখ, ঘোর বিষাদের
আঁধার ফেলেছে ছেয়ে।
কত আর বল কাঁদিবে অভাগী,
যাতনা সহিবে কত?
তোমারি সুহাসি কিরণে, ভারতি,
নাশ গো বিষাদ যত।
যদি বীণাপাণি ঢাল গো হেথায়
ও বীণার সুধারাশি,
এখনি ভারত মুছিবে নয়ন
এখনি উঠিবে হাসি!
মলিন শ্রীহীন, ভারত এখন,
সকলি গিয়েছে তার,
ধন মান যশ সুখ স্বাধীনতা
কি আছে বল গো আর!
লক্ষ্মী এক দিন ছিলেন ভারতে
ছাড়িয়া গেছেন তারে।
বল দেখি তবে ভারত এখন
কি লয়ে হাসিতে পারে?
তবে আগমনে যদি গো ভারত
হাসে দিনেকের তরে
সেই টুকু সুখে করো না বঞ্চিত
কহি দেবি সকাতরে!
এস তবে আজি বীণা-পাণি দেবি
লও বীণা কোলে তুলি,
তোমার চরণ-পরশে ভারত
যাক্ শোক তাপ ভুলি।
ও পদ পরশে মুছুক্ ভারত
নয়ন-সলিল রাশি।
দিনেকের তরে অভাগী ভারত
হাসুক্ সুখের হাসি।
আইস গো তবে ভারতী এবার,
আজি পূর্ণিমা যায় মাসে,

কবিতা কমল তুলিয়াছি শুধু
তোমার পূজার আশে।

চতুর্থ কবি।—

এত হাসি কেন আজ, ভারতের গৃহে গৃহে
কি সুখ হয়েছে আজ তার?
ভারতে সুখের রবি, আবার কি উঠিয়াছে?
ঘুচেছে কি কলঙ্ক আঁধার?
স্বাধীন বিহঙ্গ সম, ভারতে কবিরা আজ
এত কিগো গাইতেছে গান,
এত গো কিসের সুখে, উথলিয়া উঠিয়াছে
কবিদের বিষণ্ণ পরাণ?
এখনো ত ভারতের আকাশ জলদে-ভরা
এখনো ত ঘুচেনি আঁধার;
তবে কেন এত হর্ষ, হাসির উল্লাস ধ্বনি
ধ্বনিত করিছে কারাগার।
এ মহান্ আর্য্যদের সমাধি মন্দিরে বসি
কে গো আজ চায় হাসিবারে?
কাজ নাই কাজ নাই, যত কাল বেঁচে রব
পূজিব গো অশ্রু জল ধারে।
এখনি কি এ ভারত, কলঙ্কের এ শৃঙ্খল
অলঙ্কার করিয়াছে মনে?
দাসত্বের পদধূলি, অবনত করিয়া মাথা
লইছে কি গৌরবের সনে?
কি ভ্রমে ভুলিয়া তবে আজি এ দুখের দিনে
এ ভারত হাসিবারে চায়?
মর্ম্মভেদী অশ্রুজলে কাঁদিয়া মরিব, তবু
হাসিবারে চাব না হেথায়!

পঞ্চম কবি।—

হা ভারতি দেবি, তোমারে দেখিয়া
ভারত আর কি হাসিবে?
তোমার মৃদুল হাসির কিরণে
এ আঁধার কিগো নাশিবে?
চাই না গো দেবি হাসিতে আমরা
এ দুখে হাসিব কেমনে?
কাঁদিবার তরে ডাকি গো তোমারে
এই ভারতের আসনে!
আঁধার ভারতে কত দিন মাতা
তোমার ও বীণা বাজেনি!
ভারতের আহা আঁধার হৃদয়ে
তোমার চরণ সাজেনি।
ভারতের ভালে নিভিল যে দিন
সোণার প্রদীপ খানি,
সেই দিন হোতে তোমার বীণাও
নীরব ভারতী রাণী!
সেই দিন হোতে ভারত কাননে
কুসুম রহে না ফুটিয়া,
সুরভিত হত আঁধার পৃথিবী
যাহার সুরভি লুটিয়া,
সেই দিন হোতে একটি পাখীও
বসিয়া ভারত কাননে
গাহেনা হরষে হৃদয়ের গান
তরুণ রবির কিরণে!
আর ত জননি পারি না সহিতে,
নীরবে নীরবে বিষাদ বহিতে,
হৃদয়ে লুকায়ে নয়ন সলিল
মুখেতে হাসিব কেমনে?
তোমার ও বীণা বাজাও জননি
ধ্বনিত করিয়া আকাশ ধরণী,
বিজন, নীরব, আঁধার ভারত
কাঁদিবে তোমার চরণে!
ভারতের অতি বিজন মরমে
যত দুখ আছে লিখা,

ভারত-হৃদয়ে তুলিছে যে এক
লুকানো অনল-শিখা,
তোমারে সকলি দেখাবে জননি
হৃদয়-দুয়ার খুলিয়া,
মুছিবে দুখের নয়ন সলিল
তোমার আঁচল তুলিয়া।
তার হৃদয়ের বিষাদের গান
গাও তুমি ওগো জননি
স্বরগে উঠুক সে শোকের গাথা
ধ্বনিত করিয়া ধরণী!
চাই না জননি হাসিতে আমরা
হাসিবার কি বা আছে?
কাঁদিতেই চাই, তুমি না আইলে
কাঁদিব কাহার কাছে।
তাই বলি এস বীণা-পাণি দেবি
ভারত-হৃদয়-কমলে,
দুখের নয়ন-সলিল বরষি
পূজিব তোমারে সকলে!
কি দিয়ে পূজিব তোমায় জননি
নাইক কমল দল
হৃদয় হইতে ঢালিব চরণে
দুখের নয়ন জল!
দেখিতে দেখিতে ওই,আলোকে আলোকে যেন
দশ দিক উঠিল উথলি।
সুনীল আকাশ তলে, কে গো ওই কলপনা,
নিশান্তের ললাট উজলি!
চরণে জলদ রাশি, শুভ্র বিভা পরকাশি
স্তরে স্তরে স্তবকিত ভূধর সমান।
চরণ-কিরণ ধার, পদ হোতে ঝরি তাঁর
মেঘে মেঘে ইন্দ্রধনু করেছে নির্ম্মাণ।
চরণের মেঘ তলে, প্রভাতের তারা জলে
প্রাতঃশশি সে জলদে মাথা করি নত।
উষার বিশদ-বাস, দেহে তাঁর পরকাশ
দিশি দিশি শুভ্র আভা করি বিকীরিত।
অরুণ কিরীট শিরে, জ্বলিতেছে ধীরে ধীরে
নিলীম-আকাশ তল উজ্জ্বল করিয়া,
তারকা-রতন গুলি, চুল হোতে খুলি খুলি
হেথায় হোথায় পড়ে ঝরিয়া ঝরিয়া।
আলো করি দুটি পাশ, দাঁড়ায়ে বাল্মীকি ব্যাস
প্রদীপ্ত অনল সম দিগন্ত উজলি।
ভাবেতে বিভোর হোয়ে, স্বর্গ পারিজাত লোয়ে
পদ প্রান্তে কালিদাস দেন পুষ্পাঞ্জলি।
সহসা উঠিল সেই বীণার ঝঙ্কার,
পুলকে শিহরে ধরা, শিহরে শশাঙ্ক তারা
ধীরে ধীরে খুলে গেল স্বরগের দ্বার।
অনন্ত অনন্ত স্তরে দূর হোতে দূরান্তরে,
আলোকের মহারণ্য সহসা প্রকাশে,
দীপ্ত গ্রহ শত শত, ফিরিছে ঘুরিছে কত,
উঠিছে ছুটিছে শূন্যে উন্মাদ উল্লাসে।
অনন্ত অনন্ত স্তরে, দেবগণ সমস্বরে
জয় জয় সরস্বতী করিল ঘোষণা।
অনন্ত অনন্ত স্তরে, বিদ্যাধরী বিদ্যাধরে,
গাহিয়া উঠিল জয় জয় পদ্মাসনা!
সে ধ্বনি উথলি উঠি, শূন্যে করে ছুটাছুটি
দিগঙ্গনা উত্তরিল প্রতিধ্বনি দিয়ে,
উল্লাসে জাহ্নবী ছোটে, সাগর উচ্ছ্বসি ওঠে,
হিমাদ্রি কন্দরে ধ্বনি গরজে আসিয়ে।
জয় জয় সরস্বতী হইল ঘোষণা
প্রকৃতি উঠিল গাহি জয় পদ্মাসনা।
আবার উঠিল সেই বীণার ঝঙ্কার
অমনি হইল ধরা হরষ উল্লাসে ভরা,
ফুটিল বাসন্ত ফুল কানন মাঝার।

নিভৃত নিকুঞ্জে বসি খুলি দিয়া প্রাণ,
গাইল বনের পাখী বসন্তের গান।
বহিল কানন ময় বসন্তের বায়,
নবীন বসন্ত ঋতু আইল ধরায়।
তুমিও আইলে বালা, হাসিলেন উষা,
পরিল পৃথিবী নব বসন্তের ভূষা।
তোমারে দেখিয়া হর্ষে হইয়া অধীর,
মুছিয়া নয়ন হোতে নীহারের নীর,
বরণ বরণ ফুলে করিয়া খচিত,
পৃথিবী আসন তব কৌরেছে রচিত।
আইল হেথায় তবে কহিতেছে কবি
যেথা তব পদার্পণ, রাত্রি করে পলায়ন,
সেথায় জাগিয়া উঠে সুতরুণ রবি।

কবি-কাহিনী।

দ্বিতীয় সর্গ—

"এত কাল হে প্রকৃতি, করিনু তোমার সেবা,
তবু কেন এ হৃদয় পূরিল না দেবী?
এখনো বুকের মাঝে, রয়েছে দারুণ শূন্য,
সে শূন্য কি এ জনমে পূরিবে না আর?
মনের মন্দির মাঝে, প্রতিমা নাহিক যেন
শুধু এ আঁধার গৃহ রয়েছে পড়িয়া,
কত দিন বল দেবী, রহিবে এমন শূন্য,
তা হলে ভাঙিয়ে যাবে এ মনো-মন্দির!
কিছু দিন পরে আর, দেখিব সেখানে চেয়ে
পূর্ব্ব হৃদয়ের আছে ভগ্ন অবশেষ,
সেই ভগ্ন অবশেষে—সুখের সমাধি পরে
বসিয়া দারুণ দুখে কাঁদিতে কি হবে?
মনের অন্তর তলে, কি যে কি করিছে হহ
কি যেন আপন ধন নাইক সেখানে,
সে শূন্য পূরাতে দেবী, ঘুরেছি পৃথিবীময়
মরুভূমে তৃষাতুর মৃগের মতন।
কত মরীচিকা দেবি, কোরেছে ছলনা মোরে,
কত ঘুরিয়াছি তার পশ্চাতে পশ্চাতে,
অবশেষে শ্রান্ত হোয়ে তোমারে শুধাই দেবী
এ শূন্য পূরিবে না কি কিছুতে আমার?
উঠিছে তপন শশি, অস্ত যাইতেছে পুনঃ
বসন্ত শরত শীত চক্রে ফিরিতেছে—
প্রতি পদক্ষেপে আমি, বাল্যকাল হোতে দেবী,
ক্রমে ক্রমে কতদূর যেতেছি চলিয়া;
বাল্যকাল গেছে চোলে, এসেছে যৌবন এবে
যৌবন যাইবে চলি আসিবে বার্দ্ধক্য,
তবু এ মনের শূন্য, কিছুতে কি পূরিবে না?
মন কি করিবে হহ চিরকাল তরে?
শুনিয়াছিলাম কোন উদাসী যোগীর কাছে
"মানুষের মন চায় মানুষেরি মন—
গম্ভীর সে নিশীথিনী, সুন্দর সে উষাকাল
বিষণ্ণ সে সায়াহ্নের ম্লান মুখচ্ছবি,
বিস্তৃত সে অম্বুনিধি, সমুচ্চ সে গিরিবর

আঁধার সে পর্ব্বতের গহ্বর বিশাল ;
তটিনীর কলধ্বনি, নির্ঝরের ঝর ঝর
আরণ্য বিহঙ্গদের স্বাধীন সঙ্গীত,
পারে না পূরিতে তারা, বিশাল মনুষ্য হৃদি
মানুষের মন চায় মানুষেরি মন।"
শুনিয়া প্রকৃতি দেবি, ভ্রমিনু পৃথিবীময়
কত লোক দিয়েছিল হৃদি উপহার—
আমার মর্ম্মের গান, যবে গাহিতাম দেবী
কত লোক কেঁদেছিল শুনিয়া সে গীত,
তেমন মনের মত, মন পেলাম না দেবী
আমার প্রাণের কথা বুঝিল না কেহ,
তাইতে নিরাশা হোয়ে আবার এসেছি ফিরে
বুঝি গো এ শূন্য মন পূরিল না আর।"
এইরূপ কেঁদে কেঁদে, কাননে কাননে কবি,
একাকী আপন মনে করিত ভ্রমণ।
সে শোক-সঙ্গীত শুনি, কাঁদিত কাননবালা,
নিশীথিনী হাহা করি ফেলিত নিশ্বাস।
বনের হরিণ গুলি, আকুল নয়নে আহা
কবির মুখের পানে রহিত চাহিয়া।
"হাহা দেবী একি হোলো,কেন পূরিলনা প্রাণ"
প্রতিধ্বনি হোতো তার কাননে কাননে।
শীর্ণ নির্ঝরিণী যেথা, ঝরিতেছে মৃদু মৃদু
উঠিতেছে কুলু কুলু জলের কল্লোল,
সেথানে গাছের তলে একাকী বিষণ্ণ কবি
নীরবে নয়ন মুদি থাকিত শুইয়া,
তৃষিত হরিণ শিশু সলিল করিয়া পান
দেখি তার মুখ পানে চলিয়া যাইত।
শীতরাত্রে পর্ব্বতের তুষার শয্যার পরে
বসিয়া রহিত স্তব্ধ প্রতিমার মত,
মাথার উপরে তার পড়িত তুষার কণা
তীব্রতম শীত বায়ু যাইত বহিয়া।
দিনে দিনে ভাবনায়, শীর্ণ হোয়ে গেল দেহ
প্রফুল্ল হৃদয় হ'ল বিষাদে মলিন,
রাক্ষসী স্বপ্নের তরে, ঘুমালেও শান্তি নাই
পৃথিবী দেখিত কবি শ্মশানের মত।
এক দিন অপরাহ্নে, বিজন পথের প্রান্তে
কবি বৃক্ষতলে এক রয়েছে শুইয়া,
পথ-শ্রমে শ্রান্ত দেহ, চিন্তায় আকুল হৃদি,
বহিতেছে বিষাদের আকুল নিশ্বাস।
হেনকালে ধীরি ধীরি, শিয়রের কাছে আসি
দাঁড়াইল এক জন বনের বালিকা,
চাহিয়া মুখের পানে, কহিল করুণ স্বরে
"কে তুমি গো পথশ্রান্ত বিষণ্ণ পথিক ?
অধরে বিষাদ যেন, পেতেছে আসন তার
নয়ন কহিছে যেন শোকের কাহিনী।
তরুণ হৃদয় কেন, অমন বিষাদময় ?
কি দুখে উদাস হোয়ে করিছ ভ্রমণ ?"
গভীর নিশ্বাস ফেলি, গম্ভীরে কহিল কবি
"প্রাণের শূন্যতা কেন ঘুচিল না বালা ?"
একে একে কত কথা কহিল বালিকা কাছে,
যত কথা রুদ্ধ ছিল হৃদয়ে কবির—
আগ্নেয় গিরির বুকে জ্বলন্ত অগ্নির মত
যত কথা ছিল কবি কহিলা গম্ভীরে।
"নদ নদী গিরি গুহা, কত দেখিলাম তবু
প্রাণের শূন্যতা কেন ঘুচিল না দেবী !"
বালার কপোল বাহি, নীরবে অশ্রুর বিন্দু
স্বর্গের শিশির সম পড়িল ঝরিয়া,
সেই এক অশ্রু বিন্দু, অমৃত ধারার মত
কবির হৃদয় গিয়া প্রবেশিল যেন ;
দেখি সে করুণ-বারি, নিরশ্রু কবির চোখে
কত দিন পরে হল অশ্রুর উদয়।
শ্রান্ত হৃদয়ের তরে, যে আশ্রয় খুঁজে খুঁজে

পাগল ভ্রমিতেছিল হেথায় হোথায়—
আজ যেন একটুকু আশ্রয় পাইল হৃদি
আজ যেন একটুকু জুড়াল যন্ত্রণা।
যে হৃদয় নিরাশায়, মরু ভূমি হোয়েছিল
সেথা হোতে হোল আজ অশ্রু উৎসারিত।
শ্রান্ত সে কবির মাথা, রাখিয়া কোলের পরে,
সরলা মুছায়ে দিল অশ্রু বারিধারা,
কবি সে ভাবিল মনে, তুমি কোথাকার দেবী
কি অমৃত ঢালিলে গো প্রাণের ভিতর!
ললনা তখন ধীরে, চাহিয়া কবির মুখে
কহিল মমতাময় করুণ কথায়,—
"হোথায় বিজন বনে, দেখেছ কুটীর ওই
চল পান্থ ওইখানে যাই দুজনায়।
বন হোতে ফল মূল, আপনি তুলিয়া দিব,
নির্ঝর হইতে তুলি আনিব সলিল,
যতনে পর্ণের শয্যা, দিব আমি বিছাইয়া.
সুখ নিদ্রা কোলে সেথা লভিবে বিরাম,
আমার বীণাটি লয়ে গান শুনাইব কত
কত কি কথায় দিন যাইবে কাটিয়া,
হরিণ শাবক এক, আছে ও গাছের তলে
সে যে আসি কত খেলা খেলিবে পথিক!
দূরে সরসীর ধারে, আছে এক চারু কুঞ্জ
তোমারে লইয়া পান্থ দেখাব সে বন,
কত পাখী ডালে ডালে, সারাদিন গাইতেছে
কত যে হরিণ সেথা করিতেছে খেলা।
আবার দেখাব সেই, অরণ্যের নির্ঝরিণী,
আবার নদীর ধারে লয়ে যাব আমি,
পাখী এক আছে মোর, সে যে কত গায় গান
নাম ধোরে ডাকে মোরে 'নলিনী' 'নলিনী'।
যা আছে আমার কিছু, সব আমি দেখাইব,
সব আমি শুনাইব যত জানি গান—
আসিবে কি পান্থ ওই বনের কুটীর মাঝে?"
এতেক শুনিয়া কবি চলিল কুটীরে।
কি সুখে থাকিত কবি, বিজন কুটীরে সেই
দিন গুলি কেটে যেত মুহূর্তের মত—
কি শান্ত সে বন ভূমি, নাই লোক নাই জন
শুধু সে কুটীর খানি আছে এক ধারে।
আঁধার তরুর ছায়ে নীরব শান্তির কোলে
দিবস যেন রে সেথা রহিত ঘুমায়ে।
পাখীর অস্ফুট গান, নির্ঝরের ঝরঝর
স্তব্ধতারে আরো যেন দিত মিষ্ট করি।
আগে একদিন কবি মুগ্ধ প্রকৃতির রূপে,
অরণ্যে অরণ্যে একা করিত ভ্রমণ,
এখন দুজনে মিলি, ভ্রমিয়া বেড়ায় সেথা
দুই জন প্রকৃতির বালক বালিকা।
সুদূর কানন তলে, কবিরে লইয়া যেত
নলিনী, সে যেন এক বনেরি দেবতা,
শ্রান্ত হোলে পথশ্রমে, ঘুমাত কবির কোলে
খেলিত বনের বায়ু কুন্তল লইয়া,
ঘুমন্ত মুখের পানে, চাহিয়া রহিত কবি—
মুখে যেন লিখা আছে আরণ্য কবিতা।
"একি দেবি কলপনা, এত সুখ প্রণয়ে যে
আগে তাহা জানিতাম না ত!
কি এক অমৃত ধারা, ঢেলেছ প্রাণের পরে
হে প্রণয় কহিব কেমনে?
অন্য এক হৃদয়েরে হৃদয় করা গো দান,
সে কি এক স্বর্গীয় আমোদ।
এক গান গায় যদি, দুইটি হৃদয়ে মিলি
দেখে যদি একই স্বপন,
এক চিন্তা এক আশা, এক ইচ্ছা দুজনার
এক ভাবে দুজনে পাগল,
হৃদয়ে হৃদয়ে হয়, সে কি গো সুখের মিল,

এ জনমে ভাঙ্গিবেনা তাহা।
আমাদের দুজনের হৃদয়ে হৃদয়ে দেবী,
তেমনি মিশিয়া যায় যদি—
এক সাথে এক স্বপ্ন দেখি যদি দুই জনে
তা হইলে কি হয় সুন্দর!
নরকে বা স্বর্গে থাকি, অরণ্যে বা কারাগারে
হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধা হোয়ে—
কিছু ভয় করিনাকো—বিহ্বল প্রণয় ঘোরে
থাকি সদা মরমে মজিয়া।
তাই হোক্—হোক্ দেবী, আমাদের দুইজনে
সেই প্রেম এক কোরে দিক্।
মজি স্বপনের ঘোরে, হৃদয়ের খেলা খেলি
যেন যায় জীবন কাটিয়া।"
নিশীথে একেলা হোলে, এইরূপ কত গান
বিরলে গাইত কবি বসিয়া বসিয়া।
সুখ বা দুখের কথা, বুকের ভিতরে যাহা
দিন রাত্রি করিতেছে আলোড়িত প্রায়,
প্রকাশ না হোলে তাহা, মরমের গুরুভারে
জীবন হইয়া পড়ে দারুণ ব্যথিত।
কবি তার মরমের প্রণয় উচ্ছ্বাস কথা
কি করি যে প্রকাশিবে পেত না ভাবিয়া।
পৃথিবীতে হেন ভাষা নাইক, মনের কথা
পারে যাহা পূর্ণ ভাবে করিতে প্রকাশ।
ভাব যত গাঢ় হয়, প্রকাশ করিতে গিয়া,
কথা তত নাহি পায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া,
বিষাদ যতই হয়, দারুণ অন্তর ভেদী
অশ্রুজল তত যায় শুকায়ে যেমন!
মরমের তার সম হৃদয়ের কথা গুলি
কত দিন পারে বল চাপিয়া রাখিতে?
একদিন ধীরে ধীরে বালিকার কাছে গিয়া
অশান্ত বালক মত কহিল কতকি।
অসংলগ্ন কথা গুলি, মরমের ভাব আরো
গোলমাল করি দিল প্রকাশ না করি,
কেবল অশ্রুর জলে, কেবল মুখের ভাবে
পড়িল বালিকা তার মনের কি কথা!
এই কথা গুলি যেন পড়িল বালিকা ধীরে
"কত ভাল বাসি বালা কহিব কেমনে,
তুমিও সদয় হোয়ে, আমার সে প্রণয়ের
প্রতিদান দিও বালা এই ভিক্ষা চাই।"
গড়ায়ে পড়িল ধীরে বালিকার অশ্রুজল,
কবির অশ্রুর সাথে মিশিল কেমন—
স্কন্ধে তার রাখি মাথা কহিল কম্পিত স্বরে
"আমিও তোমারে কবি বাসিনা কি ভাল?"
কথা না স্ফুরিল আর, শুধু অশ্রুজল রাশি
আরক্ত কপোল তার করিল প্লাবিত।
এইরূপ মাঝে মাঝে অশ্রুজলে অশ্রুজলে
নীরবে গাইত তারা প্রণয়ের গীত।
অরণ্যে দুজনে মিলি, আছিল এমন সুখে
জগতে তারাই যেন আছিল দুজন;
যেন তারা সুকোমল ফুলের সুরভি শুধু
যেন তারা অপ্সরার সুখের সঙ্গীত।
আলুলিত চুল গুলি, সাজাইয়া বন ফুলে
ছুটিয়া আসিত বালা কবির কাছেতে,
একথা ওকথা লয়ে, কি যে কি কহিত বালা
কবি ছাড়া আর কেহ বুঝিতে নারিত।
কভু বা মুখের পানে, সে যে কি রহিত চেয়ে
ঘুমায়ে পড়িত যেন হৃদয় কবির।
কভু বা কি কথা লয়ে, সে যে কি হাসিত হাসি
তেমন সরল হাসি দেখেনি কেহই।
আঁধার অমারাত্রে, একাকী পর্ব্বত শিরে
সেওগো কবির সাথে রহিত দাঁড়ায়ে,
উনমত্ত ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ অশনি আর

পর্ব্বতের বুকে যবে বেড়াত মাতিয়া,
তাহারো হৃদয় যেন, নদীর তরঙ্গ সাথে
করিত গো মাতামাতি হেরি সে বিপ্লব,
করিত সে ছুটাছুটি, কিছুতে সে ডরিত না,
এমন দুরন্ত মেয়ে দেখিনিত আর !
কবি যা কহিত কথা, শুনিত কেমন ধীরে
কেমন মুখের পানে রহিত চাহিয়া।
বন দেবতার মত, এমন সে এলোথেলো,
কখনো দুরন্ত অতি ঝটিকা যেমন,
কখনো এমন শান্ত, প্রভাতের বায়ু যথা
নীরবে শুনে গো যবে পাখীর সঙ্গীত।
কিন্তু কল্পনা যদি কবির হৃদয় দেখ,
দেখিবে এখনো তাহা পূর্ণ হয় নাই।
এখনো কহিছে কবি, "আরো দাও ভাল বাসা,
আরো ঢাল' ভাল বাসা হৃদয়ে আমার।"
প্রেমের অমৃত ধারা, এত যে করেছে পান
তবু মিটলনা কেন প্রণয় পিপাসা ?
প্রেমের জোছনা ধারা, যত ছিল ঢালি, বালা
কবির সমুদ্র হৃদি পারেনি পূরিতে।
স্বাধীন বিহঙ্গ সম কবিদের তরে দেবী
পৃথিবীর কারাগার যোগ্য নহে কভু।
অমন সমুদ্র সম, আছে যাহাদের মন
তাহাদের তরে দেবী নহে এ পৃথিবী।
তাদের উদার মন, আকাশে উড়িতে যায়
পিঞ্জরে ঠেকিয়া পক্ষ নিম্নে পড়ে পুনঃ,
নিরাশায় অবশেষে ভেঙ্গে চুরে যায় মন,
জগৎ পূরায় তার আকুল বিলাপে।
কবির সমুদ্র বুক পূরাতে পারিবে কিসে
প্রেম দিয়া ক্ষুদ্র ওই বনের বালিকা।
কাতর ক্রন্দনে আহা আজিও কাঁদিল কবি,
"এখনও পূরিল না প্রাণের শূন্যতা।"
বালিকার কাছে গিয়া কাতরে কহিল কবি
"আরো দাও ভাল বাসা হৃদয়ে ঢালিয়া।
আমি যত ভাল বাসি, তত দাও ভাল বাসা,
নহিলে গো পূরিবেনা প্রাণের শূন্যতা।"
শুনিয়া কবির কথা, কাতরে কহিল বালা
"যা ছিল আমার কবি দিয়েছি সকলি,
এ হৃদয়, এ পরাণ, সকলি তোমার কবি,
সকলি তোমারে প্রেমে দেছি বিসর্জ্জন।
তোমার ইচ্ছার সাথে, ইচ্ছা মিশায়েছি মোর
তোমার সুখের সাথে মিশায়েছি সুখ।
সে কথা শুনিয়া কবি, কহিল কাতর স্বরে
"প্রাণের শূন্যতা তবু ঘুচিল না কেন ?
ওই হৃদয়ের সাথে, মিশাতে চাই এ হৃদি
দেহের আড়াল তবে রহিল গো কেন ?
সারাদিন সাধ যায়, শুনাই মনের কথা
এত কথা তবে কেন পাই না খুঁজিয়া ?
সারাদিন সাধ যায়, দেখি ও মুখের পানে
দেখেও মিটে না কেন আঁখির পিপাসা ?
সাধ যায় এ জীবন, প্রাণ ভোরে ভাল বাসি
বেসেও প্রাণের শূন্য ঘুচিল না কেন ?
আমি যত ভালবাসি তত দাও ভালবাসা
নহিলেগো পূরিবেনা প্রাণের শূন্যতা।
একি দেবি ! একি তৃষ্ণা জ্বলিছে হৃদয়ে মোর,
ধরার অমৃত যত করিয়াছি পান,
প্রকৃতির আছে যত অতুল সৌন্দর্য্য-রাশি,
প্রণয়ের আছে যত সুধা হতে সুধা,
কল্পনার আছে যত তরল স্বর্গীয় গীতি,
সকলি হৃদয়ে মোর দিয়াছি ঢালিয়া ;
শুধু দেবী পৃথিবীর হলাহল আছে যত
তাহাই করিনি পান মিটাতে পিপাসা !
শুধু দেবী ঐশ্বর্য্যের কনক শৃঙ্খল দিয়া

বাঁধি নাই আমার এ স্বাধীন হৃদয়!
শুধু দেবী মিটাইতে মনের বীরত্ব গর্ব্ব
লক্ষ মানবের রক্তে ধুইনি চরণ!
শুধু দেবী এজীবনে নিশাচর বিলাসেরে
সুখ-স্বাস্থ্য অর্ঘ্য দিয়া করি নাই সেবা!
তবু কেন হৃদয়ের তৃষা মিটিল না মোর
তবু কেন ঘুচিল না প্রাণের শূন্যতা?
শুনেছি বিলাস সুরা বিহ্বল করিয়া হৃদি,
ডুবাইয়া রাখে সদা বিস্মৃতির ঘুমে,
কিন্তু দেবী—কিন্তু দেবী—এতযে পেয়েছি কষ্ট
বিস্মৃতি চাইনে তবু বিস্মৃতি চাইনে!—
সেকি ভয়ানক দশা, কল্পনাও শিহরে গো—
স্বর্গীয় এ হৃদয়ের জীবনে মরণ!
আমার এ মন দেবী, হোক্ মরুভূমি সম
তৃণলতা জলশূন্য জ্বলন্ত প্রান্তর,
তবুও তবুও আমি, সহিব তা প্রাণ-পণে
বহিব তা যতদিন রহিব বাঁচিয়া;
মিটাতে মনের তৃষা ত্রিভুবন পর্য্যটিব,
হত্যা করিব না তবু হৃদয় আমার।
প্রেম ভক্তি স্নেহ আদি মনের দেবতা যত
যতনে রেখেছি আমি মনের মন্দিরে,
তাঁদের করিতে পূজা, ক্ষমতা নাইক বলে
বিসর্জ্জন করিবারে পারিব না আমি।
কিন্তু ওগো কল্পনা আমার মনের কথা
বুঝিতে কে পারিবেক বল দেখি দেবী?
আমার ব্যথার মর্ম্ম কারে বুঝাইবে বল—
বুঝাইতে না পারিলে বুক যায় ফেটে।
যদি কেহ বলে দেবি, তোমার কিসের দুখ,
হৃদয়ের বিনিময়ে পেয়েছ হৃদয়,
তবে কাল্পনিক দুখে, এত কেন ম্রিয়মাণ?
তবে কি বলিয়া আমি দিবগো উত্তর?
উপায় থাকিতে তবু যে সহে বিষাদ জ্বালা,
পৃথিবী তাহারি কষ্টে হয়গো বর্দ্ধিত,
আমার এ বিষাদের উপায় নাইক কিছু,
কারণ কি তাও দেবি পাইনা খুজিয়া।
পৃথিবী আমার কষ্ট বুঝুক্ বা না বুঝুক্,
নলিনীরে কিবলিয়া বুঝাইব দেবী?
তাহারে সামান্য কথা গোপন করিলে পরে
হৃদয়ে কি কষ্ট হয় হৃদয় তা' জানে।
এত তারে ভালবাসি, তবু কেন মনে হয়
ভালবাসা হইল না আশ মিটাইয়া,
আঁধার সমুদ্রতলে, কি যেন বেড়াই খুঁজে
কি যেন পাইতেছি না চাহিতেছি যাহা।
বুকের যেখানে তারে রাখিতে চাইগো আমি
সেখানে পাইনে যেন রাখিতে তাহারে,
তাইতে অন্তর বুক এখনো পুরিতেছে না,
তাইতে এখনো শূন্য রয়েছে হৃদয়।"
কবির প্রণয় সিন্ধু, ক্ষুদ্র বালিকার মন
রেখেছিল মগ্ন করি অগাধ সলিলে,
উপরে সে ঝড় ঝঞ্ঝা, কতকি বহিয়া যেত,
নিম্নে তার কোলাহল পেতনা শুনিতে,
প্রণয়ের অবিচিত্র, নিয়ত নূতন তবু
তরঙ্গের কলধ্বনি শুনিত কেবল,
সেই একতান ধ্বনি, শুনিয়া শুনিয়া তার
হৃদয় পড়িয়াছিল ঘুমায়ে কেমন!
বনের বালিকা আহা, সে ঘুমে বিহ্বল হোয়ে,
কবির হৃদয়ে রাখি অবশ মস্তক
স্বর্গের স্বপন শুধু, দেখিত দিবস রাতি
হৃদয়ের হৃদয়ের অনন্ত মিলন।
বালিকার সে হৃদয়ে, সে প্রণয়-মগ্ন-হৃদে
অবশিষ্ট আছিল না এক তিল স্থান,
আর কিছু জানিত না, আর কিছু ভাবিত না,

শুধু সে বালিকা ভাল বাসিত কবিরে।
শুধু সে কবির গান, কত যে লাগিত ভাল,
শুনে শুনে শুনা তার ফুরাত না আর,
শুধু সে কবির নেত্র, কি এক স্বর্গীয় জ্যোতি
বিকীরিত, তাই হেরি হইত বিহ্বল!
শুধু সে কবির কোলে, ঘুমাতে বাসিত ভাল
কবি তার চুল লয়ে করিত কি খেলা।
শুধু সে কবিরে বালা, শুনাতে বাসিত ভাল
কত কি—কত কি কথা অর্থ নাই যার,
কিন্তু সে কথায় কবি, কত যে পাইত অর্থ
গভীর সে অর্থ নাই কত কবিতায়—
সেই অর্থহীন কথা, হৃদয়ের ভাব যত
প্রকাশ করিতে পারে এমন কিছু না।
এক দিন বালিকারে কবি সে কহিল গিয়া—
"নলিনি! চলিনু আমি ভ্রমিতে পৃথিবী!
আর একবার বালা, কাশ্মীরের বনে বনে
যাই গো শুনিতে আমি পাখীর কবিতা!
রুসিয়ার হিমক্ষেত্রে, আফ্রিকার মরুভূমে
আর একবার আমি করি গে ভ্রমণ,
এই খানে থাক তুমি, ফিরিয়া আসিয়া পুনঃ—
ওই মধু মুখ খানি করিব চুম্বন।"
এতেক কহিয়া কবি, নীরবে চলিয়া গেল
গোপনে মুছিয়া ফেলি নয়নের জল।
বালিকা নয়ন তুলি, নীরবে রহিল চাহি,
কি দেখিছে সেই জানে অনিমিষ চখে।
সন্ধ্যা হোয়ে এল ক্রমে, তবুও রহিল চাহি,
তবুও ত পড়িল না নয়নে নিমেষ।
অনিমিষ নেত্র ক্রমে করিয়া প্লাবিত,
এক বিন্দু দুই বিন্দু ঝরিল সলিল।
বাহুতে লুকায়ে মুখ কাতর বালিকা
মর্ম্মভেদী অশ্রুজলে করিল রোদন।

হা-হা-কবি কি করিলে, ফিরে দেখ-ফিরে এস,
দিও না বালার হৃদে অমন আঘাত—
নীরবে বালার আহা, কি বজ্র বেজেছে বুকে
গিয়াছে কোমল মন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া!
হা কবি অমন কোরে, অনর্থক তার মনে
কি আঘাত করিলে যে বুঝিলেনা তাহা?
এত কাল সুখ স্বপ্ন, ডুবায়ে রাখিয়া মন
এত দিন পরে তাহা দিবে কি ভাঙ্গিয়া?
কবি ত চলিয়া যায়—সন্ধ্যা হোয়ে এল ক্রমে
আঁধারে কানন ভূমি হইল গম্ভীর—
একটি নড়ে না পাতা, একটু বহে না বায়ু
স্তব্ধ বন কি যেন কি ভাবিছে নীরবে!
তখন বনান্ত হোতে সুধীরে শুনিল কবি,
উঠিছে নীরব শূন্যে বিষন্ন সঙ্গীত,
তাই শুনি বন যেন রয়েছে নীরবে অতি
জোনাকি নয়ন শুধু মেলিছে মুদিছে।
একবার কবি শুধু চাহিল কুটীর পানে,
কাতরে বিদায় মাগি বন দেবী কাছে,
নয়নের জল মুছি—যে দিকে নয়ন চলে
সে দিকে পথিক কবি যাইল চলিয়া।

সঙ্গীত।—

কেন ভাল বাসিলে আমায়?
কিছুই নাইক গুণ, কিছুই জানিনা আমি,
কি আছে? কি দিয়ে তব তুষিব হৃদয়!
যা' আমার ছিল সাধ্য, সকলি করেছি আমি
কিছুই করিনি দোষ চরণে তোমার,
শুধু ভাল বাসিয়াছি, শুধু এ পরাণ মন
উপহার সঁপিয়াছি তোমার চরণে।
তাতেও তোমার মন তুষিতে নারিনু যদি,
তবে কি করিব বল, কি আছে আমার?
গেলে যদি, গেলে চলি, যাও যেথা ভাল লাগে

একবার মনে কোরো দীন অধীনীরে।
ভ্রমিতে ধরার মাঝে, কত ভাল বাসা পাবে
তাতে যদি ভাল থাক তাই হোক্ তবে,
তবু একবার যদি, মনে কর নলিনীরে
যে দুখিনী, সে তোমারে এত ভাল বাসে!
কি করিলে মন তব, পারিতাম জুড়াইতে
যদি জানিতাম কবি করিতাম তাহা!
আমি অতি অভাগিনী, জানিনা বলিয়া যেন
বিরক্ত হয়োনা কবি এই ভিক্ষা দাও।
না জানিয়া না শুনিয়া, যদি দোষ করে থাকি
ক্ষুদ্র আমি, ক্ষমা তবে করিও আমারে-
তুমি ভাল থেকো কবি, ক্ষুদ্র এক কাঁটা যেন
ফুটে না তোমার পায়ে ভ্রমিতে পৃথিবী।
জননি, কোথায় তুমি রেখে গেলে দুহিতারে?
কত দিন একা একা কাটালাম হেথা.
একেলা তুলিয়া ফুল, কত মালা গাঁথিতাম
একেলা কাননময় করিতাম খেলা!
তোমার বীণাটি ল'য়ে, উঠিয়া পর্ব্বত শিরে
একেলা আপন মনে গাইতাম গান,
হরিণ শিশুটি মোর বসিত পায়ের তলে,
পাখীটি কাঁধের পরে শুনিত নীরবে।
এইরূপ কতদিন কাটালেম বনে বনে
কতদিন পরে তবে এলে তুমি কবি!
তখন তোমারে কবি, কি যে ভাল বাসিলাম
এত ভাল কাহারেও বাসি নাই কভু।
দূর স্বরগের এক, জ্যোতির্ম্ময় দেব সম
কত বার মনে মনে করেছি প্রণাম।
দূর থেকে আঁখি ভরি দেখিতাম মুখ খানি,
দূর থেকে শুনিতাম মধুময় গান।
যে দিন আপনি আসি, কহিলে আমার কাছে
ক্ষুদ্র এই বালিকারে ভাল বাস তুমি,
সে দিন কি হর্ষে কবি, কি আনন্দে কি উচ্ছ্বাসে
ক্ষুদ্র এ হৃদয় মোর ফেটে গেল যেন।
আমি কোথাকার কেবা! আমি ক্ষুদ্র হোতে ক্ষুদ্র
স্বর্গের দেবতা তুমি, ভাল বাস' মোরে?
এত সৌভাগ্য কবি, কখনো করিনি আশা,
কখনো মুহূর্ত্ত তরে জানিনি স্বপনে।
যেথায় যাওনা কবি, যেথায় থাকনা তুমি
আমরণ তোমারেই করিব অর্চ্চনা।
মনে রাখ নাই রাখ, তুমি যেন সুখে থাক
দেবতা! এ দুখিনীর শুন গো প্রার্থনা।

সম্পাদকের বৈঠক।

অনুবাদ।

বিচ্ছেদ।

শরীর সে ধীরে ধীরে যাইতেছে আগে,
অধীর হৃদয় কিন্তু চায় পিছু বাগে,
ধ্বজা লয়ে গেলে যথা প্রতিকূল বাতে,
পতাকা তাহার মুখ ফিরায় পশ্চাতে।

শকুন্তলা।

বিচ্ছেদ।

প্রতিকূল বায়ুভরে, ঊর্ম্মিময় সিন্ধুপরে
তরীখানি যেতেছিল ধীরি,
কম্পমান কেতু তার, চেয়েছিল কতবার
সে দ্বীপের পানে ফিরি ফিরি।
যারে আহা ভালবাসি, তারে যবে ছেড়ে আসি
যত যাই দূর দেশে চলি,
সেইদিক পানে হায়, হৃদয় ফিরিয়া চায়
যেখানে এসেছি তারে ফেলি।
বিদেশেতে দেখি যদি, উপত্যকা, দ্বীপ, নদী,
অতিশয় মনোহর ঠাঁই,
সুরভি কুসুমে যার, শোভিত সকল ধার
শুধু দুইয়ের ধন নাই,
বড় সাধ হয় প্রাণে, থাকিতাম এই খানে,
হেথা যদি কাটিত জীবন,
রয়েছে যে দূরবাসে, সে যদি থাকিত পাশে
কিযে সুখ হইত তখন।
পূর্ব্বদিক সন্ধ্যাকালে, গ্রাসে অন্ধকার জালে
ভীত পান্থ চায় ফিরে ফিরে,
দেখিতে সে শেষজ্যোতি, মুহূতর হোয়ে অতি
এখনো যা' জ্বলিতেছে ধীরে।
তেমনি সুখের কাল, গ্রাসে গো আঁধার-জাল
অদৃষ্টের সায়াহ্নে যখন,
ফিরে চাই বারে বারে, শেষবার দেখিবারে
সুখের সে মুমূর্ষু কিরণ॥

Moore's Irish Melodies.

বিদায় চুম্বন।

একটি চুম্বন দাও প্রমদা আমার
জনমের মত দেখা হবেনাকো আর।
মর্ম্মভেদী অশ্রু দিয়ে, পূজিব তোমারে প্রিয়ে
দুখের নিঃশ্বাস আমি দিব উপহার।
সেত তবু আছে ভালো, একটু আশার আলো
জ্বলিতেছে অদৃষ্টের আকাশে যাহার।
কিন্তু মোর আশা নাই, যে দিকে ফিরিয়া চাই
সেই দিকে নিরাশার দারুণ আঁধার।
ভাল যে বেসেছি তারে দোষ কি আমার?
উপায় কি আছে বল উপায় কি তার?
দেখা মাত্র সেই জনে, ভাল বাসা আসে মনে
ভাল বাসিলেই তুলা নাহি যায় আর!
নাহি বাসিতাম যদি এত ভাল তারে
অন্ধ হোয়ে প্রেমে তার মজিতাম নারে
যদি নাহি দেখিতাম, বিচ্ছেদ না জানিতাম
তাহোলে হৃদয় ভেঙ্গে যেতনা আমার!
আমারে বিদায় দাও যাইগো সুন্দরী,
যাইতবে হৃদয়ের প্রিয় অধীশ্বরী,
থাক তুমি থাক সুখে, বিমল শান্তির বুকে
সুখ, প্রেম, যশ, আশা থাকুক্ তোমার
একটি চুম্বন দাও প্রমদা আমার।

Burns.

কষ্টের জীবন।

মানুষ কাঁদিয়া হাসে,
পুনরায় কাঁদেগো হাসিয়া।
পাদপ শুকায়ে গেলে,
তবু ও সে না হয় পতিত,
তরণী ভাঙ্গিয়া গেলে
তবু ধীরে যায় সে ভাসিয়া,
ছাদ যদি পোড়ে যায়,
দাঁড়াইয়া রহে তবু ভিত।
বন্দী চোলে যায় বটে,
তবুও ত রহে কারাগার,
মেঘে ঢাকিলেও সূর্য্য,
কোন মতে দিন অস্ত হয়,

তেমনি হৃদয় যদি,
ভেঙ্গে চুরে হয় চুর মার,
কোনক্রমে বেঁচে থাকে,
তবুও সে ভগন হৃদয়।
ভগন দর্পণ যথা,
ক্রমশঃ যতই ভগ্ন হয়,
ততই সে শত শত,
প্রতিবিম্ব করয়ে ধারণ,
তেমনি হৃদয় হোতে,
কিছুইগো যাইবার নয়।
হোকনা শীতল স্তব্ধ,
শত খণ্ডে ভগ্ন চূর্ণ মন,
হউকনা রক্তহীন,
হীন তেজ তবুও তাহারে,
বিনিদ্র অনন্ত জ্বালা,
ক্রমাগত করিছে দাহন,
শুকায়ে শুকায়ে যাবে,
অন্তর বিষম শোক ভারে,
অথচ বাহিরে তার,
চিহ্নমাত্র না পাবে দর্শন।

Byron.

জীবন উৎসর্গ।

এস এস এই বুকে নিবাসে তোমার,
মৃগভ্রষ্ট বাণবিদ্ধ হরিণী আমার,
এইখানে বিরাজিছে সেই চির হাসি,
আঁধারিতে পারিবেনা তাহা মেঘরাশি।
এই হস্ত এ হৃদয় চিরকাল মত
তোমার, তোমারি কাজে রহিবে গো রত!
কিসের সে চিরস্থায়ী ভালবাসা তবে,
গৌরবে কলঙ্কে যাহা সমান না রবে?
জানিনা, জানিতে আমি চাহিনা, চাহিনা,
ও হৃদয়ে এক তিল দোষ আছে কিনা,
ভালবাসি তোমারেই এই শুধু জানি,
তাই হোলে হল, আর কিছু নাহি মানি।
দেবতা সুখের দিনে বলেছ আমায়,
বিপদে দেবতা সম রক্ষিব তোমায়,
অগ্নিময় পথ দিয়া যাব তব সাথে,
রক্ষিব, মরিব কিম্বা তোমারি পশ্চাতে।

Moore's Irish melodies.

ললিত নলিনী।

(কৃষকের প্রেমালাপ।)

ললিত।

হা নলিনী গেছে আহা কি সুখের দিন,
মৌহে যবে এক সাথে, বেড়াতেম হাতে হাতে
নবীন হৃদয় চুরি করিলি নলিন!
হা নলিনী কত সুখে গেছে সেই দিন।

নলিনী।

কত ভাল বাসি সেই বলেছ ললিত,
প্রথমে বলিনু যেথা, মনের লুকানো কথা,
স্বর্গ-সাক্ষী করি যেথা হয়ে হরষিত
বলিলে, আমারি তুমি হইবে ললিত।

ললিত।

বসন্ত বিহগ যথা সুললিত ভাষী,
যত শুনি তত তার, ভাল লাগে গীত ধার,
যত দিন যায় তত তোরে ভাল বাসি,
যত দিন যায় তব বাড়ে রূপ রাশি।

নলিনী।

কোমল গোলাপ কলি থাকে যথা গাছে,
দিন দিন ফুটে যত, পরিমল বাড়ে তত,
এ হৃদয় ভাল বাসা আলো করি আছে
সঁপেছি সে ভালবাসা তোমারিগো কাছে।

ললিত

মৃদুতর রবি কর সুনীল আকাশ
হেরিলে শরৎ আশে, হৃদয় হরষে ভাসে
তার চেয়ে এ হৃদয়ে বাড়ে গো উল্লাস
হেরিলে নলিনী তোর মৃদু মধু হাস।

নলিনী

মধু আগমন বার্ত্তা করিতে কূজিত
কোকিল যখন ডাকে, হৃদয় নাচিতে থাকে
কিন্তু তার চেয়ে হৃদি হয় উথলিত,
মিলিলে তোমায় সাথে প্রাণের ললিত।

ললিত।

কুসুমের মধুময় অধর যখন
ভ্রমর প্রণয় ভরে, হরষে চুম্বন করে
সেকি এত সুখ পায় আমার মতন
যবে ও অধর খানি করি গো চুম্বন?

নলিনী।

শিশিরাক্ত পত্র কোলে মল্লিকা হসিত,
বিজন সন্ধ্যার ছায়ে, ফুটেসে মলয় বায়ে,
সে এমন নহে মিষ্ট নহে সুবাসিত
তোমার চুম্বন আহা যেমন ললিত।

ললিত।

যুরুক্ অদৃষ্ট চক্র সুখ দুখ দিয়া
কভু দিক্ রসাতলে, কভু বা স্বরগে তুলে
রহিবে একটি চিন্তা হৃদয়ে জাগিয়া
সে চিন্তা তোমারি তরে জানিওগো প্রিয়া

নলিনী।

ধন রত্ন কনকের নাহি ধার ধারি
পদতলে বিলাসীর, নত করিব না শির
প্রণয় ধনের আমি দরিদ্র ভিখারী,
সে প্রণয় ললিত গো তোমারি তোমারি।

Burns.

বিদায়।

যাও তবে প্রিয়তম সুদূর প্রবাসে
নব বন্ধু নব হর্ষ নব সুখ আশে।
সুন্দরী রমণী কত, দেখিবে গো শত শত
ফেলে গেলে যারে তারে পড়িবে কি মনে?
তব প্রেম প্রিয়তম, অদৃষ্টে নাইক মম
সে সব দুরাশা সখা করি না স্বপনে
কাতর হৃদয় শুধু এই ভিক্ষা চায়
ভুল' না আমায় সখা ভুল না আমায়।
স্মরিলে এ অভাগীর যাতনার কথা,
যদিও হৃদয়ে লাগে তিল মাত্র ব্যথা,
মরমের আশা এই, থাক্ রুদ্ধ মরমেই
কাজ নাই দুখিনীরে মনে করে আর।
কিন্তু দুঃখ যদি সখা, কখন গো দেয় দেখা
মরমে জনমে যদি যাতনার ভার,
ও হৃদয় সান্ত্বনার বন্ধু যদি চায়
ভুল না আমায় সখা ভুল না আমার।

Mrs. Opie.

মদন ভস্ম।

সময় লক্ষণ করি নায়ক তপন
উত্তর অয়ন স্থলে করিল আশ্রয়,
দক্ষিণের দিক-বালা প্রাণের হুতাশে
অধীর হইয়া উঠি ফেলিল নিঃশ্বাস।
নূপুর-শিঞ্জন-সহ সুন্দরী-কুলের
চারু পদ-পরশের বিলম্ব না সহি,
অশোকের কাঁধ হৈতে সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া
ফুটিয়া-উঠিল ফুল পল্লব সহিতে।
কচি কচি নবীন পল্লব উদগমে
সমাপ্তি লভিল যেই নব-চূত-বান,
বসাইল অলিবৃন্দ বসন্ত অমনি
কুসুম-ধনুর যেন নামাক্ষর গুলি।
কর্ণিকার-ফুলের এমন বর্ণ শোভা,
সৌরভ নাহি রে তার, বড় প্রাণে বাজে!
একাধারে সব গুণ বর্ত্তিবে যে কভু
বিধাতার প্রবৃত্তি বড়ই তাহে বাম।
মর্ম্মর শবদে যথা জীর্ণ পর্ণ ঝরে—
হেন বনে মদ-ভরে উদ্ধত হইয়া
বায়ুর প্রত্যভিমুখে চরে মৃগ কুল,—
পিয়াল-মঞ্জরী-হ'তে উড়ি' আসি রেণু
করিতেছে তা'-সবার নয়ন আকুল।
উদ্যত-কুসুম-ধনু সঙ্গে লয়ে রতি
সেই ঠাঁই যখন হইলা উপনীত,
জীব-অঙ্ক সবাকার মরমে মরমে
কি যে রস সঞ্চারিল, অন্তরের ভাব
বাহিরিতে লাগিল সবার সব কাজে।
ভ্রমরীর পিছে পিছে উড়িয়া ভ্রমর
একই কুসুম-পাত্রে মধু কৈল পান;
কৃষ্ণসার-মৃগবর-মৃগীর শরীরে
শৃঙ্গ বুলাইছে কিবা, পরশের সুখে
মুদিয়া আসিছে আঁখি কুরঙ্গিনীটির।
রসাবেশে করিণী হইয়া গদ-গদ
গণ্ডূষ করিয়া লয়ে পদ্মগন্ধী জল
পিয়াইয়া দিল তাহা প্রিয় মাতঙ্গেরে।
থামে যেই কিন্নরী করিয়া গীত গান,—
যখন মুখ-মণ্ডলে পত্রলেখা-ছাপ
উঠিয়া গিয়াছে কিছু শ্রম-জল লাগি,
ঘুরিছে আঁখি যখন পুষ্প মদ ভরে,—
সেই অবসরটিতে রসিয়া কিন্নর
প্রেয়সীর বিধুমুখ চুম্বে ঘন ঘন।
লতা-বধূ যতেক কানন-বন-ময়—
কুসুম-স্তবক-ভার স্তন যাহাদের,
নব কিশলয় আর ওষ্ঠ মনোহর,
বাঁধিল তাহারা সবে গাঢ় আলিঙ্গনে
তরু-শাখা-সবাকারে নম্র ফুল-ভরে।
দিবা শুনা যাইতেছে অপ্সরীর গান
তবুও শঙ্কর-দেব ধ্যান-পরায়ণ,
আপনি আপন-প্রভু যে মহাপুরুষ,
কোন বিঘ্ন কভু তাঁরে নারে টলাইতে।
লতা-গৃহ-দ্বারে নন্দী করি আগমন
বাম করতলে এক হেম-বেত্র ধরি
অধরে অঙ্গুলি দিয়া করিল সঙ্কেত।
নিষ্কম্প অমনি বৃক্ষ, নিভৃত ভ্রমর,
মূক হ'ল বিহঙ্গম, শান্ত মৃগ-কুল,
সমস্ত কাননময় তাহারি শাসনে
ছবি-সম যে যেমন তেমনি রহিল।
আসন্ন মরণ নাকি মদনের, তাই
দেবদারু-বেদীতে শার্দ্দূল-চর্ম্মাসনে
নিরখিল আসীন সংযমী মহাদেবে।
পূর্ব্বকায় ঋজু-স্থির, স্কন্ধ দুই নত,
কর-দুটি শোভিতেছে ঊর্দ্ধ-মুখ-তল,

প্রফুল্ল পঙ্কজ যেন অম্বের মাঝারে।
জড়ানো জটাকলাপে ভুজগ-বন্ধন,
দুই ফের করি আর কানে অক্ষমালা,
গ্রন্থিযুত কৃষ্ণাজিন আছেন যা' পরি
হয়েছে বিশেষ নীল কণ্ঠের প্রভায়।
চক্ষে নাহি পলক, স্তিমিত উগ্র তারা
কিঞ্চিৎ কেবল পাইতেছে পরকাশ,
ভুরু-দ্বয়ে বিকারের প্রসঙ্গটি নাই,
নাসিকার অগ্রভাগে লক্ষ্য আছে পড়ি।
জল-পূর্ণ জলদ বৃষ্টির নাহি নাম,
অকূল অগাধসিন্ধু তরঙ্গটি নাই,
নিবাত-নিষ্কম্প-শিখা প্রদীপ যেমন,
এমনি হইয়াছেন প্রাণ-বায়ু-রোধে।
জ্যোতির অঙ্কুর যাহা ব্রহ্মরন্ধ্র হ'তে
উঠিয়াছে, পথ পেয়ে মধ্যের আঁখিতে—
মৃণালের সূত্র হ'তে সুকুমারতর
নব শশধর-শ্রীকে করিছে মলিন।
ইন্দ্রিয় হইতে মন ফিরাইয়া আনি
হৃদয়ে স্থাপন করি সমাধির বলে,
যে অক্ষর পুরুষে ক্ষেত্রজ্ঞ জন জানে,
আত্মাতে সেই আত্মারে দেখিছেন তিনি।
মনেরো অধৃষ্য যিনি, অদূরে তাঁহারে
নিরখি অমন ধারা ধ্যানে নিমগন,
এমনি জড় আড়ষ্ট হইল মদন
হাত হৈতে পড়ি গেল ধনুর্ব্বাণ খসি,
কখন্ যে পড়িল তা নারিল জানিতে।
বীর্য্য নিভ' নিভ' প্রায় এই যে তাহার
উস্কাইয়া তুলি তাহা রূপের ছটায়,
পর্ব্বত-রাজ-দুহিতা দেখা দিল আসি,
পাছু পাছু দুই বন-দেবতা সুন্দরী।
পদ্মরাগ মণি জিনি অশোক-কুসুম,
কাড়িয়াছে হেমদ্যুতি কর্ণিকার-ফুল,
হইয়াছে সিন্ধুবার মুকুতা-কলাপ,
বসন্ত কুসুম যত অঙ্গ-আভরণ।
স্তনভারে নতকায় কিঞ্চিত অমনি,
তরুণ অরুণ রাগ বসনে আবার,
কুসুম-স্তবক-ভরে নম্র আহা মরি
সঞ্চারিণী পল্লবিনী যেন গো লতাটি।
খসি খসি পড়িতেছে বকুল মেখলা,
পুনঃ পুনঃ রাখিছেন আটক করিয়া।
ভ্রমর তৃষিত হয়ে নিশ্বাস সৌরভে
বিম্ব অধরের কাছে বেড়ায় ঘুরিয়া,
চঞ্চল-নয়ন-পাতে উমা প্রতিক্ষণ
লীলা শতদল নাড়ি দিতেছেন তাড়া।
যাঁর রূপ রাশি হেরি রতি লজ্জা পায়
অকলঙ্ক সে উমারে নিরখি মদন,
জিতেন্দ্রিয় শূলি-প্রতি স্বকাজ সাধিতে
পুনরায় বক্ষে নিজ বাঁধিল সাহস।
এমন সময়ে উমা ভবিষ্যৎ-পতি
মহেশের দুয়ারে হইলা উপনীত,
তিনিও পরম জ্যোতি পরমাত্ম রূপ
নিরখি অন্তরে ক্ষান্ত হইলেন যোগে।
ক্রমে ক্রমে প্রাণ বায়ু করিয়া মোচন
যোগাসন শিথিল করিতেছেন হর,
ওদিকে ভুজঙ্গ-অধিপতির মস্তকে
কষ্টকর ঠেকিতেছে ধরণীর ভার।
নন্দী তাঁর পদতলে প্রণিপাত করি
নিবেদিল, "এসেছেন শুশ্রূষার তরে
শৈলসুতা," মহেশের ভ্রূক্ষেপ হ'তেই
প্রবেশের অনুমতি হইল বুঝিয়া
নন্দী গিরি নন্দিনীরে পশাইল তথি।
সখী দুটি মহাদেবে করিয়া প্রণাম

উমার স্বহস্তে-তোলা পল্লবে-জড়িত
হিম-সিক্ত ফুল গুলি অর্পিল চরণে।
উমাও যেমন তাঁরে করিলা প্রণাম,
নীল অলক-শোভী নব কর্ণিকার
খসিয়া অবনী-তলে পড়িল অমনি।
অনন্ত-ভাজন পতি লাভ কর বলি
আশীষিলা মহাদেব,—যথার্থ আশীষ,
উচ্চরিত হয় যবে ঈশ্বরের বাণী
কভু বিপরীত অর্থ না হয় ঘটনা।
বহ্নি-মুখ-কামা কাম, পতঙ্গ যেমতি,
অবসর ঠাহরিয়া বাণ সন্ধানের
মুহূর্ত্তেক আকর্ষিল শরাসন-গুণ।
পার্ব্বতী এ হেনকালে তাম্র-রাগ করে
লয়ে গেলা মন্দাকিনী-পদ্মরাজ মালা
ভাস্কর কিরণে শুষ্ক, শিবেরে সাঁপিতে।
ভকত-বাৎসল্য-হেতু যেমন শঙ্কর
লহবেন আদরে পুষ্কর-বীজ-মালা,
অমান অব্যর্থ বাণ, নাম সম্মোহন,
শরাসনে যুড়িল কুসুম-শরাসন।
চন্দ্রোদয়-আরম্ভে যেমন অম্বুরাশি,
এক রতি অধীর হইল তার মন,
বিম্বাধর-শোভিত উমার মুখপানে
ত্রিনয়ন নিবেশিলা শম্ভু একেবারে।
উমাও মনের ভাব নারিলা ঢাকিতে—
অঙ্গ যেন বিকসিত কদম্ব কুসুম,
লজ্জায় বিভ্রান্ত আঁখি সামালিতে নারি
আড় ভাবে রাখিলেন চারু মুখ-খানি।
মহাবলী মহাদেব, অন্য কেহ নয়!
মুহূর্ত্তে ইন্দ্রিয়-ক্ষোভ নিগ্রহ করিয়া
বিকৃতির কারণ কি জানিবার তরে
করিলা নয়ন-পাত দিগ্ দিগন্তরে।
মদনেরে দেখিলেন, দক্ষিণ অপাঙ্গে,
মুষ্টি রহিয়াছে লগ্ন, ধনুর্গুণ-ধারী,
বাম পদ কুঞ্চিত, কাঁধের দিক নত,
চক্রাকার করিয়া সুন্দর ধনু খানি
টানিয়াছে গুণ, মারে আর কি সে বাণ।
বাড়িল শিবের ক্রোধ তপস্যার ভঙ্গে,
এমনি ভ্রূভঙ্গ যে তাকায় মুখ পানে
সাধ্য নাই কাহারো, তৃতীয় নেত্র হ'তে
স্ফুরন্ত-ঊর্দ্ধচি-বহ্নি ছুটিল সহসা।
"ক্রোধ প্রভু সংহর সংহর" এই বাণী
দেবতা-সবার হোথা চরিছে বাতাসে,
হেতায় সে হুতাশন ভবনেত্র-জাত
করিল মদন তনু ভস্ম-অবশেষ।

কুমারসম্ভব।

সঙ্গীত।

কেমন সুন্দর আহা ঘুনায়ে রয়েছে
চাঁদের জোছনা এই সমুদ্র বেলায়!
এ'স প্রিয়ে এই খানে বসি কিছুকাল;
গীতস্বর মৃদু মৃদু পশুক্ শ্রবণে!
সুকুমার নিস্তব্ধতা আর নিশীথিনী—
সাজে ভাল মর্ম্ম-ছোঁয়া সুধা-সঙ্গীতেরে।
বইস জেসিকা, দেখ, গগন প্রাঙ্গন
জ্বলৎ কাঞ্চন-পাতে খচিত কেমন!
এমন একটি নাই তারকা-মণ্ডল
দিব্য গীত যে না গায় প্রতি পদক্ষেপে!
অমর আত্মাতে হয় এমনি সঙ্গীত।
কিন্তু ধূলিময় এই মর্ত্ত্য-আবরণ
যত দিন রাখে তারে আচ্ছন্ন করিয়া
ততদিন সে সঙ্গীত পাই না শুনিতে।

সেক্‌স্‌পিয়র।

ছিটওয়ালা

সিবিলিয়ান সাহেব।

প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল, হুস্টন (Houston) সাহেব নামক এক জন সিবিলিয়ান ছিলেন। ইনি উচ্চ কুলোদ্ভব ও এক জন বিখ্যাত গবর্ণর জেনেরেলের স্বসম্পর্কীয়। ইনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। ইনি বাঙ্গালা, হিন্দি, পারসী আরবী এই সকল ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন এবং এদেশের রীতি নীতি বিশেষ রূপে অবগত ছিলেন। ইনি কার্য্যেও পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু ইহাঁর ছিট্ ছিল। সে ছিট্ ছিট্ মান যন্ত্রের ঠিক উনপঞ্চাশ সংখ্যা পর্য্যন্ত না পৌঁছুক, তাহার কাছাকাছি বটে।

যখন তিনি মেদিনীপুর জিলায় স্পেশল কালেক্টর পদে নিযুক্ত ছিলেন তখন তিনি ঐ জেলার এক জন চাষা জমীদারকে একবার একটী পরোয়ানা লিখেন। তখনকার রীত্যনুসারে ঐ পরোয়ানা পারসী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। সে পরোয়ানার প্রথমে এই পাঠ ছিল, "ঈশপনঃ লাঙ্গল দস্তগা বাদো বয়েল বঙ্গাকিয়ৎ বাশদ" "হে হলযন্ত্র ফলকপ্রতিপালক! হে হলযন্ত্রধারী! দুইটী বলীবর্দ্দ লইয়া তুমি কুশলে থাক।" একদা ঐ জিলায় জমীদারী নিলামের দিন একটি তালুক লইয়া দুই জন জমীদারের প্রতিনিধি দুই মোক্তারের মধ্যে বিলক্ষণ প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে এক জন মোক্তারের নাম তুলসী, অপরের নাম দামোদর। তুলসীর চেষ্টা তালুকটি আপনার প্রভুর জন্য ক্রয় করে। দামোদরের চেষ্টা তাহার প্রভুর জন্য ক্রয় করে। দুই জনে নিলামের ডাক ডাকিতে ডাকিতে তুলসী কিছু ঘাটিয়া গেল। তখন হুষ্টন সাহেব তাহাকে বলিলেন, "তুলসী! তোম কিসওয়াস্তে হট্ যাতে হো, দামোদর কা উপর চড়্ বইঠো।" হুষ্টন সাহেব অবগত ছিলেন যে আমরা শালগ্রামের উপরে তুলসী দিই। এই রীতির প্রতি কটাক্ষ করিয়া তিনি ঐ কথা বলিয়াছিলেন।

হুষ্টন সাহেব ভারতবর্ষকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছিলেন, কালীকা বিলাত, শিওকা বিলাত, জগন্নাথ কি বিলাত। বিলাত শব্দে পারসীতে দেশ বুঝায়। কালীঘাটের কালী বঙ্গদেশের প্রধান দেবতা, এই জন্য বঙ্গদেশকে তিনি কালীকা বিলাত বলিয়া ডাকিতেন। কাশীর বিশ্বেশ্বর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান দেবতা, এই জন্য উত্তর পশ্চিমাঞ্চলকে তিনি শিওকা বিলাত বলিয়া ডাকিতেন। জগন্নাথ উড়িষ্যার প্রধান দেবতা, এই জন্য উড়িষ্যা প্রদেশকে তিনি জগন্নাথের বিলাত বলিয়া ডাকিতেন।

মান্দ্রাজ ও বোম্বাই বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণ-স্থিত অনার্য্য দেশ বলিয়া বোধ হয় তিনি তাহা ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই।

তিনি ব্রাহ্মণকে অত্যন্ত মান্য করিতেন, আবার ব্রাহ্মণের মধ্যে কুলীনকে সর্ব্বাপেক্ষা মান্য করিতেন। তিনি প্রত্যেক উমেদারের কুলপরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেন। যদি কেহ ব্রাহ্মণ বলিয়া, বিশেষতঃ চাটুয্যে, বাঁড়ুয্যে, মুকুয্যে অথবা গাঙ্গুলী বলিয়া পরিচয় দিত, তাহা হইলে তাহার শীঘ্র কর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা। নিকৃষ্ট জাতি হইলে তাহাকে ছয় বৎসর ধরিয়া ঘোল খাইতে হইত।

যখন তিনি মেদিনীপুর জিলায় নিযুক্ত ছিলেন তখন এক জন সুবর্ণবণিক তাঁহার সেরিস্তাদার ছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার উপরওয়ালা যে কমিসনার সাহেব ছিলেন, তিনি বিলাতের এক ধোপার ছেলে। সেরিস্তাদারের সহিত হুইন সাহেবের সর্ব্বদা টক্ ঝক্ হইত, কিন্তু সে ব্যক্তি কমিসনর সাহেবের প্রিয় পাত্র বলিয়া তাহার কিছু করিতে পারিতেন না। এক দিন তিনি সেরিস্তাদারের উপর কুপিত হইয়া বলিয়াছিলেন "তোমারা পাণি কোই ছোঁতা নেই, তোমারা মনিব কা পাণিভি কোই ছোঁতা নেই।"

যখন তিনি কৃষ্ণনগর জেলায় বদলী হইলেন, তখন সেখানে গিয়া প্রথম কর্ম্মের চার্জ্জ লইবার সময় প্রত্যেক আমলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমলাদিগের মধ্যে বেচারা সেরিস্তাদার চট্টগ্রামবাসী বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে হুইন সাহেব বলিলেন, "হিয়া কাঁহাসে একঠো মগ্ আয়ারে।" চট্টগ্রাম জেলা ব্রহ্মরাজ্যের সন্নিকট প্রযুক্ত তাহার দক্ষিণ ভাগে অনেক গুলি মগের নিবাস আছে এই জন্য হুইন সাহেব সিরাস্তাদারকে মগ্ বলিয়াছিলেন।

উক্ত জিলায় কর্ম্ম করিবার সময় তিনি একবার একটী মোক্তারের প্রতি কুপিত হইয়া তাঁহার নিকটস্থ রুল হাত দিয়াছিলেন। মোক্তারকে মারিবার ইচ্ছা ছিল না, কেবল ভয় দেখাইবার জন্য ঐ প্রকার করিয়াছিলেন, কিন্তু একবার মাত্র তাঁহার সেই রুল স্পর্শের ফল অতিশয় ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইল। মোক্তার মনে করিল সাহেব বুঝি তাঁহাকে মারিতে যাইতেছেন সেই জন্য সে পলাইল। সে যদি পলাইল আমলারাও পলাইল। মোক্তার আমলারা যদি পলাইল তবে কাছারীর বাহিরে অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে উপবিষ্ট মকদ্দমাকারী ব্যক্তিগণও পলাইল। নগরের লোক দেখিল দুই তিন শত লোক কেবল ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতেছে। কি খবর, না, সাহেব খেপিয়াছেন।

একজন ব্রাহ্মণ-পুত্র হুইন সাহেবের অতিশয় প্রিয় পাত্র ছিলেন। তিনি তাঁহাকে তাঁহার বালাকালে প্রতিপালন করিয়া শেষে একটি কর্ম্ম করিয়া দেন। সে ব্যক্তি পরে ক্রমে ডেপুটি কলেক্টর পদ প্রাপ্ত হন। সাহেব যখন হুগলীতে বদলী হইলেন তখন সেই ব্যক্তি হুগলী জিলায় ঐ কর্ম্ম করিতেছিলেন। হুইন সাহেব তথাকার কালেক্টর হওয়াতে তিনি তাঁহার অধীনস্থ হইলেন। সাহেব একদিন তাঁহার প্রতি কুপিত হইয়া চাপরাসীকে তাঁহার কান ধরিয়া ঘোড়

দৌড় করাইতে হুকুম দিলেন এবং সেই হুকুম অনুসারে কার্য্যও হইল। হষ্টন সাহেব এতদ্দেশে থাকিয়া প্রায় এতদ্দেশীয় লোক হইয়া গিয়াছিলেন। যখন ঐ হুকুম দিয়াছিলেন তখন সে ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারী ইহা বিস্মৃত হইয়া ছিলেন; এবং এতদ্দেশীয় লোকে বাটীর চির প্রতিপালিত অন্নদাসের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে সেইরূপ করিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা শুনিবেন কেন? তাঁহারা তাঁহাকে অস্বাস্থ্যকর চট্টগ্রাম জেলায় বদলী করিয়া দিলেন, সেই খানেই তিনি মানব লীলা সম্বরণ করেন। বঃ—

প্রাপ্ত গ্রন্থ।

ঐতিহাসিক রহস্য; প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ। শ্রীরামদাস সেন প্রণীত, রায় যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য এক টাকা। লব্ধ-প্রতিষ্ঠ রামদাস বাবুর এই পুস্তকের গুণ গরিমা কীর্ত্তন করা বাহুল্য। পুরাতত্ত্ব-প্রিয় পাঠকগণের নিকট রামদাস বাবু বিশেষ রূপে পরিচিত আছেন।

ভারত উদ্ধার—(অথবা চারি আনা মাত্র) রামদাস শর্ম্ম বিরচিত। এই হাস্য-রস উদ্দীপক "মহা কাব্য" খানি পাঠ করিতে করিতে আমরা গ্রন্থকর্ত্তাকে শত শত সাধুবাদ দিয়াছি। বাস্তবিক এরূপ সরস গ্রন্থ আমরা অনেক দিন পাঠ করি নাই এবং বোধ হয় এরূপ বিদ্রূপাত্মক কাব্য (satire) বঙ্গভাষায় আর নাই। ভারতের স্বাধীনতা-প্রিয় বঙ্গ-যুবক কর্ত্তৃক কি রূপে "পাষণ্ড-ইংরাজ" "বটাদ্রিত" নিরস্ত্র ও পরাস্ত হইবে তাহাই গ্রন্থকার ভবিষ্যদ্বক্তা রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

মহাপ্রস্থান। শ্রীপ্রকাশনাথ মল্লিক প্রণীত। সুবর্ণ্ণন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। ইহা এক খানি নভেলী আড়ম্বরে আষাঢ়ে গল্প। গ্রন্থকার এক স্থলে ঘোর অন্ধকারের বর্ণনা করিতে গিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন—"অন্ধকার অনেক দেখিয়াছি; বর্ষাকালে মেঘাচ্ছন্ন অমানিশার অন্ধকার দেখিয়াছি, আমাদের বাটীর একটি অসূর্য্যম্পশ্যা পুরাতন ঘরের অন্ধকার দেখিয়াছি; শত সহস্র বার চক্ষুর কবাট বন্ধ করিয়া অন্ধকার দেখিয়াছি, কিন্তু এ অন্ধকার সে রূপ নয়।"

ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী। কাব্য। শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ কর্ত্তৃক প্রণীত। ভবানীপুর সোমপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য এক

আনা। পাঠকদের বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া এবং বাহুল্য সমালোচনা না করিয়া এই কাব্য হইতে কলিকাতার আক্ষেপ বর্ণনা উদ্ধৃত করিলাম।

"অভিমান ভরে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে
কহে কলিকাতা সজল আঁখি—
'যাও দিল্লী পানে, লিটন যেখানে
যাও আমেদের চাতক পাখী!
* * * *
কিসের বিভব দেখিলে আমার?
আমি কাঙালিনী বিভব কই?
ভারত সাম্রাজ্যে দিল্লী পাটেশ্বরী;
না হোলে আজিও যাতনা সই?
* * * *
বিলাতী ব্রোহাম, বিলাতী ফিটন
বগী দ্রুত গামী, আফিষ যান
চলেছে ঘর্ঘর, কাল শিরা পাড়ি
বুকেতে আমার,—যায় যে প্রাণ!
ওয়াটস্, প্যাক্সটন, মণ্টিথ হার্পার,
কইস প্রভৃতি হাঁপায়ে দেয়
পাদুকার ভারে সদাই আমারে;
আমা হোতে কেহ আছে কি হেয়?
বাথ্‌গেট, স্মিথ, টমসন, কর্ফিল্ড্
ডন্‌লপ, বেরিনি, সেক্রিল আদি
বুকেতে আমার বিষের ভাণ্ডার
রেখেছে সাজায়ে,—জ্বালায় কাঁদি।
ডাউলিং, মর্ডক,—কুলীন সন্তান—
বুকের উপর করিছে বাস!!
অভাগিনী আমি, বেঁচে আছি তাই,—
গলায় জোড়ে না দড়ির ফাঁস!"

কবিতা মঞ্জরী। শ্রীভগবানচন্দ্র সেন। ঢাকা ইষ্ট বেঙ্গল প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় আনা। প্রভাত বর্ণনা হইতে এক স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"ওই পাখীগণ, ডাকে শুন ঘন,
আর অন্ধকার নাই।
পাখী-কাক জলে, খেলে কুতূহলে
পেঁচার চেঁচানি নাই॥
কাক বুল বুল, আর দধি কুল,
নাচিছে ডাকিছে সব।
ঘরে গাভীগণ, করিতেছে ঘন—
দুগ্ধ ভরে হম্বারব॥"

এরূপ আরও অনেক উদ্ধৃত করিবার আছে।

নবপাঠ। সংযুক্ত বর্ণ-শিক্ষা। শ্রীরাম কানাই দত্ত প্রণীত। ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্রে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত। মূল্য দেড় আনা মাত্র। গ্রন্থকার বালকদিগকে সহজে যুক্তাক্ষর শিক্ষা দিবার জন্য কতকগুলি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। ট-য়ের শ্লোকটি উদ্ধৃত করিতেছি।

"কূপ-মৎস্য পড়ে যদি জলধির জলে
চট্টার চট্টার করে মিছা কৌতূহলে॥"

ড্য-য়ের শ্লোকটি এইরূপ।——

'এড়াইলে আড্য-দোষ করিয়া যতন,
দৌড়াইবে গাড়ি ঘোড়া মনের মতন॥'

ভানুসিংহের কবিতা।

ভৈরবী।

হম সখি দারিদ নারী!
জনম অবধি হম, পীরিতি করনু
মোচনু লোচন-বারি॥ ধ্রু॥
রূপ নাহি মম, কছুই নাহি গুণ
দুখিনী আহির জাতি,
নাহি জানি কছু, বিলাস ভঙ্গিম,
যৌবন গরবে মাতি॥
অবলা রমণী, ক্ষুদ্র হৃদয় ভরি
পীরিত করনে জানি।
এক নিমিখ পল, নিরখি শ্যাম জনি
সোই বহুত করি মানি॥
কুঞ্জ পথে যব, নিরখি সজনি হম,
শ্যামক চরণক চীনা।
শত শত বার ধূলি চুম্বি সখি,
রতন পাই জনু দীনা॥
নিঠুর বিধাতা, এ দুখ-জনমে
মাগিব কি তুয়া পাশ?
জনম অভাগী, উপেখিতা হম,
বহুত নাহি করি আশ॥
দূর থাকি হম, রূপ হেরইব,
দূরে শুনইব বাঁশি।
দূর দূর রহি সুখে নিরীখিব,
শ্যামক মোহন হাসি॥
মানস ফলকে, আঁকনু যো সখি
শ্যামক রূপক রেহ।
না মুছিবে সখি, লোচন সলিলে
যব তক রাখব দেহ॥
শ্যাম-প্রেয়সি রাধা! সখিলো!
থাক' সুখে চিরদিন!
তুয়া সুখে হম রোয়ব না সখি
অভাগিনী গুণ হীন॥
অপন দুখে সখি, হম রোয়ব লো,
নিভৃতে মুছইব বারি!
কোহি ন জানব, কোন বিষাদে
তন-মন দহে হমারি॥
ভানু সিংহ ভনয়ে, শুন কালা
দুখিনী অবলা বালা—
উপেখার অতি তিখিনী বাণে
না দিহ না দিহ জ্বালা॥

প্রকৃত শিক্ষাপ্রণালী।

প্রকৃতির ক্রোড়ে শিশুগণ কি প্রকারে অবলীলাক্রমে শিক্ষা লাভ করে তদ্বিষয়ে পূর্ব্ব-প্রস্তাবে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। সেই স্বাভাবিক প্রণালী যতদূর অবলম্বন করিয়া শিক্ষা প্রদান করা যাইতে পারে তাহার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সেই প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইলে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শিশুগণের মনোবৃত্তি সকল যে নিয়মে ও যে ক্রমাধীন বিকসিত হইতে থাকিবে তাহাদের শিক্ষার বিষয়ও ঠিক্ তদুপযোগী হওয়া আবশ্যক। এক্ষণে ইহা নিঃসংশয়ে অবধারিত হইয়াছে যে, স্বাভাবিক অবস্থায় মানসিক বৃত্তি সকল যুগপৎ সমভাবে পরিণত না হইয়া ক্রমে অগ্রপশ্চাৎ-রূপে পরিস্ফুটিত হইতে থাকে। এবং মনোবৃত্তির এই প্রকার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তৎ তৎ ব্যাপারোপযোগী জ্ঞানলাভের স্পৃহা ও শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সুতরাং শিশুদিগের চিত্তবৃত্তির স্বাভাবিক পরিণতির নিয়ম জানিতে পারিলে প্রকৃত শিক্ষা-প্রণালীও সুস্থির হইতে পারে। মনোবিজ্ঞানের ক্রমশঃ উন্নতি ও আলোচনা-সহকারে এই বিষয়ের প্রকৃত তথ্য যে নিশ্চয়রূপে নিরূপিত তাহার সন্দেহ নাই এবং এক্ষণে শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে যে সকল মতভেদ দৃষ্ট হয় তাহা ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়া ঐকমত্য স্থাপিত হইবেক।

কি শারীরিক কি মানসিক উভয়-বিধ উন্নতির যে নির্দ্দিষ্ট ক্রম ও স্বাভাবিক নিয়ম আছে তাহা অনেকে বুঝিতে চাহেন না। এবং অনেকে ঐ নিয়মের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও কার্য্যেতে তৎপ্রতি লক্ষ্য করেন না। রোগ হইলে কেবল ঔষধের বলে অবিলম্বে রোগের উপশম হইবেক এই দৃঢ় বিশ্বাসে শরীরের নিয়ম ও স্বভাবের গতির প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া কোন কোন চিকিৎসক অনবরত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন কিন্তু তাহাতে রোগ-শান্তি না হইয়া বিপরীত ঘটিয়া উঠে। শরীরের স্বাভাবিক ব্যাপার ও শক্তির প্রতি উপেক্ষা করাই এই অনিষ্টের কারণ। একটি চারা গাছ স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বর্দ্ধিত হইয়া, সুবৃক্ষে পরিণত হইতে যদি পাঁচ বৎসর কালের অপেক্ষা করে, তাহাকে সহস্র প্রকার যত্ন করিলেও কদাপি পাঁচ মাসের মধ্যে সেই রূপ বৃক্ষে পরিণত করা যাইতে পারিবে না। শারীরিক ও মানসিক উন্নতির সম্বন্ধেও তদ্রূপ জানিতে হইবে। অনেক শিক্ষকের সংস্কার আছে যে, বালকগণকে যতই শিখাইবে ততই তাহারা শিখিতে পারিবে। এই প্রত্যয়ে তাঁহারা বালকগণের চিত্তোন্মেষের স্বাভাবিক নিয়মের প্রতি

কিছুমাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া স্বল্পকালমধ্যে বহুতর বিষয়ে শিক্ষিত করিবার দুরাকাঙ্ক্ষায় বালকগণকে অনবরত পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত রাখেন। কিন্তু এই প্রকার শিক্ষায় প্রকৃত উন্নতি কদাপি হয় না। বরং তাহাতে যে সমূহ অনিষ্টের উৎপত্তি হয় তাহা পশ্চাতে প্রতিপাদিত হইবে। অতএব স্বাভাবিক শক্তি-অনুসারে শিশুগণের স্মৃতি-শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি যে পরিমাণে বিকসিত হইতে থাকিবে সেই পরিমাণে তাহাদের বুদ্ধির উপযোগী জ্ঞানশিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। এই সম্বন্ধে কএকটি নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

প্রথমতঃ—শিশুগণকে কোন সাধারণ বিধি বা সাধারণ তত্ত্ব-সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করিবার অগ্রে বিশেষ দৃষ্টান্ত সকল তাহাদিগকে দেখাইতে ও বুঝাইয়া দিতে হইবে। তৎপরে সেই সকল দৃষ্টান্ত হইতে সাধারণ বিধি যে প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা ক্রমে তাহাদের মধ্যে উদ্ভাবিত করিয়া দিতে হইবে। এইটি শিক্ষা প্রদানের স্বাভাবিক প্রণালী। লোকে যেমন অগ্রে বিশেষ বিশেষ ঘটনা বা বিশেষ বিশেষ বস্তু সকল পরীক্ষা করিয়া পরে চিন্তা ও সংকলন-শক্তির বলে সেই সকল ঘটনা বা বস্তু সমূহের পরস্পর সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া তৎ-তৎ সম্বন্ধে সাধারণ বিধি সকলের অবিষ্কার করিয়া থাকে, সেই প্রণালীতে শিশুগণের উপদেশ প্রদান করিতে পারিলে বাস্তবিক স্থায়ী ফল ও উপকার সাধন হয়। অনেকে মনে করেন যে সাধারণ বিধি বা তত্ত্ব সকল অল্প কথায় ব্যক্ত হয় বলিয়া বালকগণ তাহা অনায়াসে শিখিতে ও মনোমধ্যে ধারণ করিতে পারে, সুতরাং তাহাই অগ্রে শিখান উচিত। কিন্তু এই প্রণালী প্রকৃত জ্ঞানের পথ নহে। তাহাতে শিশুগণ অনেক সময়ে কতকগুলি শব্দমাত্র শিক্ষা করে, প্রকৃত জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হয় না।

দ্বিতীয়তঃ—শিশুগণ যে সকল শব্দ অভ্যাস করিবে তাহা যেমে বস্তু বা বিষয়ের প্রকাশক তৎতৎ বস্তু ও বিষয়গুলি তাহারা স্পষ্টরূপে যাহাতে উপলব্ধি করিতে পারে এ প্রকার যত্ন নিয়তই করিতে হইবে। এই বিষয়ের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য না করাতেই শিশুগণের শিক্ষার সমূহ ব্যাঘাৎ জন্মিয়া থাকে। অনেক স্থলে কেবল শিক্ষকের অনবধানতা বা অবহেলা-প্রযুক্ত কেবল কতকগুলি নীরস শব্দাবলী মাত্র কণ্ঠস্থ করাই শিশুদিগের পাঠাভ্যাসের কার্য্য হইয়া পড়ে, কিন্তু এ প্রকার অভ্যাসে সহজেই মনোভিনিবেশ হওয়া সুকঠিন। সুতরাং বালকগণ পাঠে ভঙ্গ দেয়, এবং এপ্রকার শিক্ষায় তাহাদের সহজেই বিতৃষ্ণা জন্মে। শিক্ষক-ইহার নিগূঢ় ভাব না বুঝিয়া পাঠাভ্যাসে অনাসক্ত বলিয়া বালকগণকে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু এস্থলে প্রকৃত পক্ষে শিক্ষকেরই দোষ, বালকের নহে। শিশুগণের ক্ষুদ্র বুদ্ধি যে পর্য্যন্ত পরিচালিত হইতে পারে সেই সীমার মধ্যে অনেক বিষয় আছে যাহাতে তাহাদিগকে সমূহ উপকার-জনক শিক্ষা প্রদান করা যাইতে

পারে। সেই সীমা অতিক্রম করিয়া কতকগুলি কঠোর শব্দ মাত্র অভ্যাস করাইলে বিশেষ কোন ফল, লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই, বরং তাহাতে বিশেষ অনিষ্টোৎপত্তি হইতে পারে। প্রকৃত শিক্ষার নিয়মানুসারে শিশুগণের বর্ণ পরিচয় বা শব্দবোধ হইবার পূর্ব্বে বস্তুপরিচয় হওয়া আবশ্যক। এই বিষয়ে আমাদিগের ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর কতিপয় দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার অনুরোধে এতদ্দেশীয় বালকগণকে অল্প বয়সেই বিজাতীয় ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিতে হয় এবং ইংরাজি শিখিবার জন্য ইংরাজি বালকগণের নিমিত্ত যে সকল পাঠ্য পুস্তক লিখিত হইয়াছে তাহাই এদেশীয় বালকগণের হস্তে সমর্পিত হয়। কিন্তু সেই সকল পাঠ্য পুস্তকে অনেক শব্দ আছে যাহার অনুরূপ বস্তু এতদ্দেশে নাই অথবা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐসকল পুস্তকে অনেক কথা আছে যাহার ভাব এদেশীয় লোকে সহসা উপলব্ধি করিতে পারে না সুতরাং সেই সকল শব্দ ও সেই সকল কথা এতদ্দেশীয় বালকগণকে প্রথম শিক্ষার স্থলে কদাপি অভ্যাস করান কর্ত্তব্য নহে, বাস্তবিক তাহাতে প্রকৃত শিক্ষা কিছুই হয় না।* সেই রূপ ক্ষুদ্র বালকগণকে ব্যাকরণের নিয়ম সকল অভ্যাস করাইবার যে চেষ্টা শিক্ষকগণ করিয়া থাকেন তাহাও প্রকৃত শিক্ষাপ্রণালীর বিরুদ্ধ। অনেকে মনে করেন যে এই প্রকার অভ্যাসে বালকগণের স্মরণ-শক্তি প্রবল হয় কিন্তু তাহাতে শৈশব চিত্ত যে পরিমাণে পরিশ্রান্ত হয় তদনুযায়ী ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না বরং তাহাতে শিক্ষার প্রতি অনাদর ও অনিচ্ছা জন্মিবার সম্ভাবনা। বালককে যে কোন বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবে তাহা শিখিবার বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিতে যে পর্য্যন্ত না তাহার যত্ন হয় সে পর্য্যন্ত তদভ্যাসে তাহার কদাপি মনঃসংযোগ হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ—শিশুগণের বিদ্যাভ্যাসে অতিমাত্র মানসিক পরিশ্রম যাহাতে না হয় তদ্‌বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। অনেকে ইচ্ছা করেন যে তাঁহাদের পুত্রগণ নিরবচ্ছিন্ন লেখা পড়ার চর্চ্চা করিবেক এবং অল্প কাল মধ্যে অধিক শিক্ষা করিয়া সকলের নিকট যশোভাজন হইবেক। এই অভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা বালকগণকে লেখাপড়া করিবার জন্য সর্ব্বদাই অনুযোগ ও তাড়না করিয়া থাকেন। কিন্তু এটি নিতান্ত গর্হিত কার্য্য। বালকগণের শরীরের ন্যায় মনোবৃত্তি সকল পরিণত হইতে সময় লাগে। এবং যাহাতে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি সকল সামঞ্জস্যভাবে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য সহকারে পরিবর্দ্ধিত ও বলিষ্ঠ হইতে পারে তৎপ্রতি সর্ব্বাগ্রে যত্ন করা কর্ত্তব্য। তাহাদের যেমন শক্তি সেই মত পরিশ্রম স্বাভাবিক অবস্থায় সহ্য হয়, তদপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে হইলে তাহাদের

*বিলাতী পুস্তকের এই সকল দোষ দেখিয়া মৃত বাবু প্যারীচরণ সরকার এদেশীয় বালকগণের নিমিত্ত যেসকল ইংরাজি পাঠ্য পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছেন তদ্দ্বারা উপরোক্ত দোষ অনেকাংশে খণ্ডিত হইয়াছে।

মানসিক উন্নতির পক্ষে বিশেষ হানি হইবারই সম্ভাবনা। অন্যাপেক্ষা যে বালকের কিঞ্চিৎ অধিক বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহার পিতা মাতা বা শিক্ষক তাহাকে অধিকতর যত্ন করিয়া বিদ্যাভ্যাস করাইতে থাকেন, কিছু কাল সে বালক হয় তো বিশেষ উন্নতির পরিচয় দিয়া সকলের নিকট প্রশংসা-ভাজন হয় এবং সেই উৎসাহে অধিকতর পরিশ্রম করিতে থাকে কিন্তু এই অস্বাভাবিক পরিশ্রম হেতু বয়োবৃদ্ধি-সহকারে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি বলিষ্ঠ না হইয়া ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আইসে। সুতরাং তাহার পিতা মাতার বলবতী আশা অবশেষে নিষ্ফল হইয়া যায়।

বাঙ্গালি যুবকদিগের অধিকাংশ ব্যক্তিরই এই শোচনীয় অবস্থা দৃষ্ট হয়। তাহারা যে পর্য্যন্ত পঠদ্দশায় থাকে সে পর্য্যন্ত তাহাদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, স্মরণ-শক্তির প্রাখর্য্য এবং বিদ্যাভ্যাসে সমধিক যত্ন ও অধ্যবসায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা আশ্চর্য্য শ্রমশক্তি-সহকারে অল্পকালমধ্যে নানাবিধ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে। কিন্তু বিদ্যামন্দির হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সংসার-ক্ষেত্রে পদার্পণ করিবামাত্র তাহাদের অধ্যবসায় শ্রম-শক্তি এবং বুদ্ধির প্রাখর্য্য যেন বাষ্পবৎ কোথায় উড়িয়া যায়। সংসার-ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য সাধনে সক্ষম ও পারদর্শী হইবেক এই উদ্দেশেই বাল্য কাল হইতে শিক্ষা দেওয়া হয় কিন্তু বাঙ্গালি যুবকগণের সম্বন্ধে সেই শিক্ষার ফল কিজন্য একপ্রকার বিসদৃশ হয় তাহার তথ্য অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। ইহার কারণ অন্বেষণ করিলে দৃষ্ট হইবে যে, বাঙ্গালিদিগের একে স্বাভাবিক দুর্ব্বল প্রকৃতি তাহাতে অল্প বয়সে অতিমাত্র মানসিক পরিশ্রম জন্য শারীরিক ও মানসিক শক্তির হ্রাস হওয়ায় তাহারা অল্প কালেই উদ্যম-শূন্য ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

বাস্তবিক বর্ত্তমান সভ্যতার উন্নতি-সহকারে মনুষ্যের যেরূপ সামাজিক অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এবং দিন দিন নূতন নূতন অভাব মোচনের এবং জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যে ব্যয়বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে লোকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে মানসিক পরিশ্রম না করিলে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। পুরাকালে দৈহিক বল-বীর্য্যেরই গৌরব ছিল এবং মানসিক উন্নতির প্রতি অতাল্প দৃষ্টি ছিল। এক্ষণে সভ্য জনপদমাত্রে তাহার বিপরীত ভাব উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে শারীরিক শক্তির কোন প্রভাব বা গৌরব নাই। এখন কেবল বুদ্ধি ও বিদ্যার বলই প্রধান বল, এবং ধন মান ও পদ-মর্য্যাদা লাভের এক মাত্র সোপান হইয়াছে। বিদ্যা-সাপেক্ষ বিবিধ ব্যবসায়ে ও নানাবিধ কর্ম্ম-ক্ষেত্রে বহুতর লোক প্রতিষ্ঠিত হইয়া জীবিকা আহরণের চেষ্টায় পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় সেই সকল ব্যবসায় ও কর্ম্মে বিস্তর পরিশ্রম সহকারে পারদর্শী না হইতে পারিলে তদ্দ্বারা অর্থোপার্জ্জন সুকঠিন হইয়া পড়ে। সুতরাং সর্ব্বত্রই দিন দিন লোকের মানসিক পরিশ্রম সমধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে।

যাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে রহিয়াছে তাহারা আপন আপন পদ ও ব্যবসায় রক্ষা করিবার জন্য অনবরত পরিশ্রম করিতেছে এবং বালক ও যুবকগণ সেই সকল ব্যবসায় ও কর্ম্মে প্রবেশ করিবার অভিলাষে কঠিন পরিশ্রম সহকারে প্রয়োজনীয় বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। কিসে শীঘ্র শীঘ্র বিদ্যা শিক্ষা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে সামান্যত অধিকাংশ লোকের এই চিন্তা এই চেষ্টা হইয়াছে। এই জন্যই শিশুগণের বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইতে না হইতেই তাহাদের বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করাইবার জন্য পিতা মাতা ব্যস্তসমস্ত হইয়া থাকেন। বালকগণ প্রতিদিন কি শিক্ষা করিতেছে, তাহাদের পাঠ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে এই বিষয়েরই সর্ব্বদা অনুসন্ধান লওয়া হয়। কিন্তু তাহাদের শরীরের পুষ্টি-সাধন উপযুক্ত মত হইতেছে কি না তাহা দেখিবার আবশ্যক মনে হয় না। নিয়ত কঠিন মানসিক পরিশ্রম জন্য শীর্ণকায় বলহীন হইতেছে ইহা দেখিয়াও অনেক পিতা মাতা বালককে সেই পরিশ্রম হইতে কিছুকালের জন্য বিরত করিবার চেষ্টা করেন কিন্তু শরীর ও মনের পরস্পর যে রূপ সংযোগ তাহাতে শারীরিক বল ও শক্তি না থাকিলে মানসিক পরিশ্রম এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা সম্যকরূপে হওয়াই অসম্ভব। এজন্য মানসিক উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধনের নিমিত্ত শরীরের পুষ্টিসাধন ও বলাধানের প্রতি সবিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য। এবং এই বিষয়ের প্রতি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল প্রকৃতি বঙ্গবাসীগণের সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা যে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। শারীরিক ও মানসিক সমুদায় ব্যাপার এক জীবনী শক্তির প্রভাবে সম্পাদিত হইতেছে। সেই শক্তির বলে ভুক্ত অন্ন পরিপাক হইয়া রক্তে পরিণত হয়, সেই শক্তির প্রভাবে হৃদয়স্থিত রক্ত শিরা ও ধমনীর মধ্য দিয়া পরিচালিত হইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহের পুষ্টি সাধন করিতেছে, সেই শক্তির দ্বারা আমরা অঙ্গ চালনা ও শারীরিক পরিশ্রম করিতে সক্ষম হইতেছি, সেই শক্তির দ্বারা মনের প্রধান ইন্দ্রিয় যে মস্তিষ্ক তাহা উত্তেজিত হইয়া মানসিক কার্য্য সকল সংসাধিত হইতেছে এবং শরীর ও মনের চালনা হেতু প্রতিদিন দেহের ও মস্তিষ্কের যে ক্ষয় প্রাপ্তি হয় তাহাও সেই জীবনী শক্তির প্রভাবে পূরণ হইতে থাকে। কিন্তু সেই জীবনী শক্তির একটি সীমা ও পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং শরীর সম্বন্ধীয় কোন একটি ব্যাপার সাধনে যদি সেই শক্তি অধিক মাত্রায় নিয়োজিত হয় তাহা হইলে সহজেই অন্য দিকে তাহার কার্য্য মন্দীভূত ও দুর্ব্বল হইয়া আইসে। এই জন্য অতিমাত্র ভোজন করিলে সেই ভুক্ত অন্ন পরিপাকে জীবনী শক্তির অধিকাংশ ব্যয়িত হয় সুতরাং শরীরের অন্য ব্যাপার সকল তখন মন্দীভূত হইয়া শরীর অসমর্থ ও অলস হইয়া আইসে। সে সময়ে কোন শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা হয় না। সেই মত অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম করিলে মনোবৃত্তি সক-

লের চালনা করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়। এবং মানসিক পরিশ্রম অধিক পরিমাণে করিলে শরীর নিশ্চেষ্ট ও হীন-বল হইয়া পড়ে।

পরিণত বয়স্ক ব্যক্তির অপেক্ষা বালক ও যুবকগণের শরীরের পুষ্টিসাধনের প্রতি অধিকতর যত্ন করা আবশ্যক। পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিগণের নিত্য শারীরিক ও মানসিক শ্রমোপযোগী বল এবং সেই শ্রমজনিত শারীরিক ক্ষয় পূরণ হওয়া আবশ্যক। বালকগণের শরীরের পরিবর্দ্ধন ও পুষ্টিসাধন-রূপ তদতিরিক্ত আর একটি ব্যাপার আবশ্যক। জীবনী শক্তির অধিকাংশ তাহাদের শরীরের পরিবর্দ্ধন কার্য্যে এবং অঙ্গাদির পরিণতি সাধনেই নিঃশেষিত হয় সুতরাং অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ শক্তি শিশুগণের মানসিক ব্যাপার সাধন জন্য স্বভাবতঃ সঞ্চিত থাকে এবং তদনুযায়ী মানসিক পরিশ্রম করাই শিশুগণের স্বভাবসিদ্ধ। তদতিরিক্ত পরিশ্রমসহকারে বিদ্যাভ্যাসের অনুরোধে তাহাদের মনোবৃত্তি সকল অতিমাত্র সঞ্চালিত করিলেই অনিষ্টোৎপত্তির কারণ হয়। এই রূপ মানসিক পরিশ্রমে শরীর শীর্ণ ও ক্ষুদ্রাকার হইয়া আইসে এবং মস্তিষ্কের অনবরত চালনা হেতু তাঁহার আয়তন বৃদ্ধি না হইয়া ক্ষুদ্রাকার রহিয়া যায়। সুতরাং প্রকৃত মানসিক শক্তি বয়োবৃদ্ধি-সহকারে পরিবর্দ্ধিত না হইয়া ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে।

বাস্তবিক প্রকৃতিকে হিসাবে ফাঁকি দিবার উপায় নাই। তাঁহার নিকট একদিকে অতি মাত্রায় আদায় করিয়া লইলে অন্য দিকে তিনি কর্ত্তন করিয়া লইয়া হিসাব সমান করিয়া লয়েন। যদি শরীরের কোন অঙ্গ অকালে অতিমাত্র উত্তেজিত ও অল্পকালে পরিণত করিতে চাহ তাহা হইলে বিরক্ত হইয়া প্রকৃতি তোমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন বটে কিন্তু সেই অতিরিক্ত কার্য্য-হেতু তিনি অপর গুরুতর কার্য্য সকল ফেলিয়া রাখিবেন। শারীর-বিধান বিদ্যার একটি প্রধান তত্ত্ব এই যে, শরীরের পরিবর্দ্ধন এবং সংগঠন রূপ দুইটি ব্যাপার পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন। উভয় ব্যাপার যুগপৎ সমভাবে সাধিত হয় না। যে সময়ে পরিবর্দ্ধন ব্যাপারটি ত্বরিত চলিতে থাকে তখন সংগঠন কার্য্য স্থগিত বা কিয়ৎপরিমাণে মন্দীভূত থাকে। ইহার উদাহরণ নিম্ন শ্রেণীর জীবগণের মধ্যে সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। যে কীট হইতে প্রজাপতির জন্ম তাহার পরিবর্ত্তনের প্রতি দৃষ্টি করিলে প্রতীতি হইবে যে প্রথমাবস্থায় তাহা একটি সামান্য পোকা মাত্র থাকে, তখন তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোন কিছুই দৃষ্ট হয় না, এই অবস্থায় ঐ কীটের কেবল আয়তন বৃদ্ধি হইতে থাকে। পরে সম্পূর্ণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল ক্রমে সংরচিত হইতে আরম্ভ হয়। তখন দেহের আয়তন আর বাড়ে না বরং কমিয়া যাইতে থাকে। উচ্চ শ্রেণীর জীবগণের দেহে এই দুইটি ব্যাপার যুগপৎ চলিতে থাকে বলিয়া দুইটির পরস্পর প্রভেদ ও বিরোধ এতাধিক স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয় না।

তথাপি মনুষ্য জাতির স্ত্রীপুরুষদিগের দৈহিক পরিণতি সম্বন্ধে যে প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে উপরোক্ত নিয়মের পরিচয় ও প্রমাণ অনেকাংশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্ত্রীজাতির শারীরিক গঠনের পরিণতি ও পূর্ণতা পুরুষাপেক্ষা শীঘ্র সম্পাদিত হইতে আরম্ভ হয়। এজন্য তাহাদের বৃদ্ধি অল্প কাল মধ্যে সমাপ্ত হইয়া যায়। বালকগণের শরীরের আয়তন অনেক কাল পর্য্যন্ত পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে কিন্তু তাহাদের অঙ্গ ও ইন্দ্রিয় সকল অনেক কাল পর্য্যন্ত অপূর্ণ ও অপরিপক থাকে। যে বয়সে একটি বালিকার শারীরিক বৃদ্ধি সম্পাদন ও ইন্দ্রিয় সকলের পরিণতি হয় এবং তাহার মনোবৃত্তি সকল তেজস্বী হইয়া উঠে, সে বয়সে বালকের শারীরিক কি মানসিক গঠনের পূর্ণতা সম্পাদিত হইতে অনেক বিলম্ব থাকে। তৎকালে তাহার দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধন ব্যাপারই বিশেষ রূপে হইতে থাকে। পরিবর্দ্ধন ও সংগঠন সম্বন্ধীয় উপরোক্ত নিয়ম শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই লক্ষিত হয়। এবং ইহা সামান্যত বলা যাইতে পারে যে, কোন একটি অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের গঠন-প্রক্রিয়া অকালে বা অত্যধিক মাত্রায় চালিত হইলে তাহার পরিবর্দ্ধন ও পুষ্টি সাধনের ব্যাঘাত অবশ্যই হইবে। শরীরের প্রধান অঙ্গ এবং মানসিক ব্যাপারের প্রধান ইন্দ্রিয় যে মস্তিষ্ক তাহারও সম্বন্ধে এই নিয়ম বলবৎ জানিতে হইবে। বাল্য কালে মস্তিষ্কের আয়তন বড় থাকে কিন্তু তাহার গঠন নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও অপরিপক থাকে। সেই অবস্থায় মানসিক চিন্তা ও মানসিক পরিশ্রম সহকারে যদি মস্তিষ্কের অতিমাত্র উত্তেজনা করা হয় তাহা হইলে তাহার স্বাভাবিক পুষ্টি-সাধন কার্য্য রহিত হইয়া গঠনের পরিণতি হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু এই প্রণালীতে মস্তিষ্কের আয়তন ও শক্তির বৃদ্ধি এক কালে নিবারিত হইয়া যায় এবং পরিণামে তাহা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সুতরাং মস্তিষ্কের এই প্রকার দৌর্ব্বল্য-হেতু মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তি সকল স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন অল্প বয়সে অতিমাত্র মানসিক পরিশ্রম হেতু সাধারণ রূপে শরীরের পুষ্টি-সাধনেরও ব্যাঘাৎ হয়, তাহাতে নানা উৎকট রোগ জন্মে এবং মনুষ্যকে বলহীন ও উদ্যম শূন্য করিয়া ফেলে। মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য হেতু মানুষ যেমন বুদ্ধি-বৃত্তির পরিচালনা করিতে এবং সামান্যত সকল মানসিক পরিশ্রমে অপারগ হয়, সেই মত তদ্দ্বারা শরীরের আন্তরিক প্রক্রিয়া সকলেরও অনেকাংশে ব্যাঘাৎ জন্মে এবং তজ্জন্য পরিপাকক্রিয়া রক্তসঞ্চালন ইত্যাদি ব্যাপার সকল মন্দীভূত হইয়া আইসে। এই রূপে অল্প বয়সে অতিমাত্র মানসিক পরিশ্রম দ্বারা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া কোন কোন যুবক চিরকালের নিমিত্ত দুঃসহ শিরঃপীড়ায় ভুগিতেছে, কাহার মস্তক ঘূর্ণরোগে আক্রান্ত হইয়াছে, কাহারো বা হৃৎকম্প অনিদ্রা ও অগ্নিমান্দ্য হইয়া অন্ন পরিপাক হওয়া সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছে এবং তজ্জন্য উদরাময় অম্ল শূল ইত্যাদি কঠিন

রোগ শরীরকে স্থায়ীভাবে অধিকার করিয়াছে। এই রূপে যে সকল ব্যক্তি বিদ্যামন্দির হইতে রুগ্ন ও ভগ্ন শরীর লইয়া সংসার-ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়েন তাঁহাদের দ্বারা জনসমাজের কোন উপকারই প্রত্যাশা করা যায় না। অতিমাত্র ও অস্বাভাবিক মস্তিষ্কের উত্তেজনা করিলে যে কি ভয়ানক ও শোচনীয় ফল উৎপন্ন হয় তাহা এতদ্দেশীয় শিক্ষিত যুবকগণের দৃষ্টান্তে বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হইবেক।

সাংসারিক কর্ম্মক্ষেত্রের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে থাকিয়া যে ব্যক্তি নিজ শক্তি সহকারে জয় লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে সুস্থ ও বলিষ্ঠ শরীর এবং সুপরিণত মস্তিষ্কের দ্বারা যে কার্য্য হয়, বহুপ্রযত্ন-সহকারে অর্জ্জিত বিদ্যা দ্বারা তাহা সম্পাদিত হয় না। সংসারে অধ্যবসায়ী এবং উদ্যমশীল ব্যক্তিগণ অনেক স্থলে কৃতবিদ্যগণকে অতিক্রম করিয়া আপন উদ্দেশ্য সাধন করিয়া নিজ পরিশ্রমের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন।

অল্পবয়সে অনেক শিক্ষা করিবার আকাঙ্ক্ষায় চিরকালের মত আপনার শরীরকে অসুস্থ ও অপটু করিয়া ফেলার অপেক্ষা অদূরদর্শিতার কার্য্য আর কিছুই নাই। অতএব বালকগণের মনোবৃত্তির যাহাতে অতিমাত্র পরিচালনা না হয় তদ্বিষয়ে সকল পিতামাতার সাবধান হওয়া আবশ্যক। কাঁচা আম্রকে উত্তাপের দ্বারা শীঘ্র পাকাইবার অপেক্ষা গাছে রাখিয়া তাহা সময়ে পরিপক্ক করা ভাল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীগণের উপযুক্ত বয়সের নিয়ম উঠাইবার জন্য যাঁহারা ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাঁহারা এই কথাটি মনে রাখিবেন। ষোল বৎসরের কম বয়সের ছাত্রগণ প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার অযোগ্য বলিয়া যে বিধি করা হইয়াছে তাহা বাস্তবিক সুনিয়ম বলিতে হইবে। উক্ত পরীক্ষার জন্য যে সকল পুস্তক ও যে সকল পাঠ নিরূপিত হইয়া থাকে তাহা সচরাচর ষোড়শ বর্ষের কম বয়সের বালকগণ উপযুক্ত মত শিক্ষা করিতে কদাপি সক্ষম হয় না। তবে দুই একটি মেধাবী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালক তদপেক্ষা অল্পকাল মধ্যে ঐ সকল পাঠের পরীক্ষা দিতে সক্ষম হয় বটে। কিন্তু এরূপ দুই এক জনের অনুরোধে সর্ব্বসাধারণের উপকার-জনক নিয়মটি রহিত করা কর্ত্তব্য নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযুক্ত বয়সের নিয়ম সম্বন্ধে যে রূপ দূরদর্শিতা প্রকাশিত হইয়াছে ভারতবর্ষীয় সিবিল সর্ব্বিস নামক রাজকীয় কর্ম্মে প্রবেশ জন্য পরীক্ষার্থীগণের যোগ্যতা-সূচক বয়সের যে উচ্চসীমা অবধারিত হইয়াছে তাহা যে উচিত বিবেচনার সহিত হইয়াছে ইহা কদাপি বলা যাইতে পারে না।

ভ—

ভারতবর্ষীয় ইংরাজ।

(পরিশিষ্ট)

ইংরাজেরা যেমন পুলিষ কোর্টে আমাদের রীতি নীতি স্বভাব চরিত্র শিক্ষা করেন আমরাও তেমনি হয়ত লাল বাজারের গোরাকে ইংরাজ জাতির আদর্শরূপে গ্রহণ করি। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কর্ম্মক্ষেত্রে তাহাদের সঙ্গে আমাদের যা কিছু আলাপ পরিচয়, কিন্তু তাহারা আপনাদের মধ্যে কিরূপে জীবন যাপন করে, তাহাদের গার্হস্থ্য-প্রণালী সামাজিক রীতি নীতি কিরূপ, তাহা এদেশে আমরা নভেল পড়িয়া যাহা কিছু জানিতে পারি, লৌকিক ব্যবহারে অল্পই দেখিতে পাই। ইংরাজেরাও আমাদের ভিতরকার ভাব অল্পই দেখিতে পান। তাঁহারা আমাদিগকে যেরূপ ভাবে দেখেন তাহা আমরা মেকলে-কৃত ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রস্তাবে বঙ্গবাসীদিগের চরিত্র পাঠে কতক অবগত হইতে পারি। দেশীয় সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত বিবেচনা করিতে গেলে তাঁহাদিগকে সামান্যতঃ দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক দলের মত দেশীয়দিগের প্রতি সদ্ব্যবহার, ভারতবর্ষের শুভ উদ্দেশে ভারতবর্ষ শাসন, উপযুক্ত হইলে তাহাদিগকে উচ্চ পদ উচ্চ অধিকার প্রদান। অপর দলের ভাব স্বার্থপরতা—"হিন্দুস্থান তাঁহাদেরই ভোগের বস্তু, হিন্দুরা কখনই স্বাধীনতার উপযুক্ত নহে, চিরকালই তাহাদের সঙ্গে বালকের ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে। ইংরাজদের সঙ্গে সমকক্ষ হইয়া চলিতে যাওয়া তাহাদের স্পর্দ্ধা মাত্র। এদেশ ইংরাজেরা তরবারির বলে জয় করিয়াছে, তরবারির বলে তাহাদের রক্ষা করিতে হইবে। প্রীতি সৌহার্দ্দ্য ভ্রাতৃভাব স্বাধীনতা এ সকল কেবল মুখে বলিবার জিনিস, কাজের নহে। কৃষ্ণবর্ণ জাতি কখন শ্বেতাঙ্গদের সমান অধিকার লাভের যোগ্য নহে যদি হইত ত ইংরাজদের এদেশ অধিকারের ক্ষমতা থাকিত না। তাহাদিগকে সমান অধিকার দিলে ইংলণ্ডের মর্য্যাদার হানি হইবে। যাঁহারা আপনাদের শরীর পতন করিয়া ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিজ সন্তান সন্ততিগণকে উপেক্ষা করিয়া দেশীয়দিগের মর্য্যাদা রক্ষা নিতান্ত অবিচারের কার্য্য। দেশীয়দিগকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়া, দেশীয়দিগকে স্বাধীনতা শিক্ষা দিয়া, আপনাদের পদচ্যুতির সোপান করিয়া দেওয়া নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। এরূপ নিঃস্বার্থ উপদেশ দেওয়া ভস্মে ঘৃতাহুতি মাত্র।" দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে ভারতবর্ষীয় ইংরাজদের মধ্যে এই শেষোক্ত দলের সংখ্যাই অধিক। ইংরাজি সংবাদ পত্র সকলকে যদি এই দুই দলের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য করা যায়, তাহা

হইলে এই দুই দলের আপেক্ষিক বল ও সংখ্যা সহজে অবধারিত হইতে পারে।

আর কতকগুলি ইংরাজ আছে (সংখ্যা তাহাদের অল্পই) এক কথায় যাহাদের মত এই যে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের গলগ্রহ মাত্র, আর সে এমন গলগ্রহ যে তাহা হইতে নিষ্কৃতিরও উপায় নাই। এই সম্বন্ধে ইংলণ্ডের এক মাসিক সমালোচনী পত্রিকায় (The Fortnightly Review November The foreign dominions of the Crown) পার্লমেণ্টের ভারসভ্য সুবিখ্যাত লো ব্রহেম স্বীয় অভিপ্রায় যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম পাঠকদিগের গোচরার্থ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"যেখানে যাহারা ভারতবর্ষে ব্রিটিষ রাজ্য সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহাদের স্বার্থ-সাধন ভিন্ন আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। ইংলণ্ডের গৌরব-বৃদ্ধি অথবা ভারতবর্ষবাসীদিগের কল্যাণসাধন—এরূপ কোন ভাব তাহাদের মনে উদয় হয় নাই। এক দল ব্যবসায়ীর কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া তাহাদের ভারতবর্ষে প্রবেশ—তাহারা বিলক্ষণ অবগত ছিল যে যাহা কিছু করিয়া লইতে হইবে সে কেবল তরবারির বলে। কত কত দেশ উচ্ছন্ন গেল—কত রাজা ও রাজা বিনষ্ট হইল—কত লুটপাট আরম্ভ হইল—ইংলণ্ডের সেনাগণ ক্রীত ভাকাতের কার্য্যে নিযুক্ত হইল—নিরপরাধী নিরীহ স্ত্রীগণ লুণ্ঠিত হইল—দৈব মানব সকল প্রকার নিয়ম পদতলে দলিত হইল—এ সকলি অর্থোপার্জ্জন উদ্দেশে। ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল তাহার প্রত্যেক অভিযোগ সমর্থনে অকাট্য প্রমাণ বর্ত্তমান। উপায় যেমনই নিষ্ঠুর ও কলঙ্কিত হউক না কেন—জয়লাভ তেমনি সম্পূর্ণ হইয়াছিল। যদি ক্লাইব কিম্বা হেষ্টিংসকে জিজ্ঞাসা করা যাইত—তোমাদের ভারতবর্ষে হলুস্থূল বাধাইবার অভিসন্ধি কি? তাঁহারা অনায়াসে উত্তর দিতে পারিতেন—কোম্পানি বাহাদুরের আয় বৃদ্ধি। আর যদি অকপট ভাবে উত্তর করিতে ইচ্ছা করিতেন তবে ইহাও বলিতে পারিতেন—"আর আমাদের নিজেরও যৎকিঞ্চিৎ কাজ গোছান"। কিন্তু এ ভাব স্থায়ী হইতে পারে নাই। তাহাদের কার্য্য-প্রণালী সময়োচিত হয় নাই। যদিও হেষ্টিংস্ নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইলেন, তাঁর বিচারে যে সকল ব্যাপার প্রকাশিত হইল তাহাতে অবশেষে ইংলণ্ডের ধর্ম্ম-বুদ্ধি জাগ্রত হইল। ক্রমে এই সকল অন্যায় অত্যাচার সংশোধিত হইল—বল ও যথেচ্ছাচারিতার পরিবর্ত্তে ন্যায় ও সুবিচার সংস্থাপিত হইল। বিজয়ী কোম্পানিকে প্রথমে ব্রিটিষ রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিতে হইল ও পরে তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিনাশ প্রাপ্ত হইল। যদি রোমীয়দের রাজ্য হইত ত তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে বার্ষিক ২০ কোটি টাকা আদায় করিয়া লইতেন—ব্রিটিষ রাজা নিজের জন্য এক পয়সাও গ্রহণ করেন না। প্রত্যুত ইংলণ্ডের নাবিকগণ ভারতবর্ষ রক্ষার জন্য বিনা বেতনে যে কর্ম্ম করে তাহা ধরিতে

গেলে তজ্জন্য ও অন্যান্য বিষয়ে ভারতবর্ষের উপর আমরা ন্যায়ত অনেক টাকার দাবী করিতে পারি সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষকে করদ রাজ্যরূপে গণ্য করা দূরে থাকুক আমরা উল্টা তাহাকে সাহায্য দানে সমুৎসুক। যদিও তাহার রাজস্বের সংখ্যা ৫০ কোটি পৌণ্ড, আর ধনীরা তাহাতে প্রায় কিছুই দেন না, তথাপি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সাধারণ নিজ কর্ত্তব্য সাধনে (দুর্ভিক্ষ মোচন) সাহায্য দিবার জন্য আমরা চাঁদা করিয়া টাকা উঠাইতে প্রস্তুত —আরো শুনা যাইতেছে শতকরা দুই এক টাকা সুদ বাঁচাইবার জন্য আমরা তাহার দুর্ভিক্ষ নিবারণ কার্য্যে টাকা ধার করিয়া উঠাইতে প্রস্তুত—আর ইংলণ্ডীয় করদাতা প্রজাগণ, যাহাদের উপর তাহাদের নিজের দরিদ্র-ভরণের ভার সমর্পিত, তাহাদের হইতে ভারতবর্ষকে সমুদায়ে ৫০ কোটি টাকা উপঢৌকন দেওয়া হয়, এরূপ প্রস্তাবও শ্রবণ করা যায়।

"ভারতবর্ষ হইতে লুটপাট মারপীট অন্যায় অত্যাচার সকল উঠিয়া গিয়াছে শুধু তাহা নয়, ভয় হইতেছে পাছে তাহার জন্য আমাদের অর্থ লুণ্ঠন আরম্ভ হয়। ভারতভূমি আমাদের কতই আদরের ধন—সোহাগের বস্তু—নাই পাইয়া নষ্ট শিশু তুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ যে চিরকালই আমাদের উপর তাহার নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে—কেবল তাহা নহে, সে আমাদের নিকট হইতে কত আদর কত যত্ন পায়, আর যে সকল উপনিবেশ আমাদের নিজের সৃষ্টি তাহাদের গতি কি হয়, তাহার প্রতি আমাদের ভ্রূক্ষেপও নাই।

"ভারতের উপর আমাদের ত এইরূপ স্নেহ-দৃষ্টি। ইহার উপর আমাদের যতটা অনুরাগ ও মমতা, ইহা হইতে তদুপযোগী লাভ উৎপন্ন হয় কিনা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে? এক এই বলা যাইতে পারে যে ভারতের সহিত আমাদের যেরূপ ব্যবহার তাহাতে পৃথিবী-শুদ্ধ লোকে আমাদের পরোপকার-ব্রত ও নিঃস্বার্থ ভাবের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইতেছে। আমরা এইক্ষণে ভারতের সঙ্গে যে ভদ্র ব্যবহার করিতেছি তাহাতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সকল দোষের প্রায়শ্চিত্ত যতদূর সাধ্য তাহা হইয়াছে। আমরা জগৎকে দেখাইতেছি যে অল্পসংখ্যক ইউরোপীয় কর্ত্তৃক কিরূপে কোটি কোটি প্রজাপুঞ্জের মধ্যে শান্তি সুনিয়ম সৌরাজ্য বিস্তার হইয়া তাহাদের অবস্থার সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছে—যাহা তাহাদের আপনাদের দ্বারা কখনই হইতে পারিত না ও আমাদের সাহায্য বিনা এক বৎসর কালও স্থায়ী হইত না। এই সুদৃশ্যটি আমরা পৃথিবীর সম্মুখে প্রকাশিত করিয়া আপনাদিগকে যথার্থ গৌরবান্বিত মনে করিতে পারি। কিন্তু একথা থাক্—ভারতবর্ষ হইতে আমাদের পুণ্য লাভের কথা হইতেছে না—আসল প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য এই, তাহা হইতে আমাদের বৈষয়িক লাভ কত দূর হইতেছে?

"এক এই লাভ অবশ্য স্বীকার করিতে

হইবে যে আমাদের মধ্যে অনেক গুণবান ও কর্ম্মিষ্ঠ লোক যাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র আমাদের দেশে অতি সঙ্কীর্ণ, তাহাদের জন্য ভারতবর্ষে অনেক গুলি উচ্চ অর্থকর যশস্কর পদ উন্মুক্ত রহিয়াছে। ইহা অপেক্ষাও অধিকতর লাভ এই যে, ভারতবর্ষীয় সিবিল সবিস সাধারণের জন্য মুক্ত হওয়াতে বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ উত্তেজনা লাভের এবং গুণ ও পরিশ্রমের পুরস্কার প্রদানের এক প্রকৃষ্ট উপায় যোজনা হইয়াছে। আমরা ভারতবর্ষের প্রশস্ত কার্য্যালয়ে প্রবেশ করিয়া যে সকল নিয়ম বন্ধন করিয়াছি তাহাতে আমাদের গুণবান্ বিদ্বান্ যুবকগণ যেমন তাহাদের উপযুক্ত কর্ম্মভূমি পাইতেছে সেই অনুসারে ভারতবর্ষীয়দেরও উপকার সংসাধিত হইতেছে।

"ভারতবর্ষীয় রাজত্বের সদ্ব্যয় ও শৃঙ্খলা বন্ধন আমাদের সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। লবণের উপর অযথোচিত কর ও শুল্ক আদায় সম্বন্ধে আর যে কতকগুলি দোষ ও অন্ধতা দৃষ্ট হয়, কালে তাহা বিলুপ্ত হইবে। যাহা হউক্, ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, বার্ত্তা শাস্ত্রের নিয়ম বহির্ভূত যে সকল শুল্ক ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজ্যেরাজস্ব-প্রণালীর কলঙ্ক স্বরূপ তাহা হইতে আমরা ভারতবর্ষকে মুক্ত রাখিয়াছি। মানবজাতির এমন বিস্তৃত জন-সংখ্যার মধ্যে যে আমরা শান্তি ও মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছি—যে সকল শক্তি পরস্পরের প্রতিঘাত ও বিনাশ সাধনে নিয়োজিত হইত তাহা যে পরিশ্রম ও বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিতে পারিয়াছি ইহাও বিশেষ প্রশংসার বিষয় বলিতে হইবে। প্রজার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য কি—প্রজাদের পরস্পর কিরূপ সদ্ভাবে চলা কর্ত্তব্য তাহার উচ্চ আদর্শ আমরা আর আর জাতির সম্মুখে ধারণ করিয়া জগতের কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইতেছি। ভারতরাজ্য হইতে আমাদের যাহা কিছু উপকার লাভ হইতেছে তাহার তালিকা এক প্রকার প্রদর্শিত হইল। আর অধিক কিছু ভাবিয়া পাওয়া যায় না। এখন অন্য দিকটা দেখা যাউক—এই সকল উপকার সাধনের জন্য আমাদের কতটা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে।

কোন কোন জ্ঞানবান বিচক্ষণ ব্যক্তির মত এই যে, ভারতবর্ষ অধিকারে আমাদের মহা কার্য্যদক্ষতা ও দূরদর্শিতা প্রকাশ পাইতেছে। তাহার উত্তর এই—যদি ইহা হইয়া থাকে ত তাহা আমাদের ভাগ্যের গুণে বুদ্ধিবলে নহে, কেন না ভারত-বিজয় ইংলণ্ডের মতামত-সাপেক্ষ ছিল না। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট ও প্রজাগণ, ভারত-বিজয়ে যাহাদের প্রকৃত ইন্টারেষ্ট, তাহাদের সে বিষয়ে কোন হস্ত ছিল না। পলাসীর যুদ্ধ হইতে একবার আমাদের রাজত্ব স্থাপিত হইবার পর, বিগ্রহের পর সন্ধি সন্ধির পর বিগ্রহে দেশীয় রাজ্য সকল ক্রমে আমাদের পদতলে বিদলিত হইল। আমরা প্রথম হইতে একেবারে হস্তক্ষেপ না করিতাম সে এক, কিন্তু কতক দূর অগ্রসর হইয়া এখন 'থামা যাক আর কাজ নাই'

এরূপ বলিবার আর আমাদের সামর্থ্য রহিল না। এখন তো আমাদের অবস্থা আরো ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে। এখন আর আমাদের পিছু হটিবার যো নাই। এই কোটি কোটি প্রজাপুঞ্জ যে রাজ্যের অধীন ছিল তাহা আমরা স্বার্থ-সাধন-উদ্দেশে বিনষ্ট করিয়া তাহাদের উপর রাজত্ব স্থাপন করিবার ভার লইয়াছি। ইহা নিশ্চয় যে এখন আর আমাদের মত পরিবর্ত্তনের উপায় নাই, আমরা স্বহস্তে দেশীয় রাজ্য উচ্ছিন্ন করিয়া এক্ষণে প্রজাদিগকে অরাজকতার রন্ধ্রকূপে পুনরায় নিক্ষেপ করিতে প্রস্তুত হইতে পারি না। বহু দূরস্থ ভবিষ্য কালেও কখন যে এমন সময় আসিবে যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন ভাবে স্বরাজ্য পরিচালনে সক্ষম হইবে তাহারও কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। ভারতবর্ষের সহিত আমাদের বিচ্ছেদ দুই কারণে হইতে পারে, হয় ভিতর হইতে বিদ্রোহোৎপত্তি—অথবা বাহির হইতে শত্রুর আক্রমণ। ভারতের সহিত আমাদের ভাগ্য এরূপ সম্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে যে ইচ্ছা করিলেও আমরা সে সম্বন্ধ ভগ্ন করিতে পারি না। ইহা আমাদের সামান্য বিপদ নহে। দূরদর্শী রাজা এমন কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না যাহাতে স্বীয় রাজ্যের ভাবী ভাগ্যের উপর নিজের অধিকার একেবারে তিরোহিত হয়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমরা এইরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষের রাজত্ব সম্বন্ধেও আমাদের ঘোরতর সঙ্কট উপস্থিত হইতে পারে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কথার উপর নির্ভর করিয়া কোটি কোটি মুদ্রা ধার দেওয়া হইয়াছে—পার্লমেণ্ট পর্য্যন্ত। এই ঋণের সঙ্গে জড়িত। মনে কর, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কোন কারণে এই ঋণের টাকা প্রদানে অসমর্থ হন। তখন যদি উত্তমর্ণগণ ব্রিটিষ ধনকোষের উপর দাবী করিতে প্রবৃত্ত হয় ত তাহা খণ্ডন করা আমাদের পক্ষে সহজ হইবে না। বলা যাইতে পারিবে যে পার্লমেণ্টের অধীনস্থ ব্রিটিষ রাজ্যের রাজমন্ত্রীগণ স্বয়ং এই টাকা ঋণ করিয়াছেন ও ঐ টাকা পরিশোধের জন্য রাণী নিজে কথা দিয়া দায়ী হইয়াছেন।

ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া—শুধু অধিকার করিয়া নয়, তথায় শান্তি ও সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া আমাদের এক লাভ এই হইয়াছে যে, সে দেশে আমাদের বাণিজ্য ব্যবসা নির্ব্বিঘ্নে চলিবার সুবিধা হইয়াছে। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের সহিত ইংলণ্ডের বাণিজ্য ব্যবসায় ঘটিত সম্বন্ধ—সেই সকল দেশে রাজ্যের সুব্যবস্থা শান্তি ও ধন সমৃদ্ধি স্থায়ী হইলে তাহাতে ইংলণ্ডের নিজের স্বার্থ সন্দেহ নাই। কিন্তু এই স্বার্থের পূর্ণ ফল লাভের জন্য ইহা আবশ্যক যে অন্যান্য স্থানে তাহারা যে মূল্যে যে প্রকার সামগ্রী পাইতে পারে আমরা তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সামগ্রী অল্প মূল্যে আনয়ন করি। কিন্তু ইহা সকল সময় হইয়া উঠে না। ভারতবর্ষে শ্রমের মূল্য অপেক্ষাকৃত সুলভ, এই জন্য এবং অন্যান্য কারণে ভারতবর্ষীয়গণ আমাদের ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া

উঠিতেছে। অতএব বাণিজ্য সম্বন্ধীয় লাভ অপ্রতিহত ও স্থায়ী লাভ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

এই সম্বন্ধে আর একটী গুরুতর বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। ভারতের উপর আমাদের যে অধিকার তা কিসের বলে? বাহির হইতে বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণের ভয় বিচার-যোগ্য কিন্তু তাহা দূরে থাকুক ইহা ত অপ্রকাশ নাই যে আমাদের রাজত্ব রক্ষাহেতু সেই উষ্ণদেশে প্রায় ৭০০০০ ব্রিটিষ সৈনা রাখিবার প্রয়োজন হইতেছে। আমরা দেশীয়দের সদ্ভাব রক্ষা ও প্রীতি আকর্ষণ করিবার জন্য যতই চেষ্টা করি না কেন তথাপি ব্রিটিষ সৈন্যের সাহায্য ব্যতীত আমাদের চলে না। আর কোন কালে যে তাহা ছাড়িয়া চলিবে তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। এই সকল সৈন্য রক্ষার জন্য যে ব্যয়ের আবশ্যক তাহা ভারতবর্ষীয় রাজস্ব হইতে নির্ব্বাহিত হয় সত্য তথাপি এই কারণে আমাদিগকে অল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। আমাদের রাজ্য সম্বন্ধীয় স্বাধীনতা এইরূপ যে, আমরা কোন প্রজাকে তাহার ইচ্ছা-বিরুদ্ধে সৈন্যদলে ভুক্ত করিতে পারি না। আমরা যে কেবল লোক-সংখ্যায় দরিদ্র তাহা নয় কিন্তু অপরাপর স্থলে অধিক বেতনে কর্ম্ম লাভের যেরূপ সুবিধা তাহাতে সৈন্য-সংখ্যা হ্রাস হইবার আর এক প্রধান কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। ভারতবর্ষ তাঁহার নিজের সন্তানগণকে ভক্ষণ করেন না বটে কিন্তু ইউরোপীয় রাজপুরুষদের উপর তাঁহার এরূপ কটাক্ষ যে ঐদেশের জলবায়ুর গুণে ইউরোপীয়দের যে ধ্বংস, তাহা অনেক ঘোর রক্তস্রাবী যুদ্ধজনিত নিপাতের সমতুল্য। ১৮৫৭ সালের সিপাই বিদ্রোহের ফল কি হইয়াছিল বিবেচনা কর। আমরা তৎপূর্ব্বে যে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলাম তাহাতে আমাদের সৈন্যসংখ্যা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। আমাদের ভারতবর্ষীয় সৈন্যদলও নানা কারণে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল ও সে ক্ষতি পূরণ না হইতে হইতেই ভারতবর্ষে এক মহা বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইল। কত কষ্টে কত সাহসী ও অনুরাগী ব্রিটিষ সৈন্যের অতুল বীর্য্য উদ্যম সাহস পরাক্রমে—কি ভয়ানক হত্যাকাণ্ডের পর তবে আমাদের রাজ্য প্রলয় দশা হইতে উদ্ধার পাইল। ইহা যেন কেহ মনে না করেন এইরূপ সঙ্কট চলিয়া গিয়াছে, আর আসিবে না। যদি ইংলণ্ড আর এক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন ত আমাদের সৈন্যাভাব তেমনিই উপলব্ধি হইবে—তেমনি বিপদ উপস্থিত হইবে। মনে কর সিপাই বিদ্রোহ আর এক বৎসর পূর্ব্বে সঙ্ঘটিত হইত অথবা ক্রাইমিয়ার যুদ্ধ আর এক বৎসর অধিক স্থায়ী হইত। তাহা হইলে কি হইত? তাহা হইলে রুসিয়ার রণক্ষেত্রে আমাদের আরো অধিক সৈন্য পাঠাইবার আবশ্যক হইত। আবার এদিকে ভারতবর্ষে আমাদের অল্প সংখ্যক প্রপীড়িত সৈন্য-দলের সাহায্যে লোক না পাইলে সিবিলিয়ন দলের ইংরাজগণ ও তাহাদের অসহায় স্ত্রী পুত্রদের সমূহ বিপদ উপস্থিত—এরূপ স্থলে কি

করা যাইত? উভয় পক্ষ রক্ষা করিতে কি আমরা কৃতকার্য্য হইতাম? তাহা না হইলে কোন্ পক্ষকে কাল-কবলে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইতাম?

"যে সকল লেখক ও বক্তা ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের রাজমুকুটের মহামূল্য মণি বলিয়া বর্ণনা করে তাহাদের বাক্যের সত্যতা বিষয়ে এখন আমরা বিবেচনা করিতে পারি। তাহাদের মতে ভারতবর্ষ গেলে ইউরোপীয় রাজ্য-মণ্ডলীতে ইংলণ্ডের প্রাধান্য বিনষ্ট হইবে। আমাদের মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি কখন আমাদিগের বিপদে পড়িতে হয় ত সে কেবল ভারতবর্ষেরই জন্য। আমরা অতীত ঘটনা হইতে যে শিক্ষা ও বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছি তাহা ইউরোপীয় জাতিদের সহিত ব্যবহারে কার্য্যে আসিতে পারে। আমরা আমাদের পরস্পরের ভাব বুঝিতে পারিয়াছি—আমাদের মতাভিমত উদ্দেশ্য অনেকটা সমান। কিন্তু ভারতবর্ষীয়দের মনোগত অভিপ্রায় বোধে আমরা কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি? এই রূপ শুনা যায় যে ভারতবর্ষীয় মুসলমানদের বিশ্বাস এই যে আমরা তুর্কির সুলতানের করদ আশ্রিত প্রজা। চর্বিযুক্ত কার্ট্রিজে যেমন সিপাহি বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়—পাগড়ীর আকার পরিবর্ত্তনে যেমন বেলোরে বিদ্রোহ সমুদ্ভূত হয়, কে বলিতে পারে কখন এইরূপ কোন সামান্য কারণে আমাদের ভারতবর্ষীয় রাজ্যে মহা হলুস্থূল বাধিয়া যাইবে?"

গ্রীস—

প্রাচীন ভারতের শিল্প।

এক সময়ে এই ভারতবর্ষে কি পর্য্যন্ত শিল্পোন্নতি হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত আমরা "প্রাচীন ভারতের শিল্প" এই শীর্ষক প্রস্তাব প্রচার করিয়া আসিতেছি।

পঞ্চম সংখ্যক ভারতীতে ব্যক্ত করিয়াছিলাম যে, যাহাতে বাস্তবিক শিল্প-সংযোগ আছে, তাহা প্রচার করিবার পূর্ব্বে আমরা ভারতে জ্যোতিঃ-শাস্ত্রের আবির্ভাব নির্ণয় করিয়া, পশ্চাৎ সে গুলি ব্যক্ত করিব। কোন কারণ বশত সে অধ্যবসায় হইতে আপাতত ক্ষান্ত হইলাম। তথাপি আমরা এস্থলে বলিয়া দিতেছি যে, যাহাকে আমরা অতি আধুনিক মনে করিয়া থাকি, সেই সিদ্ধান্ত শিরোমণি নামক গ্রন্থ খানির উপর দিয়া অনূন ৮০০ শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ইহাই যথেষ্ট, আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। চিন্তাশীল ভারতী-পাঠকগণ এই ৮০০ শত বৎসর পূর্ব্বের ভারতবর্ষ এবং ইয়ুরোপে মনোরথে গমন করিয়া দেখিবেন, তাহা হইলেই আমরা সন্তুষ্ট হইব, তাঁহারাও সন্তুষ্ট হইবেন।

৮০০ বৎসরের পূর্ব্বের ইয়ুরোপে যাইতে বলিতেছি কেনও তাহা'তন। কতকগুলি লোকের এমন এক প্রকার স্বভাব আছে, যাহা চিন্তাশীলদিগের নিকট কূপমণ্ডূকতা দোষে আঘাত বলিয়া প্রতীত হয়। এই শ্রেণীর লোকেরা মনে করেন যে, ইংরাজ-জগৎ একটি নূতন জগৎ, ইংরাজ-সৃষ্টি নূতন সৃষ্টি। "আমাদের অমুক বস্তু ছিল" বলিলে যদি তাহা কোন অংশে ইংরাজ সৃষ্টির সদৃশ হয় তবেই তাঁহারা বলিয়া ফেলেন, "ইহা কৃত্রিম—আধুনিক ইংরাজ-দিগের দেখিয়া কোন ধূর্ত্ত ভট্টাচার্য্য বচন গড়িয়া দিয়াছে।" কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা জানেন না কাল অনুসারে পুরাতন বস্তুরও 'নূতন' সংজ্ঞা হইয়া থাকে। আমাদের সময়েও কোন বস্তু যদি দীর্ঘকাল লুপ্তাবস্থায় থাকে, আর তাহা কিম্বা তাহার সদৃশ বস্তু যদি আমাদের নিম্নতন বংশ-পুরুষের সময়ে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহা তাহারা নূতন বলিয়া স্থির করিবে সংশয় নাই। সূর্য্যসিদ্ধান্ত-রচয়িতা নানা-বিধ যন্ত্রের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই সকল যন্ত্র সাক্ষাৎ সূর্য্যের রচিত, কিন্তু ইহা সময়ে সময়ে লোপ হয়, আবার কোন বুদ্ধিমান্ দ্বারা তাহাই প্রস্তুত হয়। বস্তু এক, কিন্তু প্রত্যেক আবির্ভাবে কিছু কিছু বা কোন এক অংশে প্রভেদ থাকে মাত্র।

"যুগে যুগে সমুচ্ছিন্না রচনেয়ং বিবস্বতঃ।
প্রসাদাৎ কস্যচিদ্ভূয়ঃ প্রাদুর্ভবতি কামতঃ।"
১৩,১৮, সূ।

তথাপি আমরা বলিতেছি যে, যে যে স্থানে আধুনিকত্ব শঙ্কার সম্ভাবনা, সেই সেই স্থানের মূল এবং সেই সেই গ্রন্থের নামাদি প্রদান করিব, যাঁহাদের ইচ্ছা হয়, দেখিয়া লইতে পারিবেন।

কাল-সাধন যন্ত্র ত্রিবিধ। অবহ ও স্বয়ংবহ এবং ঘটী। অবহ যন্ত্র কি? লিখন-ভঙ্গীতে জানা যায় যে, তাহা ছায়া-সাধক যন্ত্র। স্বয়ংবহ যন্ত্র সেরূপ নহে, তাহার প্রক্রিয়া ভিন্ন। এ সমস্তই আমরা প্রদর্শন করিব, কিন্তু এবিষয়ে ভারতী-পাঠকগণের ধৈর্য্যের আশা করি।

এই 'অবহ' জাতীয় যন্ত্র অনেক আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থকার ৬টি এবং সিদ্ধান্ত শিরোমণি ৫টি যন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"কালসংসাধনার্থায় তথা যন্ত্রাণি সাধয়েৎ।"
১৩,১৯।

"শঙ্কু র্যষ্টি র্ধনুশ্চক্রে ছায়াযন্ত্রৈরণেকধা।
গুরূপদেশাদ্বিজ্ঞেয়ং কালজ্ঞানমতন্দ্রিতৈঃ॥"
১৩,২০।

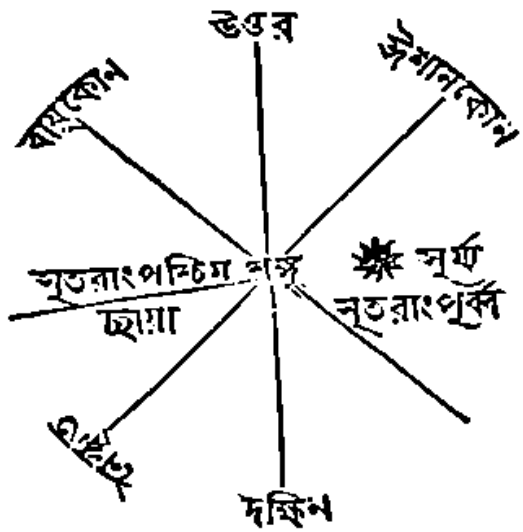
শঙ্কু, যষ্টি, ধনু ও চক্র প্রভৃতি ছায়া-সাধক যন্ত্র অনেক প্রকার আছে। সে সকল জ্ঞান গুরু-উপদেশ-সাপেক্ষ।

শঙ্কু যন্ত্র।—এই শঙ্কুযন্ত্র যে কেবল কাল জ্ঞানেরই সাধক এমন নহে; ইহার দ্বারা দিক্ ও দেশাদির জ্ঞানও হইয়া থাকে। সিদ্ধান্ত-শিরোমণি গ্রন্থে ভাস্করাচার্য্য বলি-য়াছেন যে, "জ্ঞানং দিগ্‌দেশকালানাম্।" দিক্ নির্ণয়ও ইহার দ্বারা হয়। ইহার আ-কার কিরূপ? তাহা নিম্ন লিখিত বাক্যের দ্বারা বুঝিয়া লও। ইহার গণিত বিচার

এবং সংস্থাপন-নির্ণয় চক্ষে না দেখিলে বুঝা যায় না, বুঝানও যায় না। কাশীর মান-মন্দিরে এখন কিছু নাই, কিন্তু যখন ছিল, তখন যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা অধ্যয়ন না করিলেও গুরুর নিকট শিক্ষা না করিলেও বুঝিতে পারিতেন।

"সমতলমস্তকপরিধিভ্রমসিদ্ধো দন্তি-দন্তজঃ শঙ্কুঃ।

তচ্ছায়াতঃ প্রোক্তং জ্ঞানং দিগ্দেশ-কালানাম্॥" সি, তা।



মস্তক ও পরিধি সমতল, কিংবা তলভাগ, মস্তক ও পরিধি সমান, হস্তিদন্তনির্ম্মিত শলাকাকে ভ্রম-সিদ্ধ অর্থাৎ ঘুরিবার যোগ্য করিয়া লইয়া তাহার ছায়ার দ্বারা কাল-জ্ঞানের বিধি বলা হইয়াছে এবং ইহার দ্বারা দিক্ নির্ণয়ের ব্যবস্থাও উক্ত হইয়াছে।

ইহার দ্বারা এই যন্ত্রের সমস্ত কৌশল অবগত হওয়া যায় না। কিন্তু ইহা বুঝা যাইতেছে যে, এই শলাকার দ্বারা যে কৌশলে বা যে প্রক্রিয়ায় কাল-নির্ণয় হয়, দিক্-নির্ণয় কালে তাহার অন্য প্রক্রিয়া বা অন্যবিধ কৌশল আছে। তাহা কি? আমরা জানি না। জ্যোতিষজ্ঞ পণ্ডিতেরাই তাহা জ্ঞাত আছেন।

প্রক্রিয়া—"যৈর্যত্র দৃশ্যতে ভানুঃ স তেষামুদয়ঃ স্মৃতঃ।" যেখান হইতে যাহারা সূর্য্যকে প্রথম দেখে, তাহাই তাহাদের নিকট সূর্য্যোদয় বলিয়া প্রথিত এবং তাহাই তাহাদের পূর্ব্ব দিক্। সূর্য্যের উদয়াবধি অস্ত পর্য্যন্ত বস্তু মাত্রেরই ছায়া থাকে এবং তাহা সূর্য্যের বিপরীত দিকেই পতিত হয়। এই নিয়মানুসারে উদয়-কালের ছায়া পশ্চিমবাহিনী হয় এবং সূর্য্যের আবর্ত্তনের সঙ্গে ছায়াও আবর্ত্তিত হইতে থাকে। সেই কারণে সূর্য্য পশ্চিমে গমন করিলে ছায়া সকল পূর্ব্ববাহিনী হইয়া দাঁড়ায়। ইত্যাকারের ছায়া-পরিবর্ত্তন কখন দক্ষিণাবর্ত্ত ক্রমে, কখন বা বামাবর্ত্ত ক্রমে

হইয়া থাকে এবং তাহা সূর্য্যের দক্ষিণায়ন উত্তরায়ণ অনুসারেই হইয়া থাকে।

এখন মনে কর, যদি আমাদের কখন দিগ্‌ভ্রম উপস্থিত হয়, আর আমরা 'শঙ্কুযন্ত্র' সঙ্গে রাখি, তাহা হইলে আমরা দিঙ্‌নির্ণয় করিয়া লইতে পারি কি না।

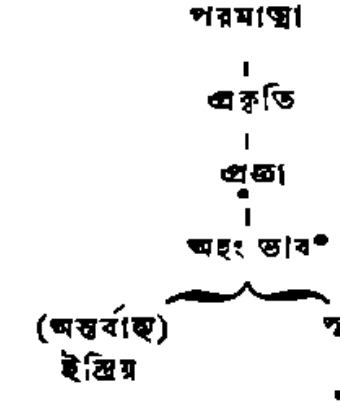
উল্লিখিত "শঙ্কুযন্ত্রের" চিত্র দেওয়া হইল। এতদ্দ্বারা দিঙ্‌নির্ণয় এবং বেলা-নির্ণয় করা যাইতে পারে (যদি মেঘ না থাকে)। বেলা-নির্ণয়-ব্যবস্থা ও তাহার সঙ্কেতাদি আগামী কোন পত্রিকায় প্রকাশ করা যাইবেক।

কালনির্ণায়ক "অবহযন্ত্র" "স্বয়ংবহযন্ত্র" ও "ঘটীযন্ত্র" প্রভৃতির সমুদায় বিবরণ ক্রমে বিবৃত করিব।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

অনুলোম পদ্ধতির সোপান-পরম্পরা যাহা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা এই ;—



উপরি-উক্ত সোপান-পরম্পরার মধ্যমটি অহংভাব; অহংভাবের উর্দ্ধে পরমাত্মা, প্রকৃতি, প্রজ্ঞা, এবং নিম্নে অন্তরিন্দ্রিয়, বহিরিন্দ্রিয়, ভূত-সর্গ।

পরমাত্মা।—

সাংখ্য প্রকৃতিকে প্রথম বলিয়া ধরিয়াছেন, আমরা পরমাত্মাকে প্রথম বলিয়া ধরিতেছি। যদি এরূপ মনে কর যে পরমাত্মা পরিপূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ—আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত, এমতস্থলে জড় জগৎ এবং অপূর্ণ জীবজন্তু সৃষ্টি করিয়া কি আর তাঁহার ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে। ইহার উত্তর এই যে, যেখানে জ্ঞান সেইখানে আপনাকে ভালবাসা, এবং সেইখানেই আপনার আবির্ভাবের ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকিবেই থাকিবে। যে জ্ঞান আপনাকে জানে, সে জ্ঞান আপ-

*অহংভাব শব্দটি দ্বারা দার্শনিক অহঙ্কার শব্দের প্রকৃত অর্থটি খুলিয়া দেওয়া হইল। চলিত ভাষায় অহঙ্কার বলিবামাত্র গর্ব্ব বুঝায়, অহংকার শব্দের দার্শনিক অর্থ "আমি কর্ত্তা" এই রূপ একটা মনের ভাব; অর্থাবস্থানানুরোধে অহংভাব শব্দ নূতন প্রয়োগ করিলাম।

নাকে ভালও বাসে, আর আপনার আবির্ভাব ইচ্ছাও করে। জ্ঞান হইতে প্রেম এবং ইচ্ছাকে হরণ করিলে জ্ঞানের প্রাণহরণ করা হয়। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানেতেই আমরা দেখিতে পাই যে, প্রেম এবং তাহার আবির্ভাবের ইচ্ছা আছে বলিয়াই তাহা জীবন্ত আছে। ভিতরের বিশুদ্ধ-জ্ঞানকে যত আমরা বাহিরের কার্য্যে আনয়ন করিতে পারি, ততই আমরা জাগ্রত জীবন্ত আত্মা নামের যোগ্য হই, মনুষ্য নামের যোগ্য হই। পরমাত্মার জ্ঞান কি আমাদের জ্ঞান অপেক্ষা নির্জ্জীব যে, তাহাতে প্রেম থাকিবে না, আবির্ভাবের ইচ্ছা থাকিবে না? এ অতি অসঙ্গত কথা! সকল আপেক্ষিক সত্যের মূলে যে এক নিরালম্ব সত্য পরমাত্মা আছেন, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি, আবার তাহা পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

প্রকৃতি।—

প্রকৃতি কি? না প্র-কৃতি, প্রকৃষ্ট কার্য্য, জগৎকার্য্য। আবার, যে শক্তি দ্বারা জগৎকার্য্য নির্ব্বাহিত হয় তাহাও প্রকৃতি-শব্দে উক্ত হইয়া থাকে; এক কথায় এই যে, আবহমান কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলাই প্রকৃতি। কার্য্যোৎপত্তির মূলে কার্য্যোৎপাদিকা-শক্তিরূপে প্রকৃতি বর্ত্তমান এবং উৎপদ্যমান কার্য্যেতে সেই শক্তির অভিব্যক্তিরূপে প্রকৃতি বর্ত্তমান। প্রকৃতি স্বতঃ কিছুই নহে—তাহা পরমাত্মার শক্তি-স্বরূপা। বস্তু যাহা, তাহা যাহা আছে তাহাই আছে, তাহার পরিবর্ত্তন নাই শক্তি যাহা, তাহা অব্যক্ত হইতে ক্রমশঃ ব্যক্তে পরিণত হয়। ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এই দুই পক্ষে ভর দিয়া শক্তি নিয়তই কার্য্যে পরিণত হইতে থাকে। উত্তাপ-শক্তি কাহাকে বলে? উত্তাপ পূর্ব্বে অব্যক্ত ছিল, এখন ব্যক্ত হইল; উত্তাপের ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এই যে দুই অবস্থা, উভয়ের সন্ধিস্থলে কোন না কোন শক্তি অবশ্যই বিদ্যমান আছে; কেন না, অব্যক্ত আছে অব্যক্তই থাকুক—তাহা না থাকে কেন? ব্যক্ত হয় কেন? শক্তির উত্তেজনাতেই না? উত্তাপের ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এ দুই অবস্থার সন্ধিস্থলেই উত্তাপ-শক্তি লক্ষিত হইয়া থাকে। এ যেমন দেখা গেল, এমনি জগতের অব্যক্ত অবস্থা, এবং ব্যক্ত অবস্থা, উভয়ের মধ্যস্থলে মহতী এক ঐশী শক্তি অবশ্যই বিদ্যমান আছে; তাহাই প্রকৃতি শব্দের বাচ্য। সাংখ্য বলেন, ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি; আবার ইহাও বলেন যে, প্রকৃতি নিয়তই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা হইতে বৈষম্যাবস্থায় পরিণত হইতেছে। উভয়ই-সত্য,—এজন্য উক্ত সাম্যাবস্থা এবং বৈষম্যাবস্থা উভয়ের মধ্যস্থলে প্রকৃতি, এরূপ বলিলেও হানি নাই। কারণরূপী প্রকৃতি অব্যক্ত, কার্য্যরূপী প্রকৃতি ব্যক্ত, কিন্তু উভয়ই প্রকৃতি এটি যেন মনে থাকে। এই কাগজের এ পৃষ্ঠা ব্যক্ত, ও পৃষ্ঠা অব্যক্ত, কিন্তু কাগজ একই—এমনি প্রকৃতি একদিকে ব্যক্ত, একদিকে অব্যক্ত, কিন্তু পদার্থ একই। চক্ষুরুন্মীলন করিলাম, আর, একটা অট্টালিকা নয়ন সমক্ষে ব্যক্ত হইল; চক্ষু নিমীলন করিলাম আর অমনি

তাহা অব্যক্ত হইয়া গেল;—অব্যক্ত হউক কিন্তু যে শক্তি দ্বারা তাহা ইতিপূর্ব্বে ব্যক্ত হইয়াছিল তাহা যেমন তেমনি আছে;—কেবল চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগের অভাবে তাহার কার্য্য স্থগিত রহিয়াছে,—এই মাত্র; চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ ঘটিবামাত্রেই আবার তাহার কার্য্য পরিস্ফুট হইবে। নেত্রপথবর্ত্তী কার্য্যরূপী অট্টালিকা এবং নেত্র-বহির্ভূত শক্তিরূপী অট্টালিকা—একই অট্টালিকা। এমনি, জগৎ-কার্য্যের অব্যক্ত শক্তি, এবং ব্যক্ত আবির্ভাব উভয়ই একই প্রকৃতি।

প্রকৃতিকে পরমাত্মা হইতে বিযুক্ত করিয়া দেখিলে তাহা মূলে একটা অন্ধ শক্তি এবং ফলে—কোথাও কিছু নাই—একটা বৃহৎ আড়ম্বর, এ ভিন্ন আর যে কি তাহা বুঝা যায় না। প্রকৃতি পরমাত্মার ঐশী শক্তি, তাঁহার ইচ্ছাতেই বিচেষ্টিত হইতেছে,—প্রকৃতিকে এইরূপ চক্ষে দেখিলেই প্রকৃতির ভিতরকার ভাবরত্ন-সকল আমাদের নিকট অনাবৃত হয়।

পরমাত্মার প্রতি প্রগাঢ় নির্ভরের ভাবই প্রকৃতির সর্ব্বস্ব। পরমাত্মার আশ্রয়-প্রভাবে প্রকৃতি অকিঞ্চন হইয়াও সকল ঐশ্বর্য্যের আকর-স্বরূপা, অন্ন-স্বরূপা, প্রাণ-স্বরূপা, ধ্যান-স্বরূপা, বিদ্যা-স্বরূপা, আনন্দ-স্বরূপা সকলই।

আদিতে, প্রকৃতি সত্ত্ব রজ এবং তমোগুণের সাম্যাবস্থা; কিন্তু পরিণামে সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাব প্রসব করিবে সেই দিকেই তাহার চেষ্টা, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা সেই চেষ্টার উত্তেজক। পরমাত্মার সদৃশাবির্ভাব যে সত্ত্বগুণ, তাহা প্রকৃতির গর্ভে পরিপোষিত হইয়া, পরিশেষে প্রজ্ঞারূপে মনুষ্য মনুষ্যে অভিব্যক্তি লাভ করিবে সৃষ্টির এই একটি প্রধান উদ্দেশ্য। প্রকৃতির সত্ত্বগুণ-প্রধান অংশটিকেই প্রজ্ঞা কহি। সন্তান যতক্ষণ মাতার গর্ভে থাকে ততক্ষণ তাহা মাতার অংশ বই আর কি? ভূমিষ্ঠ হইলে পর—তবে তাহা একটি স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি (ব্যক্তি) বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ইত্যাকারে,—প্রজ্ঞা প্রথমে প্রকৃতির সারাংশ—পরে প্রকৃতির অভিব্যক্তি—বলিয়া অবধারিতব্য।

পরমাত্মার প্রগাঢ় প্রেমপূর্ণ মঙ্গল ইচ্ছা প্রকৃতির উপর এমনি স্থির ভাবে পড়িয়া আছে যে, ক্রমিকই তাহা অভিব্যক্তি হইতে অভিব্যক্তি লাভ করিতেছে, নিয়তই তাহার শ্রী সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতেছে, ক্রমশই তাহার মধ্য হইতে প্রজ্ঞা প্রস্ফুটিত হইয়া উন্নতি-সোপানে অগ্রসর হইতেছে।

প্রজ্ঞা।—

প্রকৃতির মূলে ত্রিগুণাতীত অনন্ত জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মা; প্রকৃতির অভ্যন্তরে তাঁহার ত্রিগুণাত্মক প্রতিচ্ছবি, প্রতিনিধি, আবির্ভাব, অথবা অনুপ্রকাশ—প্রজ্ঞা। ছবির সম্বন্ধে যেমন প্রতিচ্ছবি, ধ্বনির সম্বন্ধে যেমন প্রতিধ্বনি, পরমাত্মার সম্বন্ধে সেইরূপ প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞাতে পরমাত্মাতে এরূপ বিভিন্নতা সত্ত্বেও যে, আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি প্রজ্ঞা ভাবস্বরূপ আর অহংভাব তাহার আবির্ভাব স্বরূপ—অযথা বলি নাই; জীবের অহংভাবের সম্বন্ধেই প্রজ্ঞা ভাবস্বরূপ, পর-

মাত্মার সম্বন্ধে আবির্ভাব মাত্র; অহংভাবও একদিকে যেমন আবির্ভাব-স্বরূপ, আর এক দিকে তেমনি ভাব-স্বরূপ,—প্রজ্ঞার সম্বন্ধে আবির্ভাব স্বরূপ, ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধে ভাব-স্বরূপ। অতএব অহংভাবের সম্বন্ধে প্রজ্ঞাকে আমরা ভাবস্বরূপ বলিয়াছি বলিয়া এমন যেন কেহ না ভাবেন যে আমরা প্রজ্ঞাকে সাক্ষাৎ পরমাত্মা বলিয়াছি। আমাদের প্রজ্ঞাতে পরমাত্মার আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়া ইহাও বলিয়াছি যে, পরমাত্মা প্রজ্ঞারূপে আমাদের আত্মাতে বিরাজমান আছেন;—এস্থলেও প্রজ্ঞাকে স্বয়ং পরমাত্মা জ্ঞান করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। সংস্কৃত একটি প্রবাদ আছে "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ", আপনিই পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে, ইহাতে এইমাত্র বুঝায় যে পুত্র আপনার সদৃশ-আবির্ভাব; তেমনি "প্রজ্ঞা রূপে পরমাত্মা আত্মাতে বিরাজমান", ইহার অর্থ প্রজ্ঞা পরমাত্মার সদৃশ-আবির্ভাব, এই পর্য্যন্ত। প্রজ্ঞা-সম্বন্ধে আর একটি কথা এই বলিয়াছি,—পরমাত্মা প্রজ্ঞার জ্ঞাতৃপক্ষ। প্রজ্ঞা-শব্দে যদি আমরা আমাদের নিজের প্রজ্ঞাটুকুই বুঝি, তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে আমরা নিজেই তাহার জ্ঞাতৃপক্ষ। কিন্তু কেবল আমাদের নিজের কেন, যত জীবের যত প্রজ্ঞা আছে, সকলই প্রজ্ঞা-নামের যোগ্য; সকল প্রজ্ঞার সমষ্টি স্বরূপ এক যে সেই সার্ব্বলৌকিক প্রজ্ঞা তাহার একমাত্র জ্ঞাতা কেবল পরমাত্মা। সার্ব্বলৌকিক প্রজ্ঞা সমস্ত প্রকৃতির চক্ষুরুন্মীলন-স্বরূপ; তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছি যে, তাহার জ্ঞাতৃপক্ষ পরমাত্মা। আমাদের প্রতিজনের অহংভাব সেই সার্ব্বলৌকিক প্রজ্ঞার এক একটি শাখা বই নয়; এই যে শাখা-প্রজ্ঞা ইহারি জ্ঞাতৃপক্ষ আমরা আপনারা। অহংভাব সেই শাখা-প্রজ্ঞার নামান্তর মাত্র।

প্রকৃতির অভ্যন্তরে সত্ত্ব-গুণের প্রাদুর্ভাবই প্রজ্ঞা; কিন্তু তাহাতেও রজস্তমোগুণের সহকারিতা চাই। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, তিন গুণের সম্মিশ্র ভিন্ন পরিমিত সৃষ্টবস্তু সম্ভবে না। সাংখ্যদর্শন ত্রিগুণাত্মক বস্তুর সহিত প্রদীপের উপমা দিয়াছেন। তিনি বলেন "যথা প্রদীপঃ পরস্পরবিরুদ্ধতৈলাগ্নিবর্ত্তিসংযোগাদর্থপ্রকাশং জনয়তি এবং সত্ত্বরজস্তমাংসি পরস্পরবিরুদ্ধান্যর্থং নিষ্পাদয়ন্তি।" 'প্রদীপের তৈল অগ্নি এবং বর্ত্তিকা যেমন পরস্পর-বিরুদ্ধ অথচ সংযোগ দ্বারা বস্তু-প্রকাশ উৎপাদন করে, এই রূপ সত্ত্ব রজস্তমোগুণ পরস্পর-বিরুদ্ধ অথচ সমবেত হইয়া প্রয়োজনীয় অর্থ সাধন করে।' সত্ত্বগুণের পক্ষে রজস্তমোগুণের একেবারে সম্পর্করহিত হওয়াও যা, আর তিরোহিত হওয়াও তাই; ইহার কারণ এই যে বিভিন্ন শক্তির পরস্পর বাধ্যবাধকতা ব্যতীত পরিমিত কিছুরই প্রকাশ সম্ভবে না। পরমাত্মার পূর্ণ-প্রকাশ তাঁহাতেই কেবল সম্ভবে; জগতে তাঁহার ক্রমশঃ প্রকাশ্য আবির্ভাবই কেবল সম্ভবে। রজস্তমোগুণের উপরে সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাবই সেই ক্রমশঃ প্রকাশ্য আবির্ভাব। অগ্নি-শিখার উৎপত্তিই যেমন প্রদীপের লক্ষ্য, তৈল এবং বর্ত্তিকা তাহার উপলক্ষ্য মাত্র; সেইরূপ সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাবই

সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য, রজস্তমোগুণের সাহচর্য্য তাহার কেবল উপলক্ষ্য মাত্র। রজস্তমোগুণের ঘাত-প্রতিঘাত ভিন্ন সত্ত্বগুণের প্রকাশ সম্ভবে না ইহারই জন্য ও-দুটির প্রয়োজন। দীপ বলিবা-মাত্র আমাদের লক্ষ্য দীপশিখার প্রতিই সর্ব্বাগ্রে ধাবিত হয়, তাহার যে সঙ্গী দুটি—তৈল এবং বর্ত্তিকা, উভয়ের কাহাকেও মনে হয় না; অতএব প্রজ্ঞা বলিবামাত্র পরমাত্মার প্রতিচ্ছবি যে সত্ত্বগুণ তাহারই প্রতি আমাদের চক্ষু পড়িবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? সত্ত্বগুণ শুদ্ধ যে কেবল প্রকাশ-ধর্ম্মী তাহা নহে তদ্ব্যতীত তাহা আনন্দ ধর্ম্মীও বটে, সদিচ্ছা-ধর্ম্মীও বটে, সকল শাস্ত্রেরই এইরূপ অভিপ্রায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জ্ঞান হইতে প্রেম এবং ইচ্ছাকে হরণ করিলে তাহার প্রাণ হরণ করা হয়। পুনর্ব্বার বলিতেছি যে, যে খানে যে কোন জ্ঞানের কথা উল্লেখ করিয়াছি বা করিব, সেইখানেই তাহার সহিত প্রেম এবং সদিচ্ছা পরিমাণ-বিশেষে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। অতএব ইহা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে যে, সুপরিস্ফুট প্রজ্ঞা প্রেমপূর্ণ এবং সদিচ্ছাপূর্ণ।

অহংভাব।—

জীবের ত্রিগুণাত্মক পরিমিত অহংভাবকে লক্ষ্য করিয়াই অহংভাব এই শব্দ ব্যবহার করা যাইতেছে। পরমাত্মার ত্রিগুণাতীত অচিন্ত্য অনন্ত অহংভাব আমাদের বুদ্ধির অগোচর সুতরাং বচনের অতীত। যথা-সময়ে যথা-নিয়মে মনুষ্যে মনুষ্যে অভিব্যক্তি লাভ করিবে এমন যে একটি বীজ প্রকৃতি আপনার গর্ভে ধারণ করিতেছেন, তাহাই প্রজ্ঞা; এবং সেই প্রজ্ঞা-বীজের শস্য অভিব্যক্তিই অহংভাব,—এ জন্য অহংভাব ব্যক্তি শব্দের বাচ্য। সাংখ্যদর্শন জীবাত্মাকে অহংভাব হইতে ভিন্ন স্বতন্ত্র একটি তত্ত্ব বলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু আমরা অহংভাবকেই জীবাত্মা বলি; সাংখ্যদর্শন জীবাত্মাকে ত্রিগুণাতীত বলিয়াছেন, আমরা পরমাত্মাকেই ত্রিগুণাতীত বলি। আমরা যেখানে পরমাত্মা বলিতেছি, সাংখ্যদর্শন সেই খানে অল্প কিঞ্চিৎ হাতে রাখিয়া জীবাত্মা বলিতেছেন, এই জন্য আমরা সাংখ্যের মতে সম্পূর্ণ মত দিতে পারি না।

বৃক্ষের বীজকে মনে কর যেন সত্ত্বগুণ, জল বায়ুকে মনে কর যেন রজোগুণ, এবং মৃত্তিকাকে মনে কর যেন তমোগুণ। বীজ প্রথমে মৃত্তিকা এবং জলের সহিত মিশিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়; মনে কর যেন, তাহাই সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা। কিয়ৎকাল পরে বৃক্ষ যখন উৎপন্ন হয়, তখন তাহাতে বীজেরও অংশ আছে, মৃত্তিকারও অংশ আছে, জল বায়ুরও অংশ আছে ইহা নিঃসংশয়; তাহার পর বৃক্ষের যখন চরম অভিব্যক্তি হয়, তখন উক্ত তিন অংশই সমবেত হইয়া ভবিষ্যৎ বীজাকারে কিনা শস্যাকারে পরিণত হয়। প্রকৃতির মধ্যে পরমাত্মার অনুপ্রকাশ যে বীজরূপী সত্ত্বগুণ তাহাই প্রজ্ঞা; সেই প্রজ্ঞার শস্যরূপী অভিব্যক্তিই অহংভাব।

এক বীজ যেমন নানা শস্যে পরিণত

হয়; সেই রূপ এক প্রজ্ঞা নানা অহংভাবে পরিণত হয়। এজন্য জনে জনে অন্যান্য নানা প্রকার প্রভেদ সত্ত্বেও, সকলেই যে এক প্রজ্ঞা-ছাঁচে গঠিত, ইহার অন্যথা দেখা যায় না।

জীবাত্মা যদিও অনেক কিন্তু সকলের মূল স্থান—প্রকৃতির অভ্যন্তরে (ঐশী শক্তির অভ্যন্তরে) একীভূত রহিয়াছে; সকল জীবাত্মার মধ্যে মূলের এই যে একাত্মভাব ইহা পরমাত্মারই প্রতিচ্ছবি—ইহাই মহান্ আদর্শ—ইহাই প্রজ্ঞা। অপিচ ত্রিকালজ্ঞ পরমাত্মার নিকট অনন্ত ভবিষ্যৎ কাল একই বর্ত্তমান কাল। এজন্য প্রকৃতির মধ্য হইতে, সকল জীবাত্মার সমষ্টি স্বরূপ যে, এক পূর্ণ-প্রজ্ঞ মহান্ আদর্শ অনন্ত ভবিষ্যৎ কালে উদ্ভাসিত হইবে, পরমাত্মার নিকট তাহা পূর্ব্ব হইতেই উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। সেই মহান্ আদর্শকে চক্ষে রাখিয়া চলা সকলেরই কর্ত্তব্য; কিন্তু ইহা যেন মনে থাকে যে, কোন জীবাত্মাই পরিমিত কালের মধ্যে সে আদর্শের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারিবেন না; তবে যদি কল্পনাতেও এরূপ কদাচিৎ সম্ভবে যে, অনন্ত ভবিষ্যৎ কাল কোন সময়ে বর্ত্তমান হইয়াছে, তবেই বলা যাইতে পারে যে, সেই সময়ে সকল জীবাত্মা একাত্মা হইয়া সেই মহান্ আদর্শের স্থলাভিষিক্ত হইবে। কিন্তু বাস্তবিক এই যে, ত্রিকালাতীত পরমাত্মার ত্রিকালজ্ঞ দৃষ্টিতেই সৃষ্টির সেই চরম আদর্শ বর্ত্তমান রহিয়াছে,—এবং তিনি স্বয়ং সেই আদর্শের স্থলাভিষিক্ত হইয়া প্রকৃতির অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন, কোন সৃষ্ট জীব সে মহান্ আদর্শে পৌঁছিতে পারে না। পরমাত্মা প্রকৃতির আদ্যন্ত অন্তর্বাহ্য সমস্ত ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন।

এতক্ষণ যে বিষয়ের মীমাংসা করিলাম, তাহার তাৎপর্য্য কি—উদ্দেশ্য কি—ফল কি—ইহা জানিবার জন্য অনেকে উৎসুক হইতে পারেন। ফল নিরপেক্ষ হইয়া সত্যের আলোচনা করা কতক দূর পর্য্যন্তই শোভা পায়—শুধু শোভা পায় কেন—নিতান্তই আবশ্যক। কিন্তু তাহার পরক্ষণে এমনি একটি সময় উপস্থিত হয় যে, আর ফলের প্রতি উদাসীন থাকিলে চলে না। সত্যের অবয়বগুলিকে পরস্পর বিযুক্ত করত এক-একটি করিয়া ক্রমান্বয়ে আলোচনা করা যে সময়ে আবশ্যক, সে সময়ে ফল জিজ্ঞাসা করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। কিন্তু যখন সত্যের অবয়ব-গুলি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তখন একটু থামিয়া দাঁড়াইয়া দেখা উচিত যে, বিভিন্ন অবয়বগুলির আদ্যোপান্ত সকল কুড়াইয়া কি পাওয়া যায়—অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি জোড়া দিলে ফলে কি দাঁড়ায়;—ফল কি—তাৎপর্য্য কি—উদ্দেশ্য কি—এ সকল প্রশ্ন তখনই কেবল শোভা পায়; তাহার পূর্ব্বে তাহার প্রসঙ্গও মুখে আনিতে নাই।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, সমস্ত একত্র করিলে ফলে এই রূপ দাঁড়ায়;—

পরমাত্মার মঙ্গল ইচ্ছা, অথবা শুভ আশীর্ব্বাদ, প্রকৃতির মধ্য দিয়া সমুদায় জীবাত্মার সঙ্গম স্থলে (জ্ঞান নদীর সাগর-

সঙ্গম-স্বরূপ, মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ-স্বরূপ) প্রজ্ঞাতে, চির প্রবাহিত রহিয়াছে। তথা হইতে, সমস্ত জগতের প্রতি ব্যক্তিতে, প্রতি অহংভাবেতে, প্রবাহিত হইতেছে। কোন অবতারাভিমানী ব্যক্তি এমন মনে করিতে পারেন যে, ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা কেবল আমাতেই কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে, কিন্তু তাহা নিতান্ত অত্যুক্তি তাহাতে আর সংশয় নাই। বাস্তব এই যে, তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা এক জন বা দুই জনেতে সংকুচিত নাই,—প্রত্যুত সকল জীবাত্মার সঙ্গম-স্থলে কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে; সকল জগতের যেখানে ভ্রাতৃভাব সেই খানেই পুঞ্জীভূত রহিয়াছে। আমরা অহংকারের বিপরীত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক প্রজ্ঞা দ্বারে উপনীত হইলে তবেই আমরা তাঁহার সেই আশীর্ব্বাদে পরিপ্লুত হই. রোগ শোক মোহ হইতে নিষ্কৃতি পাই, পরম পুরুষার্থ লাভ করি।

প্রজ্ঞার নিম্নে অহংভাব, প্রজ্ঞার উর্দ্ধে প্রকৃতি (ঐশী শক্তি), এবং পরমাত্মা। ইহার তাৎপর্য্য এখন আর অপ্রকাশ থাকিতে পারে না। সে তাৎপর্য্য এই — প্রকৃতির উর্দ্ধে পরমাত্মার পিতৃভাব, এবং প্রকৃতির মধ্যে আত্মা-সমস্তের ভ্রাতৃভাব, দুয়েরই প্রতি যেন আমাদের দৃষ্টি থাকে। পরমাত্মা কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি পক্ষপাতী, ইহা বলিলে আত্মা-সমস্তের মধ্যে যে পরস্পর ভ্রাতৃ-ভাব আছে তাহার বিপক্ষে বলা হয়; আর যদি সাংখ্যের মতানুসারে প্রজ্ঞাবিশিষ্ট প্রকৃতিকে পরব্রহ্ম জ্ঞান করা যায়, তাহা হইলে নিরালম্ব সত্যের স্থলে আপেক্ষিক সত্যের অধ্যারোপ করা হয়। যদিও সাংখ্য-মতের সহিত আমাদের এই রূপ অনৈক্য,কিন্তু ইহা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি (সময়ান্তরে প্রমাণও করিব) যে, আমাদের দেশের প্রধান প্রধান তত্ত্ব-জ্ঞান-শাস্ত্রের ভিতরকার ভাব যাহা, তাহাই আমি বলিয়াছি। এক্ষণে অনুলোম পঙ্‌ক্তির অবশিষ্ট পথ অতিবাহন করা যাউক্।

কবিকাহিনী।

তৃতীয় সর্গ।

কত দেশ দেশান্তরে ভ্রমিল সে কবি
তুষার-মণ্ডিত গিরি করিল লঙ্ঘন,
সুতীক্ষ্ণ কণ্টকময় অরণ্যের বুক
মাড়াইয়া গেল চলি রক্তময় পদে।
কিন্তু বিহঙ্গের গান, নির্ঝরের ধ্বনি,
পারে না জুড়াতে আর কবির হৃদয়।
বিহগ, নির্ঝর-ধ্বনি প্রকৃতির গীত,
মনের যে ভাগে তার প্রতিধ্বনি হয়,
সে মনের তন্ত্রী যেন হোয়েছে বিকল।
একাকী যাহাই আগে দেখিত সে কবি,
তাহাই লাগিল তার কেমন সুন্দর,
এখন কবির সেই একি হোল দশা,

যে প্রকৃতি-শোভা মাঝে নলিনী না থাকে
ঠেকে তা শূন্যের মত কবির নয়নে,
নাইক দেবতা যেন মন্দির মাঝারে।
বালার মুখের জ্যোতি করিত বর্দ্ধন
প্রকৃতির রূপছটা দ্বিগুণ করিয়া ;
সে না হোলে অমাবস্যা নিশির মতন
সমস্ত জগৎ হোত বিষণ্ণ আঁধার।

* * * *

জ্যোৎস্নায় নিমগ্ন ধরা, নীরব রজনী।
অরণ্যের অন্ধকারময় গাছগুলি
মাথার উপরে মাখি রজত জোছনা,
শাখায় শাখায় ঘন করি জড়াজড়ি,
কেমন গম্ভীর ভাবে রোয়েছে দাঁড়ায়ে।
হেথায় ঝোপের মাঝে প্রচ্ছন্ন আঁধার,
হোথায় সরসীবক্ষে প্রশান্ত জোছনা।
নভ-প্রতিবিম্ব-শোভী ঘুমন্ত সরসী
চন্দ্র তারকার স্বপ্ন দেখিতেছে যেন!
লীলাময়ী প্রবাহিনী চলেছে ছুটিয়া,
লীলাভঙ্গ বুকে তার পাদপের ছায়া
ভেঙ্গে চুরে কত শত ধরিছে মূরতি।
গাইছে রজনী কিবা নীরব সঙ্গীত!
কেমন নীরব বন নিস্তব্ধ গম্ভীর ;
শুধু দূর-শৃঙ্গ হোতে ঝরিছে নির্ঝর,
শুধু এক পাশ দিয়া সঙ্কুচিত অতি
তটিনীটি সর সর যেতেছে চলিয়া।
অধীর বসন্ত বায়ু মাঝে মাঝে শুধু
ঝরঝরি কাঁপাইছে গাছের পল্লব।
এহেন নিস্তব্ধ রাত্রে কত বার আমি
গম্ভীর অরণ্যে একা কোরেছি ভ্রমণ।
স্নিগ্ধ রাত্রে গাছ পালা ঝিমাইছে যেন,
ছায়া তার পোড়ে আছে হেথায় হোথায়।
দেখিয়াছি নীরবতা যত কথা কয়
প্রাণের মরম-তলে, এত কেহ নয়।
দেখি যবে অতি শান্ত জোছনায় মজি
নীরবে সমস্ত ধরা রয়েছে ঘুমায়ে,
নীরবে পরশে দেহ বসন্তের বায়,
জানিনা কি এক ভাবে প্রাণের ভিতর
উছলিয়া, উথলিয়া উঠেগো কেমন!
কি যেন হারায়ে গেছে খুঁজিয়া না পাই,
কি কথা ভুলিয়া যেন গিয়েছি সহসা,
বলা হয় নাই যেন প্রাণের কি কথা,
প্রকাশ করিতে গিয়া পাইনা তা' খুঁজি!
কে আছে এমন যার এহেন নিশীথে,
পুরাণো সুখের স্মৃতি উঠেনি উথলি!
কে আছে এমন যার জীবনের পথে
এমন একটি সুখ যায়নি হারায়ে,
যে হারা-সুখের তরে দিবা নিশি তার,
হৃদয়ের এক দিক্ শূন্য হোয়ে আছে।
এমন নীরব-রাত্রে সে কিগো কখনো
ফেলে নাই মর্ম্মভেদী একটি নিশ্বাস?
কত স্থানে আজ রাত্রে নিশীথ-প্রদীপে
উঠিছে প্রমোদ-ধ্বনি বিলাসীর গৃহে।
মুহূর্ত্ত ভাবেনি তারা আজ নিশীথেই
কত চিত্ত পুড়িতেছে প্রচ্ছন্ন অনলে।
কত শত হতভাগা আজ নিশীথেই
হারায়ে জন্মের মত জীবনের সুখ
মর্ম্মভেদী যন্ত্রণায় হইয়া অধীর
একেলাই হা হা করি বেড়ায় ভ্রমিয়া!

* * * *

ঝোপ-ঝাপে-ঢাকা ওই অরণ্য-কুটীর।
বিষণ্ণ নলিনী বালা শূন্য নেত্র মেলি
চাঁদের মুখের পানে রয়েছে কাহিনী!

জানিনা কেমন কোরে, বালার বুকের মাঝে,
সহসা কেমন ধারা লেগেছে আঘাত,
আর সে গাহেনা গান, বসন্ত ঋতুর অন্তে
পাপিয়ার কণ্ঠ যেন হোয়েছে নীরব।
আর সে লইয়া বীণা বাজায়না ধীরে ধীরে,
আর সে ভ্রমেনা বালা কাননে কাননে।
বিজন কুটীরে শুধু, পরণ শয্যার পরে
একেলা আপন মনে রয়েছে শুইয়া।
যে বালা মুহূর্ত্তকাল, স্থির না থাকিত কভু,
শিখরে, নির্ঝরে, বনে করিত ভ্রমণ,
কখনো তুলিত ফুল, কখনো গাঁথিত মালা,
কখনো গাইত গান, বাজাইত বীণা,
সে আজ এমন শান্ত, এমন নীরব স্থির,
এমন বিষণ্ণ শীর্ণ সে প্রফুল্ল মুখ।
এক দিন, দুই দিন, যেতেছে কাটিয়া ক্রমে
মরণের পদ শব্দ গণিছে সে যেন!
আর কোন সাধ নাই, বাসনা রয়েছে শুধু
কবিরে দেখিয়া যেন হয়গো মরণ।
এদিকে পৃথিবী ভ্রমি, সহিয়া ঝটিকা কত
ফিরিয়া আসিছে কবি কুটীরের পানে,
মধ্যাহ্নের রৌদ্রে যথা জ্বলিয়া পুড়িয়া পাখী
সন্ধ্যায় কুলায়ে তার আইসে ফিরিয়া।
বহুদিন পরে কবি, পদার্পিল বন-ভূমে,
বৃক্ষলতা সবি তার পরিচিত সখা,
তেমনি সকলি আছে, তেমনি গাইছে পাখী,
তেমনি বহিছে বায়ু ঝর ঝর করি।
অধীরে চলিল কবি কুটীরের পানে;
দুয়ারের কাছে গিয়া, দুয়ারে আঘাত দিয়া,
ডাকিল অধীর স্বরে নলিনী, নলিনী!
কিছু নাই সাড়া শব্দ, দিলনা উত্তর কেহ,
প্রতিধ্বনি শুধু তারে করিল বিদ্রূপ।
কুটীরে কেহই নাই, শূন্য তা রয়েছে পড়ি,
বেষ্টিত বিতস্ত্রী-বীণা লুতা-তন্তু-জালে।
ভ্রমিল আকুল কবি কাননে কাননে,
ডাকিয়া সমুচ্চ স্বরে নলিনী নলিনী।
মিলিয়া কবির সাথে, বন দেবী উচ্চস্বরে
ডাকিল কাতরে আহা নলিনী, নলিনী।
কেহই দিলনা সাড়া, শুধু সে শবদ শুনি
সুপ্ত হরিণেরা ত্রস্ত উঠিল জাগিয়া।
অবশেষে গিরি-শৃঙ্গে উঠিল কাতর কবি,
নলিনীর সাথে যেথা থাকিত বসিয়া।
দেখিল সে গিরি-শৃঙ্গে, শীতল তুষার পরে,
নলিনী ঘুমায়ে আছে ম্লান-মুখচ্ছবি।
কঠোর তুষারে তার এলায়ে পড়েছে কেশ,
খসিয়া পড়েছে পাশে শিথিল আঁচল।
বিশাল নয়ন তার অর্দ্ধ নিমীলিত,
দুটি হাত ঢাকা আছে অনাবৃত বুকে।
একটি হরিণ শিশু, খেলা করিবার তরে
কভুবা অকল ধরি টানিতেছে তার,
কভু শৃঙ্গ দুটি দিয়া সুধীরে দিতেছে ঠেলি,
কভুবা অবাক্-নেত্রে রয়েছে চাহিয়া,
তবু নলিনীর ঘুম, কিছুতেই ভাঙ্গিছে না,
নীরবে নিস্পন্দ হোয়ে রয়েছে ভূতলে।
দূর হোতে কবি তারে দেখিয়া কহিল উচ্চে,
"নলিনি, এয়েছি আমি দেখ্‌সে বালিকা।"
তবুও নলিনী বালা না দিয়া উত্তর,
শীতল তুষার পরে রহিল ঘুমায়ে।
কবি সে শিখর পরে করি আরোহণ
শীতল অধর তার করিল চুম্বন;
শিহরিয়া, চমকিয়া দেখিল সে কবি
না নড়ে হৃদয় তার, না পড়ে নিশ্বাস।
দেখিল না, ভাবিল না, কহিল না কিছু,

যেমন চাহিয়া ছিল রহিল চাহিয়া।
নিদারুণ কি যেন কি দেখিয়া তরাসে
নয়ন হইয়া গেল অচল পাষাণ।
কতক্ষণে কবি তবে পাইল চেতন,
দেখিল তুষার-শুভ্র নলিনীর দেহ,
হৃদয়-জীবন-হীন জড় দেহ তার;
অনুপম সৌন্দর্য্যের কুসুম-আলয়,
হৃদয়ের মরমের আদরের ধন—
তৃণ কাষ্ঠ সম ভূমে যায় গড়াগড়ি!
বুকে তারে তুলে লয়ে ডাকিল "নলিনী",
হৃদয়ে রাখিয়া তারে, পাগলের মত কবি
কহিল কাতর স্বরে "নলিনী" "নলিনী!"
স্পন্দহীন, রক্তহীন অধর তাহার
অধীর হইয়া ঘন করিল চুম্বন।

* * * *

তার পর দিন হোতে, সে বনে কবিরে আর
পেলে না দেখিতে কেহ গেছে সে কোথায়;
ঢাকিল নলিনী-দেহ তুষার সমাধি,
ক্রমে সে কুটীরখানি, কোথা ভেঙ্গে চুরে গেল
ক্রমে সে কানন হোল গ্রাম লোকালয়,
সে কাননে—কবির সে সাধের কাননে
অতীতের পদচিহ্ন রহিল না আর।

ক্রমশঃ

বিজন চিন্তা।

কল্পনা।

এই মহাকল্লোলময় মহানগরের এক প্রান্তে এক খানি পর্ণ-কুটীরে আমার বাস। আমি সংসারী নহি; কেন না আমার সংসার নাই—আমি বিধবা, আমার আদর করিবার স্বামী নাই, সান্ত্বনা করিবার বন্ধু নাই স্নেহ কিনিবার বিভব নাই, যত্ন লাভের সামর্থ্য নাই। ছিন্ন তৃণবৎ আমি সংসার-স্রোতে একলাই ভাসিতেছি, একলাই উঠিতেছি, একলাই পড়িতেছি। ভিক্ষা ভিন্ন আমার আর উপায় নাই। ভিক্ষা করিতে গিয়া আমি নানা প্রকার লোক দেখিতে পাই—তাহাদের নানাবিধ ভাবভঙ্গী আলোচনা করি—বিদ্বান মূর্খদের দলে দাঁড়াইয়া তাহাদের মতামত শুনি, মনে মনে হাসি কখন বা কাঁদি, আবার বাড়ি আসিয়া সেই সব কথা লিখি। এইরূপে কোন প্রকারে সময় কাটাই। আমি এখন খুব স্বাধীন, অথচ স্বাধীনতায় সুখ পাই না। মনের ভিতর যেন কেমন একটা হু হু করিতে থাকে। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রিকাল পর্য্যন্ত আমি কত লোকই দেখিতেছি কিন্তু আমি কেমন আছি, বা আমি কে, একথা জিজ্ঞাসা করিবার এক জনকে দেখিতে পাই না—সুতরাং লক্ষ লক্ষ মানবের মধ্যে থাকিয়াও আমার পর্ণ-কুটীরের বিজনতা কখনই ভঙ্গ হয় না। আমি আপনি হাসি, আপনি কাঁদি, আপনি ভাবি। মনে করিয়াছিলাম যে সংসারের শৃঙ্খল ছেদ করিয়া এই বিজন কুটীরে মনের সুখে বাস

করিব৯ মনে করিয়াছিলাম যে, যখন কাহারো সঙ্গে আর সম্পর্ক নাই তখন কিসের উদ্বেগ, যখন আমি আর মোহের অধীন নহি তখন আর কিসের যাতনা, যখন মায়ায় আবদ্ধ নহি তখন কিসের ভাবনা, কিন্তু অপরিমিত স্বাধীনতাতেই কি সুখ?— অপরিমিত স্বাধীনতাতে রাজ্য উচ্ছিন্ন হয়, সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হয়, ব্রহ্মাণ্ড বিপ্লবস্থ হয়। লোকে যেমন ভাষা কথায় বলিয়া থাকে "বড় হবে ত ছোট হও" তেমনি প্রকৃত স্বাধীনতা সম্বন্ধে একথাও বলা যাইতে পারে যে, স্বাধীন হবে ত পরাধীন হও। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পক্ষে যে কথা স্থির সিদ্ধান্ত প্রায়, সমস্ত সমাজ, সমস্ত রাজ্যপক্ষে যে কথা স্থির সিদ্ধান্ত প্রায়, প্রত্যেক মনুষ্যের পক্ষে কেনই বা তাহা অপ্রতিষ্ঠ হইবে? সমস্ত বাহ্য প্রকৃতির নিয়ম পরাধীনতা; সমস্ত অন্তঃপ্রকৃতির নিয়মও পরাধীনতা। সমস্ত বাহ্য প্রকৃতি এক আকর্ষণের অধীন হইয়া চলিতেছে, সমস্ত অন্তঃপ্রকৃতিও এক আকর্ষণের অধীন হইয়া চলিতেছে। যে লোক বলিয়াছেন—

"আমার হৃদয় আমারি হৃদয়
বেচিনিত তাহা কাহারো কাছে।"

তিনি মিথ্যা কথা কহিয়াছেন। এরূপ গর্ব্বিত আস্ফালন কোন হৃদয়-সম্পন্ন মানুষের কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইতে পারে না। আমার হৃদয় আছে যখনি ভাবিতে পারিলাম তখন ইহাও নিশ্চয় যে সে হৃদয় পরাধীন——হয় কোন ব্যক্তি বিশেষের নয় কোন বস্তুবিশেষের। কিন্তু এই প্রকার পরাধীনতা কি বিষাদের? এই পরাধীনতার শৃঙ্খল কি মানুষ মাকড়ষার মত আপনা হইতেই উদ্গীরণ করিয়া আপনিই তাহাতে বিজড়িত হইতে চাহে না? এই পরাধীনতার বীজ মানবহৃদয়ে নিহিত থাকিলেও মানুষে আপনিই কি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া তাহা অঙ্কুরিত করিতে—তাহা বৃক্ষে পরিণত করিতে চাহে না? পরিণামে সেই বৃক্ষে বিষময় ফলই উৎপন্ন হোক আর সুধাময় ফলই উৎপন্ন হোক, সে বৃক্ষকে ফলিত করিতে কি মানুষে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে শিথিল-প্রযত্ন হয়? মানব হৃদয়ের ইতিবৃত্ত পড়িলে কখনই তাহা বোধ হইবে না। কিন্তু কিসের মোহে মুগ্ধ হইয়া মানুষে এইরূপ স্ব-নির্ম্মিত তরঙ্গে তরঙ্গিত হইতে থাকে? সে কেবল কল্পনার মোহে! মহাকবি সেক্‌স্‌পিয়ার বলিয়াছেন বটে যে, কবি প্রণয়ী আর উন্মাদগ্রস্ত ইহারাই কল্পনাপ্রধান, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বাহ্যপ্রকৃতি যেমন এক মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে পরিচালিত হইতেছে, মানবহৃদয়ও সেই প্রকার কেবল কল্পনা-প্রভাবেই পরিচালিত হইতেছে। মাডেগাস্কর দ্বীপের অসভ্য জাতিরা যখন তাহাদের বিকট-দর্শন প্রস্তরময় দেবমূর্ত্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কাতর হৃদয়ে বর প্রার্থনা করে, হিন্দুরা যখন বিজয়া দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া ভগ্নহৃদয় হয়, খ্রীষ্টানেরা যখন কুমারিপুত্র যিশুখ্রীষ্টকে আপনাদের পাপের ভার বহন করিতে প্রার্থনা করে, তখন কি কল্পনার মোহন

প্রভাব প্রতীত হয় না? ধর্ম্মোপার্জ্জন, বিদ্যাশিক্ষা, পুত্রপালন, এ সকলেরই গভীরতম মূল প্রদেশে কল্পনা-শক্তিই প্রচ্ছন্ন ভাবে বিরাজিত থাকে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে এসকল কার্য্যে আশাই আমাদিগকে প্রবর্ত্তিত করে, কিন্তু যদি আশারূপ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের কাঁচ কল্পনার দ্বারা সুমার্জ্জিত ও সুরঞ্জিত না হইত, তাহা হইলে আশার উত্তেজনায় কেহই উত্তেজিত হইত না।

কল্পনার মহান্ প্রভাব এখানেই ক্ষান্ত নহে; শুদ্ধ যে আমরা ইহার প্রভাবে সুন্দর সামগ্রীকে সুন্দরতর দেখি এমন নহে, শুদ্ধ যে আমরা ইহার প্রভাবে সকল প্রকার বিঘ্ন ব্যবধান অতিক্রম করিয়া মরুভূমিতে থাকিয়াও নন্দনকাননের শোভা সন্দর্শন করি এমন নহে, কিন্তু ইহার প্রভাবে আমরা সকল প্রকার সুন্দর পদার্থ হইতে তাহাদের সুন্দরতম অংশগুলি গ্রহণ করিয়া অশেষবিধ তিলোত্তমা বা প্যাণ্ডোরা সৃজন করিতে পারি।

সত্য বটে যে কল্পনা যেমন সুখের কারণ, আবার কল্পনা তেমনি দুঃখের কারণ, সত্য বটে যে, কল্পনা-প্রভাবে আমরা বৈজয়ন্ত ধামকেও শ্মশানের চিতা-আকারে রূপান্তরিত করিতে পারি, সত্য বটে যে কল্পনা-প্রভাবে আমরা মিল্‌টন-বর্ণিত দেবতুল্য মানবমুখেও বায়রণ-বর্ণিত পিশাচের প্রতিকৃতি উপলব্ধি করিতে পারি এবং মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর দেবী-অংশভূতা নারীজাতিকেও হ্যামলেটের মত অসতীত্বরূপ দুর্ব্বলতার নামান্তর মনে করিতে পারি, কিন্তু তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে কল্পনার দোষ নহে, তাহা আমাদেরই দোষ! কল্পনাকে সংযত করা শিক্ষিত করা ও বিবেক বুদ্ধির অধীন করা আমাদের উপরেই নির্ভর করিতেছে। কল্পনাই আমাদের কার্য্যের প্রবর্ত্তক, ভাবনার প্রকৃত উত্তেজক, আশার চিত্রকর, সুখের আত্মা।

কল্পনার তারতম্যে আমাদের সুখেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এই যে সমস্ত বিশ্বকাণ্ড আমাদের সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে, এই যে অনন্ত শোভার ভাণ্ডার আমাদের সম্মুখে মুক্তদ্বার রহিয়াছে—ইহার কি কোন রসই আমরা অনুভব করিতে পারিতাম, কোন ভাবই কি গ্রহণ করিতে পারিতাম, কোন শোভাই কি উপভোগ করিতে পারিতাম যদি কল্পনার দ্বারা আমাদের দিব্য চক্ষু না পরিস্ফুটিত হইত? পৃথিবী ত মৃত্তিকাময়, সমুদ্র ত সলিলময়, সূর্য্য ত অগ্নিময় মাত্র—তবে কেন পৃথিবীর শোভা সন্দর্শনে হৃদয় দ্রবীভূত হয়, সাগরের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে এবং সূর্য্যের অভ্যুদয়ে হৃদয়ও এক নূতন জীবনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে।

কল্পনা-বিরহিত হইলে কে আর সেক্‌স্‌পিয়রের মতন বৃক্ষপল্লবে অস্ফুট ভাষা বুঝিতে পারিত, প্রবহমান নদীবক্ষে গ্রন্থ পাঠ করিতে পারিত, প্রস্তর-খণ্ডে উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিত ও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডময় মঙ্গল ভাব উপলব্ধি করিতে পারিত? কল্পনায় সকল দ্রব্যকেই হৃদয়ের উপভোগের মত করিয়া লওয়া যায়—

The meanest floweret of the vale,
The simplest note that swells the gale,
The common sun, the air, the skies,
To him are sweetest paradise.

বিধবা

মেঘনাদ-বধ কাব্য।

রামের নিকট বিদায় লইয়া লক্ষ্মণ এবার যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন, মায়ার প্রসাদে অদৃশ্য হইয়া লক্ষ্মণ লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়া—

হেরিলা সভয়ে বলী সর্ব্বভুক্‌রূপী
বিরূপাক্ষে মহারক্ষঃ, প্রকোষ্ঠধারী।
ইত্যাদি।

কবি কাব্যের স্থানে স্থানে অমত্ন সহকারে, নিশ্চিন্তভাবে দুই একটি কথা ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার ফল বড় ভাল হয় নাই। "সভয়ে" কথাটি এখানে না ব্যবহার করিয়াও তিনি সমস্ত বর্ণনাটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে শেষ করিতে পারিতেন।

প্রবল পবন-বলে বলীন্দ্র পাবনি
হনু, অগ্রসরি শূর, দেখিলা সভয়ে
বীরাঙ্গনা মাঝে রঙ্গে প্রমীলা দানবী।

হনুমানের প্রমীলাকে দেখিয়া এত ভয় কেন হইল তাহা জানেন? হনুমান রাবণের প্রণয়িনীদের দেখিয়াছেন, 'রক্ষঃকুলবধূ ও রক্ষঃকুলবালাদের' দেখিয়াছেন, শোকাকুলা রঘুকুল-কমলকে' দেখিয়াছেন, "কিন্তু এহেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে" দেখেন নাই বলিয়াই এত সভয়! "——কুম্ভকর্ণ বলী ভাই মম, তায় আমি জাগানু অকালে ভয়েশ" যাহা হউক এরূপ সভয়ে, সত্রাসে, সজল নয়নে, প্রভৃতি অনেক কথা কাব্যের অনেক স্থানে অযথা-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এরূপ দুটি একটি ক্ষুদ্র কথার ব্যবহার লইয়া এতটা আড়ম্বর করিতেছি কেন? তাহার অনেক কারণ আছে। তুলিকার একটি সামান্য স্পর্শ মাত্রেই চিত্রের অনেকটা এদিক ওদিক হইয়া যায়। কবি লিখিবার সময় লক্ষ্মণের চিত্রটি সমগ্র ভাবে মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইতে পারেন নাই নহিলে যে লক্ষ্মণ দর্শনে ভীষণ "মূর্ত্তি" মহাদেবকে দেখিয়া অস্ত্র উদ্যত করিয়াছিলেন, তিনি প্রকোষ্ঠধারী বিরূপাক্ষ রাক্ষসের প্রতি সভয়ে দৃষ্টিপাত করিলেন কেন? "সভয়ে" এই কথাটির ব্যবহারে আমরা লক্ষ্মণের ভয়গ্রস্ত মুখশ্রী স্পষ্ট দেখিতেছি, ইহাতে "রঘুজ-অজ-অঙ্গজ" দশরথ-তনয় সৌমিত্রির প্রতি যে আমাদের ভক্তি বাড়িতেছে তাহা নহে।

ইহার পরে লক্ষ্মণের সহিত ইন্দ্রজিতের যে যুদ্ধ বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে যে, লক্ষ্মণের নীচতা, কাপুরুষতা, অক্ষত্রোচিত ব্যবহার স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে-তাহা কে অস্বীকার করিবেন? কবি তাহা ভ্রমক্রমে করেন নাই, ইচ্ছা পূর্ব্বক করিয়াছেন, তিনি একস্থলে ইন্দ্রজিতের মুখ দিয়াই কহিয়াছেন,

ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে?
কহ, মহারথি, একি মহারথী প্রথা?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা!'

যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক করিয়া থাকেন, তবে কেন করিলেন? এ মহাকাব্যে কি মহান চরিত্র যথেষ্ট আছে? রাবণকে কি স্ত্রী-লোক করা হয় নাই? ইন্দ্রকে কি ভীরু-মনুষ্যরূপে চিত্রিত করা হয় নাই? এ কাব্যের রাম কি একটি কৃপাপাত্র বালক নহেন? তবে এ মহাকাব্যে এমন কে মহান্ চরিত্র আছেন, যাঁহার কাহিনী শুনিতে শুনিতে আমাদের হৃদয় স্তম্ভিত হয়, শরীর কণ্টকিত হয়, মন বিস্ফারিত হইয়া যায়। ইহাতে সয়তানের ন্যায় ভীষণ দুর্দ্দম্য মন, ভীষ্মের ন্যায় উদার বীরত্ব, রামায়ণের লক্ষ্মণের ন্যায় উগ্র জ্বলন্ত-মূর্ত্তি, যুধিষ্ঠিরের ন্যায় মহান্ শান্তভাব, চিত্রিত হয় নাই। ইহাতে রাবণ প্রথম হইতেই পুত্রশোকে কাঁদিতেছেন, ইন্দ্র ইন্দ্রজিতের ভয়ে কাঁপিতেছেন, রাম বিভীষণের নিকট গিয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছেন, ইহা দেখিয়া যে কাহার হৃদয় মহান্ ভাবে বিস্ফারিত হইয়া যায়, জানি না।

যখন ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণকে কহিলেন,

নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথীকুল প্রথা আঘাতিতে তারে।
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে;—কি আর কহিব?

তখন জলদ প্রতিমস্বনে কহিলা সৌমিত্রি,*

"আনায় মায়াবে বাঘে পায়লে কি কভু
ছাড়েরে কিরাত তারে? ক্ষমিব এখনি,
অবোধ তেমনি তোরে! ক্ষম রক্ষঃকুলে
তোর, ক্ষত্রধর্ম্ম, পাপি, কি হেতু পালিব,
তোর সঙ্গে? মারি অরি, পারি যে কৌশলে!

একথা বলিবার জন্য জলদপ্রতিমস্বনের কোন আবশ্যক ছিল না।

রামায়ণের লক্ষ্মণ একটি উদ্ধত উগ্র-যুবক, অন্যায় তাঁহার কোন মতে সহ্য হয় না, তরবারীর উপরে সর্ব্বদাই তাঁহার হস্ত পড়িয়া আছে, মনে যাহা অন্যায় বুঝিবেন মুহূর্ত্তে তাহার প্রতিবিধান করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহার আর বিবেচনা করিবেন না, অগ্রপশ্চাৎ করিবেন না, তাহার ফল ভাল হইবে কি মন্দ হইবে তাহা জ্ঞান নাই, অন্যায় হইলে আর রক্ষা নাই। অল্প-বয়স্ক বীরের উদ্ধত চঞ্চল হৃদয় রামায়ণে সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। যখন দশরথ রামকে বনে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন ও রামও তাহাতে সম্মত হইলেন, তখন লক্ষ্মণ যাহা কহিতেছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, ইহাতে পাঠকেরা কিয়ৎ পরিমাণে রামায়ণে বর্ণিত লক্ষ্মণচরিত্র বুঝিতে পারিবেন।

"রাম এইরূপ কহিলে মহাবীর লক্ষ্মণ সহসা দুঃখ ও হর্ষের মধ্যগত হইয়া অবনত-মুখে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন এবং ললাট-পট্টে ভ্রূকুটী বন্ধন পূর্ব্বক বিলমধ্যস্থ ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধভরে ঘন ঘন নিশ্বাস পরি-

* হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কৃত রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত।

ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার বদনমণ্ডল নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল এবং কুপিত সিংহের মুখের ন্যায় অতি-ভীষণ বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর হস্তী যেমন আপনার শুণ্ড বিক্ষেপ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি হস্তাগ্র বিক্ষিপ্ত এবং নানা প্রকার গ্রীবাভঙ্গী করিয়া বক্রভাবে কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! ধর্ম্মদোষ পরিহার এবং স্বদুষ্টান্তে লোক-দিগকে মর্য্যাদায় স্থাপন এই দুই কারণে বন গমনে আপনার যে আবেগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। * * *আপনি অনায়াসে দৈবকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তবে কি নিমিত্ত একান্ত শোচনীয় অকিঞ্চিৎকর দৈবের প্রশংসা করিতেছেন? * *বীর! এই জঘন্য ব্যাপার আমার কিছুতেই সহ্য হইতেছে না! একণে আমি মনের দুঃখে যাহা কিছু কহি-তেছি, আপনি ক্ষমা করিবেন। আরও আপনি যে ধর্ম্মের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া মুগ্ধ হইতেছেন, যাহার প্রভাবে আপনার মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে, আমি সেই ধর্ম্ম-কেই ঘৃণা করি। আপনি কর্ম্মকম, তবে কি কারণে সেই ক্লৈব রাজার ঘৃণিত অধর্ম্ম-পূর্ণ বাক্যের বশীভূত হইবেন? এই যে রাজ্যাভিষেকের বিঘ্ন উপস্থিত হইল, বরদান ছলই ইহার কারণ; কিন্তু আপনি যে তাহা স্বীকার করিতেছেন না, ইহাই আমার দুঃখ; ফলতঃ আপনার এই ধর্ম্মবুদ্ধি নিতা-ন্তই নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। * * * তাঁহারা আপনার রাজ্যাভিষেকে বিঘ্নাচরণ করি-লেন, আপনিও তাহা দৈবকৃত বিবেচনা করিতেছেন, অনুরোধ করি, এখনই এইরূপ দুর্বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন, এই প্রকার দৈব কিছুতেই আমার প্রীতিকর হইতেছে না। যে ব্যক্তি নিস্তেজ, নির্ব্বীর্য্য, সেই দৈবের অনুসরণ করে, কিন্তু যাঁহারা বীর, লোকে যাঁহাদিগের বল-বিক্রমের শ্লাঘা করিয়া থাকে, তাঁহারা কদাচই দৈবের মুখাপেক্ষা করেন না। যিনি স্বীয় পৌরুষপ্রভাবে দৈবকে নিরস্ত করিতে সমর্থ হন, দৈববলে তাঁহার স্বার্থহানি হইলেও অবসন্ন হন না। আর্য্য! আজ লোকে দৈববল এবং পুরুষের পৌরুষ উভয়ই প্রত্যক্ষ করিবে। অদ্য দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই বলাবল পরীক্ষা হইবে। যাহারা আপনার রাজ্যাভিষেক দৈবপ্রভাবে প্রতিহত দেখিয়াছে, আজ তাহারাই আমার পৌরুষের হস্তে তাহাকে পরাস্ত দেখিবে। আজ আমি উচ্ছৃঙ্খল দুর্দ্দান্ত মদস্রাবী মত্ত কুঞ্জরের ন্যায় দৈবকে স্বীয় পরাক্রমে প্রতিনিবৃত্ত করিব। পিতা দশরথের কথা দূরে থাকুক, সমস্ত লোক-পাল, অধিক কি ত্রিজগতের সমস্ত লোকও আপনার রাজ্যাভিষেকে ব্যাঘাত দিতে পারিবে না। যাহারা পরস্পর একবাক্য হইয়া আপনার অরণ্যবাস সিদ্ধান্ত করি-য়াছে, আজ তাঁহাদিগকেই চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত নির্ব্বাসিত হইতে হইবে। আপনার অনিষ্ট সাধন করিয়া ভরতকে রাজ্য দিবার নিমিত্ত রাজা ও কৈকেয়ীর যে আশা উপ-স্থিত হইয়াছে, আজ আমি তাহাই দগ্ধ করিব। যে আমার বিরোধী, আমার দুর্ব্বি-

সহ পৌরুষ যেমন তাহার দুঃখের কারণ হইবে, তদ্রূপ দৈববল কদাচই সুখের নিমিত্ত হইবে না।

* * প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমিই আপনকার রাজ্য রক্ষা করিব, নতুবা চরমে যেন আমার বীরলোক লাভ না হয়। তীরভূমি যেমন মহাসাগরকে রক্ষা করিতেছে, তদ্রূপ আমি আপনার রাজ্য রক্ষা করিব। এক্ষণে আপনি স্বয়ংই যত্নবান হইয়া মাঙ্গলিক ক্রিয়ায় অভিষিক্ত হউন। ভূপালগণ যদি কোন প্রকার বিরোধাচরণ করেন আমি একাকীই তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইব। আর্য্য! আমার যে এই ভুজদণ্ড দেখিতেছেন, ইহা কি শরীরের সৌন্দর্য্য সম্পাদনার্থ? যে কোদণ্ড দেখিতেছেন, ইহা কি কেবল শোভার্থ? এই খড়্গ কি কাষ্ঠ বন্ধন এই শরে কি কাষ্ঠভার অবতরণ করা হয়? —মনেও করিবেন না; এই চারিটি পদার্থ শত্রুবিনাশার্থই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক্ষণে বজ্রধারী ইন্দ্রই কেন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হউন না, বিদ্যুতবৎ ভাস্বর তীক্ষ্ণধার অসি দ্বারা তাঁহাকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব। হস্তীর শুণ্ড অশ্বের উরুদেশ এবং পদাতির মস্তক, আমার খড়্গে চূর্ণ হইয়া সমরাঙ্গন একান্ত গহন ও দুরবগাহ করিয়া তুলিবে। অদ্য বিপক্ষেরা আমার অসিধারায় ছিন্নমস্তক হইয়া শোণিতলিপ্ত দেহে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় বিদ্যুদ্দাম-শোভিত মেঘের ন্যায় রণক্ষেত্রে নিপতিত হইবে। * * যে হস্ত চন্দন লেপন, অঙ্গদ ধারণ, ধনদান ও সুহৃদ্বর্গের প্রতিপালনের সম্যক উপযুক্ত, অদ্য সেই হস্ত আপনার অভিষেক-বিঘাতকদিগের নিধন বিষয়ে স্বীয় অনুরূপ কার্য্য সাধন করিবে। এক্ষণে আজ্ঞা করুন আপনার কোন্ শত্রুকে ধন প্রাণ ও সুহৃদ্গণ হইতে বিযুক্ত করিতে হইবে। আমি আপনার চিরকিঙ্কর, আদেশ করুন, যেরূপে এই বসুমতী আপনার হস্তগত হয়, আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব।

মূল রামায়ণে ইন্দ্রজিতের সহিত লক্ষ্মণের যেরূপ যুদ্ধ বর্ণনা আছে তাহার কিয়দংশ আমরা পাঠকদিগের গোচরার্থে এই খানে অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

তুমি এই স্থানে বয়স কাটাইয়াছ, তুমি আমার পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা, সুতরাং পিতৃব্য হইয়া কিরূপে আমার অনিষ্ট করিতেছ? ভ্রাতৃত্ব ভ্রাতৃস্নেহ প্রীতি ও সৌহার্দ্যও তোমার নিকট কিছুই নয়। তুমি ধর্ম্মকেও উপেক্ষা করিতেছ। নির্ব্বোধ! তুমি যখন স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের সহিত সখ্য স্বীকার করিয়াছ তখন তুমি শোচনীয় এবং সাধুগণের নিন্দনীয়। আত্মীয় স্বজনের সহবাস ও অপর নীচ ব্যক্তির আশ্রয় এই দুইটীর যে কত অন্তর তুমি বুদ্ধি লৈখিলো তাহা বুঝিতেছ না। পর যদি গুণবান হয় এবং স্বজন যদি নির্গুণও হয় তবুও নির্গুণ স্বজন শ্রেষ্ঠ, পর সে সে পরই। স্বজনের প্রতি তোমার যেরূপ নির্দ্দয়তা, ইহাতে তুমি জনসমাজে প্রতিষ্ঠা ও সুখ কদাচই পাইবে না। আমার পিতা গৌরব বা প্রণয় বশতই হউক তোমাকে যেমন কঠোর

ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন তেমনি তাঁ আবার সান্ত্বনাও করিতেছেন। গুরু লোক প্রীতি-ভরে অপ্রিয় কথা বলেন বটে কিন্তু অবিচলিত মনে আবার ত সমাদরও করিয়া থাকেন। দেখ, যে ব্যক্তি সুশীল মিত্রের বিনাশার্থ শত্রুর বৃদ্ধি কামনা করে ধানা গুন্ডের সন্নিহিত শ্যামাকের ন্যায় তাহাকে পরিত্যাগ করা উচিত।

ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া বোধহয় লক্ষ্মণকে কটূক্তি করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর লক্ষ্মণ রোষাবিষ্ট হইয়া নির্ভয়ে কহিলেন, রে দুষ্ট! কথা মাত্রে কখন কার্য্যের পারগামী হওয়া যায় না, যিনি কার্য্যত তাহা প্রদর্শন করিতে পারেন তিনিই বুদ্ধিমান। তুই নির্ব্বোধ, কোন দুষ্কর কার্য্যে কতক গুলি নিরর্থক বাক্য ব্যয় করিয়া আপনাকে কৃতকার্য্য জ্ঞান করিতেছিস্। তুই অন্তরালে থাকিয়া রণস্থলে আমাদিগকে ছলনা করিয়াছিস্। কিন্তু দেখ্ এই পথটী তস্করের, বীরের নয়। এক্ষণে আত্মশ্লাঘা করিয়া কি হইবে,যদি তুই সম্মুখ্ যুদ্ধে তিষ্ঠিতে পারিস্ তবেই আমরা তোর বলবীর্য্যের পরিচয় পাইব। আমি তোরে কঠোর কথা কহিব না, তিরস্কার কি আত্মশ্লাঘাও করিব না অথচ বধ করিব। দেখ্ আমার কেমন বল বিক্রম। অগ্নি নীরবে সমস্ত দগ্ধ করিয়া থাকেন এবং সূর্য্য নীরবে উত্তাপ প্রদান করিয়া থাকেন। এই বলিয়া মহাবীর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

অভিনয় সমালোচনা।

আমাদের নাট্যশালার একটা বড় আশ্চর্য্য দেখিতেছি, কত কাল হইল তাহার আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু গোড়ায় যাহা দেখিয়াছিলাম আজো তাহাই দেখিতেছি, ইহার আর উন্নতিও হইল না, অবনতিও হইল না। বীর রস অভিনয় করিতে হইলেই তাঁহারা চীৎকার করিতে থাকেন, করুণ রস হইলেই তাঁহারা বুক চাপড়াইয়া নিশ্বাস টানিয়া টানিয়া বিকৃত অস্ফুট স্বরে কাঁদিতে থাকেন, হাস্য রসের অবতারণা করিতে হইলেই বিবিধ অপূর্ব্ব অঙ্গভঙ্গী করিয়া বিকৃত কণ্ঠে সে যে কত প্রকার ভাঁড়ামি করিতে থাকেন তাহার আর সীমা পরিসীমা নাই। বীর প্রশান্ত গম্ভীর বীরত্ব যে কিরূপ, তাহা তাঁহারা জানেন না, চটুল চপল আস্ফালনই তাঁহাদের বীরত্বের আদর্শ; প্রশান্ত চিন্তাময় যে এক প্রকার বিষাদ আছে তাহা তাঁহারা জানেন না, তাঁহারা যখন চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকেন, তখন করুণ রসের আবির্ভাব দূরে থাকুক, উল্টা এমন বিরক্তি বোধ হয় যে, তাহা আর বলিবার নহে; আর ভাঁড়ামি না করিয়া, নিরর্থক প্রলাপোক্তি না

করিয়াও যে হাসাইবার শত সহস্র উপায় আছে ইহা কি তাঁহারা এপর্য্যন্ত বুঝিলেন না? কিন্তু দর্শক-মণ্ডলীরই বা কিরূপ বিচার? নাটকের যদি কোন বীর প্রাণপণে ভগ্ন কণ্ঠে চীৎকার করিতে পারিলেন, যদি কোন শোকগ্রস্ত ব্যক্তি দুই চারিটি কথা বলিয়া সোজা হইয়া মূর্চ্ছা যাইতে পারিলেন, তবে আর রক্ষা নাই; করতালীর পর করতালী, রঙ্গভূমির কল্পিত বাদ্য অপেক্ষাও আমাদের বিরক্ত করিয়া তুলে। দর্শকমণ্ডলীর রুচির উপর অভিনয়ের ও অভিনেতাদিগের অভিনয়ের উপর দর্শকমণ্ডলীর রুচির উন্নতি নির্ভর করে সত্য, এবং নাট্যশালাধ্যক্ষেরা বলিতে পারেন যে, দর্শকদের যাহাতে ভাল লাগে সেই অনুসারেই তাঁহাদের কার্য্য করিতে হইবে, নহিলে তাঁহাদের চলিবে কি করিয়া। চাতক পক্ষীর ন্যায় তাঁহাদিগকে ঐ করতালীর ধারা বর্ষণের জন্য তৃষিত কর্ণে অপেক্ষা করিতে হয়, কিন্তু তাহাতেও বঞ্চিত হইলে তাঁহাদের উৎসাহ থাকিবে কিরূপে? এবং উৎসাহ অভাবে যে অভিনয় অধিকতর নিকৃষ্ট হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কথাটি সত্য বটে, কিন্তু ইহা তাঁহারা নিশ্চিত জানিবেন যে, ভাল অভিনয় হইলে দর্শকদিগের সন্তোষজনক হইবে না ইহা অসম্ভব; যদি দর্শকদিগের এতই রুচি বিকৃত হইয়া থাকে তবে তাঁহাদের দোষেই হইয়াছে এবং তাঁহাদেরই হস্তে তাহার সংস্কারের ক্ষমতাও আছে। অভিনেতাদিগের আর এক দোষ আছে গ্রন্থকার নাটকের প্রতি ছত্র কত ভাবিয়া চিন্তিয়া কত সাবধানে বসাইয়াছেন তাহা তাঁহারা ভাবেন না, তাঁহারা যে মুহূর্ত্তের মধ্যে নিশ্চিন্ত ভাবে দুই এক কথা বাড়াইয়া বা কমাইয়া দেন, তাহা অতিশয় অবিবেচনার কার্য্য বলিতে হইবে। একটি ক্ষুদ্র কথায় সামান্য স্বর ও হস্তপদ-ভঙ্গীতে এক একটি চরিত্র উলটিয়া পালটিয়া যায়, তাহা তাঁহাদের জ্ঞান নাই।

সমালোচনা করায় যে অনেক উপকার আছে ইহা আবার নূতন করিয়া প্রমাণ করিতে বসিলে অনেক পুরাতন কথার উল্লেখ করিতে হয় এই জন্য সে বিষয়ে ক্ষান্ত হইলাম, কেবল সংক্ষেপে বলিয়া রাখি যে, ন্যাসনেল থিয়েটরের অধ্যক্ষ মহাশয়গণ যে আমাদের আহ্বান পত্র দিয়াছেন তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি, এবং আমরা তাঁহাদের অভিনয় সমালোচনা করিব ও সমালোচনা করিলে তাহা নিষ্ফল হইবে না এই আমাদের বিশ্বাস। আমরা মেঘনাদবধ অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম, সে সম্বন্ধে আমাদের মত সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি।

মেঘনাদের চরিত্র অতি সুন্দর অভিনীত হইয়াছিল। ইন্দ্রজিৎ কেমন গম্ভীর ভাবে লক্ষ্মণকে কহিলেন

"সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু
লক্ষ্মণ; সংগ্রাম সাধ অবশ্য মিটাব
মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু
রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ?"

অন্য কোন অভিনেতা হইলে এই খানে এমন চীৎকার করিতেন যে তাঁহার ভগ্ন

কণ্ঠস্বর কর্কশ স্বরে একটি অক্ষরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম না! বিভীষণকে কেমন বিদ্রূপ অথচ তীব্র ভর্ৎসনায় কহিলেন

"এতক্ষণে ———

আনিলু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল—"

ইত্যাদি

সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইন্দ্রজিতের অংশ অতি সুন্দর অভিনীত হইয়াছিল। কিন্তু প্রমীলার চরিত্র তেমনি অঘন্য হইয়াছিল। প্রথমতঃ সে যাহাই বলুক না কেন তাহার মুখের ভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় না, অর্থাৎ তাহার মুখের কথার সহিত তাহার মুখের ভাবের কিছুমাত্র মিল হয় নাই, কি এক প্রকার হাস্য তাহার মুখে সমান ভাবে লাগিয়া ছিল, তাহা আমাদের অতিশয় কষ্টকর বোধ হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ সে অত যাকাযাকি দৌড়াদৌড় করে কেন বুঝিতে পারিলাম না, সে ছুটিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করে এবং ছুটিয়া রঙ্গস্থল হইতে প্রস্থান করে, প্রমীলার চরিত্রের সহিত ছুটাছুটি লাফালাফি করা অতিশয় অসংলগ্ন। যে প্রমীলা "কি কহিলি বাসন্তী?" প্রভৃতি বলিয়াও

"গজপতি গতি

রোষাবেশে প্রবেশিলা স্বর্ণ মন্দিরে।"

তাহার কি অত চপলতা ভাল দেখায়?

রাবণের অভিনয় ভাল হয় নাই, সেখানে সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন "কি-সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে," ইত্যাদি যাহার প্রতি ছত্রে ছত্রে তীব্র উপহাসের ভাব প্রথিত রহিয়াছে সে স্থলে রাবণ এমন হাহাকার শব্দে বিলাপ করিয়াছিলেন যে তাহা সমূহ বিরক্তিজনক হইয়া উঠিয়াছিল। রোদনের স্বরে কথা কহাটা প্রত্যেক অভিনেতার এমন অভ্যস্ত যে তাহাই আশ্চর্য্য! যখন দূত কহিল যে

"শত বক্ষস্থল মম, দেখ, নৃপমণি,

রিপু প্রহরণে; পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।"

তখন এমন রোদনের স্বরে কহিয়াছিল যে, মনে হইয়াছিল, যেন পৃষ্ঠে অস্ত্রলেখা নাই বলিয়া তাহার অতিশয় অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে।

মহাদেব সুন্দর হইয়াছিল। অভিনেতা এমন গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছিলেন যে, মনে হইয়াছিল যেন পাষাণের মূর্ত্তিই কথা কহিতেছে। সীতা ও সরমার অংশ পরিত্যাগ করিলেই ভাল হইত, সে অংশটি অতিশয় বিরক্তিজনক হইয়াছিল।

রামের অংশও অতিশয় সুন্দর অভিনীত হইয়াছিল। ইন্দ্রজিৎ ও রামের অংশই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইয়াছিল।

স্বাস্থ্য।

৪। স্তনপানু করাইবার জন্য ধাত্রীর অনাবশ্যকতা।——সন্তান ধাত্রীর হস্তে প্রতিপালিত হইলে, উহার স্তন পান করিয়া বালক ধাত্রীর পৈতৃক রোগপ্রবণতা ও কিয়দংশ তাহার স্বভাব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ইহা অন্যায় ও নিতান্ত দোষাবহ।

কখন কখন এরূপও দেখা গিয়াছে যে দাইয়ের দোষে সন্তানের শরীরে নানা প্রকার অঘন্য রোগ জন্মে। এতদ্ভিন্ন এদেশের ধাত্রী মাত্রেই প্রায় নীচকুলোদ্ভব। উহাদের দ্বারা সুকুমার বালকহৃদয়ে যে কতপ্রকার অসৎ প্রবৃত্তির বীজ সংরোপিত হয় তাহা বলা যায় না। এই সমস্ত বিষয় সন্তানের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। মিথ্যা কথন, চৌর্য্যবৃত্তি ও অপরাপর অন্যায়াচরণ আমরা অনেক সময়ে এই ধাত্রী হইতেই শিক্ষা করি। শৈশবে এই সকল দোষ একবার বদ্ধমূল হইলে আমরা আজীবন উহাতেই লিপ্ত থাকি। এই রূপ জানিয়া শুনিয়া কোন্ অভাগা জননী ইচ্ছাপূর্ব্বক আপন সন্তানকে ঈদৃশ অসৎ সম্পর্কে অধিক দিন রাখিতে পারেন। কোন্ নরাধম, সন্তানের এই সমস্ত অপ্রতিকার্য্য দোষ ঘটিবে জানিয়া তাহাকে স্বহস্তে নরকস্বরূপা ধাত্রীর ক্রোড়ে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। যাহাই হউক নিতান্ত নিরুপায় হইলেও কেহ যেন সন্তানকে ধাত্রীর হস্তে এক বৎসরের অধিক না রাখেন। "সৎপুত্র কুলের ভূষণ" ইহা আমাদের মধ্যে একটি চিরপ্রচলিত কথা। কিন্তু পুত্র কিরূপে সৎ হয় তাহা অনেকেই জানেন না। শৈশব হইতে সন্তানের প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে সে জন্মের মত মন্দ হইয়া যায়। কারণ আমরা শৈশবাবস্থায় যাহা শিক্ষা করি বা দেখি তাহাই পরিণামে আমাদিগের একমাত্র পথপ্রদর্শক হয়। জ্ঞানোদয় হইলে আমরা শৈশবাগত অনেক দোষ পরিহারে চেষ্টা পাই কিন্তু অভ্যাস দোষে আমরা সময়ে সময়ে ভ্রমে পতিত হই। বাল্যসংস্কারই ইহার একমাত্র কারণ। অতএব ঐ সময় সন্তান যাহাতে কুসংসর্গে না পড়ে তদ্বিষয়ে সকলেরই সতর্ক হইয়া চলা উচিত। তাহা হইলে অনেক পরিবার মধ্যে সুখের সীমা থাকিবে না। অনেক মাতার অসৎপুত্র লইয়া আর সংসারে চিরদিন যন্ত্রণা ভোগ বা রোদন করিতে হইবে না।

৫। মাতৃস্তন-অভাবে সন্তান প্রতিপালনের উপায়।—সন্তান কোন বিশেষ বিশেষ কারণে মাতৃস্তন না পাইলে তাহাকে অতি যত্ন পূর্ব্বক ও সাবধানে প্রতিপালন করিতে হয়। কারণ স্বভাবতঃ মাতৃদুগ্ধই উহাদের একমাত্র খাদ্য। তাহার অসদ্ভাব ঘটিলে অপর যে কোন প্রকার দুগ্ধ হউক না কেন, সকলেতেই সন্তানের অসুখ আনয়ন করে। এমন কি যত দিন ঐরূপ দুগ্ধপান অভ্যস্ত না হয় তত দিন ছেলে কষ্ট পায়। তথাপি সন্তানের পোষণার্থ আমাদিগকে অগত্যা নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। এই

সকল উপায় মধ্যে গোহুগ্ধই প্রধান। এই দুগ্ধ অল্পক্ষণ গাভি হইতে পাইলেই ভাল। তাহার ঐ দুগ্ধে অর্দ্ধেক জল ও কিঞ্চিৎ মিছরি বা পরিষ্কার চিনি মিশ্রিত করিয়া সন্তানকে যথানিয়মে খাওয়াইতে হয়। টাটকা দুধ না পাইলে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই গরম করিয়া একটি কাচের মুখনল-বিশিষ্ট বোতলে পুরিয়া রাখিতে হয় এবং যথাসময়ে ঐ বোতল সন্তানের মুখে ধরিলে সে মুখনল চুসিয়া দুধ পান করে। এইরূপে সন্তানের উদরপূর্ত্তি করিতে হয়। এই বোতল গুলির নাম ফিডিং বট্‌ল, ইহা ভাল ডিস্পেন্সরি মাত্রেই কিনিতে পাওয়া যায়। দুগ্ধ খাওয়াইবার জন্য বোতল একবার ব্যবহার হইলে পর উহাকে প্রথমতঃ গরম জল দিয়া সাফ করিতে হয়, পরে কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা জলে রাখিলেই উহা পুনরায় ব্যবহার্য হইয়া থাকে। এরূপ না করিলে দুগ্ধ-সংস্পর্শে বোতল মধ্যে অম্লরস উৎপন্ন হয়, সুতরাং বালক তদবস্থায় উহা হইতে দুগ্ধ পান করিলে, উকি তোলে অথবা বমন করিতে থাকে। এতদ্ভিন্ন অপর একটি কাচের পাত্রে চিনি ভিজাইয়া রাখিতে হয়, ঐ চিনিপানা দুগ্ধের পরিবর্ত্তে মধ্যে মধ্যে দেওয়া যাইতে পারে।

সন্তানের যতই বয়োবৃদ্ধি হয় ও পরিপাক শক্তি বাড়িতে থাকে ততই দুগ্ধে মিশাইবার জলের পরিমাণ কমাইতে হয়। যদি ইহাতে উদরাময় জন্মে তাহা হইলে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে যবসিদ্ধ জল, কিঞ্চিৎ চিনির সহিত মিশাইয়া খাওয়ানই ভাল। তাহাতে ও পেটের অসুখ না সারিলে চিকিৎসকের ব্যবস্থা লইতে হইবে। বালক শুদ্ধ দুধ খাইয়া পরিতৃপ্ত না হইলে, তাহাকে সাগু, এরারুট, টেপিওকা অথবা পাঁউরুটি গরম দুগ্ধে দিয়া খাওয়াইতে হয়। কিন্তু তাহাতে পেট খারাপ হইলে অমনি উহা বন্ধ করিয়া অন্য কোন লঘু আহার দেওয়া উচিত।

অনেকে মনে করেন যে সন্তান দেখিতে যত হৃষ্টপুষ্ট হয় ততই ভাল কিন্তু এটি তাহাদের বড় ভুল। কারণ সে পুষ্টি কখনই স্থায়ী হয় না, প্রত্যুত একটু কিছু অসুখ হইলেই শীর্ণ হইয়া পড়ে। আর এক দোষ এই যে, সন্তান স্থূলকায় হইলে সর্ব্বদা ফোড়া ও পাঁচড়া হয়। সুতরাং জনক জননীরা যেন সন্তানকে অধিক মোটা করিবার জন্য ব্যস্ত না হন। যতদিন সন্তানের দাঁত না উঠে ততদিন উহাকে পেয় দ্রব্য ভিন্ন অন্য কোন কঠিন দ্রব্য খাইতে দেওয়া উচিত নহে। দাঁত উঠিলেই কঠিন দ্রব্য দেওয়া বিধেয়।

যে সকল বালক দুগ্ধপোষ্য, স্বভাবতঃ অতিশয় শীর্ণ ও রোগপ্রবণ, তাহাদের বয়স বেশী হইলেও, তৈলাক্ত সামগ্রী খাইতে দেওয়া অন্যায়। ইহাতে তাহার জীবনান্ত হইবার সম্ভাবনা। অতএব তাহাদিগকে কেবল জলমিশ্রিত দুগ্ধ দিতে হইবে এবং প্রত্যহ শীতল জলে পৃষ্ঠদেশ (মেরুদণ্ড) ধৌত করিতে হইবে। এ ছাড়া তাহাদিগকে ঔষধ দেওয়াও আবশ্যক।

য—

করুণা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নরেন্দ্রের অনেকগুলি দোষ ফুটিয়াছে সত্য, কিন্তু করুণাকে সে সকল কথা কে বলে বল দেখি? সে বেচারী কেমন বিশ্বস্ত চিত্তে স্বপ্ন দেখিতেছে,তাহার সে স্বপ্ন ভাঙ্গাইবার প্রয়োজন কি? কিন্তু সে এত শত বুঝেও না, অত কথায় কাণও দেয় না; কিন্তু রাত দিন শুনিতে শুনিতে দুইএকটা কথা মনে লাগিয়া যায় বৈ কি। করুণার অমন প্রফুল্ল মুখ, সেও দুই একবার মলিন হইয়া যায় নয় ত কি? কিন্তু নরেন্দ্রকে পাইলেই সে সকল কথা ভুলিয়া যায়, জিজ্ঞাসা করিতে মনেই থাকে না, অবসরই পায় না, তাহার অন্যান্য এত কথা কহিবার আছে যে, তাহাই ফুরাইয়া উঠিতে পারে না, ত অন্য কথা! কিন্তু করুণার এভাব আর অধিক দিন থাকিবে না তাহা বলিয়া রাখিতেছি। নরেন্দ্র যেরূপ অন্যায় আরম্ভ করিয়াছে তাহা আর বলিবার নহে। নরেন্দ্র এখন আর কলিকাতায় বড় একটা যাতায়াত করে না। করুণাকে ভাল বাসিয়া যে, যায় না, সে ভ্রম যেন কাহারো না হয়। কলিকাতায় সে যথেষ্ট ঋণ করিয়াছে,পাওনাদারদের ভয়ে সে কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইয়াছে।

দিনে দিনে করুণার মুখ মলিন হইয়া আসিতেছে,নরেন্দ্র যখন কলিকাতায় থাকিত ছিল ভাল, চব্বিশ ঘণ্টা চখের সামনে থাকিলে কাহাকেই বা না চিনা যায়? নরেন্দ্রের স্বভাব করুণার নিকট ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল। করুণার কিছুই তাহার ভাল লাগিত না। সর্ব্বদাই খিট্ খিট্, সর্ব্বদাই বিরক্ত। এক মুহূর্ত্তও ভাল মুখে কথা কহিতে জানে না, অধীরা করুণা যখন হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া তাহার নিকট আসে তখন সে সহসা এমন বিরক্ত হইয়া উঠে যে করুণার মন একেবারে দমিয়া যায়। নরেন্দ্র সর্ব্বদাই এমন রুষ্ট থাকে যে করুণা তাহাকে সকল কথা বলিতে সাহস করে না, সকল সময় তাহার কাছে যাইতে ভয় করে, পাছে সে বিরক্ত হইয়া তিরস্কার করিয়া উঠে। তদ্ভিন্ন সন্ধ্যাবেলা তাহার নিকট কাহারো যেঁসিবার যো ছিল না, সে মাতাল হইয়া যাহা ইচ্ছা তাই করিত। যাহা হউক করুণার মুখ দিনে দিনে মলিন হইয়া আসিতে লাগিল; অলীক কল্পনা বা সামান্য অভিমান ব্যতীত অন্য কোন কারণে করুণার চক্ষে প্রায় জল দেখি নাই, এইবার ঐ অভাগিনী আন্তরিক মনের কষ্টে কাঁদিল। ছেলেবেলা হইতেই সে কখনো অনাদর উপেক্ষা সহ্য করে নাই,আজ আদর করিয়া তাহার অভিমানের অশ্রু মুছাইবার আর কেহই নাই। অভিমানের প্রতিদানে তাহাকে এখন বিরক্তি সহ্য করিতে হয়। যাহা হউক করুণা আর বড় একটা খেলা

করা বেড়ায় না, সেই পাকীটে লইয়া অন্তঃপুরের বাগানে বসিয়া থাকে। নরেন্দ্র মাঝে মাঝে কলিকাতায় গেলে দেখিয়াছি এক এক দিন করুণা সমস্ত জ্যোৎস্না রাত্রি বাগানের সেই বাঁধা ঘাটটির উপরে শুইয়া আছে, কতকি ভাবিতেছে জানিনা, ক্রমে তাহার নিদ্রাহীন নেত্রের সম্মুখ দিয়া সমস্ত রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

নরেন্দ্র যেমন অর্থ ব্যয় করিতে লাগিল, তেমনি ঋণও সঞ্চয় করিতে লাগিল। সে নিজে এক পয়সাও সঞ্চয় করিতে পারে নাই, টাকার উপর তাহার তেমন মায়াও জন্মে নাই, তবে এক পরিবারের মুখ চাহিয়া লোকে অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করে, তা নরেন্দ্রের সে সকল ঝামেলাই আসে নাই। একটু আধটু করিয়া যথেষ্ট ঋণ সঞ্চিত হইল। অবশেষে এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ঘর হইতে দুটা একটা জিনিষ বন্ধক রাখিবার প্রয়োজন হইল।

করুণার শরীর অসুস্থ হইয়াছে। অনর্থক কতক গুলা অনিয়ম করিয়া তাহার পীড়া উপস্থিত হইয়াছে। নরেন্দ্র কহিল, সে দিবারাত্র এক পীড়া লইয়া লাগিয়া থাকিতে পারে না; তাই বিরক্ত হইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল। এদিকে করুণার তত্ত্বাবধান করে কে তাহার ঠিক নাই; পণ্ডিত মহাশয় যত্নাদি করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতেই বা কি হইবে? করুণা কোন প্রকার ঔষধ খাইতে চায় না, কোন নিয়ম পালন করে না। করুণার পীড়া বিলক্ষণ বাড়িয়া উঠিল; পণ্ডিত মহাশয় মহা বিব্রত হইয়া নরেন্দ্রকে আসিবার জন্য এক চিঠি লিখিলেন। নরেন্দ্র আসিল, কিন্তু করুণার পীড়া বৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া না, কলিকাতায় গিয়া তাহার এত ঋণ বৃদ্ধি হইয়াছে যে চারিদিক হইতে পাওনাদারেরা তাহার নামে নালিশ আরম্ভ করিয়াছে, গতিক ভাল নয় দেখিয়া নরেন্দ্র সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

নরেন্দ্রের এবার কিছু ভয় হইয়াছে, দেশে ফিরিয়া আসিয়া ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে। এবং মদের পাত্রের মধ্যে মনের সমুদয় আশা ডুবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। আর কাহার সঙ্গে দেখা করে নাই, কথা কহে নাই, তাহার সে ঘরটিতে কাহারো প্রবেশ করিবার যো নাই। নরেন্দ্র যেরূপ রুক্ষ ও সেরূপ কথায় কথায় বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে, চাকর বাকররা তাহার কাছে ঘেঁষিতেও সাহস করে না। পীড়িতা করুণা খাদ্যাদি গুছাইয়া ধীরে ধীরে সে ঘরে প্রবেশ করিল, নরেন্দ্র মহা রুক্ষ হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, কে তাহাকে সে ঘরে আসিতে কহিল? একথার উত্তর আর কি হইতে পারে? তাহার পরে পিশাচ যাহা কহিল তাহা কল্পনা করিতেও কষ্ট বোধ হয়, পীড়িতা করুণাকে এমন নিষ্ঠুর পদাঘাত করে যে সে সেই খানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, নরেন্দ্র সে ঘর হইতে অন্যত্র চলিয়া গেল।

অল্পদিনের মধ্যে করুণার এমন আকার

পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে যে, তাহাকে দেখিলে সহসা চিনিতে পারা যায় না। তাহার সে শীর্ণ বিবর্ণ বিষণ্ণ মুখখানি দেখিলে এমন মায়া হয় যে, কি বলিব। নরেন্দ্র এবার তাহার উপর যত দূর অত্যাচার করিবার তাহা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সরলা সমস্তই নীরবে সহ্য করিতেছে, একটি কথা কহে নাই, নরেন্দ্রের নিকটে এক মুহূর্ত্তের জন্য রোদনও করে নাই; এক দিন কেবল অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া অনেক ক্ষণ নরেন্দ্রের মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আমি তোমার কি করিয়াছি?" নরেন্দ্র তাহার উত্তর না দিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়।

দশম পরিচ্ছেদ।

এক বার ঋণের আবর্ত্ত মধ্যে পড়িলে আর রক্ষা নাই। যখনি কেহ নালিশের ভয় দেখাইত, নরেন্দ্র তখনই তাড়াতাড়ি অন্যের নিকট হইতে অপরিমিত সুদে ঋণ করিয়া পরিশোধ করিত। এইরূপে আসল অপেক্ষা সুদ বাড়িয়া উঠিল, নরেন্দ্র এবার অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল, নালিশ দায়ের হইল, সমনও বাহির হইল। এক দিন প্রাতঃকালে শুভ মুহূর্ত্তে নরেন্দ্রের নিদ্রা ভঙ্গ হইল ও ধীরে ধীরে শ্রীঘরে বাস করিতে চলিলেন।

বেচারী করুণা না খাওয়া না দাওয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া একাকার করিয়া দিল. কি করিতে হয় কিছুই জানে না, অধীর হইয়া বেড়াইতে লাগিল। পণ্ডিত মহাশয় এ কুসংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু কি করিতে হইবে, সে বিষয়ে তাঁর করুণা অপেক্ষা অধিক জানিবার কথা নহে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নিধিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; নিধি কিনিষ পত্র বিক্রয় করিয়া ধার শুধিতে পরামর্শ দিল। এখন বিক্রয় করে কে? সে স্বয়ং তাহার ভার লইল। করুণার অলঙ্কার অল্পই ছিল, পূর্ব্বেই নরেন্দ্র তাহার অধিকাংশ বন্ধক দিয়াছে ও বিক্রয় করিয়াছে, যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল সমস্ত আনিয়া দিল। নিধি সেই সমুদয় অলঙ্কার ও অন্যান্য গার্হস্থ্য দ্রব্য অধিকাংশ নিজে যৎসামান্য মূল্যে, কোন কোনটা বা বিনামূল্যেই গ্রহণ করিল ও অবশিষ্ট বিক্রয় করিল। পণ্ডিত মহাশয় ত কাঁদিতে বসিলেন, ভয়ে কষ্টে করুণা অধীর হইয়া উঠিল। বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাওয়া গেল তাহাতে পণ্ডিত মহাশয় নিজের সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশ দিয়া দেয়-অর্থ কোন প্রকারে পূরণ করিয়া দিলেন। নরেন্দ্র কারাগার হইতে মুক্ত হইল, কিন্তু ঋণ হইতে মুক্ত হইল না। তদ্ভিন্ন এই ঘটনায় তাহার কিছুমাত্র শিক্ষাও হইল না। যে রকম করিয়াই হউক না কেন, এখন মদ নহিলে তাহার আর চলে না। করুণার প্রতি কিছুমাত্র সদয় হয় নাই, করুণা গার্হস্থ্য দ্রব্যাদি কেন অমন করিয়া বিক্রয় করিল, তাহাই লইয়া নরেন্দ্র করুণাকে যথেষ্ট পীড়ন করিয়াছে।

গদাধর ও স্বরূপ এখানে আসিয়াও

ছুটিয়াছে। সেবারকার প্রহারের পরও গদাধরের অন্তঃপুর-সংস্কার-প্রিয়তা কিছুমাত্র কমে নাই, বরঞ্চ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেখানেই যাউক না কেন সেখানেই তাহার ঐ চিন্তা, নরেন্দ্রের দেশেও তাঁহার সেই উদ্দেশেই আগমন, ইচ্ছা আছে এখানেও দুই একটি সৎউদাহরণ রাখিয়া যাইবেন। পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধুদের পাইয়া নরেন্দ্র বিলক্ষণ আমোদ করিতে লাগিলেন। স্বরূপ ও গদাধরের নিকট আরো অনেক ঋণ করিলেন, তাহারা জানিত না যে নরেন্দ্র লক্ষ্মী ভ্রষ্ট হইয়াছে, সুতরাং বিশ্বস্তচিত্তে কিঞ্চিৎ সুদের আশা করিয়া ধার দিল। গদাধরের হস্তে এই বার একটি কাজ পড়িয়াছে; নরেন্দ্রের মুখে সে কাত্যায়নী ঠাকুরাণীর সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিতে পাইয়াছে, শুনিয়া সে মহা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বিবাহিত স্ত্রী পুরুষের মধ্যে এত বয়সের তারতম্য কোন হৃদয় সম্পন্ন মনুষ্য সহ্য করিতে পারে না; বিশেষতঃ সমাজ সংস্কারই যাহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, হৃদয়ের প্রধান আশা, অবকাশের প্রধান ভাবনা, কার্য্যক্ষেত্রের প্রধান কার্য্য, তাহারা সমাজের এ সকল অন্যায় অবিচার কোন মতেই সহ্য করিতে পারে না। ইহা সংশোধনের জন্য, এপ্রকার অন্যায় রূপে বিবাহিত স্ত্রীলোকদিগের কষ্ট নিবারণের জন্য, সংস্কারকদিগের সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করা কর্ত্তব্য, এবং আমাদের কাত্যায়নী দেবীর উদ্ধারের জন্য গদাধর সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতেই প্রস্তুত আছেন। আর যখন স্বরূপ বাবু তাঁহার ক্ষুদ্র কবিতাবলী পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন, তাহার মধ্যে "রাহুগ্রাসে চন্দ্র" নামে একটি কবিতা পাঠ করিয়াছিলাম, তাহাতে, যে বিধাতা কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, কোকিলে কুরূপ দিয়াছেন, তাঁহাকে যথেষ্ট নিন্দা করিয়া একটি বিবাহ বর্ণনা লিখিত ছিল, আমরা গোপনে সন্ধান লইয়া শুনিয়াছিলাম যে, তাহা কাত্যায়নী ঠাকুরাণীকেই লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয়, অনেক সমালোচক নাকি তাহাতে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

প্রাপ্ত গ্রন্থ।

মৃন্ময়ী।—পণ্ডিত গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। আমরা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া সংপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছি। পাঠকগণ 'মৃন্ময়ী' নাম শুনিলে সহসা মনে করিতে পারেন যে, পুস্তকখানি কোন প্রকার নাটক অথবা আখ্যায়িকা সংক্রান্ত, "মৃন্ময়ী" তাহার নায়িকা, বস্তুতঃ তাহা নহে। এখানি আর্য্যজাতির সিদ্ধান্ত বা গণিত শাস্ত্রোক্ত ভূগোলবিদ্যার সার সঙ্কলন গ্রন্থ। ইহাতে গ্রহ ভ্রমণ, পৃথিবীর আকার সংস্থান প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় ব্যক্ত আছে। বিদেশীয়দিগের সিদ্ধান্তের সহিত সামঞ্জস্য

করিয়া লেখায় গ্রন্থখানি উপাদেয় ও আদরের বস্তু হইয়াছে সংশয় নাই, এরূপ গ্রন্থ যত অধিক প্রচারিত হইবে ততই মঙ্গল। কেননা দেশীয় পুরাতত্ত্বের মর্য্যাদা দেখিতে পাইলে সেই সূত্রে লোকের ক্রমশঃ স্বদেশানুরাগ অঙ্কুরিত হইতে পারে।

পুরাবৃত্তাদি শাস্ত্র বিশদ না থাকাতে মাধ্যাকর্ষণবাদী এতদ্দেশীয় ইংরাজী পাঠকেরা আপনাদের পূর্ব্বপিতামহদিগকে ভ্রমান্ধ বলিয়া উপেক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। রায়মহাশয় দেখাইয়া দিয়াছেন যে, নিউটনের বহু পূর্ব্বেও এদেশের লোকেরা পৃথিবীর ঐ আশ্চর্য্য শক্তির বিষয় অবগত ছিলেন। সূর্য্য-কিরণে প্রতিফলিত হইয়াই যে চন্দ্র প্রকাশমান হন, তাহারও প্রমাণ দেখান হইয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই মতটি আমাদের দেশে প্রচলিত। বৈদিক ঋষিরাও উহা জ্ঞাত ছিলেন। যথা—

চন্দ্রমা অপ্স্বন্তরা সুপর্ণো ধাবতে দিবি।

(ঋগ্বেদ ১সংকুৎস্য ঋষিরত্রোক্ত)

জলময় মণ্ডলের মধ্যে বর্ত্তমান সূর্য্যরশ্মিযুক্ত চন্দ্রমা দ্যুলোকে ধাবিত হইতেছেন।

পার্থিবচ্ছায়া দ্বারা যে গ্রহণ হয়, তাহাও বৈদিক ঋষিরা জানিতেন। অত্রি গোত্রের ঋষিরা ইহার প্রথম জ্ঞাতা। লোকের শ্রদ্ধা বৃদ্ধির নিমিত্তে বৈদিক বাক্যের সহিত মৃণ্ময়ীর সম্বন্ধ বন্ধন করিলে সমধিক সুখের বিষয় হইত।

গ্রন্থকার একস্থলে বলিয়াছেন "পঞ্চাল রাজধানী অহিচ্ছত্রের চিহ্নও নাই" কিন্তু অহিচ্ছত্র পঞ্চাল রাজধানী বলিয়া বোধ হয় না, মহাভারত দৃষ্টে বোধ হয় যে অহিচ্ছত্র হস্তিনার নিকটবর্ত্তী এবং তাহা হস্তিনার পূর্ব্বাংশে অবস্থিত ছিল। কারণ উদ্যোগ পর্ব্বে লিখিত আছে যে, প্রথমতঃ দ্রুপদ রাজা সন্ধির নিমিত্ত স্বয়ং পুরোহিতকে প্রেরণ করেন। পুরোহিত পাঞ্চালের রাজধানী হইতে হস্তিনায় আসিয়া দেখিলেন যে, হস্তিনায় তিলার্দ্ধ স্থান নাই, সৈন্য সামন্ত পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং তদ্ভিন্ন

"তথা রোহিতকারণ্যং মরুভূমিশ্চ কেবলা।
অহিচ্ছত্রং কালকূটং গঙ্গাকূলঞ্চ ভারত॥"

এই সকল প্রদেশও কুরুসৈন্যে পরিপূর্ণ, অতএব যদি অহিচ্ছত্র পাঞ্চাল রাজধানী হইল তথা হইতে দ্রুপদ-পুরোহিত হস্তিনায় আসিয়া আবার কোন্ অহিচ্ছত্রে কুরুসেনার স্কন্ধাবার দেখিবেন? যাহাই হউক এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা অতিমাত্র প্রীত হইলাম। এবং বোধ হয় সাধারণেও ইহা আদরের সহিত গৃহীত হইবে।

কোরকে কীট। বা সমাজ চিত্র। উপন্যাস। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ৸৹ আনা মাত্র। প্রকৃতিবাদ যন্ত্রে মুদ্রিত। এ গ্রন্থখানি হইতে এক স্থল উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"স্বামী—যত্নে রত্নহার; মনের অভিলাষ; চিন্তায় কল্পনা। ভক্তিতে গুরু; ব্যথায় ব্যথিত; প্রণয়ে প্রণয়ী। স্বামী সুখের সুখী; দুঃখের দুঃখী, বিপদে বান্ধব।

তৃষ্ণায় জল ; জলে তরণী ; অগ্নিতে জল। স্বামী—জলমগ্নে সন্তরণ ; গৃহদাহে পলায়ন; সর্পদংশনে মণিমন্ত্র। স্বামী—গ্রীষ্মে শীতল বীজন ; বর্ষায় সুখশয্যা, শরতের চাঁদ। স্বামী—হেমন্তে গাত্র-বস্ত্র ; শীতের আগুন; বসন্তে. মলয়ানিল।

কুসুম কলিকা।—শ্রী প্রসন্নকুমার ঘোষ প্রণীত। বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। "রমণীর কেশের প্রতি" নামক চতুর্দ্দশপদী কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিলাম!!

প্রাচীন মিসর বাসী, স্বদেশ প্রিয়তা
দেখাইতে ধরাতলে, করিত যেমন
স্বদেশেতে চিরবাস, পেয়েও পক্কতা,
দেহে অপরূপ বাস করিয়া ধারণ,
হে রমণী কেশদল! তোমরা তেমন
জন্ম স্থান প্রতি দৃঢ় অনুরাগ ভরে,
উৎপাটিত হইয়াও, কর গো ধারণ—
রজ্জুরূপ, নারীশিরে থাকিবার তরে!
ভবের ভূষণ হোয়ে, অসীম আদরে,
সাধে কি গো নারীকুল করেন ধারণ
তোমাদের কালো রূপ মস্তক উপরে?
তোমরা করিতে পাও শ্যামাঙ্গে লেপন
দেবতার অভীপ্সিত গন্ধদ্রব্য চয়,
নারী সনে ভাল বাসা করি বিনিময়।

পাদুকা নামক কবিতাটিতে পাদুকার সহিত আধুনিক ভারতবর্ষবাসীগণের যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ তুলনা করা হইয়াছে তাহা সর্ব্বাংশে বেশ মিলিয়া গিয়াছে।

ভানুসিংহের কবিতা।

সখিরে—পিরীত বুঝবে কে?
আঁধার মরমক, আঁধার কাহিন (১)
বোলব, শুনবে কে?
রাধিকার অতি অন্তর বেদন
কে বুঝবে অয়ি সজনী,
কে বুঝবে সখি রোয়ত রাধা
কোন সুখে দিন রজনী?
কলঙ্ক রটায়ব অনি সখি রটাও (২)
কলঙ্ক নাহিক মানি,
সকল তেয়াগব লভিতে শ্যামক
একঠো আদর বাণী।

মিনতি করিলো সখি শত শত বার, তু (৩)
শ্যামক না দিহ গালি,
শীল মান কুল, অপনি সজনি হম
চরণে দিয়াছি ঢালি।
সখিলো
বৃন্দাবন কো দুরুজন মানুষ
পিরীত নাহিক জানে,
বৃথাই নিন্দা কাহে রটাওত
হমার শ্যামক নামে?
কলঙ্কিনী হম রাধা, সখিলো
ঘৃণা করহ জনি (৪) মনমে,

(১) কাহিনী।
(২) সখি! যদি কলঙ্ক রটাইতে চাও তবে রটাইও।
(৩) তুমি।
(৪) যদি।

ন আসিও তব, কবহুঁ সজনি লো
হমার আঁধা ভবনমে ॥
কহে ভানু অব—বুঝবে না সখি
কোহি মরম কো বাত.
বিরলে শ্যামক, কহিও বেদন,
রক্ষে রাখয় মাথ !

সতিমির রজনী, সচকিত সজনী,
শূন্য নিকুঞ্জ অরণ্য !
কলয়িত মলয়ে, সুবিজন নিলয়ে
বালা বিরহ-বিষণ্ণ !
নীল আকাশে, তারক ভাসে
যমুনা গাওত গান,
পাদপ মরমর, নির্ঝর ঝরঝর
কুসুমিত বল্লি বিতান।
তৃষিত নয়ানে, বন-পথ পানে
চায় বিয়াকুল বালা,
দেখ ন পাওয়ে, আঁখি ফিরাওয়ে
গাঁথে বন-ফুল মালা।
কুঞ্জে কুঞ্জে, বিহঙ্গ পুঞ্জে
সহসা গাওল গান,
মঞ্জু তরঙ্গিনী, গঙ্গা-সঙ্গিনী,
সহসা বহল উজান!
বকুল কলাপে, ভৃঙ্গ আলাপে
সহসা প্রফুল্ল বল্লি,
ফুটল মঞ্জুল বঞ্জুল মঞ্জরী
ফুটল হসন্ত মল্লি।
সহসা রাধা, হরষে উলসিত
দূরে ফেলল মালা,
কহল "সজনি শুন, বাঁশরি বাজে
কুঞ্জে আওল কালো !
চমকি গহন নিশি, দূর দূর দিশি
বাজত বাঁশি সুতানে !
কণ্ঠ মিশাওল ঢল ঢল যমুনা
কল কল কল্লোল গানে !
হসিত বয়ানে ফুল্ল নয়ানে
কুঞ্জে আওল কালা,
সঙ্গিনী মেলই, নাচল গাওল
উলসিল রাধিক বালা ॥
কহতহ ভানু—শুন গো কানু
পিয়াসিত গোপিনী প্রাণ।
তোঁহার প্রেমক বিমল অমৃত রস
হরষে করবে পান ॥

সম্পাদকের বৈঠক।

বায়রণের কথোপকথনকালীন উক্তি।

অমরত্ব।—আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসই জীবনের দুঃখকষ্ট নিবারণের একমাত্র প্রকৃত ঔষধ।

যশের যন্ত্রণা।—কোন গ্রন্থ জনসমাজে সমাদৃত হইলে তাহার লেখক চিরকালের জন্য অসুখী হয়েন। ইহাতে তাঁহার যশ-তৃষ্ণা এতদূর বর্দ্ধিত হয় যে, তাঁহার মন হইতে শান্তি চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হয়। তাঁহার একটি গ্রন্থ জনসমাজে আদৃত হওয়ায় তিনি উৎসাহিত হইয়া আরও অনান্য

গ্রন্থ লিখিতে সচেষ্ট হয়েন; লোকেও প্রত্যাশা করে যে, তাঁহার প্রথম গ্রন্থ অপেক্ষা পরবর্ত্তী গ্রন্থগুলি আরও উৎকৃষ্ট হইবে। এই জন্য নিরাশা উপস্থিত হয়। কারণ লোকের আশা এতদূর উত্তেজিত হয় যে, তাহা কিছুতেই পূর্ণ হয় না। বিশেষতঃ আজ কালের এইরূপ ধরণ যে, গ্রন্থকারের একটি রচনাও যদি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট হয়—তাহা হইলে আর তাঁহার রক্ষা নাই—তাঁহার পূর্ব্ব রচিত যদি ৫০ খানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ থাকে তথাপি একটি নিকৃষ্ট গ্রন্থ তাঁহার পূর্ব্ব-কীর্ত্তির অপলাপ করে।

জীবন।—জীবনের স্বল্পতা লইয়া লোকে আক্ষেপ করে; জীবন অতি দীর্ঘ বলিয়া বরং তাহাদিগের আক্ষেপ করা উচিত। কারণ জীবন-চক্রের অর্দ্ধ পথে যাইতে না যাইতেই জীবনের সমস্ত সুখ তিরোহিত হইয়া যায়। যে সকল ছলনার অস্তিত্বে জীবন ভারবহ বলিয়া বোধ হয় না, সেই সকল ছলনাগুলি চলিয়া গিয়া যখন গম্ভীর উপদেষ্টা অভিজ্ঞতা আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করে, তখন আর জীবনে কি সুখ? তাহার পূর্ব্বেই যাহারা মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় তাহারা অতি ভাগ্যবান্। যৌবন যখন জীবন-তরণীর হাল ধরিয়া থাকে, প্রবৃত্তি স্রোত যখন তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়—অভিজ্ঞতা তখন তফাৎ থাকেন। কিন্তু যখনি যৌবন পলায়ন করে ও প্রবৃত্তির বেগ মন্দীভূত হয়, যখন অভিজ্ঞতার সাহায্য আর প্রয়োজন হয় না, তখনি অভিজ্ঞতা আসিয়া অতীতের জন্য আমাদিগকে তিরস্কার করিতে থাকেন, বর্ত্তমানের প্রতি বিরক্তি জন্মাইয়া দেন, এবং ভবিষ্যতের জন্য ভয় প্রদর্শন করেন।

বিজনতা।—বিজনতায় একটি মাত্র দোষ আছে। নির্জ্জনে থাকিলে আপনাকে আপনি অত্যন্ত বড় মনে হয়। কিন্তু জনসমাজ আমাদের নিজ দোষ প্রতিক্ষণে স্মরণ করাইয়া দেয়।

উন্মাদ।—এসংসারে পাগলামির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব পাগলামির তিনটি সোপান আছে।—এই তিন সোপানের ভিন্ন ভিন্ন তিনটী নাম আছে,—ছিট্‌গ্রস্ততা, বাতিকগ্রস্ততা ও উন্মাদ। খেয়াল, রুচি বা ব্যবহার বিষয়ে অন্য অপেক্ষা একটু তফাৎ হইলেই লোকে তাহাকে ছিট্‌গ্রস্ত বলে—আরও অধিক তফাৎ হইলে তাহাকে বাতিকগ্রস্ত বলে; এবং যখন এই প্রভেদটী একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে তখনই তাহা উন্মাদ হইয়া দাঁড়ায়। প্রতিভাশালী ব্যক্তি মাত্রই একটু ছিটগ্রস্ত।

আত্মনির্ভর।—অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞান আমাদের অন্তরে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক। জনসমাজে মিশিলে এই উপকারটী সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যুবকদিগের এই একটী বিষম দোষ যে তাহারা অন্যের মতে নিতান্ত অতর্কিত ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে। কিন্তু যুবকের পক্ষে ইহার বিপরীত আচরণই লোকে প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করে।

কিন্তু আমি বলি আপনার বিবেচনার উপরেই নির্ভর করিবে। যদি তুমি জান যে

তোমার একটু বিবেচনা শক্তি আছে তবে অন্যের পরামর্শ চাইবে না। তোমার কাছে কোন বিষয় অজ্ঞাত থাকিলে অবশ্য অন্যের নিকট তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পার। কেন না, কোন বিষয়ে তোমা অপেক্ষা আর এক জনের বেশি জানা থাকিতে পারে। তাই বলিয়া যার তার নিকটে পরামর্শ চাইতে পারো না। পরামর্শ চাহিবার অর্থই এই, যে তুমি তোমার নিজের বিবেচনা শক্তির উপর নির্ভর করিতে পার না। যদি কোন বিশেষ কার্য্য সাধনে তোমার নিজের বিবেচনা শক্তির অভাব অনুভব কর, তাহা হইলে সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবারই প্রয়োজন নাই।

ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক।—ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিকের মধ্যে অনেক প্রভেদ। একজন ভবিষ্যতের জন্য বর্ত্তমানকে বিসর্জ্জন করেন,—আর একজন বর্ত্তমানের জন্য ভবিষ্যৎকে বিসর্জ্জন করেন।

প্রেম।—অধিক বয়সে হাম্‌রোগ যেরূপ সাঙ্ঘাতিক, প্রেম রোগও সেইরূপ।

রাজশাসনের নিগূঢ়তথ্য।—রাজনৈতিক সততা বলিয়া কোন পদার্থ মূলেই নাই। একজন রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি নিজে কি বিশ্বাস করেন তাহা লইয়া কিছুই আইসে যায় না। তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে তিনি অন্যকে কি পরিমাণে বিশ্বাস করাইতে পারেন। ইহাই রাজকীয় ব্যাপারের গূঢ় মর্ম্ম।

কবিতা-প্রবণ প্রকৃতি।—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে কবিতাপ্রবণ-প্রকৃতিতে কি একটী উপাদান আছে যাহা সুখের নিতান্ত বিরোধী। যাহার প্রকৃতি কবিতাপ্রবণ সে নিজেও সুখী হয় না—তাহার সম্পর্কীয় লোকদিগকেও সুখী হইতে দেয় না।

প্রতিভা ও জন-সমাজ।—জনসমাজ ও প্রতিভা এই দুইটী পরস্পর বিরোধী পদার্থ। প্রতিভা, জনসমাজের সহিত অধিক কিম্বা ঘনিষ্ট সংস্রবে আসিলে প্রায়ই অধোগতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু রসিকতা ও কার্য্যপটুতা সম্বন্ধে সেরূপ নহে। এই দুইটী গুণ জনসমাজের ঘর্ষণেই উত্তেজিত ও বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

বাল্যসখী।

এই তো সুরমা নন্দন কাননে,
কত যে করেছি খেলা,
দেখিতে দেখিতে, জানিনে কেমনে,
কাটিয়া যাইত বেলা।
তরু মূলে মূলে, ফুল তুলে তুলে,
কহেছি লুকানো কথা,
সুখেতে হেসেছি, কেঁদেছিও সুখে
দুজনে পেয়েছি ব্যথা।

উড়াইয়া অলি, তুলি বেল-কলি,
তুলিয়ে কত কি ফুল,
কুসুমের সাজে, সাজাইতে তোরে,
গেঁথেছি মালিকা দুল।
আহালো কতই, হরষিত হৃদে,
কতই আমোদে মেতে,
লতিকার বিয়ে, দিয়েছি যতনে,
অশোক তমাল সাথে।

সরযূর কূলে, বসে দুজনায়,
গাঁথিতে গাঁথিতে মালা,
পাপড়ি ভাসায়ে দেখিতাম সুখে
কেমন করিত খেলা।

মলয় সমীর, ফুল ছুঁয়ে তোর,
দোলাত কানের ফুল,
মৃদুল মৃদুল, ওমুখ চুমিয়া
দুলিত অলক চুল।

মরি কি মধুর, সাজিত তখন,
কমল বদন খানি,
উজলিয়া রূপে, কুসুম কানন,
শোভিতিস্ বন-রাণী।

আবার যখন, সাঁজের গগণে
পরিয়া তারকা মালা,
দেখা দিত বিধু, ছড়াইত মধু,
জোছনায় করি আলা।

মনে আছে সখি! চাঁদিমা হইতে
ও মুখ লাগিত ভাল,
মরি মরি এ রূপের কাছে,
জোছনা ও যেন কাল।

ও কেমন কথা, বলিয়া সোহাগে,
হাসিতে সরম হাসি,
অমনি লাজের রকতিম মুখে,
চুমিতাম রাশি রাশি।

কোকিল, পাপিয়া, পিউ পিউ কুহু
ডাকিয়া মোহিত প্রাণ,
সেই মধু সুরে, মিলাইয়া বীণা
দুজনে গেয়েছি গান।

আপনা ধ্বনিতে, মোহিত হইয়া,
আপনা হয়েছি হারা,
ভুলেছি জগতে, আছে আর কেহ
আমরা দুইটি ছাড়া।

হৃদয় দুইটি, একটি সুরেতে,
বাঁধা গো আছিল হেন,
ছুঁইলে একটি হৃদয়ের তার,
দুইটি কাঁপিত যেন।

সারাদিন গেছে, বনেতে কাটিয়ে,
দুজনে বনের বালা—
জানিতাম না তো, সরলে আমরা,
কেমন বিষাদ জ্বালা।

সে সুখের দিন, কোথায় এখন,
সজনি লো বল দেখি,
হৃদয়ের ধন, তুই লো কোথায়
আমি বা কোথায় সখি!

একটি বোঁটায়, দুইটি কুসুম,
আছিল কেমন ফুটি,
কে ছিঁড়িল আহা, একটি গো তার
একটি হৃদয় টুটি,

সকলি ত হায়, তেমনি রয়েছে,
তেমনি ফুটিছে ফুল,
এ ফুলে ও ফুলে, মধু খেয়ে খেয়ে,
ছোটে ত মধুপকুল।

সেই তো বহিছে, তেমনি করিয়া,
সমীরণ মৃদু মৃদু,
সেই তো তারকা, উজলে বিমান,
অমৃত ঢালিছে বিধু।

পাপিয়া কোকিল, গাহিছে সেই তো,
কেন নাহি মোহে প্রাণ,
কেন আর সখি, নাহি মন উঠে,
গাইতে লো কোন গান!

সেই তো হোথায়, বীণা আছে পড়ে,
ছুঁইতে পারিনে আর,
কতদিন হতে, কি বলিব সখি,
নীরব আছে ও তার,

দুই দিনে বালা, সকলি ফুরাল,
ঘুচিল গো ছেলে বেলা,
ফুরাইল সুখ, ফুরাইল দুঃখ
ফুরালো সাধের খেলা।

শ্ব—

বোম্বাই রায়ৎ।

বঙ্গদেশে ভূমি সম্পর্কীয় চিরস্থায়ী বন্দবস্ত বঙ্গসমাজের ইষ্টজনক কি অনিষ্টজনক এই বিষয় লইয়া সর্ব্বদাই বাদানুবাদ শ্রবণ করা যায়। অধিকাংশ আঙ্গ্লো-ইণ্ডিয়ানের মত এই যে এ বন্দবস্ত ভাল হয় নাই। ইহাতে জমিদারদিগের ধনাগমের সুবিধা হইয়াছে বটে কিন্তু প্রজাদিগের অকল্যাণ। ইহা যে কেবল বঙ্গদেশের প্রজাগণের দুরবস্থার মূলকারণ তাহা নহে কিন্তু ইহাতে সমুদয় ভারতবর্ষের ক্ষতি। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের স্পৃহনীয় রাজস্ব জমিদারের ঘরে যাইতেছে এবং সে ক্ষতি পূরণ করিবার জন্য ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের উপর অযথোচিত করভার ন্যস্ত হইতেছে। তাহার দৃষ্টান্তে তাঁহারা বলেন যে দেখ বঙ্গদেশের আয়তন ও বসতি অনুসারে তাহা হইতে যে নির্দ্ধারিত রাজস্ব আদায় করা হয়, বোম্বাইয়ের আয়তন ও বসতির তুলনায় তাহা হইতে তদপেক্ষা অধিক টাকা নিষ্পীড়িত হইতেছে ও যত দিন এ বন্দবস্ত বিদ্যমান থাকিবে ততদিন এই রূপ চলিবে। এই সকল লোকের বাক্য কতদূর যুক্তিসিদ্ধ তাহা নির্ণয় করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। ইহা নিশ্চয় যে ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট বঙ্গ দেশে নিজ ভূস্বত্ব কতকটা শিথিল করিয়া এই ক্ষণে অনুতাপ করিতেছেন। অন্যান্য অনেক কৃতবিদ্য লোকের মত এই যে বঙ্গদেশের যাহা কিছু উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি দেখা যায় সে কেবল এই চিরস্থায়ী বন্দবস্তের প্রসাদে। বঙ্গদেশে জমিদার ও প্রজামধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, অন্যান্য স্থলে গবর্ণমেণ্ট ও প্রজার মধ্যে সে সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। ধনী জমিদার রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ। অন্ন-চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া দেশের উন্নতি সাধনে তিনি সময় পান ও তাহার যোগ্য উপায় অবলম্বন করিতে পারেন। সে যাহা হউক এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে এই বন্দবস্তে যেমন জমিদারের লাভ সেই অনুসারে প্রজার কল্যাণ কি না? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি প্রস্তুত নহি. কেন না বঙ্গদেশের প্রজাদের অবস্থা কিরূপ সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে বোম্বাই প্রদেশে ভূমি সম্বন্ধে যে নিয়ম তাহাতে প্রজারা যে সুখে আছে তাহা বোধ হয় না। এখানকার অস্থায়ী বন্দবস্ত বশতঃ ও অন্যান্য কারণে প্রজাদের উপর লক্ষ্মী অপ্রসন্না সন্দেহ নাই ও অনেকের বিশ্বাস এই যে চিরস্থায়ী বন্দবস্ত তাহাদের দারিদ্র্য মোচনের এক প্রধান উপায়।

এ প্রদেশে প্রজাদের যে দুরবস্থা তাহা কাহারো অবিদিত নাই। তাহাদের অধিকাংশই আপাদ মস্তক ঋণগ্রস্ত—ও কোন বৎসর অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি কি অন্য কোন উৎপাত উপস্থিত হইলে তাহাদের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা থাকে না। এক বৎসর

শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত জন্মিলে তাহাদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া যায়, এতটুকু সঙ্গতি নাই যে তাহার বলে তাহারা দৈবের ক্ষণস্থায়ী বিঘ্ন সকল অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারে। এই দুর্ভিক্ষে তাহার পরিচয় বিলক্ষণ পাওয়া গিয়াছে। মহারাষ্ট্র দেশে মহাজনদের বিরুদ্ধে যে রায়তদের বিদ্রোহ সংঘটিত হয় তাহা বোধ করি পাঠকগণ শুনিয়া থাকিবেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এই বিপ্লব উপস্থিত হয়। ঐ বৎসরে মে মাসের দ্বাদশ দিবসে পুণা জিলায় সুপা নামক গ্রামে ইহার প্রথম সূত্রপাত। সে দিন হাটের দিন, পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী হইতে অনেক লোকজনের সমাগম হইয়াছে, এমন সময় সহসা বণিক ও মাড়ওয়ারীর দোকানে লুটপাট আরম্ভ হইল। রায়তেরা ঐ সকল দোকানদারদের খাতাপত্র, কাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী একত্রিত করিয়া জ্বালাইয়া দেয়। এই বিদ্রোহের সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র জিলার মাজিষ্ট্রেট-পদাতিক ও অশ্বারোহী পুলিস সিপাহি ও এক দল সৈনা সমভিব্যাহারে সুপায় গিয়া উপস্থিত হন—এদিকে পুলিসের অধ্যক্ষ তাঁহার দলবল লইয়া উপস্থিত। তাঁহাদের যত্নে গ্রামের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রায় ৬।৭০০০ টাকার সামগ্রী উদ্ধার করা যায়—শতাধিক রায়ত গ্রেফ্‌তার হয় ও তাহাদের মধ্যে সাব্যস্ত অপরাধীগণ মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক দণ্ডিত হয়। এই বিপ্লব সংবাদ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া অন্যান্য গ্রামেও এই অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। এ সকলেরই লক্ষণ একই প্রকার, রায়তেরা মহাজনদের নিকট হইতে তাহাদের খৎ-পত্র কাড়িয়া লইয়া ভস্মসাৎ করে ও মহাজনেরা কাগজ পত্র বাহির করিতে বিলম্ব করিলে তাহাদের উপর নানাবিধ অত্যাচার করে। কাগজ পত্রই মহাজনদের প্রখর অস্ত্র,ইহার জ্বালায় অস্থির হইয়া প্রজারা ভাবিল—এই কাগজগুলা জ্বালাইয়া দিতে পারিলেই আমরা পরিত্রাণ পাই। এই রূপে শত শত দলিল দস্তাবেজের ধ্বংশ—ও অনেকানেক মহাজনের নাক কান কর্ত্তন, দ্রব্যাদি লুণ্ঠণ আরম্ভ হইল। পুণা হইতে অহমদনগরের স্থানে স্থানে এই উৎপাত প্রবেশ করে। পরিশেষে কর্ত্তৃপুরুষ ও পুলিষের যত্নে বিদ্রোহানল প্রশমিত হয়। ইহাতে মহারাষ্ট্রীয় মহাজনদের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল কিন্তু এক উপকার এই হয় যে তথাকার রায়তদের অবস্থার প্রতি গবর্ণমেণ্টের বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। এই বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য কয়েক জন প্রবীন ও বিচক্ষণ জুডিসিয়াল ও রেবেনিউ কর্ম্মচারীর এক কমিসন নিযুক্ত হয় ও কমিসনরগণ বিস্তর অনুসন্ধানের পর অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট প্রেরণ করেন। তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, রায়তদের দারিদ্র্য নিবন্ধন কষ্ট ও দুর্দ্দশার সীমা নাই। জুডিসিয়ল মেম্বরেরা বলেন—রায়তেরা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ভারে প্রপীড়িত, তাহার লাঘব করা কর্ত্তব্য—রেবেনিউ মেম্বরদের মতে আদালত ও মকদ্দমার হাঙ্গামেই রায়তের সর্ব্বনাশ—ভূমিসংক্রান্ত নিয়ম সং-

শোধন করা কর্ত্তব্য। এই সকল রিপোর্টের কি হইল এখন আর তাহার বিশেষ কিছু শুনা যায় না। রিপোর্টাবলীর চিরনিদ্রার স্থান —অকেজো কাগজের ঝুড়িতে তাহার গতি না হইলে রক্ষা। আশা হয় না, কমিসনরগণ রায়তের দুর্গতি নিবারণের যে সকল উপায় নিরূপন করিয়াছেন তাহা অচিরাৎ অবলম্বিত হইয়া তাহাদের যত্ন ও পরিশ্রম সার্থক হইবে। তালুকদার, জাইগীরদার প্রভৃতি বড় বড় জমিদারদের ঋণ মুক্তি লাভ উদ্দেশে ভূরি ভূরি আইন বর্ধিত হইতেছে কিন্তু গরীব রায়তের পক্ষে হইয়া কেহ কোন কথা কহিলে তাহাতে সহজে কর্ণপাত প্রত্যাশা করা যায় না।

বোম্বাই অঞ্চলে অধিকাংশ ভূমি সম্বন্ধে রয়তওয়ারী বন্দবস্ত দৃষ্ট হয়। এই বন্দবস্তের দোষ গুণ বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বোম্বাই প্রদেশের রেবেনিউ কার্য্য-প্রণালী কিরূপ তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত করা সঙ্গত বোধ হইতেছে।

নিম্নলিখিত কর্ম্মচারীদিগের হস্তে রেবেনিউ কার্য্য পরিচালনের ভার সমর্পিত। *

কর্ম্মচারী	মোট মাসিক বেতন সংখ্যা
৩ জন রেবিনিউ কমিসনর	১০০০০
১২ জন বরিষ্ঠ (সিনিয়র) কলেক্টর	২৭৯০০
৬ জন কনিষ্ঠ (জুনিয়র) কলেক্টর	১০৮০০
১৫ জন প্রথম সহকারী কলেক্টর	১৩৫০০
১৫ জন দ্বিতীয় সহকারী কলেক্টর	১০৫০০
৩৫ জন ডিপুটী কলেক্টর	১৪০০০

*Revenue Handbook Bombay

ইঁহারাই স্থায়ী কর্ম্মকর্ত্তা—এতদ্ব্যতীত কতক গুলি অতিরিক্ত সহকারী কলেক্টর আবশ্যকমতে স্থানে স্থানে নিযুক্ত হয়। ইঁহাদের সর্ব্বশুদ্ধ মাসিক বেতন সংখ্যা ১ জানুয়ারি ১৮৭৭ পর্য্যন্ত—২৩,৪১৪ টাকা।

সিন্ধুদেশ ও নিম্ন বোম্বাই সহরের স্বতন্ত্র বন্দবস্ত। তাহা ছাড়িয়া দিলে এই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ব্রিটিষ রাজ্য অষ্টাদশ কলেক্টরেটে বিভক্ত ও তাহা উল্লিখিত কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক প্রশাসিত। ইঁহাদের মোট বেতন সংখ্যা মাসিক এক কোটিরও অধিক টাকা।

প্রতি কলেক্টরেট কতকগুলি তালুকে বিভক্ত ও প্রত্যেক তালুকের প্রধান রেবেনিউ কর্ত্তৃপুরুষ এক এক জন মামলতদার, গ্রামস্থ অপরাপর রেবেনিউ কর্ম্মচারীগণ তাঁহার অধীন।

এত দিন পর্য্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে দুই জন রেবেনিউ কমিসনর নিযুক্ত ছিলেন।—সম্প্রতি মধ্য ভাগের জন্য এক জন তৃতীয় রেবেনিউ কমিসনর নিযুক্ত হইয়াছেন। রেবেনিউ কমিসনরগণ পুলিষেরও প্রধান অধ্যক্ষ। পূর্ব্বে তাঁহাদের নাম 'রেবেনিউ ও পুলিষ কমিসনর' ছিল। সম্প্রতি তাঁহাদের হস্তে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় সংস্থানের * রাজকার্য্য তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত হইয়া তাঁহাদের উপাধি 'কমিসনরে' পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কতকগুলি

* মহারাষ্ট্র দেশে Stateকে সংস্থান কহে।

'পোলিটিকল এজেণ্ট' যাঁহাদিগের সহিত পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পত্র লেখালেখি চলিত তাঁহাদিগকে এক হিসাবে কমিসনরের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে—এই নিয়ম এক বৎসরের জন্য ধার্য্য হইয়াছে—এক বৎসর কাল কিরূপ চলে তাহা দেখিয়া পরে তাহার স্থায়িত্ব নির্ণীত হইবে। কমিসনরদের হস্তে মাজিস্ট্রেটের কোন অধিকার নাই।—রেবেনিউ সংক্রান্ত তত্ত্বাবধান তাঁহাদের প্রধান কার্য্য। শীত কালে তাঁহারা নিজ নিজ বিভাগ পরিদর্শনার্থে বাহির হইয়া কলেক্টরদের কাজকর্ম্ম হিসাবপত্র পর্য্যবেক্ষণ করেন। প্রত্যেক কমিসনরের অধীনস্থ কনিষ্ঠ কর্ম্মচারীদিগের উপর এক জন সহকারী কমিসনর প্রতিষ্ঠিত—তাঁহার পদটী ডেপুটী কলেক্টরের সঙ্গে সমান।

প্রত্যেক কলেক্টরেটে এক এক জন কলেক্টর বিরাজিত—তিনিই আবার জিলার মাজিস্ট্রেট। জিলার মধ্যে তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। কলেক্টর নাম তাঁহার কার্য্যের ঠিক উপযোগী নয়। এই নামে লোকে মনে করিতে পারে যে গবর্ণমেণ্টের কর আদায়ের জন্যই তিনি নিযুক্ত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তীর্ণ—জিলার মধ্যে এমন কোন কার্য্য নাই যাহা তাঁহার দৃষ্টিবহির্ভূত। বাণিজ্য ব্যবসার উন্নতি অবনতি—অর্থের হ্রাস বৃদ্ধি—ন্যায় ও শিক্ষাকার্য্যের শৃঙ্খলা—পথ ঘাট বাপী সেতু কোথায় কি আবশ্যক—নগরের শোভা সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন—যে কোন কার্য্য তাঁহার অধীনস্থ প্রজাপুঞ্জের সুখসমৃদ্ধি সাধনের উপযোগী তাহার সহিত তাঁহার কোন না কোন রূপ সংস্রব দেখা যায়। তাঁহার পক্ষে পরাধিকার চর্চ্চা বর্জ্জনীয় সত্য বটে কিন্তু তাঁহার নিজাধিকারবহির্ভূত কোন বিষয়ে বিশৃঙ্খলা দেখিলে বিবেচনা পূর্ব্বক হস্তক্ষেপ করা তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইতে পারে।

কলেক্টর এবং সহকারী কলেক্টরের পদে সিবিলিয়ন ভিন্ন কেহ আরূঢ় হইতে পারে না। সহকারী কলেক্টরের সংখ্যা অল্প কমাইয়া তাহাদের বেতন বৃদ্ধির সম্প্রতি এক প্রস্তাব হইয়াছে। কোন এক জন সিবিলিয়ন প্রথমে এদেশে পদার্পণ করিলে তিনি অতিরিক্ত সহকারীরূপে এক জন কলেক্টরের অধীনে নিযুক্ত হন। পরে প্রথম ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইলে তিনি দুই এক তালুকের স্বতন্ত্র অধিকার প্রাপ্ত হয়েন ও ক্রমে কার্য্যগতিকে তাঁহার পদের উন্নতি ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বেতন বৃদ্ধি হয়। গ্রামস্থ ও তালুকের কর্ম্মচারীদিগের তত্ত্বাবধান সহকারী কলেক্টরের প্রধানকার্য্য। তিনি কোন গ্রামে গিয়া তাম্বু করিলে প্রথমে পাটেল, কুলকর্ণী অথবা তলাটীদিগকে ডাকাইয়া তাহাদের সহিত কৃষিকার্য্য রাস্তা বিদ্যালয় ও অন্যান্য বিষয়ে কথোপকথন করিয়া গ্রামের কার্য্য বিবরণ অবগত হইবেন। পরে কোন এক দিবস স্থির করিয়া রায়তদের দাখিলা প্রভৃতি হিসাব পত্র অবলোকন করিবেন—তাহারা যে খাজানা দিয়াছে তাহা তাহাদের রসিদ পুস্তকে

বরাবর জমা হইয়াছে কিনা ও তাহাদের কাহার কি আবেদন কাহার কি অভাব এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করিবেন। গ্রামের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি করিবেন —বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবেন, ক্ষেত্রের সীমা চিহ্ন সকল ঠিক আছে কি না বিশেষ করিয়া দেখিবেন। পথ ঘাট বাঁধ পুষ্করিণী ছায়াতরু সকলের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। গ্রাম পরিদর্শন কার্য্য সমাপ্ত হইলে তালুকের কাচারী, ত্রিজুরি—মামলতদারদিগের হিসাবপত্র পরীক্ষা করা ইত্যাদি অনেক কাজ সহকারী কলেক্টরের হস্তে। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও বিচক্ষণতার উপর তালুকের মঙ্গল অনেকটা নির্ভর করে।

ডেপুটী কলেক্টরগণ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত—সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ডেপুটীর বেতন মাসিক ৭০০ টাকা। তাঁহাদের কর্ম্ম বিভাগ অনুসারে—হজুর ডেপুটী ও জিলার ডেপুটী এই দুই নাম। ডিষ্ট্রিক্ট ডেপুটী ও সহকারী কলেক্টরের কার্য্য ও অধিকার প্রায় সমান। হজুর ডেপুটী জিলার প্রধান নগরীতে ত্রিজুরী সম্বন্ধীয় ও অপর কার্য্যে নিযুক্ত—তদ্ভিন্ন আর আর রেবেনিউ কর্ম্মচারীগণ বর্ষার চতুর্মাস ভিন্ন নিজ নিজ বিভাগ পরিদর্শনের জন্য তাম্বু করিয়া ভ্রমণে বাহির হয়েন।

তালুকের প্রধান রেবেনিউ কর্ম্মাধ্যক্ষের নাম মামলতদার। তাঁহার অধীনস্থ গ্রাম সমূহের কর্ম্মচারী মুখী পাটেল কুলকর্ণী তলাটি প্রভৃতি তাঁহার আজ্ঞাবহ। তালুকের ত্রিজুরী যাহাতে গ্রাম-সংগৃহীত গবর্ণমেণ্টের সমুদয় খাজানা জমা হয় ও যাহা হইতে তালুকের নির্দ্দিষ্ট সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়—তাহার তিনিই পরিরক্ষক। কলেক্টর যাহাকে যে কোন অনুজ্ঞা প্রেরণ করেন তাহা মামলতদারের হস্ত হইতেই প্রেরিত হয়। মামলতদারদের কার্য্যকুশলতা অনুসারে তাহাদের প্রথম দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের অধিকার। তদ্ব্যতীত পোলিষাধ্যক্ষ— এঞ্জিনিয়র — ইন্সপেক্টিং পোষ্টমাষ্টর—রেজিষ্ট্রার প্রভৃতি সকলেরই মামলতদারের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে পত্রব্যবহার চলে। কোন ভ্রমণকারী যে কোন কারণেই হউক তাঁহার সীমার মধ্যে আগমন করিলে তাঁহার যখন যাহা আবশ্যক হয় তাহার জন্য মামলতদারের নিকটেই আবেদন করেন। ইহা হইতে মামলতদারের উপরে যে অগাধ কার্য্যভার নিপতিত তাহা সহজে বোধগম্য হইতে পারে। রেবেনিউ ও অপরাপর বিষয়ে মামলতদার যে কোন আদেশ প্রদান করেন তালুকের সহকারী কলেক্টরের নিকট সামান্যতঃ তাহার আপীল হইয়া থাকে। কেবল এক বিষয়ে কোন আপীল নাই। কোন ব্যক্তি কোন ভূমি, বাটী বৃক্ষ ফসল জলকর অথবা তাহার উপস্বত্ব হইতে অন্যায় পূর্ব্বক বেদখল হইলে অথবা ইজারার মেয়াদ অতীত হওয়াতে কি অন্য কোন কারণে ঐ সকল বস্তুর ন্যায্য অধিকার লাভে স্বত্ববান্ হইয়া তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে সে প্রতিকার উদ্দেশে ছয় মাসের মধ্যে মামলতদারের নিকটে আবেদন করিতে পারে ও তাহা হইলে মামলতদার তাহাকে তাহার

অপহৃত বিষয় প্রত্যর্পণ অথবা তাহার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করিতে পারেন। অথবা এই সকল বিষয়ের অধিকার হইতে কেহ কাহাকেও বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিলে মামলতদার সেই আশঙ্কিত অত্যাচার নিবারণের জন্য আজ্ঞা প্রচার করিতে পারেন। বোম্বাই আইন অনুসারে এই সকল মকদ্দমার উপর আপীল নাই। মামলতদার ব্রাহ্মণের গরুটির মত মহোপকারী ভৃত্য অথচ অল্পাহারে সন্তুষ্ট। তাঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—প্রধান শ্রেণীস্থ মামলতদারের মাসিক ২৫০ টাকা বেতন মাত্র।

যে সকল কর্ম্মচারী গবর্ণমেণ্ট ও রায়তের মধ্যবর্ত্তী তাঁহাদের শৃঙ্খল সম্পূর্ণ বাঁধিতে গেলে গ্রামস্থ কর্ম্মচারীগণের উল্লেখ করিতে হয়। এই সকল কর্ম্মচারীর মধ্যে পটেল ও কুলকর্ণী প্রধান। গুজরাটে পটেলের নাম মুখী ও কুলকর্ণীর নাম তলাটি। আক্ষেপের বিষয় এই যে পল্লীগ্রামে পূর্ব্বে কাজ কর্ম্মের যে সুন্দর ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল ইংরাজদের আমলে তাহা ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইতেছে। মুখী অথবা পটেল গ্রামের মণ্ডল—রায়ত ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যে সকল কার্য্যস্থলে পটেল রায়তের মুখপাত স্বরূপ। পটেলের কার্য্য অনুসারে সে—হয় রেবেনিউ কিম্বা পুলিষ পটেল—এই দুই নাম ধারণ করে। রেবেনিউ পটেলের হস্তে গ্রামের রেবেনিউ সংক্রান্ত সমুদয় কার্য্য; পুলিষ পটেলের হস্তে পুলিষ সংক্রান্ত সমুদয় কার্য্য। কোন কোন স্থলে রেবেনিউ ও পুলিষ পটেলের কার্য্য একই জনের হস্তে সন্ন্যস্ত দেখা যায়। রায়তের নিকট হইতে সরকারী খাজানা আদায় করা ও সর্ব্বতোভাবে গ্রামের কৃষি ও আর আর বিষয়ের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রাখা পটেলের কার্য্য। অনেক স্থলে পটেলের কার্য্য বংশানুক্রমে পিতা হইতে পুত্রে অবতীর্ণ হয় ও কার্য্যকর্ত্তা চাকরা জমী বেতনের বিনিময়ে উপভোগ করে।

গ্রামের হিসাবপত্র রাখা কুলকর্ণীর কার্য্য। ইহার পদও অনেক স্থলে বংশ পরম্পরাগত ও ভূমির উপস্বত্ব হইতে সে তাহার বেতন লাভ করে। পটেলের ন্যায় তাহার হস্তেও সরকারী খাজানা আদায়ের ভার। খাজানা আদায় হইলে তাহা সরকারী দফ্তরে প্রবিষ্ট করা ও রায়তকে তাহার দাখিলা লিখিয়া দেওয়া এই সকল লেখা পড়ার কর্ম্ম কুলকর্ণীর। সে সচরাচর ব্রাহ্মণজাতীয়—গ্রামের সরকারী খাজাঞ্চি। গ্রামে যে খাজনা জমা হয় তাহা মামলতদারের তহবিলে ও তথা হইতে হজুর ত্রিজরীতে প্রেরিত হয়।

এতদ্ভিন্ন আরো কতকগুলি কর্ম্মচারী আছে যাহাদের কতক গবর্ণমেণ্টের কাজে—কতক গ্রামবাসীদের কাজে নিযুক্ত যথা,—

মাহার—গ্রাম পরিরক্ষক—ফসল ও সীমাচিহ্ন রক্ষণাবেক্ষণ করা, সরকারী খাজানা তালুকের তহবিলে পৌঁছান—চিটিপত্র লইয়া যাওয়া—পথিকদিগের পথ প্রদর্শন করা ইত্যাদি তাহার কার্য্য। ছুতার—লৌহকার—স্বর্ণকার কুম্ভকার—পদ্ধার ধোবা নাপিত—দৈবজ্ঞ—গুরু ইত্যাদি লোকেরা

প্রচলিত প্রথা অনুসারে গ্রামবাসীদের কার্য্য করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ চাকরা জমী উপভোগ করে, কেহ বা অন্য প্রকারে রায়তদের নিকট হইতে কিছু কিছু করিয়া পায়।

এইত রেবেনিউ কার্য্যপ্রণালী ও কর্ম্মচারীদিগের বিষয় বলা হইল—এই ক্ষণে রায়তওয়ারী বন্দবস্ত বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। এই বন্দবস্তের মূলসূত্র এই যে রাজার প্রজার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ—তাহাদের মধ্যবর্ত্তী কোন ভূস্বামী নাই। গবর্ণমেণ্টই জমীদার ও গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের প্রতি খাজানা আদায়ের ভার অর্পিত। পূর্ব্বে দেশীয় রাজার রাজত্ব কালে সামান্যতঃ এইরূপ বন্দবস্ত ছিল যে, জমিতে যে শস্য জন্মিত রাজা তাহার অমুক অংশ গ্রহণ করিতেন, এক্ষণে আর শস্যের ভাগ গৃহীত হয় না। তাহার পরিবর্ত্তে নির্দ্ধারিত খাজানা মুদ্রাকারে গ্রহণ করা হয়। এই রূপে সমুদয় রয়তওয়ারী ভূমির জরীপ হইয়া তাহার জমাবন্দি নিরূপিত হইয়াছে। ১৮৩৬—৩৭ শালে এই অঞ্চলে জরীপ কার্য্য আরম্ভ হয় ও তৎসংক্রান্ত নিয়মাবলি ১৮৬৫ শালের বোম্বায়ের ১ আইনে বিধিবদ্ধ হয়।

জরীফ বিভাগের কার্য্য দুই জন কমিসনর, কতকগুলি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও তাহার অনেকানেক সহকারী ও কনিষ্ঠ কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হয়। জরিপ ও জমাবন্দি করিবার নিয়ম এই —

১ ভূপৃষ্ঠ পরিমাপ।

২ জমীর গুণাগুণ নির্ণয় করিয়া তাহা শ্রেণীবদ্ধ করা।

৩ জল বায়ু বাজার কৃষির অবস্থা অনুসারে এক এক তালুক কতকগুলি পল্লী শ্রেণীতে বিভাগ করা।

৪ প্রতি পল্লী শ্রেণীর জন্য এই রূপ নিয়মে কর নির্দ্ধারণ করা যে তাহা রায়তেরা সহজে দিতে পারিবে—অর্থাৎ যাহা দিয়া উদ্বৃত্ত মুনফায় তাহারা কৃষিকার্য্যের খরচ ও উন্নতি সাধনে সমর্থ হইতে পারে।

৫ প্রতি ক্ষেত্রের জমা নিরূপণ করা।

১ ভূমি পরিমাপ, এই কার্য্যের জন্য এক দল আমীন তালুকে প্রেরিত হয়—তাহারা এক এক গ্রামের আবাদ যোগ্য ও পতিত ভূমি কতকগুলি ক্ষেত্রে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ক্ষেত্রের এক এক 'জরীপ নম্বর' স্থির করে। এক জোড়া বলদের সাহায্যে যত বিঘা জমী সহজে আবাদ করা যায় তাহা দেখিয়া ক্ষেত্রের আয়তন স্থির হয়। তত বিঘা হইতে তাহার দ্বিগুণ বিঘা পর্য্যন্ত এক এক ক্ষেত্রের আয়তন, তাহা অপেক্ষা নিতান্ত বড়ও নয় ছোটও নয়। আয়তন স্থির হইলে ক্ষেত্রের সীমা নিরূপিত ও সীমাচিহ্ন স্থাপন ও রক্ষণের বিহিত উপায় অবলম্বিত হয়।

২ ক্ষেত্রের গুণাগুণ নির্ণয়।

ইহার জন্য পরে আর এক দল আমীন আসিয়া উপস্থিত হয়। যে সকল কারণে জমী মূল্যবান হয়—যেমন তাহার ফলবত্তা

—জল সেকের সুবিধা, বাজারের সন্নিধি ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য করিয়া কোন্ ক্ষেত্র কোন্ শ্রেণীতে গণ্য তাহারা তাহা নির্ণয় করে। ইহার অনেক নিয়ম আছে, প্রস্তাব বাহুল্য-ভয়ে তৎপ্রদর্শনে ক্ষান্ত হইলাম।

৩—৪ পল্লী শ্রেণীতে তালুকের বিভাগ —ও প্রত্যেক শ্রেণীর দর নিরূপণ।

ইহা খাজানার হারের সমীকরণের জন্য। ক্ষেত্রের জরীপ নকসা ও শ্রেণী বিভাগ হইয়া গেলে গ্রাম শ্রেণীতে তালুকের বিভাগ করা হয় ও প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য তাহার উর্দ্ধ সংখ্যক হার নিরূপিত হয়। এই হার জরীপ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কমিসনরের মত লইয়া বন্ধন করেন ও গবর্ণমেণ্টের সম্মতি হইলে তাহা ধার্য্য হয়।

৫ প্রতি ক্ষেত্রের জমা নিরূপণ—

তৎপরে প্রত্যেক ক্ষেত্রের শ্রেণী অনুসারে তাহার জমাবন্দির হার নির্দ্ধারিত হয়। উত্তর পশ্চিম ও অন্যান্য প্রদেশে গ্রামের জন্য সদর খাজনা ধার্য্য হয় ও প্রত্যেকের জমির জন্য কত করিয়া খাজানা দিতে হইবে তাহা গ্রামনিবাসীগণ আপনাদের মধ্যে স্থির করে কিন্তু বোম্বায়ে সেরূপ নয়। —এখানে আমীনেরা প্রত্যেক ক্ষেত্রের জন্য খাজানার দেয় অংশ স্থির করিয়া দেন। ক্ষেত্রের জমাবন্দি স্থির হইলে গ্রামস্থ রায়েত দিগকে আহ্বান করিয়া প্রতি জনের জমির জন্য যাহা দেয় তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া—তাহাদের কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে তাহার নিষ্পত্তি করা—অনধিকৃত জমীর উপর প্রজাপত্তন—রেবেনিউ আমীন দিগের এই শেষ কার্য্য। এই সকল শেষ হইলে কাগজপত্র কলেক্টরের নিকট প্রেরিত হয় ও আমীনগণ দল বল লইয়া অন্যত্রে প্রস্থান করেন। এই যে জমাবন্দী সম্বন্ধীয় বন্দবস্ত ইহাকেই রায়তওয়ারী বন্দবস্ত কহে—সামান্যতঃ ইহা ত্রিংশৎ বৎসর-ব্যাপী।

এই রূপে যে খাজানা নির্দ্দিষ্ট হয় রায়ত তাহা যত দিন দিতে পারিবে ততদিন জমির উপর তাহার সম্পূর্ণ স্বত্ব—সে স্বত্ব হইতে কেহই তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। তাহার সে স্বত্ব বিক্রী কিম্বা বন্ধক দ্বারা হস্তান্তর করা তাহার সম্যক্ ইচ্ছাধীন—যে তাহা গ্রহণ করিবে সেই গবর্ণমেণ্টের নিয়মিত খাজানার জন্য দায়ী। জমাবন্দি সম্বন্ধীয় বন্দবস্ত সাধারণতঃ ত্রিংশৎ বৎসর ব্যাপী—তাহার মধ্যে জমার হ্রাস বৃদ্ধি হইবার নহে। সেই কাল অতীত হইলে রায়তের অযত্নসম্ভূত কারণে জমি ও ফসলের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন বন্দবস্তে গবর্ণমেণ্টের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। সেই খাজানা দিতে পারিলে রায়তের স্বত্ব বংশ পরম্পরা চালিত হইবার কোন বাধা নাই।

ক্রমশঃ

শ্রী স—

কবিকাহিনী।

চতুর্থ সর্গ।

"এ তবে স্বপন শুধু? বিম্বের মতন
আবার মিলায়ে গেল নিদ্রার সমুদ্রে!
সারারাত নিদ্রার করিনু আরাধনা,
যদি বা আইল নিদ্রা এ শ্রান্ত নয়নে,
মরীচিকা দেখাইয়া গেল গো মিলায়ে!
হা স্বপ্ন, কি শক্তি তোর, এহেন মুরতি
মুহূর্ত্তের মধ্যে তুই ভাঙ্গিলি, গড়িলি?
হা নিষ্ঠুর কাল, তোর এ কিরূপ খেলা,
সত্যের মতন তুই গড়িলি প্রতিমা,
স্বপ্নের মতন তাহা ফেলিলি ভাঙ্গিয়া?
কালের সমুদ্রে এক বিম্বের মতন
উঠিল, আবার গেল মিলায়ে তাহাতে?
না না, তাহা নয় কভু, নলিনী, সেকিগো
কালের সমুদ্রে শুধু বিম্বটির মত!
যাহার মোহিনী মূর্ত্তি হৃদয়ে হৃদয়ে
শিরায় শিরায় আঁকা শোণিতের সাথে,
যত কাল রব বেঁচে যার ভাল বাসা
চিরকাল এহৃদয়ে রহিবে অক্ষয়,
সে বালিকা, সে নলিনী, সে স্বর্গ-প্রতিমা,
কালের সমুদ্রে শুধু বিম্বটির মত
তরঙ্গের অভিঘাতে অম্নিল মিশিল?
না না, তাহা নয় কভু, তা যেন না হয়!
দেহ-কারাগার মুক্ত সে নলিনী এবে
সুখে দুখে চিরকাল সম্পদে বিপদে,
আমারিই সাথে সাথে করিছে ভ্রমণ।
চির হাস্যময় তার প্রেম দৃষ্টি মেলি,
আমারি মুখের পানে রয়েছে চাহিয়া।
রক্ষক দেবতা সম আমারি উপরে
প্রশান্ত প্রেমের ছায়া রেখেছে বিছায়ে।
দেহ-কারাগার মুক্ত হইলে আমিও
তাহার হৃদয় সাথে মিশাব হৃদয়।
নলিনি, আছ কি তুমি, আছকি হেথায়?
এক বার দেখা দেও, মিটাও সন্দেহ!
চিরকাল তরে তোরে ভুলিতে কি হবে?
তাই বল্ নলিনীলো, বল্ একবার!
চিরকাল আর তোরে পাব না দেখিতে,
চির কাল আর তোর হৃদয়ে হৃদয়
পাব না কি মিশাইতে, বল্ একবার!
মরিলে কি পৃথিবীর সব যায় দূরে?
তুই কি আমারে ভুলে গেছিস্ নলিনি?
তাহোলে নলিনি, আমি চাইনা মরিতে।
তোর ভাল বাসা যেন চিরকাল মোর
হৃদয়ে অক্ষয় হোয়ে থাকে গো মুদ্রিত
কষ্ট পাই পাব, তবু চাইনা ভুলিতে!
তুমি নাহি থাক যদি তোমার স্মৃতিও
থাকে যেন এ হৃদয় করিয়া উজ্জ্বল!
এই ভাল বাসা, যাহা হৃদয়ে মরমে
অবশিষ্ট রাখে নাই এক তিল স্থান,
একটি পার্থিব ক্ষুদ্র নিঃশ্বাসের সাথে
মুহূর্ত্তে হবে কি তাহা অনন্তে বিলীন?
যত কাল বেঁচে রব, রবে যা' হৃদয়ে
মুহূর্ত্তে না পাল্টিতে আঁখির পলক
ক্ষণ-স্থায়ী কুসুমের সুরভের মত
শূন্য এই বায়ুস্রোতে যাইবে মিশায়ে?

হিমাদ্রির এই স্তব্ধ আঁধার গহ্বরে
সময়ের পদক্ষেপ গনিতেছি বসি,
ভবিষ্যৎ ক্রমে হইতেছে বর্তমান,
বর্তমান মিশিতেছে অতীত সমুদ্রে।
অস্ত যাইতেছে নিশি, আসিছে দিবস,
দিবস নিশার কোলে পড়িছে ঘুমায়ে।
এই সময়ের চক্র ঘুরিয়া নীরবে
পৃথিবীরে, মানুষেরে অলক্ষিত ভাবে
পরিবর্তনের পথে যেতেছে লইয়া,
কিন্তু মনে হয় এই হিমাদ্রির বুকে
তাহার চরণ-চিহ্ন পড়িছে না যেন।
কিন্তু মনে হয় যেন আমার হৃদয়ে
দুর্দান্ত সময়-স্রোত অবিরাম গতি,
নূতন গড়েনি কিছু, ভাঙেনি পুরাণো।
বাহিরের কত কি যে ভাঙ্গিল চুরিল,
বাহিরের কত কি যে হইল নূতন,
কিন্তু ভিতরের দিকে চেয়ে দেখ দেখি,
আগেও আছিল যাহা এখনো তা' আছে,
বোধ হয় চিরকাল থাকিবে তাহাই!
বরষে বরষে দেহ যেতেছে ভাঙ্গিয়া
কিন্তু মন আছে তবু তেমনি অটল।
নলিনী নাইক বটে পৃথিবীতে আর,
নলিনীরে ভাল বাসি তবুও তেমনি।
যখন নলিনী ছিল, তখন যেমন
তার হৃদয়ের মূর্তি ছিল এ হৃদয়ে
এখনো তেমনি তাহা রয়েছে স্থাপিত।
এমন অন্তরে তারে রেখেছি লুকায়ে,
মরমের মর্মস্থলে করিতেছি পূজা,
সময় পারে না সেথা কঠিন আঘাতে
ভাঙ্গিবারে এজনমে সে মোর প্রতিমা,
হৃদয়ের আঁধারের লুকানো সে ধন!
ভেবেছিনু এক বার এই যে বিষাদ
নিদারুণ তীব্র-স্রোতে বহিছে হৃদয়ে,
এ বুঝি হৃদয় মোর ভাঙ্গিবে চুরিবে,
পারেনি ভাঙ্গিতে কিন্তু একতিল তাহা,
যেমন আছিল মন তেমনি রয়েছে!
বিষাদ যুঝিয়াছিল প্রাণপণে বটে,
কিন্তু এ হৃদয়ে মোর কি যে আছে বল,
এ দারুণ সমরে সে হইয়াছে জয়ী।
গাওগো বিহগ তব প্রমোদের গান
তেমনি হৃদয়ে তার হবে প্রতিধ্বনি!
প্রকৃতি! মাতার মত সুপ্রসন্ন দৃষ্টি
যেমন দেখিয়াছিনু ছেলে বেলা আমি,
এখনো তেমনি যেন পেতেছি দেখিতে।
যা কিছু সুন্দর, দেবি, তাহাই মঙ্গল,
তোমার সুন্দর রাজ্যে হে প্রকৃতি দেবি,
তিল অমঙ্গল কভু পারে না ঘটিতে।
অমন সুন্দর আহা নলিনীর মন,
জীবন্ত সৌন্দর্য্য, দেবি, তোমার এরাজ্যে
অনন্ত কালের তরে হবে না বিলীন।
যে আশা দিয়াছ হৃদে ফলিবে তা' দেবি,
এক দিন মিলিবেক হৃদয়ে হৃদয়।
তোমার আশ্বাস বাক্যে হে প্রকৃতি দেবি,
সংশয় কখন আমি করি না স্বপনে!
বাজাও রাখাল তব সরল বাঁশরী!
গাওগো মনের সাধে প্রমোদের গান!
পাখীরা মেলিয়া যবে গাইতেছে গীত,
কানন ঘেরিয়া যবে বহিতেছে বায়ু,
উপত্যকা মধ্য যবে ফুটিয়াছে ফুল,
তখন তোদের আর কিসের ভাবনা?
দেখি চির হাস্য ময় প্রকৃতির মুখ,
দিবা নিশি হাসিবারে শিখেছিস্ তোরা,

সমস্ত প্রকৃতি যবে থাকে গো হাসিতে,
সমস্ত জগৎ যবে গাহেগো সঙ্গীত,
তখন ত তোরা নিজ বিজন কুটীরে,
ক্ষুদ্রতম আপনার মনের বিষাদে
সমস্ত জগৎ ভুলি কাঁদিস্ না বসি !
জগতের, প্রকৃতির ফুল্ল মুখ হেরি,
আপনার ক্ষুদ্র দুঃখ রহে কিগো আর ?
ধীরে ধীরে দূর হোতে আসিছে কেমন
বসন্তের সুরভিত বাতাসের সাথে
মিলিয়া মিলিয়া এই সরল রাগিণী।
একেক রাগিণী আছে করিলে শ্রবণ,
মনে হয় আমারি তা' প্রাণের রাগিণী;
সেই রাগিণীর মত আমার এ প্রাণ,
আমার প্রাণের মত যেন সে রাগিণী !
কখনো বা মনে হয় পুরাতন কাল
এই রাগিণীর মত আছিল মধুর,
এমনি স্বপন ময় এমনি অস্ফুট ;
তাই শুনি ধীরি ধীরি পুরাতন স্মৃতি
প্রাণের ভিতরে যেন উথলিয়া উঠে !"
ক্রমে কবি যৌবনের ছাড়াইয়া সীমা,
গম্ভীর বার্দ্ধক্যে আসি হোল উপনীত !
সুগম্ভীর বৃদ্ধ কবি, স্কন্ধে আসি তার
পড়েছে ধবল জটা অযত্নে লুটায়ে !
মনে হোত দেখিলে সে গম্ভীর মুখশ্রী,
হিমাদ্রি হোতেও বুঝি সমুচ্চ মহান্ !
নেত্র তাঁর বিকীরিত' কি স্বর্গীয় জ্যোতি,
যেন তাঁর নয়নের শান্ত সে কিরণ
সমস্ত পৃথিবীময় শান্তি বরষিবে।
বিস্তীর্ণ হইয়া গেল কবির সে দৃষ্টি,
দৃষ্টির সম্মুখে তার, দিগন্তও যেন,
খুলিয়া দিতগো নিজ অভেদ্য দুয়ার।
যেন কোন দেববালা কবিরে লইয়া
অনন্ত নক্ষত্রলোকে কোরেছে স্থাপিত,
সামান্য মানুষ যেথা করিলে গমন,
কহিত কাতর স্বরে ঢাকিয়া নয়ন,
"একিরে অনন্ত কাণ্ড, পারি না সহিতে !"
সন্ধ্যার আঁধারে হোথা বসিয়া বসিয়া,
কি গান গাইছে কবি, শুন কল্পনা।
"কি সুন্দর সাজিয়াছে ওগো হিমালয়,
তোমার বিশালতম শিখরের শিরে
একটি সন্ধ্যার তারা ! সুনীল গগন
ভেদিয়া, তুষারশুভ্র মস্তক তোমার !
সরল-পাদপরাজি আঁধার করিয়া
উঠেছে তাহার পরে; সে ঘোর অরণ্য
ঘেরিয়া হুহুহু করি তীব্র শীত বায়ু
দিবানিশি ফেলিতেছে বিষম নিশ্বাস !
শিখরে শিখরে ক্রমে নিভিয়া আসিল
অস্তমান তপনের আরক্ত কিরণে
প্রদীপ্ত জলদ চূর্ণ। শিখরে শিখরে
মলিন হইয়া এল উজ্জ্বল তুষার,
শিখরে শিখরে ক্রমে নামিয়া আসিল
আঁধারের যবনিকা ধীরে ধীরে ধীরে !
পর্ব্বতের বনে বনে গাঢ়তর হোল
ঘুমময় অন্ধকার। গভীর নীরব !
সাড়াশব্দ নাই মুখে অতি ধীরে ধীরে
অতি ভয়ে ভয়ে যেন চলেছে তটিনী
সুগম্ভীর পর্ব্বতের পদতল দিয়া !
কি মহান্ ! কি প্রশান্ত ! কি গম্ভীর ভাব !
ধরার সকল হোতে উপরে উঠিয়া
স্বর্গের সীমায় রাখি ধবল জটায়
জড়িত মস্তক তব, ওগো হিমালয়,
নীরব ভাষায় তুমি কি যেন একটি

গম্ভীর আদেশ ধীরে করিছ প্রচার !
সমস্ত পৃথিবী তাই নীরব হইয়া
শুনিছে অনন্য মনে সভয়ে বিস্ময়ে।
আমিও একাকী হেথা রয়েছি পড়িয়া,
আঁধার মহা-সমুদ্রে গিয়াছি মিশায়ে,
ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র নর আমি, শৈলরাজ !
অকূল সমুদ্রে ক্ষুদ্র তৃণটির মত
হারাইয়া দিগ্বিদিক্, হারাইয়া পথ,
সভয়ে বিস্ময়ে হোয়ে হত জ্ঞান প্রায়
তোমার চরণতলে রয়েছি পড়িয়া।
ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে দেখি ভেদিয়া আঁধার
শূন্যে শূন্যে শত শত উজ্জ্বল তারকা,
অনিমিষ নেত্র গুলি মেলিয়া যেন রে
আমারি মুখের পানে রয়েছে চাহিয়া।
ওগো হিমালয়, তুমি কি গম্ভীর ভাবে
দাঁড়ায়ে রয়েছ হেথা অচল অটল,
দেখিছ কালের লীলা, করিছ গণনা,
কালচক্র কত বার আইল ফিরিয়া !
সিন্ধুর বেলায় চক্ষে গড়ায় যেমন
অযুত তরঙ্গ, কিছু লক্ষ্য না করিয়া,
কত কাল আইল রে, গেল কত কাল
হিমাদ্রি, তোমার ওই চক্ষের উপরি।
মাথার উপর দিয়া কত দিবাকর
উলটি কালের পৃষ্ঠা গিয়াছে চলিয়া।
গম্ভীর আঁধারে ঢাকি তোমার ওদেহ
কত রাত্রি আসিয়াছে গিয়াছে পোহায়ে।
কিন্তু বল দেখি ওগো হিমালয় গিরি,
মানুষ সৃষ্টির অতি আরম্ভ হইতে
কি দেখিছ এই খানে দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে ?
যা' দেখিছ যা' দেখেছ, তাতে কি এখনো
সর্ব্বাঙ্গ তোমারি গিরি, উঠেনি শিহরি ?
কি দারুণ অশান্তি এ মনুষ্য জগতে,
রক্তপাত, অত্যাচার, পাপ কোলাহল
দিতেছে মানব মনে বিষ মিশাইয়া !
কত কোটি কোটি লোক, অন্ধকারাগারে
অধীনতা শৃঙ্খলেতে আবদ্ধ হইয়া
ভরিছে স্বর্গের কর্ণ কাতর ক্রন্দনে,
অবশেষে মন এত হোয়েছে নিস্তেজ,
কলঙ্ক-শৃঙ্খল তার অলঙ্কার রূপে
আলিঙ্গন ক'রে তারে রেখেছে গলায় !
দাসত্বের পদধূলি অহঙ্কার কোরে
মাথায় বহন করে পর প্রত্যাশিরা !
যে পদ মাথায় করে ঘৃণার আঘাত
সেই পদ ভক্তি ভরে করে গো চুম্বন !
যে হস্ত ভ্রাতারে তার পরায় শৃঙ্খল,
সেই হস্ত পরশিলে স্বর্গ পায় করে।
স্বাধীন, সে অধীনেরে দলিবার তরে,
অধীন, সে স্বাধীনেরে পূজিবারে শুধু !
সবল, সে দুর্ব্বলেরে পীড়িতে কেবল,
দুর্ব্বল, বলের পদে, আত্ম বিসর্জ্জিতে !
স্বাধীনতা কারে বলে জানে যেই জন
কোথায় সে অসহায় অধীন জনের
কঠিন শৃঙ্খল রাশি দিবেগো ভাঙ্গিয়া,
না, তার স্বাধীন হস্ত হোয়েছে কেবল
অধীনের লৌহপাশ দৃঢ় করিবারে।
সবল দুর্ব্বলে কোথা সাহায্য করিবে,
দুর্ব্বলে অধিকতর করিতে দুর্ব্বল,
বল তার, হিমগিরি, দেখিছ কি তাহা ?
সামান্য নিজের স্বার্থ করিতে সাধন
কত দেশ করিতেছে শ্মশান অরণ্য,
কোটি কোটি মানবের শান্তি স্বাধীনতা,
রক্তময় পদাঘাতে দিতেছে ভাঙ্গিয়া,

তবুও মানুষ বলি গর্ব্ব করে তারা,
তবু তারা সভ্য বলি করে অহঙ্কার !
কত রক্ত মাখা ছুরি হাসিছে হরষে,
কত জিহ্বা হৃদয়েরে ছিঁড়িছে বিঁধিছে !
বিষাদের অশ্রুপূর্ণ নয়ন হে গিরি,
অভিশাপ দেয় সদা পরের হরষে,
উপেক্ষা ঘৃণায় মাখা কুঞ্চিত অধর
পর অশ্রু জলে ঢালে হাসি মাখা বিষ !
পৃথিবী জানে না গিরি, হেরিয়া পরের জ্বালা,
হেরিয়া পরের মর্ম্ম-দুখের উচ্ছ্বাস,
পরের নয়ন জলে, মিশাতে নয়ন জল
পরের দুখের শ্বাসে মিশাতে নিশ্বাস !
প্রেম ? প্রেম কোথা হেথা এ অশান্তি ধামে
প্রণয়ের ছদ্মবেশ পরিয়া যেথায়
বিচরে ইন্দ্রিয়সেবা, প্রেম সেথা আছে ?
প্রেমে পাপ বলে যারা, প্রেম তারা চিনে ?
মানুষে মানুষে যেথা আকাশ পাতাল,
হৃদয়ে হৃদয়ে যেথা আত্ম অভিমান,
যে ধরায় মন দিয়া ভাল বাসে যারা
উপেক্ষা বিদ্বেষ ঘৃণা মিথ্যা অপবাদে
তারাই অধিক সহে বিষাদ যন্ত্রণা,
সেথা যদি প্রেম থাকে তবে কোথা নাই,
তবে প্রেম কলুষিত নরকেও আছে !
কেহবা রতনময় কনক ভবনে
ঘুমায়ে রয়েছে সুখে বিলাসের কোলে,
অথচ সুমুখ দিয়া দীন নিরালয়
পথে পথে করিতেছে ভিক্ষান্ন-সন্ধান !
সহস্র পীড়িতদের অভিশাপ লোয়ে
সহস্রের রক্তধারে ক্ষালিত আসনে
সমস্ত পৃথিবী রাজা করিছে শাসন,
বাঁধিয়া গলায় সেই শাসনের রজ্জু,
সমস্ত পৃথিবী তার রহিয়াছে দাস !
সহস্র পীড়ন সহি আনত মাথায়
একের দাসত্বে রত অযুত মানব !
ভাবিয়া দেখিলে মন উঠে গো শিহরি
ভ্রমান্ধ দাসের জাতি সমস্ত মানুষ !
এ অশান্তি কবে দেব, হবে দূরীভূত !
অত্যাচার গুরু ভারে হোথে নিপীড়িত,
সমস্ত পৃথিবী দেব, করিছে ক্রন্দন !
সুখ শান্তি সেথা হতে লয়েছে বিদায় !
কবে দেব এ রজনী হবে অবসান ?
স্নান করি প্রভাতের শিশির সলিলে,
তরুণ রবির করে হাসিবে পৃথিবী !
অযুত মানবগণ এক কণ্ঠে দেব,
এক গান গাইবেক স্বর্গ পূর্ণ করি !
নাইক দরিদ্র, ধনী, অধিপতি, প্রজা,
কেহ কারো কুটীরেতে করিলে গমন
মর্য্যাদার অপমান করিবে না মনে,
সকলেই সকলের করিতেছে সেবা,
কেহ কারো প্রভু নয়, নহে কারো দাস !
নাই ভিন্ন জাতি আর নাই ভিন্ন ভাষা
নাই ভিন্ন দেশ, ভিন্ন আচার ব্যাভার !
সকলেই আপনার আপনার লোয়ে
পরিশ্রম করিতেছে প্রফুল্ল অন্তরে।
কেহ কারো সুখে নাহি দেয় গো কণ্টক,
কেহ কারো দুখে নাহি করে উপহাস !
দ্বেষ নিন্দা ক্রূরতার জঘন্য আসন
ধর্ম্ম-আবরণে নাহি করে গো সজ্জিত !
হিমাদ্রি, মানুষ সৃষ্টি আরম্ভ হইতে
অতীতের ইতিহাস পড়েছ সকলি,
অতীতের দীপ শিখা যদি হিমালয়
ভবিষ্যৎ অন্ধকার পারে গো ভেদিতে,

তবে বল কবে গিরি, হবে সেই দিন
যেদিন স্বর্গই হবে পৃথ্বীর আদর্শ!
সে দিন আসিবে গিরি, এখনিই যেন
দূর ভবিষ্যৎ সেই পেতেছি দেখিতে
যেই দিন এক প্রেমে হইয়া নিবদ্ধ
মিলিবেক কোটি কোটি মানব হৃদয়!
প্রকৃতির সব কার্য্য অতি ধীরে ধীরে,
এক এক শতাব্দীর সোপানে সোপানে,
পৃথ্বী সে শান্তির পথে চলিতেছে ক্রমে,
পৃথিবীর সে অবস্থা আসেনি এখনো,
কিন্তু একদিন তাহা আসিবে নিশ্চয়।
আবার বলিগো আমি হে প্রকৃতি দেবি,
যে আশা দিয়াছ হৃদে ফলিবেক তাহা,
এক দিন মিলিবেক হৃদয়ে হৃদয়।
এযে সুখময় আশা দিয়াছ হৃদয়ে
ইহার সঙ্গীত দেবি, শুনিতে শুনিতে
পারিব হরষ চিতে ত্যজিতে জীবন।"
সমস্ত ধরার তরে নয়নের জল
রুদ্ধ সে কবির নেত্র করিল পূর্ণিত!
যথা সে হিমাদ্রি হোতে ঝরিয়া ঝরিয়া
কত নদী শত দেশ করয়ে উর্ব্বরা।
উচ্ছ্বসিত করি দিয়া কবির হৃদয়
অসীম করুণা সিন্ধু পোড়েছে ছড়ায়ে
সমস্ত পৃথিবীময়। মিলি তাঁর সাথে
জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী ভারতী
কাঁদিলেন আর্দ্র হোয়ে পৃথিবীর দুখে,
বাধ শরে নিপতিত পাখীর মরণে
বাল্মীকির সাথে যিনি করেন রোদন!
কবির প্রাচীন-নেত্রে পৃথিবীর শোভা
এখনও কিছুমাত্র হয়নি পুরাণো!
এখনো সে হিমাদ্রির শিখরে শিখরে
একেলা আপন মনে করিত ভ্রমণ।
বিশাল ধবল জটা বিশাল ধবল শ্মশ্রু,
নেত্রের স্বর্গীয় জ্যোতি গম্ভীর মূরতি,
প্রশস্ত ললাট দেশ, প্রশান্ত প্রকৃতি তার
মনে হত হিমাদ্রির অধিষ্ঠাতৃ-দেব!
জীবনের দিন ক্রমে ফুরায় কবির!
সঙ্গীত যেমন ধীরে আইসে মিলায়ে,
কবিতা যেমন ধীরে আইসে ফুরায়ে,
প্রভাতের শুক তারা ধীরে ধীরে যথা
ক্রমশঃ মিশায়ে আসে রবির কিরণে,
তেমনি ফুরায়ে এল কবির জীবন।
প্রতিরাত্রে গিরিশিরে জোছনায় বসি,
আনন্দে গাইত কবি সুখের সঙ্গীত।
দেখিতে পেয়েছে যেন স্বর্গের কিরণ,
শুনিতে পেয়েছে যেন দূর স্বর্গ হোতে,
নলিনীর সুমধুর আহ্বানের গান।
প্রবাসী যেমন আহা দূর হোতে যদি
সহসা শুনিতে পায় স্বদেশ-সঙ্গীত,
ধায় হরষিত চিতে সেই দিক্ পানে,
এক দিন দুই দিন যেতেছে যেমন
চলেছে হরষে কবি, যেই দেশ হোতে
স্বদেশ সঙ্গীত ধ্বনি পেতেছে শুনিতে।
এক দিন হিমাদ্রির নিশীথ বায়ুতে
কবির অন্তিম শ্বাস গেল মিশাইয়া!
হিমাদ্রি হইল তার সমাধিমন্দির,
একটি মানুষ সেথা ফেলেনি নিশ্বাস।
প্রত্যহ প্রভাত শুধু শিশিরাশ্রু জলে
হরিত পল্লব তার করিত প্লাবিত।
শুধু সে বনের মাঝে বনের বাতাস.
হহু করি মাঝে মাঝে ফেলিত নিশ্বাস।
সমাধি উপরে তার তরুলতা কুল

প্রতি দিন বরষিত কত শত ফুল!
কাছে বসি বিহগেরা গাইত গো গান,
তটিনী তাহার সাথে মিশাইত তান!

সান্ত্বনা।

আমার সময়ে সময়ে কেমন মন খারাপ হইয়া যায়, হয় হউক্‌গে তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু অমনি লোকে সান্ত্বনা দিতে আইসে কেন? অমনি দশ জনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি হইয়াছে, কেন হইয়াছে, করিয়া এমন বিরক্ত করিয়া তুলে যে, হাজার কষ্ট হইলেও কিছুই হয় নাই কিছুই হয় নাই করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিতে হয়, সে হাসির চেয়ে আর কষ্টকর কিছু আছে? এ হাসি হাসার অপেক্ষা যদি সমস্ত দিন রাত্রি মুখ গম্ভীর করিয়া ভাবিতে পারিতাম তবে বাঁচিয়া যাইতাম। তাহারা কি এসকল বুঝে না? হয়ত বুঝে, কিন্তু মনে করে, পাছে আমি মনে করি যে, আমি এমন মুখ বিষণ্ণ করিয়া বসিয়া আছি, তথাপি আমাকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিল না, কাজেই তাহাদের কর্ত্তব্য কাজ করিতে আসে। যেমন চিঠিতে মান্যবর, পরম পূজনীয়, প্রাণাধিক প্রভৃতি সম্বোধন পড়িবার সময় আমরা চোক্ বুলাইয়া যাই মাত্র, তখন মনে একতিলও বিশ্বাস হয় না যে, যিনি আমাকে লিখিতেছেন তিনি আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা মান্য করেন বা আমাকে পরম পূজা করিয়া থাকেন, বা আমি তাঁহার প্রাণেরো অধিক, অতীত কালের শিরোনামা-প্রস্তাবেরা উহা আমাদের বরাদ্দ করিয়া দিয়াছেন মাত্র, তেমনি উহারা আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করিতে আসে, তখন বেশ বুঝিতে পারি যে আমাকে মমতা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে না, জিজ্ঞাসা করিতে হয় বলিয়া করিতেছে, তাহাতে আমার যে কি সান্ত্বনা হয়, তাহা আমিই জানি। অধিকাংশ লোক সান্ত্বনা করিবার পদ্ধতি জানে না, তাহারা যে দুঃখে সান্ত্বনা দিতে আসে, সে দুঃখ তাহাদের সান্ত্বনা বাক্য অপেক্ষা অধিকতর মিষ্ট বোধ হয়। সান্ত্বনা দিতে হইলে প্রায়ই লোকে কহিয়া থাকে, তোমার কিসের দুঃখ? আরোত কত লোক তোমার মত কষ্ট পাইতেছে। এমন কষ্টকর সান্ত্বনা আর নাই, প্রথমতঃ যে একথা বলিয়া সান্ত্বনা দিতে আইসে, স্পষ্টই বোধ হয় আমার দুঃখে তাহার কিছু মাত্র মমতা হয় নাই; কারণ সে আমার দুঃখকে এত তুচ্ছ বলিয়া জানে, যে, এত ক্ষুদ্র দুঃখে তাহার মমতাই জন্মিতে পারে না, দ্বিতীয়ত মনে হয় যে, আমার মনের দুঃখ সে বুঝিলই না, যে সকলের সঙ্গে আমার দুঃখের তুলনা করিয়া বেড়ায়, সে আমার দুঃখের মর্য্যাদাই বুঝে নাই, আমার যেটুকু দুঃখ হইয়াছে তাহাতেই তোমার মমতা জন্মায় ত জন্মাউক্, নহিলে আর কেহ এরূপ দুঃখ পায় কি না, আর কাহাকেও এত

কষ্ট পাইতে হয় কি না, এত শত ভাবিয়া চিন্তিয়া আমার দুঃখের গুরুলঘুত্ব ওজন করিয়া তবে তুমি আমার সহিত একটুখানি মমতা করিতে আসিবে, আমার সে মমতায় কাজ নাই। যদিও মমতা উদয় হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ওই সকল ভাবনা হয়ত অলক্ষিত ভাবে হৃদয়ে কার্য্য করে; কিন্তু তাই বলিয়া মুখে ওই সকল কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিলে তাহা কষ্টকর হইয়া পড়ে, আর কাহারো হয় কি না জানি না কিন্তু আমার হয়। আমি কাহাকেও সান্ত্বনা করিতে গেলে অমন করি না, আমি হয়ত বলি যে, আহা, বাস্তবিক তোমার বড় কষ্টের অবস্থা, সে মনে করে যে, আহা তবু আমার কষ্ট একজন বুঝিতে পারিল, সে তাহাতে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে ও তখন আমার কাছে কত কথাই বলিতে থাকে, এইরূপে তাহার হৃদয়ের ভার অনেকটা লঘু হইয়া যায়। এমন করিয়া সান্ত্বনা দেওয়া আবশ্যক যে, শোকগ্রস্ত ব্যক্তি না বুঝিতে পারে যে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে আসা হইয়াছে। আমি যদি বুঝিতে পারি আমাকে কেহ সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছে, অমনি মনে হয়, ও ব্যক্তি আমার কষ্টে কষ্ট অনুভব করে নাই, ও ব্যক্তি মনে করে যে, আমার এ কষ্টে কষ্ট পাওয়া উচিত নহে, নহিলে সে আমার এ কষ্ট থামাইতে চেষ্টা করিবে কেন? যে ব্যক্তি মনে করে যে, যে কষ্টে আমি শোক করিতেছি সে কষ্ট শোকের উপযুক্ত নহে, সে ব্যক্তি আমার কষ্টে তেমন মমতা অনুভব করিতেছে না ইহা অনেকটা নিশ্চয়। সে হয়ত মনে করিতেছে যে এ কি ছেলে মানুষ! আমি হইলে ত এরূপ করিতাম না। মনে না করুক আমাকে সেইরূপ বিশ্বাস করাইতে চায়। অতটা আত্মাবমাননা স্বীকার করিয়া আমি মমতা প্রার্থনা করি না। একজন যে গম্ভীর ভাবে বসিয়া বসিয়া আমার অশ্রুজলের সমালোচনা করিতেছে ইহা জানিতে পারা অতিশয় কষ্টকর। কি! আমি যে কষ্টে কষ্ট পাইতেছি, তাহা কষ্ট পাইবার যোগ্যই নহে; আমার কষ্ট এতই সামান্য, আমি এতই দুর্ব্বল যে অত সামান্য কষ্টেই কষ্ট পাই? একথা মনে করিয়া কেহ কেহ হয়ত সান্ত্বনা পাইতেও পারে, আপনার প্রতি ধিকার দিতেও পারে ও ক্রমে দুঃখ ভুলিতেও পারে। কিন্তু আমার মত লোকও ত ঢের আছে, আমার সে সান্ত্বনাকারীর প্রতি রাগ হয়, মনে হয় কি, আমাকে এত ক্ষুদ্র ঠাহরাইতেছে? তুমি যদি আমার শোকের কারণ দেখিয়া কষ্ট পাইয়া থাক ত আইস, তোমাকে আমার মনের কথা বলি, তাহা হইলে আমার কষ্টের অনেকটা লাঘব হইবে, নহিলে তোমার যদি মনে হইয়া থাকে, দুর্ব্বল হৃদয়, অল্পেতেই কষ্ট পাইতেছে, উহাকে একটু থামাইয়া ঘুমাইয়া দিই, তবে তোমার কাজ নাই, তোমার সান্ত্বনা দিতে হইবে না। আসল কথাটা এই যে, সান্ত্বনা অনেক সময় বড় বিরক্তিজনক, অনেক সময় মনে হয় যে, আমার নিজের দুঃখের ভাবনা ভাবিবার যেটুকু সময় পাইয়াছি, একজন

আসিয়া তাহা মিছামিছি নষ্ট করিয়া দিতেছ মাত্র ; দুঃখ ভাবনা ভাবিবার সময় নষ্ট হইলে যে কষ্ট হয় না তাহা নহে, দুঃখের ভাবনা ভাবিবার সময় লোকে গোলমাল করিতে আইলে বড় কষ্ট হয়, এই জন্যই বজনে দুঃখের ভাবনা ভাবিতে ভাল লাগে। শোকার্ত্ত ব্যক্তির পক্ষে তাহার দুঃখের কারণ কষ্টের হউক কিন্তু দুঃখের ভাবনা অনেকটা সুখের, যদি তুমি তাহার দুঃখের কারণ বিনাশ করিতে পারিতে ভাল, নতুবা তাহার ভাবনার সময় অলীক সান্ত্বনা দিতে গিয়া তাহার ভাবনায় ব্যাঘাৎ দিও না।

ভ—

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

প্রজ্ঞা প্রকৃতির অভ্যন্তরে অপরিস্ফুট ভাবে বর্ত্তমান আছে, এবং তাহাই মনুষ্যে মনুষ্যে পরিস্ফুট-ভাব ধারণ করিতেছে, এ বিষয়টি স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া দেওয়া আবশ্যক।

জ্ঞান সকল-মনুষ্যতেই বর্ত্তমান আছে, কিন্তু পাত্র-বিশেষে, অবস্থা-বিশেষে কাল-বিশেষে জ্ঞান-পরিস্ফুটনের বিস্তর মাত্রা-ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞান, অসভ্য জাতিতে অপরিস্ফুট, সভ্য জাতিতে পরিস্ফুট, নিদ্রা-কালে অপরিস্ফুট, জাগ্রৎকালে পরিস্ফুট, অশিক্ষিত ব্যক্তিতে অপরিস্ফুট, শিক্ষিত ব্যক্তিতে পরিস্ফুট, শৈশবকালে অপরিস্ফুট, প্রৌঢ় বয়সে পরিস্ফুট, অধম জীবে অপরিস্ফুট, মনুষ্যে পরিস্ফুট ; এই রূপ জ্ঞানোন্মীলনের তারতম্য সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কেহ বলিতে পারেন যে, জ্ঞানের অপরিস্ফুট ভাবও যা, জ্ঞানের অভাবও তাই। পরিস্ফুটতা কি ? না প্রকাশ। অপরিস্ফুটতা কি ? না অপ্রকাশ। প্রকাশই জ্ঞানের ধর্ম্ম—ধর্ম্ম কেন—জ্ঞানের সাক্ষাৎ স্বরূপ। অতএব জ্ঞান যখন অপ্রকাশ আছে, তখন আর কেমন করিয়া বলি যে তাহা বর্ত্তমান আছে। এই প্রশ্নটির মীমাংসায় প্রবৃত্ত হই ;—

এই কাগজটি আমরা দেখিতেছি, সুতরাং দর্শনেন্দ্রিয়ে প্রকাশ পাইতে পারে এই গুণটি ইহার আছে; ঐ গুণটিকে বলা যাউক্ দৃশ্য গুণ। সমুদায় কাগজটির যেমন দৃশ্য-গুণ আছে, তাহার প্রত্যেক অংশেরও সেইরূপ দৃশ্য-গুণ আছে। মনে কর এই কাগজটিকে কোটি বা দশ কোটি অংশে বিভাগ করিলে ইহার খণ্ডাংশ-গুলি এত সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, তাহারা একেবারেই আমাদের দৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়া পড়ে। সেই খণ্ডাংশ গুলি দৃষ্টিবহির্ভূত হউক্, কিন্তু ইহা বলিতে পার না যে, দৃশ্য-গুণ তাহাদের নাই ; কেন না প্রত্যেক খণ্ডাংশের দৃশ্য-গুণ সংগ্রহ করিয়াই কাগজের সমস্তটা দৃষ্টি-পথে আবির্ভূত হইতেছে। এমন একটি অণুবীক্ষণ থাকিবার কোন বাধা নাই

যাহাতে এই কাগজের অযুত কোটি খণ্ডাংশের একাংশ পর্য্যন্ত দৃষ্টি-পথে উদ্ভাসিত হইতে পারে। ঐরূপ একটি অণুবীক্ষণ পাইলে এই কাগজের দশ কোটি খণ্ডাংশের একাংশ সহজেই দৃষ্টি-গোচর হইতে পারে। দৃষ্টি-বহির্ভূত উক্ত খণ্ডাংশের—মূলেই যদি দৃশ্য-গুণ নাই, তবে অণুবীক্ষণের মধ্য দিয়া দৃষ্ট হইতে পারে এই যে তাহার একটি গুণ দেখা গেল, তাহাও ত দৃশ্য-গুণ, তাহা কোথা যাইবে। অতএব খণ্ডাংশগুলি দৃষ্টিবহির্ভূত হইলেও এরূপ বলিতে পার না যে, মূলেই তাহাদের দৃশ্য-গুণ নাই—এই মাত্র বলিতে পার যে, সে গুণ অপরিস্ফুট অথবা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

খণ্ডাংশগুলির একেবারেই দৃশ্য-গুণ নাই এ কথা বলিলে কি দোষ হয়? না ব্যষ্টিদিগের গুণ একত্র সংগৃহীত হইয়া সমষ্টির গুণ স্থিরীভূত হইতেছে, সর্ব্বাংশের মধ্যে একটি অবহমান যোগ-সূত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে, এই সত্যটির অগৌরব করা হয়। জ্ঞান যেখানে অপরিস্ফুট বা প্রচ্ছন্ন আছে সেখানে জ্ঞানকে অবর্ত্তমান বলিলে ঠিক্ ঐ দোষটি ঘটে। নিদ্রিতাবস্থায় জ্ঞানকে অপরিস্ফুট না বলিয়া যদি অবর্ত্তমান বল তবে জাগিয়া উঠিবার সময় যে জ্ঞানোদয় হয় তাহাকে কি বলিবে? তোমার মতে, কল্যকার পুরাতন জ্ঞান ত অবর্ত্তমান হইয়াছে, একেবারেই লোপ পাইয়াছে, সুতরাং তুমি এরূপ বলিতে পার না যে, গতকল্য যে-জ্ঞান ছিল তাহাই অদ্য উদিত হইল—কল্যকার সূর্য্য যদি কল্যই লোপ পাইয়া থাকে তবে অদ্যকার সূর্য্যোদয় আর একটি সূর্য্যের নূতন-সৃষ্টি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? সুতরাং তোমার মতানুসারে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, গত কল্যকার জ্ঞান গত কল্যই বিলুপ্ত হইয়াছে, আজিকার এইযে জ্ঞান, ইহা জ্ঞানের একটি নূতন সৃষ্টি। এ অবস্থায় আজিকের জ্ঞানের সহিত কালিকের জ্ঞানের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না; কালিকে তুমি যাহা দেখিয়াছ শুনিয়াছ করিয়াছ আজিকে তাহা তোমার জ্ঞানে স্থান পাইতে পারে না। এই সকল অলীক সিদ্ধান্ত হইতে যদি অব্যাহতি চাও, তবে স্বীকার কর যে, নিদ্রার সময় জ্ঞান অবর্ত্তমান থাকে না—প্রচ্ছন্ন থাকে মাত্র।

সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রজ্ঞা বর্ত্তমান আছে—প্রজ্ঞা কোথাও অবর্ত্তমান নাই—এখন ইহা সুস্পষ্টরূপে বোধগম্য হইতে পারিবে। প্রজ্ঞা মনুষ্যে যেমন পরিস্ফুট, পশু পক্ষীতে তেমন নহে; পশু পক্ষীতে যেমন, তরু লতাতে তেমন নহে; তরু-লতাতে যেমন, ধাতু প্রস্তরে তেমন নহে, কোথাও বা অধিক পরিস্ফুট কোথাও বা অল্প পরিস্ফুট এই যা প্রভেদ—আছে সর্ব্বত্রই। জ্ঞান পরিস্ফুটনের এই যে তারতম্য,ইহা কেবল বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে নহে, একই ব্যক্তির মধ্যে কাল-ভেদে অবস্থা ভেদে দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে। জাগ্রদবস্থা অপেক্ষা স্বপ্নাবস্থাতে, স্বপ্নাবস্থা অপেক্ষা সুষুপ্তি অবস্থাতে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই

জ্ঞান অপরিস্ফুট হইয়া আইসে। সুষুপ্তির পূর্ব্ব সময় এবং সুষুপ্তি ভাঙিবার সময়, এই দুই বিভিন্ন মুহূর্ত্তের মধ্যে যেটুকু কালের ব্যবধান, সেই ব্যবধান-স্থলে জ্ঞান নাই যে এমন নহে, আছে—তবে কি না প্রচ্ছন্নভাবে। যদি সুষুপ্তির সময় জ্ঞানের অসদ্ভাব হইত, তবে সুষুপ্তির পূর্ব্ব-কালীন জ্ঞান এবং তাহার উত্তর-কালীন জ্ঞান, উভয়ই যে ধারাবাহিক একই জ্ঞান, এ সত্যটি কিছুতেই রক্ষা পাইতে পারিত না। এক ব্যক্তির জ্ঞানের সহিত যে সেই ব্যক্তির জ্ঞানান্তরের যোগ আছে, এ সত্যটির যখন অন্যথা সম্ভবে না, তখন, সুষুপ্তির সময় জ্ঞান প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান থাকে, ইহাই যুক্তি-সঙ্গত; অবর্ত্তমান থাকে—ইহা অত্যুক্তি।

সুষুপ্তির সহিত জড়ের, স্বপ্নের সহিত অধম জীবের এবং জাগ্রৎভাবের সহিত মনুষ্যের তুলনা হইতে পারে। সুষুপ্তির অভ্যন্তরে যদি জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারিল, তবে জড়ের অভ্যন্তরে কেননা তাহা প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারিবে? স্বপ্নে যদি কিয়ৎ পরিমাণে পরিস্ফুট হইতে পারিল তবে অধম জীবে কেননা পারিবে? জাগ্রৎকালের সহিত মনুষ্যের জ্ঞান-সাদৃশ্যের ত কথাই নাই। সুষুপ্তি কাল, স্বপ্ন কাল, জাগরণ কাল, এই রূপ কালভেদে জ্ঞান-বিকাশের তারতম্য সত্ত্বেও যেমন জ্ঞানের অসদ্ভাব কোন কালেই সম্ভবে না, সেইরূপ—মনুষ্য, পশুপক্ষী, উদ্ভিদ্, ধাতু-প্রস্তর প্রভৃতি পাত্র-ভেদে জ্ঞান-বিকাশের প্রভূত তারতম্য সত্ত্বেও জ্ঞানের অসদ্ভাব কুত্রাপি সম্ভবে না। অতএব প্রকৃতির অভ্যন্তরে প্রজ্ঞা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেই বল, আর অব্যক্ত রহিয়াছেই বল, যাহাই বল না কেন—আছে তাহাতে আর ভুল নাই। কিন্তু প্রজ্ঞার যদি স্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখিতে চাও, তবে মনুষ্যেতে তাহা দেখ—আপন অভ্যন্তরে মনুষ্যত্বের যে একটি আদর্শ আছে, তাহার প্রতি প্রণিধান কর—দেখিতে পাইবে।

মনুষ্যে মনুষ্যে প্রজ্ঞা কিরূপে প্রস্ফুটিত হয়? প্রজ্ঞা এমন কোন আকস্মিক জ্ঞান নহে যে, তাহা পূর্ব্বে ছিল না এক মুহূর্ত্তে অমনি আমাদের হস্তগত হইল। যেমন একখণ্ড আকাশের মধ্যে সকল প্রকার আয়তন, রেখায়তন* ক্ষেত্রায়তন† পিণ্ডায়তন‡ তন্ময়ীভূত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে যাহার প্রতি যত মনোনিবেশ করা যায় তাহাই তত পরিস্ফুট ভাব ধারণ করে, সেইরূপ প্রজ্ঞার অভ্যন্তরে সকল প্রকার মূলতত্ত্ব তন্ময়ীভূত রহিয়াছে, যাহার যেমন আলোচনা হয় তাহা সেইরূপ পরিস্ফুটতা লাভ করে। প্রজ্ঞার অভ্যন্তরে যে-সকল মূলতত্ত্ব সংগ্রথিত আছে, তাহাদের মধ্যে যে পরস্পর প্রভেদ, তাহা প্রজ্ঞার স্বগত ভেদ; আহংকারিক জ্ঞান হইতে প্রজ্ঞার যে প্রভেদ, তাহা প্রজ্ঞার স্বজাতীয় ভেদ; মনো-বৃত্তি হইতে প্রজ্ঞার যে প্রভেদ তাহা প্রজ্ঞার বিজাতীয় ভেদ। প্রজ্ঞার

* Linear extension.
† Superficial extension.
‡ Solid extension.

সহিত, আহঙ্কারিক জ্ঞানের কিরূপ ভেদাভেদ তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আহংকারিক জ্ঞানের সহিত মনোবৃত্তির কিরূপ ভেদাভেদ তাহার প্রতি একবার প্রণিধান করা হউক। মনোবৃত্তি সকলের উপর আহংকারিক জ্ঞানের এরূপ অধিকার যে, আহংকারিক জ্ঞানকে মনোবৃত্তি-সমূহের লয়স্থান, মূলপ্রদেশ, অথবা কেন্দ্র বলিলেই হয়; এবং উভয়ের মধ্যে এইরূপ একটি নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনোবৃত্তির বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইলে আহংকারিক জ্ঞান অভিভূত হয় আর আহংকারিক জ্ঞানের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইলে মনোবৃত্তি-সকল অভিভূত হয়। সূর্য্য-গ্রহণের প্রারম্ভ-কালে সূর্য্যের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া গ্রাসের পরিমাণ নিরূপণ করিতে আমরা পরাস্ত মানি কেন? না তৎকালে সূর্য্যের প্রখর জ্যোতির উত্তেজনায় আমাদের চাক্ষুষ মনোবৃত্তির এত প্রাদুর্ভাব হয় যে আমরা আপনার কর্তৃত্ব (আহংকারিক জ্ঞান) খাটাইয়া গ্রহণের গ্রাস-মাত্রা নির্ণয় করি এতটুকুও আমাদের শক্তি থাকে না। এ যেমন দেখা গেল, এমনি আর একটি নিয়ম প্রজ্ঞা এবং আহঙ্কারিক জ্ঞান উভয়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। আহঙ্কারিক জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হইলে প্রজ্ঞা অভিভূত হয়, এবং প্রজ্ঞার প্রাদুর্ভাব হইলে আহংকারিক জ্ঞান অভিভূত হয়। যাঁহারা আহংকারিক জ্ঞান খাটাইয়া প্রজ্ঞার স্বতঃসিদ্ধ সত্য আয়ত্ত করিতে যান, ঐ নিয়মটি তাঁহাদিগকে অকূল দ্বৈধসাগরে ভাষাইয়া দেয়। এ উপলক্ষে শঙ্করাচার্য্য একটি চমৎকার উপমা দিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন "মানং প্রবোধয়ন্তং বোধং মানেন যে বুভুৎসন্তি। এ ধোতিরেব দহনং দগ্ধুং বাঞ্ছন্তি তে মহাসুধিয়ঃ॥ প্রমাণকে প্রবোধিত করে, অর্থাৎ প্রমাণের প্রমাণত্ব সাধন করে, এমন যে স্বতঃসিদ্ধ মূল-জ্ঞান কি না প্রজ্ঞা, তাহাকে যাঁহারা প্রমাণ দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন, সেই মহা পণ্ডিতেরা কি করেন? না কাষ্ঠকে দহন করে যে অগ্নি, সেই অগ্নিকে কাষ্ঠ দ্বারা দহন করিতে ইচ্ছা করেন। ক্যাণ্ট নামে বিখ্যাত ইউরোপের একজন অদ্বিতীয় তত্ত্ববিৎ ঐ নিয়মটি বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। দেশকালের অতীত প্রজ্ঞাতত্ত্বকে শুদ্ধ কেবল আহংকারিক (Subjective) জ্ঞান দ্বারা প্রমাণ করিতে গেলে বাস্তবিক সত্য যে কি তাহার কিছুই নির্ণয় হয় না ইহা তিনি জলের ন্যায় স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু তিনি অবিনীত আহংকারিক জ্ঞানের ঐরূপ অরাজকতা দোষ দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, সে দোষের প্রতীকার কিরূপে হইতে পারে তাহা দেখাইতে পারেন নাই; চিকিৎসক রোগ খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে ঔষধি প্রয়োগ করিতে ইতস্ততঃ করিয়া বিভ্রান্ত হইয়াছেন। তিনি বলেন যে স্বতঃসিদ্ধ প্রজ্ঞাতত্ত্বকে কার্য্যত জানিতে চেষ্টা কর, জ্ঞানত জানিতে যাইও না। রোগ হইয়াছে চক্ষে, ঔষধি লেপনের ব্যবস্থা হস্তপদে, এ যেমন অসঙ্গত—জ্ঞানেতে দোষ

দর্শন, কার্য্যেতে তাহার প্রতিবিধান, ইহাও সেই প্রকার বলিতে হইবে। প্রকৃত কথা এই যে, প্রজ্ঞাতত্ত্ব প্রমাণের গম্য নহে বলিয়া তাহা যে মূলেই জ্ঞানের গম্য নহে, ইহা একটি ঘোরতর অত্যুক্তি। "শিরো নাস্তি" যদি সত্য হয় তবে শিরঃপীড়া থাকে কোথায়? অহংজ্ঞান যদি নাই, তবে রূপ রসাদি জ্ঞান থাকে কোথায়? গোড়ায় যদি স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান নাই, তবে প্রমাণের দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? অতএব স্বতঃসিদ্ধ সত্যকে প্রমাণ করিতে চাহিতেছ—এইটি রোগ; স্বতঃসিদ্ধ সত্য তুমি ভিতরে ভিতরে জানিতেছ, অতএব তাহাতে অকুতোভয়ে বিশ্বাস স্থাপন কর,—এইটি ঔষধি।

প্রজ্ঞা এবং আহংকারিক জ্ঞান দুয়ের মধ্যে বিবাদই আধ্যাত্মিক সকল-রোগের মূল। প্রজ্ঞা দ্বারা আহংকারিক জ্ঞানকে নিয়মিত হইতে দেও, তবেই প্রজ্ঞা যে কি অমূল্য রত্ন তাহা বুঝিতে পারিবে; তাহা না করিয়া প্রজ্ঞাকে যদি আহঙ্কারিক জ্ঞানের অধীনে আনিতে চেষ্টা কর, তবে এমন যে সুনিশ্চিত প্রজ্ঞা-তত্ত্ব তাহাও তোমার নিকট অলীক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। প্রজ্ঞা নিয়ামক, আহংকারিক জ্ঞান নিয়মিতব্য, এইটি বিশেষরূপে জানা উচিত। আপনার কিংবা অন্যের অহংকারের উপাসনা করিয়া কেহ কখন সত্য লাভ করিতে পারে নাই পারিবে না,—অহংকারের বিপরীত পথেই ধ্রুব সত্যের মন্দির প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে—প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আহংকারিক জ্ঞান যখন প্রজ্ঞাকে অমান্য করে তখন তাহা বুদ্ধির গর্ব্বই করে, বুদ্ধির কার্য্য একটুও করে না। "পরমাত্মাকে আমার কোন প্রয়োজন নাই—তোমার প্রয়োজন থাকে তুমি যাহা ভাল বিবেচনা কর তাহা কর, আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই" এরূপ গর্ব্ব শূন্যগর্ভ ইহা কি আর জানা যাইতেছে না? আত্মাকে ঈশ্বর-প্রেমে আর্দ্র করিবার প্রয়োজন নাই—প্রয়োজন কেবল আত্মাকে শুষ্ক কাষ্ঠ করিয়া রাখা! অনন্ত জীবনে প্রয়োজন নাই—প্রয়োজন কেবল অনন্ত কাল মরিয়া থাকা! জ্ঞানালোকে প্রয়োজন নাই, সত্য বস্তুতে প্রয়োজন নাই—প্রয়োজন কেবল অজ্ঞানান্ধকার আর শূন্য অভাব! এ সকল নিষ্ফল গর্ব্বোক্তি বিসর্জ্জন দিয়া এই সত্যটির প্রতি মনোনিবেশ করিলে ভাল হয় যে, মনোবৃত্তি-সকল অহংভাবের অনুগত এবং অহংভাব প্রজ্ঞার অনুগত হইলে তবেই আধ্যাত্মিক রাজ্যে সুনিয়ম সংস্থাপিত হইবে, তাহার ব্যতিক্রম হইলে অরাজকতা উপস্থিত হইবে, ইহা অনিবার্য্য।

অশ্রুজল।

যে দিকে ফিরিয়া দেখি সেই দিকেই হাসির লহরী উঠিতেছে, সেই দিকেই সুখের আড়ম্বর বিদ্যমান। এমন একটুও স্থান নাই, একটুও সময় নাই, যে আমি নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদি। আবার সকলে যে সময় হাসিতেছে, সে সময় না হাসিলেও নয়, সুতরাং হাসিতেই হয়, কিন্তু সে হাসির কষ্ট, হে অন্তর্দেবতা তুমিই জান'। আমার মনে হয় যে হাস্য-আমোদকারীরা যদি একমুহূর্ত্তের জন্য কান্নার কোমলতর ভাব অনুভব করিতে পারিত, তাহা হইলে হাসিবার জন্য তাহারা অত লালায়িত হইত না। তরঙ্গময়ী গঙ্গার উপকূলে নীরব নিশীথে একাকী শয়ান রহিয়া ঊর্দ্ধ-দৃষ্টে চন্দ্র তারা দেখিতে দেখিতে আপনার দুঃখেই হোক, পরের দুঃখেই হোক, যখন যুগল চক্ষুর অপাঙ্গ ভিজাইয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রুজল নিঃসৃত হইতে থাকে, শ্মশানের চিতালোক দেখিয়া যখন কোন মৃত শৈশব-সহচরীর বিদায়-কটাক্ষ মনোমধ্যে আলেয়া-আলোকের ন্যায় সহসা প্রতিভাত হয়, বিজন প্রান্তরে অথবা গভীর নিশীথে বিচরণ করিতে করিতে সুদূর পল্লী হইতে মন্দীভূত বংশীধ্বনি আসিয়া যখন বালিকা বয়সের কোন অতি প্রিয় অথবা বিস্মৃত একটি সঙ্গীতকে অর্দ্ধজাগরিত করিয়া দেয়, তখন অতি ধীরে, অতি মৃদুভাবে হৃদয়ের পূর্ণ উৎস হইতে যে অশ্রু লহরী উৎসারিত হয়, তাহার কোমলতা, তাহার গভীরতা, তাহার পবিত্রতা, তাহার মহান ভাব চিরহাস্যকারীরা কখনই অনুভব করিতে পারে না। সে সময়ে হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তিগুলি কি যে এক মোহমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া যায়; বর্ত্তমানের দারুণ শোক বা বিকট উল্লাস কি যে এক মোহিনী নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে, মরমের কোন্ নিভৃত স্থল হইতে যে ঈষৎ মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রের বিষণ্ণ জ্যোৎস্নার ন্যায় একটি রমণীয় ভাব সমস্ত হৃদয়ে বিকীরিত হয় তাহা অনুভব ব্যতীত বর্ণনা করা যায় না। হাসি যত সহজে হয়, কান্না তত সহজে হয় না। হৃদয়ের গূঢ়তম তন্ত্র না বাজিয়া উঠিলে চক্ষে এক ফোঁটাও অশ্রু আইসে না। এমন কি, আনন্দও প্রকৃত আনন্দ নামে পরিচিত হইতে পারে না যতক্ষণ না তাহা অশ্রুতে পরিণত হয়। যুগ যুগান্তের পরে যখন বান্ধবে বান্ধবে মিলিত হয়, তখন উভয়ে উভয়ের বক্ষে মুখ লুকাইয়া দরবিগলিত লোচনে যত অশ্রু বিসর্জ্জন করে, তাহা তো হাস্যের স্থানীয় মাত্র। কিন্তু সে হাস্য, মর্ম্মভেদী সে হাস্য, হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশের অশ্রু-উৎসকে জাগাইয়া অশ্রুরূপেই পরিণত হয়। আবার যখন দেখি কোন মহান্ ঋষিপুরুষ গঙ্গার পবিত্র জলে আবক্ষ নিমগ্ন হইয়া ঊর্দ্ধহস্তে প্রাতঃসূর্য্যকে বন্দনা করিতে করিতে জাহ্নবীর তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অশ্রুতরঙ্গ মিশাইতে

থাকেন,তখন সেই প্রশান্ত প্রতিমা ছাড়িয়া, সংসার! আমি তোমার কোন প্রতিমাই হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহি না।

এই স্বর্ণময়ী মহানগরীতে বিচরণ করিতে করিতে আমরা কত অট্টালিকাই দেখিতে পাই—কিন্তু সে সকল দেখিয়া আমাদের চক্ষু তৃপ্ত হয় মাত্র, হৃদয়ের একটি শিরাও স্পন্দিত হয় না। তাহাদের সঙ্গে ভূতকালের সম্পর্কই নাই। তাহারা কেবল বর্ত্তমান কালটিকে ঘিরিয়া আছে। তাহাদিগকে দেখিলে আমরা কেবল শিল্পকরের নিপুণতায় ঈষৎ মুগ্ধ হইতে পারি, এবং মানুষের কার্য্যদক্ষতায় ঈষৎ চমৎকৃত হইতে পারি। কিন্তু মনে কর যদি কোন জ্যোৎস্নাময়ী গভীর রজনীতে ইন্দ্রপ্রস্থের ভগ্নাবশিষ্ট প্রাসাদ মণ্ডলে বিচরণ করিতে করিতে সেই ভূতকালের সাক্ষীস্বরূপ, বর্ত্তমানের মোহস্বরূপ এবং ভবিষ্যতের কবিতাস্বরূপ জরাজীর্ণ স্তম্ভগুলিকে দেখিতে পাই, যখন তাহাদের অর্দ্ধস্ফুট মূর্ত্তিতে তাহাদের মুগ্ধকর ইতিবৃত্ত জ্বলন্ত অক্ষরে দেদীপ্যমান দেখি, যখন তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে কালের করাল স্রোতে উজান বাহিয়া কল্পনা প্রায় কালের উৎস-প্রদেশে গিয়া পড়ে, তখন হৃদয়ের তরঙ্গভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে যে মমতালহরী বহিতে থাকে তাহা হে প্রকৃতি দেবি তোমার অনন্ত ভাণ্ডারের কোন্ সামগ্রীর সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারে?

আবার দুঃখের সময় হৃদয় যখন শোকে নিষ্পেষিত হইতে থাকে, যখন শরীরের সমস্ত শোণিত একত্র হইয়া মর্ম্মের দ্বারে ভীষণ আঘাত করিতে থাকে, যখন আমাদের এই ক্ষুদ্র মনের ভিতরে প্রলয়-বিপ্লব উপস্থিত হয়, তখন অশ্রুলহরী ব্যতীত আমাদের আর কি সহায় আছে? কবিবর টেনিসন বলিয়াছেন যে, কোন সময় একটি বীরপুরুষ সমরে হত হইলে তাঁহাকে তাঁহার পরিবার মধ্যে আনা হয়। বীরপত্নী তাঁহাকে দেখিয়া একেবারে প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন,তাহার চেতনা লোপ হইল না বটে কিন্তু তাহার মুখে কথা নাই, চক্ষেও অশ্রু নাই। তাঁহার সহচরীরা তাঁহাকে কাঁদাইতে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে কাঁদাইতে পারিল না, সুতরাং সকলেই এই আশঙ্কা করিতে লাগিল যে অসহ্য যাতনায় তিনিও সহসা হতপ্রাণ হইবেন। পরিশেষে একটি বৃদ্ধা সহচরী সেই বীরপত্নীর নবপ্রসূত শিশুটিকে লইয়া তাঁহার অঙ্কে দিবা মাত্রই তিনি "রে বিধবা-সর্ব্বস্ব! আমি তোরই জন্য বাঁচিয়া আছি" বলিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন এবং শ্রাবণ ধারার ন্যায় চক্ষে বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন সকল সহচরীরাই তৃপ্ত হইল, সকলেই বুঝিল যে বীর পত্নীর যাতনার উপশম হইয়া আসিতেছে। বাস্তবিক, অশ্রুলহরী না থাকিলে আমরা অনেক সময়ে আত্মহত্যা করিতে কিছুমাত্র পরাঙ্মুখ হইতাম না। আবার, আমার হৃদয়বেদনা উপস্থিত হইলে আমি নিজেই অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া যে আমার বেদনা নিবারণ করি এমন নহে, কিন্তু আ-

মার বেদনা জানিয়া অন্যে যদি আমার জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করে, তাহা হইলে বেদনার উপশমের কথা দূরে থাকুক, অনেক সময়ে সেই বেদনাকেই প্রকৃত পক্ষে সুখকর বলিয়া মনে হয়। যখন মনোবেদনায় অস্থির হইয়া একেলা সংসার মধ্যে উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিতে থাকি, যখন শরতের ছিন্ন পল্লবের ন্যায় বায়ুতাড়নে ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত হই—যখন আমার আর্ত্তনাদ কেবল দিক-মণ্ডলেই ধ্বনিত হইতেছে; দীর্ঘশ্বাস বায়ুতেই মিশাইতেছে, অশ্রুলহরী বালুকাতেই শুখাইতেছে, তখন যদি কোন ব্যথার ব্যথী আসিয়া আমার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করে, আমার দীর্ঘনিঃশ্বাসে তাহার নিঃশ্বাস মিশায়, আমার অশ্রুতরঙ্গে অশ্রুতরঙ্গ ঢালিয়া দেয়, তখন হে পৃথিবি! তোমার রাক্ষসী মূর্ত্তিও কি বিনোদ বেশ ধারণ করে!

কিন্তু হায়, সংসারে এই অশ্রুতে অশ্রুর প্রত্যুত্তর কি দুর্লভ! অশ্রুতে অশ্রু মিশান' দূরে থাকুক অনেক সময়ে অনেক স্থলে অশ্রুর উত্তরে কেবল মাত্র তিরস্কার বা বিরক্তিই প্রতিদান পাওয়া যায়। পত্নীহারা অরফিয়ুস্ যখন প্রেতলোকে যমরাজার কাছে নিজের দুঃখের কথা বলিয়াছিলেন তখন নৃশংস যমরাজের গণ্ডস্থল ভিজাইয়া "লৌহময় অশ্রুলহরী" প্রবাহিত হইয়াছিল, কিন্তু মর্ত্তালোকের কোন কোন পিশাচ পিশাচীদের চক্ষুর্ব্বয় এমন বজ্রায়সে নির্ম্মিত, যে ভগ্ন-হৃদয়ের অনর্গল অশ্রুলহরীতে অশ্রু মিশান দূরে থাকুক, তাহাতেই তাহারা ঘৃণার হাসা, উপেক্ষার কটাক্ষ বর্ষণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। এমন স্থলে এমন সময়ে অনেক বার বৃদ্ধ রাজা লিয়রের মত আপনার চক্ষু বলপূর্ব্বক উৎপাটন করিয়া ধূলির সঙ্গে বিমর্দ্দিত করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে যেন তার এক বিন্দুও অশ্রুজল নিপতিত না হয়, কিন্তু-ভগ্নহৃদয়ের অশ্রু থামিবার নহে, পাষাণ হৃদয়ের মমতাও পাইবার নহে, সুতরাং হে পৃথিবি তোমারই জয়!!

চ—

করুণা।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সমস্ত দিন মেঘ-মেঘ করিয়া আছে, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে, বাদলার আর্দ্র বাতাস বহিতেছে, আজ করুণা মন্দিরে মহাদেবের পূজা করিতে গিয়াছে। কাঁদিয়া কাটিয়া প্রার্থনা করিল, যেন তাহাকে আর অধিক দিন এরূপ কষ্টভোগ করিতে না হয়, এবার তাহার যে সন্তান হইবে সে যেন পুত্র হয়, কন্যা না হয়, নারী-জন্মের যন্ত্রণা যেন আর কেহ ভোগ না করে। করুণা প্রার্থনা করিল, তাহার মরণ হউক,

তাহা হইলে নরেন্দ্র স্বেচ্ছামতে অকণ্টকে সুখ ভোগ করিতে পাইবে।

এই দুঃখের সময় নরেন্দ্রের এক পুত্র জন্মিল। অর্থের অনটনে সমস্ত খরচপত্র চলিবে কি করিয়া তাহার ঠিক নাই। নরেন্দ্রের পূর্ব্বকার চাল কিছুমাত্র বিগড়ায় নাই; সেই সন্ধ্যাকালে গদাধর ও স্বরূপের সহিত বসিয়া তেমনি মদটি খাওয়া আছে, তেমনি ঘড়িটি, ঘড়ির চেনটি, ফিন্‌ফিনে ধুতিটি, এসেন্সটুকু, আতরটুকু সমস্তই আছে, কেবল নাই অর্থ। করুণার গার্হস্থ্য পটুতা কিছুমাত্র নাই, তাহার সকলই উল্টা পাল্টা গোলমাল। গুছাইয়া কি করিয়া খরচ পত্র করিতে হয় তাহার কিছুই জানে না, হিসাব পত্রের কোন সম্পর্কই নাই, কি করিতে যে কি করে তাহার ঠিক নাই। করুণা যে কি গোলে পড়িয়াছে তাহা সেই জানে, নরেন্দ্র তাহাকে কোন সাহায্য করে না, কেবল মাঝে মাঝে গালাগালি দেয় মাত্র, নিজে যে, কি দরকার, কি অদরকার, কি করিতে হইবে, কি না করিতে হইবে, তাহার কিছুই ভাবিয়া পায় না। করুণা রাত দিন ছেলেটি লইয়া থাকে বটে, কিন্তু কি করিয়া সন্তান পালন করিতে হয় তাহার কিছু যদি জানে! ভবি বলিয়া বাড়ির যে পুরাতন দাসী ছিল, সে করুণার এই দুর্দ্দশায় বড় কষ্ট পাইতেছে। করুণাকে সে নিজ হস্তে মানুষ করিয়াছে, এই জন্য তাহাকে সে অত্যন্ত ভাল বাসে। নরেন্দ্রের অন্যায়াচরণ দেখিয়া সে মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে খুব মুখনাড়া দিয়া আসিত, হাত মুখ নাড়িয়া যাহা না বলিবার তাহা বলিয়া আসিত। নরেন্দ্র সহ্য করিয়া কহিত "তুই বাড়ি হইতে দূর হইয়া যা!" সে কহিত "তোমার মত পিশাচের হস্তে করুণাকে সমর্পণ করিয়া কোন্ প্রাণে চলিয়া যাই?" অবশেষে নরেন্দ্র উঠিয়া দুই চারিটি পদাঘাত করিলে পরে সে গর্‌গর্ করিয়া বকিতে বকিতে কখনো বা কাঁদিতে কাঁদিতে সেখান হইতে চলিয়া যাইত। ভবিই বাড়ির গিন্নি, সেই বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম্ম করিত, করুণাকে কোন কাজ করিতে দিত না। করুণার এই অসময়ে সে যাহা করিবার তাহা করিয়াছে। ভবির আর কেহ ছিল না, যাহা কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল, সমস্ত করুণার জন্য ব্যয় করিত। করুণা যখন একলা পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিত, তখন সে তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। করুণাও ভবিকে বড় ভাল বাসিত, যখন মনের কষ্টের উচ্ছ্বাস চাপিয়া রাখিতে পারিত না, তখন দুই হস্তে ভবির গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া এমন কাঁদিয়া উঠিত যে, ভবিও আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিত না, সে শিশুর মত কাঁদিয়া একাকার করিয়া দিত। ভবি না থাকিলে করুণা ও নরেন্দ্রের কি হইত বলিতে পারি না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

স্বরূপ বাবু কহেন যে, পৃথিবী তাঁহাকে ক্রমাগতই জ্বালাতন করিয়া আসিয়াছে, এই নিমিত্ত মানুষকে তিনি পিশাচ জ্ঞান করেন; কিন্তু আমরা যতদূর জানি, তাহাতে তিনিই

দেশের লোককে জ্বালাতন করিয়া আসিতেছেন, তিনি যাহার সহিত কোন সংস্রবে আসিয়াছেন, তাহাকেই অবশেষে এমন গোলে ফেলিয়াছেন যে, কি বলিব!

স্বরূপ বাবু সর্ব্বদা এমন কবিত্ব চিন্তায় মগ্ন থাকেন যে অনেক ডাকাডাকিতেও তাঁহার উত্তর পাওয়া যায় না ও সহসা আঁা বলিয়া চমকিয়া উঠেন। হয়ত অনেক সময়ে কোন পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া আছেন, অথচ যে, সম্মুখে পশ্চাতে পার্শ্বে মানুষ আছে তাহা টেরও পান নাই, অথবা যাহারা দাঁড়াইয়া আছে, তাহারা টের পায় নাই যে তিনি টের পাইতেছেন। ঘরে বসিয়া আছেন এমন সময়ে হয়ত থাকিয়া থাকিয়া বাহিরে চলিয়া যান, জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, জানালার ভিতর দিয়া তিনি এক খণ্ড মেঘ দেখিতে পাইয়াছিলেন, তেমন সুন্দর মেঘ কখনো দেখেন নাই। কখনো কখনো তিনি যেখানে বসিয়া থাকেন, ভুলিয়া দুই এক খণ্ড তাঁহার কবিতা লিখা কাগজ ফেলিয়া যান; নিকটস্থ কেহ সে কাগজ তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলে তিনি 'ও! —এ কিছুই নহে' বলিয়া টুকুরা টুকুরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলেন। বোধ হয় তাঁহার কাছে তাহার আর এক খানা নকল থাকে, কিন্তু লোকে বলে যে, না, অনেক বড় বড় কবির ঐরূপ অভ্যাস আছে। মনের ভুল এমন আর কাহারও দেখি নাই, কাগজ পত্র কোথায় যে কি ফেলেন তাহার ঠিক নাই, এইরূপ কাগজপত্র যে কত হারাইয়া ফেলিয়াছেন তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু সুখের বিষয়, ঘড়ি টাকা, বা অন্য কোন বহুমূল্য দ্রব্য কখনো হারান্ নাই। স্বরূপ বাবুর আর একটি রোগ আছে, তিনি যে কোন কবিতা লিখেন, তাহার উপরে বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে 'বিজন কাননে' বা 'গভীর নিশীথে' লিখিত, বলিয়া লিখা থাকে, কিন্তু আমি বেশ জানি যে, তাহা তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্তানগণ দ্বারা পরিবৃত গৃহে দিবা দ্বিপ্রহরের সময় লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক আমাদের স্বরূপ বাবু বড় প্রেমিক ব্যক্তি। তিনি যত শীঘ্র প্রেমে বাঁধা পড়েন এত আর কেহ নয়, ইহাতে তিনিও কষ্ট পান, আর অনেককেই কষ্ট দেন।

স্বরূপ বাবু দিবা রাত্রি নরেন্দ্রের বাড়িতে আছেন, মাঝে মাঝে আড়ালে আবডালে করুণাকে দেখিতে পান, কিন্তু তাহাতে বড় গোলযোগ বাধিয়াছে। তাঁহার মন অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে, ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িতেছে ও রাত্রে ঘুম হইতেছে না। তিনি ঘোর ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মিয়াছেন, সুতরাং এখন তাঁহাকে কোকিলেও ঠোক্রায় না, চন্দ্রকিরণও দগ্ধ করে না বটে, কিন্তু হইলে হয় কি, পৃথিবী তাঁহার চক্ষে অরণ্য শ্মশান হইয়া গিয়াছে, ফুল শুকাইতেছে আবার ফুটিতেছে, সূর্য্য অস্ত যাইতেছে আবার উঠিতেছে, দিবস আসিতেছে ও যাইতেছে, মানুষ শুইতেছে ও খাইতেছে, সকলি যেমন ছিল তেমনি আছে, কিন্তু হায়! তাঁহার হৃদয়ে আর শান্তি নাই, দেহে বল নাই, নয়নে নিদ্রা নাই, হৃদয়ে সুখ নাই,

এক কথায়, যাহাতে যাহা ছিল, তাহাতে আর তাহা নাই! স্বরূপ কতকগুলি কবিতা লিখিয়া ফেলিল, তাহাতে যাহা লিখিবার সমস্তই লিখিল! তাহাতে ইঙ্গিতে করুণার নাম পর্য্যন্ত গাঁথিয়া দিল। এবং সমস্ত ঠিকঠাক্ করিয়া মধ্যস্থ নামক কাগজে পাঠাইয়া দিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নিধি নরেন্দ্রের বাড়িতে মাঝে মাঝে আইসে। কিন্তু আমরা যে ঘটনার সূত্র অবলম্বন করিয়া আসিতেছি, সে সূত্রের মধ্যে কখনো পড়ে নাই; এই বার পড়িয়াছে। স্বরূপ বাবু তাঁহার অভ্যাসানুসারে ইচ্ছাপূর্ব্বক বা দৈবক্রমেই হউক, এক খণ্ড কাগজ ঘরে ফেলিয়া গিয়াছেন, নিধি সে কাগজটি কুড়াইয়া পাইয়াছে। সে কাগজটিতে গুটি দুয়েক কবিতা লিখা আছে, অন্য লোক হইলে সে কবিতাগুলির সরল অর্থটি বুঝিয়া পড়িত ও নিশ্চিন্ত থাকিত, কিন্তু বুদ্ধিমান নিধি সেরূপ লোকই নহে। যদিবা তাহার কোন গূঢ় অর্থ না থাকিত তথাপি নিধি তাহা বাহির করিতে পারিত। তবু ইহাতে ত কিছু ছিল! নিধির সে কবিতা গুলি বড় ভাল ঠেকিল না, ট্যাঁকে গুঁজিয়া রাখিল ও ভাবিল, ইহার নিগূঢ় তাহাকে জানিতে হইবে। অমন বুদ্ধিমান লোকের কাছে কিছুই ঢাকা থাকে না, ইঙ্গিতে সকলি বুঝিয়া লইল। চতুরতাভিমানী লোকেরা নিজ বুদ্ধির উপর অসন্দিগ্ধ রূপে নির্ভর করিয়া এক এক সময়ে যেমন সর্ব্বনাশ ঘটায়, এমন আর কেহই নহে।

"দিদি, কেমন আছ, দেখিতে আসিয়াছি" বলিয়া নিধি করুণার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। নিধি ছেলেবেলা হইতেই অনুপের অন্তঃপুরে যাইত ও করুণার মাকে মা বলিয়া ডাকিত। নিধি এখন মাঝে মাঝে প্রায়ই করুণা কেমন আছে দেখিতে আইসে। একদিন নরেন্দ্র কলিকাতায় গিয়াছে; নরেন্দ্র কবে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিবে, করুণা, স্বরূপ বাবুর নিকট ভবিকে জানিয়া আসিতে কহিল। নিধি আড়াল হইতে শুনিতে পাইল, মনে মনে কহিল "হুঁ হুঁ — বুঝিয়াছি, এত লোক থাকিতে স্বরূপ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে পাঠান কেন, গদাধর বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেও ত চলিত!" এক দিন করুণা ভবিকে কি কথা বলিতেছিল, দূর হইতে নিধি শুনিতে পাইল না, কিন্তু মনে হইল, করুণা যেন একবার "স্বরূপ বাবু" বলিয়াছিল, আর একটি প্রমাণ জুটিল। আর এক দিন নরেন্দ্র, স্বরূপ ও গদাধর বাগানে বসিয়াছিল, করুণা সহসা জানলা দিয়া সেই দিক পানে চাহিয়া গেল, নিধি স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, করুণা স্বরূপেরই দিকে চাহিয়াছিল, নিধি এইত তিনটি অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছে, ইহা অন্য লোকের নিকট যাহাই হউক কিন্তু নিধির নিকট ইহা সমস্তই পরিষ্কার প্রমাণ! শুদ্ধ ইহাই যথেষ্ট নহে, করুণা যে দিনে দিনে শীর্ণ, বিষণ্ণ, রুগ্ন হইয়া যাইতেছে, নিধি স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, তাহার কারণ আর কিছুই নয়,—স্বরূপের ভাবনা!

এখন স্বরূপের নিকট কথা আদায়

করিতে হইবে, এই ভাবিয়া নিধি ধীরে ধীরে তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। হঠাৎ গিয়া কহিল, "করুণা ত ভাই তোমার জন্য একেবারে পাগল!" স্বরূপ একেবারে চমকিয়া উঠিল, আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি করিয়া জানিলে?' নিধি মনে মনে কহিল "হুঁ-হুঁ আমি তোমাদের ভিতরকার কথা কি করিয়া সন্ধান পাইলাম, ভাবিয়া ভয় পাইতেছ? পাইবে বৈ কি, কিন্তু নিধিরামের কাছে কিছুই এড়াইতে পায় না।" কহিল "জানিলাম, এক রকম করিয়া!" বলিয়া চোক টিপিতে টিপিতে চলিয়া গেল। তাহার পরদিন গিয়া আবার স্বরূপকে কহিল, "করুণার সহিত তুমি যে গোপনে গোপনে দেখা সাক্ষাৎ করিতেছ ইহা নরেন্দ্র যেন টের না পায়।" স্বরূপ কহিল "সেকি? করুণার সহিত একবারো ত আমার দেখা সাক্ষাৎ কথা বার্ত্তা হয় নাই!" নিধি মনে মনে কহিল "নিশ্চয় দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল, নহিলে এত করিয়া ভাঁড়াইবার চেষ্টা করিবে কেন?" ইহাও একটি প্রমাণ হইল, কিন্তু আবার স্বরূপ যদি বলিত যে "হাঁ দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল" তবে তাহাও একটি প্রমাণ হইত।

যাহা হউক্ নিধির মনে আর সন্দেহ রহিল না। এমন একটী নিগূঢ় বার্ত্তা নিধি আপনার বুদ্ধি-কৌশলে জানিতে পারিয়াছে, একথা কি সে আর গোপনে রাখে? তাহার বুদ্ধির পরিচয় লোকে না পাইলে আর হইল কি? "তুমি যাহা মনে করিতেছ তাহা নয়, আমি ভিতরকার কথা সকল জানি।" চতুরতাভিমানী লোকেরা ইহা বুঝাইতে পারিলে বড়ই সন্তুষ্ট হয়। নিধির কাছে যদি বল যে, "রামহরি বাবু বড় সৎলোক।" অমনি নিধি চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিবে "কি বলিতেছ? কে সৎলোক? রামহরি বাবু? ওঃ—" এমন করিয়া বলিবে যে তুমি মনে করিবে, এবুঝি রামহরি বাবুর ভিতরকার কি একটা দোষ জানে। পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে কহিবে, "সে অনেক কথা!" নিধি সম্প্রতি যে গুপ্ত খবর পাইয়াছে তাহা পরামর্শ দিবার ছলে নরেন্দ্রকে বলিবে এইরূপ মনে মনে স্থির করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কয়দিন ধরিয়া ছোট ছেলেটির পীড়া হইয়াছে। তাহা হইবে নাতকি? কিছুরইত নিয়ম নাই, করুণা ডাক্তার ডাকাইয়া আনিল, ডাক্তার আসিয়া কহিল পীড়া শক্ত হইয়াছে। করুণা ত দিন রাত্রি তাহাকে কোলে করিয়া বসিয়া রহিল, পীড়া বাড়িতে লাগিল, করুণা কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইল, গ্রামের নেটিব ডাক্তার কপালীচরণ বাবু পীড়ার তত্ত্বাবধান করিতেছেন, তাঁহাকে ফি দিবার সময় তিনি কহিলেন থাক্, থাক্, পীড়া অগ্রে সারুক। পণ্ডিত মহাশয় বুঝিলেন, নরেন্দ্রদের দুরবস্থা শুনিয়া দয়ার্দ্র ডাক্তারটি ফি লইতে বুঝি রাজি নহেন। দুই বেলা তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিলেন, তিনিও অম্লান বদনে আসিলেন।

নরেন্দ্র এক্ষণে বাড়িতে নাই। ওপাড়ার পিতৃমাতৃহীন নাবালক জমিদারটি

সম্প্রতি সাবালক হইয়া উঠিয়া জমীদারী হাতে লইয়াছেন, নরেন্দ্র তাঁহাকেই পাইয়া বসিয়াছেন। তাঁহারি স্কন্ধে চাপিয়া নরেন্দ্র দিবা আরামে আমোদ করিতেছেন এবং গদাধর ও স্বরূপকে তাঁহারি হস্তে গচ্ছিত রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু গদাধর ও স্বরূপকে যে শীঘ্র তাঁহার স্কন্ধ হইতে নড়াইবেন, তাহার যো নাই; গদাধরের একটি উদ্দেশ্য আছে, স্বরূপেরও এক উদ্দেশ্য আছে।

ছেলেটির পীড়া অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। ডাক্তার ডাকিতে একজন লোক পাঠান হইল। ডাক্তারটি তাহার হস্ত দিয়া, তাঁহার দুবেলার যাতায়াতের দরুণ যাহা পাওনা আছে সমস্ত হিসাব সমেত এক বিল পাঠাইয়া দিলেন। ছেলেটি অবশ হইয়া পড়িয়াছে, করুণা তাহাকে কোলে করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে, সকল কর্ম্মে নিপুণ নিধি মাঝে মাঝে তাহার নাড়ি দেখিতেছে, কহিল নাড়ি অতিশয় ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। আকুল হৃদয়ে সকলই ডাক্তারের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে, এমন সময়ে বিল লইয়া সেই লোকটি ফিরিয়া আসিল। সকলই সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল ডাক্তার কই? সে সেই বিল হাজির করিল। সকলেই ত অবাক্। মুখ চোক শুকাইয়া. পণ্ডিত মহাশয় ত ঘামিতে লাগিলেন, নিধির হাত ধরিয়া কহিলেন "এখন উপায় কি?' নিধি কহিল "টাকার যোগাড় করা হউক্।" সহসা টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে? এদিকে পীড়ার অবস্থা ভাল নহে, যত কাল বিলম্ব হয় ততই খারাপ হইবে, মহা গোলযোগ পড়িয়া গেল, করুণা বেচারী কাঁদিতে লাগিল। পণ্ডিত মহাশয় বিব্রত হইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন, হাতে যাহা কিছু ছিল আনিলেন। কাত্যায়নী ঠাকুরাণীটি টাকা বাহির করিয়া দিবার সময় অনেক আপত্তি করিয়া ছিলেন, পণ্ডিত মহাশয় বিস্তর কাকুতি মিনতি করিয়া তবে টাকা বাহির করেন। তবি তাহার শেষ সম্বল বাহির করিয়া দিল। অনেক কষ্টে অবশেষে ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন রোগীর মুমূর্ষু অবস্থা। ডাক্তারটি অম্লান বদনে কহিলেন "ছেলে বাঁচিবে না।"

এমন সময় টলিতে টলিতে নরেন্দ্র ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ঘরে ঢুকিয়া ঘরে যে কিসের গোলমাল কিছুই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। কিছু ক্ষণ শূন্যনেত্রে পণ্ডিত মহাশয়ের দিকে চাহিয়া রহিল, অবশেষে কি বিড় বিড় করিয়া বকিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে জড়াইয়া ধরিয়া মারিতে আরম্ভ করিল, পণ্ডিত মহাশয়ও মহা গোলযোগে পড়িয়া গেলেন, ডাক্তার ছাড়াইতে গেলেন, তাহার হাতে এমন একটি কামড় দিল যে রক্ত পড়িতে লাগিল। এইরূপ গোলযোগ করিয়া সেই খানে শুইয়া পড়িল।

ক্রমে শিশুর মুখ নীল হইয়া আসিল। করুণা সমস্ত গোলমালে অর্দ্ধ হতজ্ঞান হইয়া বালিসে ঠেস দিয়া পড়িয়াছে। ক্রমে শিশুর মৃত্যু হইল, কিন্তু দুর্ব্বল করুণা তখন একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।

উদ্ভিদ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উদ্ভিদগণ সজীব এবং প্রাণিগণের ন্যায় ইহাদেরও উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও বিনাশ হইয়া থাকে। সন্তান পরম্পরায় যেরূপ জীব সমূহের বংশ বৃদ্ধি হয়, ইহাদের সংখ্যাবৃদ্ধির নিয়মও তদনুরূপ। কিন্তু প্রাণিশরীরে যেরূপ নিয়ত তাপানুভব হয় উহাদের শরীরে সেরূপ হয় না। উদ্ভিদগণের পার্শ্ববর্ত্তী জলবায়ুর তাপানুসারে ইহাদের শরীরে তাপ অনুভূত হইয়া থাকে। কেবল অঙ্কুরোৎপত্তি ও পুষ্পোদ্গমের সময়ে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। অর্থাৎ তখন ইহাদের তাপ পার্শ্ববর্ত্তী জলবায়ুর তাপাপেক্ষা অধিক হইয়া উঠে।

উদ্ভিদের জীবিত কাল।—কতকগুলি উদ্ভিদের জীবন-কাল নির্দ্দিষ্ট। অর্থাৎ একবার মাত্র পুষ্পোদ্গম হইলেই মরিয়া যায়। অপর কতকগুলির জীবন কাল অনির্দ্দিষ্ট; ইহারা যাবজ্জীবন ঋতু বিশেষে পুষ্পোৎপাদন করিয়া থাকে। প্রথমোক্ত উদ্ভিদের মধ্যে এক বৎসর বা যে গুলি তদপেক্ষা অল্প কাল জীবিত থাকে তাহাদিগকে বার্ষিক বলে। যথা ছোলা, মটর, গম ইত্যাদি। যাহারা দুই বৎসর কাল জীবিত থাকে, তাহাদিগকে দ্বিবার্ষিক বলে, যেমন বাঁধা কপি, শালগম ইত্যাদি। আর যেগুলি বহু কাল পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে একবার মাত্র পুষ্পোৎপাদন করিয়া মরিয়া যায়, তাহাদিগকে পুষ্পঘাতক বলে, যথা বাঁশ, মানকচু ইত্যাদি। যে সকল উদ্ভিদের জীবন কাল নির্দ্দিষ্ট নাই, তাহাদিগকে বহুবার্ষিক বা স্থায়ী উদ্ভিদ বলে। এই শেষোক্ত উদ্ভিদের মধ্যে কতকগুলি তরু ও গুল্ম অপর গুলি কোমল কাণ্ড বলিয়া অভিহিত হয়। তরু গুল্মেরও শাখা ও কাণ্ড বর্ষে বর্ষে বর্দ্ধিত হয়, যেমন ওক্, হদরন্ ইত্যাদি। কিন্তু কোমল কাণ্ডের ভূমধ্যস্থ মূলসদৃশ কাণ্ড হইতে প্রতিবৎসর নূতন নূতন শাখা বা পত্র উৎপন্ন হইয়া আবার সেই বৎসরেই শুষ্ক হইয়া যায়। যথা ভুঁইচাঁপা, রজনীগন্ধ ইত্যাদি।

উদ্ভিদের স্থান বিশেষে অবস্থিতির নিয়ম।—অর্থাৎ উদ্ভিদের আবাস ভূমি। পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই উদ্ভিদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বত্র এক জাতীয় দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ও আর্দ্রভূমিতেই অধিক পরিমাণে বৃক্ষলতাদি উৎপন্ন হয়, কিন্তু যেখানে শীতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব অথবা যেখানকার ভূমী অত্যন্ত নীরস সেখানে কোন প্রকার উদ্ভিদ প্রায় লক্ষিত হয় না। সেইরূপ হ্রদ অথবা সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশেও উদ্ভিদের চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। এদিকে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হইতে যতই শীতপ্রধান দেশে যাওয়া যায় ততই বৃক্ষগণের

আকার খর্ব্ব বলিয়া বোধ হয়। কেবল দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া ও কালীফর্ণিয়া দেশে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। তথায় শীতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইলেও অতি বিশাল দুই প্রকার বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। আবার কোন কোন শীতপ্রধান দেশস্থ সমুদ্রের শৈবাল, গ্রীষ্মপ্রধান দেশীয় সমুদ্রজাত শৈবাল অপেক্ষা অধিক বড় হয়। ভূপৃষ্ঠের উদ্ভিদ ব্যতীত গিরি-গহ্বরে স্থানে স্থানে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের দেহাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়, সেই সকল বৃক্ষ পৃথিবীতে আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বোক্ত দেহাবশেষের মধ্যে, যে গুলি অতি অল্প দিন তদবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে সুতরাং পর্ব্বতের নূতন স্তরে অবস্থিত, সে গুলির সহিত এক্ষণকার ভূপৃষ্ঠস্থিত বৃক্ষের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। আর যেগুলি অনেক দিন হইল তদবস্থাপন্ন হইয়াছে, তাহাদের সহিত বর্ত্তমান উদ্ভিদের সাদৃশ্য অতি অল্প। এমন কি কোন কোন স্থলে উহাদিগকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় বলিয়া বোধ হয়। ফলতঃ যে উদ্ভিদ যত প্রাচীন, বর্ত্তমান উদ্ভিদের সহিত তাহার ততই প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান ও প্রাচীন বৃক্ষে যতই প্রভেদ থাকুক না কেন উহাদের উৎপত্তি বৃদ্ধি ও বিনাশের নিয়ম এক। অর্থাৎ উভয়ই আলোক উত্তাপ ও জলের সাহায্য সাপেক্ষ।

উদ্ভিদের আকার নানাবিধ। তরু, গুল্ম, লতা, তৃণ প্রভৃতির যে ভিন্ন ভিন্ন আকার ইহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু ভূমণ্ডলে যত প্রকার উদ্ভিদ আছে তাহার সহিত তুলনা করিলে এই কয়েকটি নাম অতি অল্প বলিয়া বোধ হয়। বর্ষাকালে ছাদ ও আলিশার উপর স্থানে স্থানে যে সকল কৃষ্ণ, হরিৎ ও শ্বেত বর্ণের পদার্থ জন্মিয়া থাকে তাহাও এক এক প্রকার উদ্ভিদ বিশেষ। এরূপ উদ্ভিদ শুদ্ধ ভারতবর্ষেই যে কত শত আছে তাহা বলা যায় না। এতদ্ভিন্ন আমাদের দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্করিণী বা জলাশয়ে যে এক প্রকার পানা জন্মে তাহাও পূর্ব্বোক্ত উদ্ভিদের অন্যতর নিদর্শন। দূর হইতে ঐ সকল স্থান দেখিলে বোধ হয় যেন কোন হরিদ্বর্ণ আবরণে আবৃত রহিয়াছে। পুরাতন প্রাচীরে অথবা কোন জলময় কাষ্ঠের উপর যে ছ্যাত্‌লা পড়ে, ইহাও এক প্রকার শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ—প্রস্তরময় পর্ব্বতপ্রদেশে অথবা শক্ত মাটির উপর ক্রমাগত জল পড়িলেও ঐ রূপ উদ্ভিদ জন্মিয়া থাকে। বর্ষাকালে পুস্তক, চর্ম্মপাদুকা, অব্যবহৃত বস্ত্র, ও তণ্ডুলাদিতে যে এক প্রকার ছাতা ধরে, তাহাও উদ্ভিদ পদার্থ। এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার উদ্ভিদ আছে যাহা বৃক্ষের স্থান বিশেষে উৎপন্ন হইয়া অচিরকাল মধ্যে উহাকে নষ্ট করিয়া ফেলে। কতক গুলি আবার গোল আলু, দ্রাক্ষা ও অন্যান্য ফলে উৎপন্ন হইয়া ঐ সমস্ত দ্রব্য নষ্ট করে। এমন কি কখন কখন ইহারা, জীবের শরীর পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া থাকে।

উদ্ভিদ-শরীরের পোষণোপযোগী পদার্থ। উদ্ভিদগণের জীবন রক্ষার্থ জল,

বায়ু তাপ, আলোক ও আর কতকগুলি পার্থিব পদার্থ-নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু দুই একটি স্থলে উহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশে তুষার-রঞ্জন নামে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক প্রকার লোহিত বর্ণের উদ্ভিদ জন্মিয়া থাকে, তদ্দ্বারা ঐ সকল স্থানের বরফ রক্তবর্ণ দেখায়। এতদ্ভিন্ন আর এক জাতীয় উদ্ভিদ নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারেও উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার উদ্ভিদ ব্যতীত অপর কোন উদ্ভিদই—তাপ ও আলোকের অভাবে সতেজ ও জীবিত থাকিতে পারে না।

উদ্ভিদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির উপযোগিতা বা শ্রম-বিভাগ। জীবদ্দশায় উদ্ভিদগণের ভিন্ন ভিন্ন অংশ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সাধিত হয়। কোন কোন অংশ উহাদের শরীর পোষণ ও জীবন রক্ষার উপযোগী। কোন কোন অংশ হইতে বীজ উৎপন্ন ও সেই বীজ হইতে বৃক্ষান্তর জন্মিয়া থাকে। উল্লিখিত অংশগুলিকে উদ্ভিদের অঙ্গ বলে।

পুষ্পদ উদ্ভিদের চারিটি প্রধান অঙ্গ মূল, কাণ্ড, পত্র ও পুষ্প। ১ম—মূল, উহা দ্বারা বৃক্ষ ভূমিতে দৃঢ় রূপে সংলগ্ন থাকে। অর্থাৎ বল প্রয়োগ ব্যতীত কোনরূপে স্থানচ্যুত হয় না। মৃত্তিকা হইতে শরীর পোষণ জন্য রস গ্রহণ করা ইহার আর একটি কার্য্য। ২য়—কাণ্ড, ইহা শাখা, কোরক, পত্র, পুষ্প ও ফলের আধার স্বরূপ। ৩য়—পত্র, আলোক সমাহরণ ইহার কার্য্য। এই নিমিত্ত পত্রের এক পিঠ নিয়ত সূর্য্যাভিমুখে থাকে। ৪র্থ পুষ্প, ইহা কতকগুলি অঙ্গের সমষ্টি মাত্র। ইহার কিয়দংশ ফল রূপে পরিণত হয় এবং ঐ ফলে বীজ থাকে।

পূর্ব্বোক্ত অঙ্গ দ্বারা যে সকল ব্যাপার নিষ্পন্ন হয় তাহাকে উহার কার্য্য বলে। এই সকল কার্য্য মধ্যে পোষণ ও বীজোৎপাদনই প্রধান।

মূল ও পত্র দ্বারাই পুষ্পপ্রসূ উদ্ভিদের ক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে। প্রাণিগণের ন্যায় ইহাদের আহার গ্রহণোপযোগী পৃথক পাকস্থলী বা পুষ্টিকর রস সঞ্চালনের জন্য স্বতন্ত্র কোন হৃদয় বা শিরা নাই এবং শরীর হইতে অসার ও অব্যবহৃত অংশ বহিষ্কৃত করিবার জন্যও কোন পথ দৃষ্ট হয় না।

উদ্ভিদের পোষণ সামগ্রী তরল ও বায়বীয় পদার্থ ভিন্ন অপর কোন কঠিন ও নীরস দ্রব্য দ্বারা উদ্ভিদগণের শরীর পোষণ হয় না। মূল দ্বারা যে জল বা রস আকৃষ্ট হয় তাহাতে বায়বীয় ও খনিজ উভয়বিধ পদার্থই মিশ্রিত থাকে। এই রস ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগামী হইয়া পত্রেতে আনীত হয়। পত্রগুলিও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বায়ু হইতে আঙ্গারিক অম্ল গ্রহণ করে। এই পত্রস্থ আঙ্গারিক অম্ল ও জলের উপর আলোক পতিত হওয়াতে তন্মধ্যে যে এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকে নির্য্যাস বলে। এই নির্য্যাস সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়া উদ্ভিদের শরীর পোষণে নিয়োজিত হয়।

মূলাকৃষ্ট জলের অনাবশ্যক ভাগ পত্র হইতে বাষ্পাকারে নির্গত হয়। এইরূপে

প্রতিনিয়ত বাষ্পোদ্গম হওয়াতে পত্র গুলির শীতলতা রক্ষিত হইয়া থাকে। পত্রাভ্যন্তরস্থ নির্য্যাস এবং মূল দ্বারা আকৃষ্ট যে তরল মিশ্র পদার্থ বৃক্ষের সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপিয়া থাকে, তাহা হইতে শ্বেত সারাত্মক এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়। ইহা উদ্ভিদ-শরীরের পুষ্টি সাধনে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এবং উহা হইতেই বৃক্ষাভ্যন্তরে ধূনা, শর্করা, তৈল, মোম ও নানাবিধ বর্ণ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

উদ্ভিদের উৎপত্তির নিয়ম। ইহা দ্বিবিধ।—বীজ ও অঙ্কুর। ইহাদের মধ্যে বীজই প্রধান। দুইটি পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গের পরস্পর সংযোগ দ্বারা ঐ বীজ উৎপন্ন হয়। এই বীজ ও তদুপরিস্থ বীজাবরণের সাধারণ নাম ফল। অঙ্কুর সকল উদ্ভিদের নানা স্থান হইতে উৎপন্ন হয়। যথা পত্র ও কাণ্ডের সংযোগ-স্থল বা গ্রন্থিতে। যেমন ওল ও বিলাতি আলুর মৃত্তিকা-নিহিত কন্দ।

কতকগুলি উদ্ভিদ আবার কৃত্রিম উপায় দ্বারা উৎপাদিত হয়। যেমন গোলাব ও করবী ফুলের ডাল মূলবৃক্ষ হইতে ছিন্ন করিয়া আর্দ্র ভূমিতে পুতিলে উহা হইতে অঙ্কুর ও শিকড় বাহির হয় এবং কালক্রমে উহাই একটি স্বতন্ত্র বৃক্ষ হইয়া উঠে। আম্রের যোড়-কলমও এই কৃত্রিম উপায়ের আর একটি উদাহরণ-স্থল।

উদ্ভিদ তন্তু। একখানি প্রস্তর ভাঙ্গিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা নিরীক্ষণ করিলে ধূলিকণার ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন একাকারে কতগুলি পদার্থ নয়নগোচর হয়। উদ্ভিদ্ ছেদন করিয়া ঐ রূপে নিরীক্ষণ করিলে সেরূপ লক্ষিত হয় না। বরং তৎপরিবর্ত্তে কতক গুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণ্ডাকৃতি পদার্থ পরস্পর সংসক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে কোষ বলে। এতদ্ভিন্ন নলের ন্যায় আর এক প্রকার পদার্থও পূর্ব্ববৎ পরস্পর সংলগ্ন থাকে। এই গুলিকে দীর্ঘ কোষ বা শিরা কহে। কিন্তু শেষোক্ত শিরাগুলি প্রথমোক্ত কোষের উপর্য্যুপরি বিন্যাস বশতই সেরূপ দীর্ঘাকার হয়।

উদ্ভিদের অন্তর্ব্বর্ত্তী রাসায়নিক উপাদান। প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিদ-শরীরে অপরাপর বস্তু অপেক্ষা জলের ভাগই অধিক। উদ্ভিদ-তন্তুতে জলের মূলীভূত রূঢ় পদার্থ অর্থাৎ প্রাণ-বায়ু ও লঘু-বায়ু ভিন্ন অঙ্গার ও নাইট্রোজেন (ক্ষারজ) নামক আর দুইটি রূঢ় পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শেষোক্ত পদার্থ, সকল স্থানে লক্ষিত হয় না। কিন্তু উদ্ভিদ-তন্তু মাত্রেই যে অঙ্গার আছে, কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া দেখিলেই তাহা অনায়াসে প্রতিপন্ন হইতে পারে। বৃক্ষে যে জলের ভাগ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই মূল দ্বারা বৃক্ষাভ্যন্তরে নীত হয়। উদ্ভিদগণ পত্র দ্বারা বায়ুমণ্ডলের আঙ্গারিক অম্ল হইতে অঙ্গার এবং মূল দ্বারা মৃত্তিকা-অংশভূত শোরা বা নিশাদল হইতে জলবৎ ক্ষারজ অর্থাৎ নাইট্রোজেন বায়ু গ্রহণ করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অধিকাংশ উদ্ভিদের মধ্যে যে দুই একটি খনিজ পদার্থ লক্ষিত হয় তাহাও জলবৎ অবস্থায় মূল দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

উদ্ভিদের বল্কল ও পত্র প্রভৃতির কোষ সমূহে যে এক প্রকার বর্ণক পদার্থ আছে তাহার গুণেই বৃক্ষ লতাদির বর্ণ হরিৎ হয়। সেই বর্ণক পদার্থকে পত্রহরিৎ বা হরিতায়ক বলে। সূর্য্যালোক-প্রভাবেই উক্ত পদার্থ হরিদ্বর্ণ দেখায়। এই নিমিত্ত যে সকল উদ্ভিদ অন্ধকারে উৎপন্ন হয় তাহাদের বর্ণ কখনই হরিৎ হয় না। এই জন্যই মৃত্তিকা-নিহিত মূল সকল শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত হরিৎ পদার্থ, কোষগুলির অভ্যন্তরে থাকে। ঐ কোষের পার্শ্বদেশ কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ; ঐ স্বচ্ছ প্রদেশ হইতে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হয় বলিয়া অধিকাংশ বৃক্ষের পত্র চিক্কণ ও উজ্জ্বল দেখায়।

উদ্ভিদগণের শ্রেণীবিভাগ। আমরা চতুর্দ্দিকে যে সকল উদ্ভিদ দেখিতে পাই তাহারা পরস্পর নিতান্ত বিসদৃশ বা নিঃসম্পর্ক নহে। প্রত্যুত উহাদের মধ্যে কতকগুলির সহিত অপর কতকগুলির এরূপ সৌসাদৃশ্য আছে যে তাহাদিগকে এক জাতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু এক জাতীয় বলিয়া তাহারা পরস্পর সম্পূর্ণ সমান নহে। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে একজাতীয় বা একশ্রেণীভুক্ত দুইটি বৃক্ষের মধ্যেও প্রভেদ লক্ষিত হয়। এই নিমিত্ত উদ্ভিদবেত্তারা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া উদ্ভিদকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

উদ্ভিদগণ প্রথমতঃ দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। পুষ্পসহ ও পুষ্পহীন। এই দুই শ্রেণীর পরস্পর প্রভেদ অত্যন্ত গুরুতর। পুষ্পসহ উদ্ভিদ জাতির যে সকল লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে তন্মধ্যে পুষ্পই সর্ব্বপ্রধান। এই পুষ্প হইতেই বীজ উৎপন্ন হয় এবং এই বীজ মধ্যে ভাবী উদ্ভিদের অঙ্কুর,ভ্রূণের ন্যায় অবস্থিতি করে। পুষ্পহীন বৃক্ষে এই দুয়ের কিছুই নাই। সুতরাং ইহাদের পুষ্পে বীজও লক্ষিত হয় না। কিন্তু বীজের পরিবর্ত্তে ইহাদের মধ্যে এক প্রকার সূক্ষ্ম রেণু আছে তাহাই পরিবর্দ্ধিত হইয়া বৃক্ষে পরিণত হয়। পুষ্পহীন যথা—শুষনির শাক ও পানা।

জীবগণ প্রতিনিয়ত নিশ্বাস দ্বারা যে বায়ু দূষিত করে,উদ্ভিদগণ সেই বায়ু সংশোধিত করিয়া পুনরায় জীবের প্রশ্বাস-যোগ্য করিয়া থাকে। আবার অধিকাংশ প্রাণীর উদ্ভিদ বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ প্রধান আহার ও আশ্রয় স্থান। এতদ্ভিন্ন ভূপৃষ্ঠে বৃক্ষ লতাদি থাকাতেই দিবাভাগে তদুপরি অধিক সূর্য্যোত্তাপ লাগিতে পায় না এবং রাত্রিকালেও পৃথিবী সহসা শীতল হয় না। বৃক্ষ লতাদির দ্বারা তাপোদ্গমের ব্যাঘাত হয় বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। এদিকে বৃক্ষ লতাদি থাকাতেই ভূপতিত বৃষ্টির জল বাষ্পাকারে শীঘ্র শীঘ্র উপরে উঠিতে পায় না। পরিশেষে এই উদ্ভিদ হইতে মানবগণ নানাবিধ ঔষধ ও শিল্প কার্য্যের উপকরণ সামগ্রী ও রন্ধনার্থ যাবদীয় কাষ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ব—

স্বাস্থ্য।

মাতৃস্তন্য-পান-কালের সীমা। প্রকৃতি স্বয়ং এই বিষয় দেখাইয়া দেন। কারণ সন্তান নয় মাসের হইলেই মাতৃ-স্তন নরম হইয়া ঝুলিয়া পড়ে। এদিকে মাসিক ঋতুও দেখা দেয়। এবং সন্তানের দাঁত উঠিতে থাকে। এজন্য স্তনাপানেরও ব্যাঘাত জন্মে। অতএব নয় মাস পর্য্যন্ত মাই দেওয়াই প্রকৃতির নিয়ম। ইহার অতিরিক্ত হইলে স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। অনেকে মাথাঘোরা পৃষ্ঠ বেদনা প্রভৃতি দুর্ব্বলতার চিহ্ন দেখিয়া ইহার পূর্ব্ব হইতেই স্তন দেওয়া বন্ধ করেন। কিন্তু এরূপ সাবধানতা প্রায় ধনবানের গৃহেই লক্ষিত হয়। অধিকাংশ স্ত্রীলোক দুর্ব্বলতার লক্ষণ দেখিয়াও কখন এক বৎসর কখন বা দুই বৎসর পর্য্যন্ত স্তনপান করাইয়া থাকেন ও পরিশেষে যন্ত্রণার পরাকাষ্ঠা ভোগ করেন।

নয় মাসের মধ্যে মাতা পুনরায় গর্ভবতী হইলে, তদ্দণ্ডেই অমনি স্তনপান বন্ধ করিতে হয়, ইহা না করিলে গর্ভস্থ বালকের হানি হইতে পারে।

প্রসবের পর ছয় মাসের মধ্যে মাতা ঋতুমতী হইলেই স্তন পান বন্ধ করার তাদৃশ আবশ্যকতা নাই। তবে সন্তানকে মধ্যে মধ্যে গাভি-দুগ্ধ দিলে ভাল হয়, কারণ রক্তস্রাবের নিমিত্ত তৎকালে স্তন-দুগ্ধের পুষ্টিকারিতার হানি হইয়া থাকে। ঐ সময় মাতারও পুষ্টিকর দ্রব্য খাওয়া উচিত। বেশী দুর্ব্বল বুঝিলে বলকর ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য।

মাই ছাড়াইবার নিয়ম। হঠাৎ সন্তানকে মাই দেওয়া বন্ধ করা উচিত নহে। করিলে মাতা ও সন্তান উভয়েরই অসুখ হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং ক্রমে ক্রমে বন্ধ করিলেই ভাল হয়।

বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে প্রসবের ছয় মাস পরে মাই ছাড়াইতে আরম্ভ করিতে হয় এবং নয় মাস পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে ঐ চেষ্টায় থাকিতে হয়। প্রথমে দিবসের মধ্যে একবার কমাইতে হয়, পরে দুইবার; এইরূপ ক্রমে ক্রমে বন্ধ করিতে হয়। তৎকালে স্তনদুগ্ধের পরিবর্ত্তে সন্তানকে মধ্যে মধ্যে গাভিদুগ্ধ খাওয়াইতে হয়।

যখন সন্তান দিনান্তে একবার বই আর স্তন পান করে না, তখন একভাবে মাই ছাড়ান অতিশয় সহজ হইয়া উঠে। কারণ এই কালের মধ্যে সন্তানের গাভিদুগ্ধ খাওয়া একরূপ অভ্যাস পায়।

সন্তানের কঠিন দ্রব্য আহারের সময় নির্দ্ধারণ।—দুই চারিটি দাঁত না উঠিলে সন্তানকে কখন শক্ত জিনিশ খাইতে দেওয়া উচিত নহে। ঐ সময়ে আবশ্যক হইলে মধ্যে মধ্যে শীতল জলও দেওয়া যাইতে পারে। শক্ত দ্রব্যের মধ্যে রুটি ও সুরস ও সুপক্ক ফল খাইলে কোন অপকার

হয় না। দুগ্ধ দিবসে দুইবার ও রাত্রিতে একবার মাত্র খাইলেই যথেষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন তাহাকে আসুদিদ্ধ একটু মিষ্টান্ন অথবা বিস্কুট দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ সতর্ক হইয়া সন্তানকে লালন পালন করিতে পারিলে এবং ক্ষুধার্ত্ত বুঝিয়া খাইতে দিলে তাহার কখনই পেটের অসুখ হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

দোলায় চড়াইয়া ঘুম পাড়াইবার বিষময় ফল। বিলাতে কোন সময়ে শৈশব মৃত্যুর সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া কয়েক জন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক উহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন যে দোলাইয়া ঘুম পাড়ান শৈশব-মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ। দোলায় রাখিয়া দোল দিলে, সন্তানের মস্তক ঘুরিতে থাকে ও তজ্জন্য মোহ উপস্থিত হওয়াতে সে ঘুমাইয়া পড়ে। কিন্তু তাহার নিদ্রা গাঢ়তর হয় না। সে মধ্যে মধ্যে স্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠে ও কাঁদিতে থাকে। তখন পুনরায় উহাকে দোল দিতে হয়। দোল দিলেই আবার ঘুমাইয়া পড়ে। এই রূপে পুনঃ পুনঃ দোল খায় ও ঘুমায়। ইহাতে বালকের শরীর সুস্থ হওয়া দূরে থাকুক বরং অধিকতর কাতর হইয়া পড়ে। কোমলাবস্থায় বালকের মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত কোমল, সেই জন্য পুনঃ পুনঃ দোল দিলে তাহার সর্ব্বদা বমনেচ্ছা বা বমন হয়; এমন কি কখন কখন ঐ কারণে মস্তিষ্কের প্রদাহ পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। আর যদি দুলিতে দুলিতে কোন স্থানে ধাক্কা লাগে তাহা হইলে মস্তিষ্ক গুরুতররূপেই আহত হয়।

ভোজনের পর পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকেও দোলায় চড়াইয়া দোল দিলে তাহার ভয়ানক অসুখ করে। ইহা জানিয়াও অনেক জননী ক্রোড়স্থ শিশুসন্তানকে দুধ খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইবার জন্য স্নেহভরে তাহাকে ঘন ঘন দোলাইতে থাকেন। কিন্তু ইহাতে যে সন্তানের শরীর সম্বন্ধে বিশেষ হানি হইতে পারে তাহা স্বপ্নেও ভাবিয়া দেখেন না।

বালকগণের দোল খাওয়া একবার অভ্যাস হইলে, সে দিনের বেলায় সর্ব্বদা কোলে থাকিতে চাহে, সুতরাং তাহাকে নিয়ত একজন বুকে বা হাতে করিয়া বেড়াইতে না পারিলে সে কাঁদিয়া অস্থির হয়। যখন কোলে থাকিয়াও সুস্থির না হয় তখন মাতা বা দাসী তাহার পৃষ্ঠ বা পাছা চাপড়াইয়া সান্ত্বনা করেন কিন্তু এরূপ করাতে সন্তানের জননেন্দ্রিয় অকালে অতিশয় উত্তেজিত হয়, ও তজ্জন্য পরিণামে বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে আর একটি কুপ্রথা এই যে, সন্তানকে আদর দিবার জন্য স্ত্রীলোকেরা তাহার জননেন্দ্রিয় চুম্বন বা স্পর্শ করে কিন্তু ইহাতে ভবিষ্যতে সন্তানের যে কতদূর অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা তাহা কেহই বুঝেন না। অতএব এই সকল বিষয়ে মাতার বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত।

ঘুম পাড়াইবার জন্য দুগ্ধের সহিত সন্তানকে পুনঃ পুনঃ কোন মাদক দ্রব্য দেওয়া অনুচিত। ইহাতে হঠাৎ বালকের

মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা। মৃত্যু না ঘটিলেও পুনঃ পুনঃ মাদক দ্রব্য সেবন করাতে সন্তানের বুদ্ধির দোষ ঘটিতে পারে।

প্রসবের পর কিছুদিন পর্য্যন্ত সন্তান মাতার কাছেই শুইয়া থাকে। কিন্তু কিছু বয়োবৃদ্ধি হইলে উহাকে দিবারাত্র নিকটে রাখা উচিত নহে। এরূপ করিলে মাতৃ-শরীরের দূষিত বায়ুস্পর্শে সন্তানের স্বাস্থ্যের হানি হয়। নিয়ত মাতার সঙ্গে একত্র শয়ন করার আর এক দোষ এই যে, সন্তান একাকী নিদ্রা যাইতে পারে না। এজন্য মাতার ঘুম না পাইলেও ছেলের জন্য অসময়ে শয়ন করিতে হয়।

এতদ্ভিন্ন সন্তানের অসুখ করিলে সে একটি বারও মায়ের কাছ-ছাড়া হইতে চাহে না। এই কারণ বশত জননীর অসুবিধার একশেষ হয়।

নিতান্ত শৈশবাবস্থায় অতিবৃদ্ধ স্ত্রীলোক বা পুরুষের নিকট সন্তানকে ঘুমাইতে দেওয়া ভাল নহে। ইহাতে বালকের জীবনী শক্তির হানি হয় এবং সে দিন দিন শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইতে থাকে।

শয়নের জন্য সন্তানকে হয় চুলের মাদুর নয় এদেশীয় কাটির মাদুর দিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। ইহার উপর ছোট ছোট দুই খানি চাদর বা এক খানি কাঁথা পাড়িতে হয়। বালিশও ঘোড়ার চুলের হইলে ভাল হয়। কিন্তু উহা ২ ইঞ্চের অধিক উচ্চ না হয়। বালিসের খোলটি চামড়ার হইলেই ভাল কিন্তু ওয়াড় কাপড়ের হইবে। এতদ্ভিন্ন শরীর ঢাকিয়া রাখিবার জন্য শীতকালে ফ্লানেলের চাদর অথবা সরু লেপ এবং গ্রীষ্ম কালে সুতি চাদর বা সূক্ষ্ম কাঁথার আবশ্যক হইয়া থাকে। আর যাহাতে শিশুর শয্যা সর্ব্বদা শুষ্ক থাকে তাহার উপায় বিধান করা উচিত।

ধনী লোকের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে সন্তানের বিছানা যত কোমল হয় ততই ভাল। এই ভাবিয়া কেহ নরম গদি কেহবা পালঙ্কের তোষকের উপর সন্তানকে শয়ন করাইয়া কৃতকৃতার্থ হন। কিন্তু ইহাতে সন্তানের হিতে বিপরীত হয়। কারণ নরম বিছানায় সর্ব্বদা শয়ন করাতে শিশুর অতিশয় ঘর্ম্ম হয়, ও তজ্জন্য তাহার শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে থাকে। এতদ্ভিন্ন তাহার মেরুদণ্ড কোমল শয্যার উপর সমভাবে না থাকাতে পৃষ্ঠদেশ বক্র হইয়া পড়ে। এই জন্যই বালকের শয্যা যাহাতে সর্ব্বত্র কঠিন ও সমতল হয় তাহা করা উচিত। তাহা হইলে শরীরের কোমল স্থান নতোন্নত হইবার আশঙ্কা থাকে না। এবং প্রথম হইতে এই রূপ শয্যায় শয়ন করা অভ্যাস হইলে মনুষ্যের কোন কালে আর কোমল শয্যার প্রয়োজন হয় না। এমন কি বিপাকে পড়িয়া যদি কখন কাহাকে কাঠের উপর বা মাটিতে শয়ন করিতে হয়, তাহা হইলেও সে সুখে নিদ্রা যাইতে পারে।

মাছি ও মশা নিবারণের জন্য একটি টাপা বা ছেলে-ঢাকা কিনিয়া দেওয়া উচিত। নতুবা অনেক সময় উহাদের দৌরাত্ম্যে সন্তানের ঘুমের ব্যাঘাত হয়।

নিদ্রাবস্থায় সন্তানকে উত্তর কি দক্ষিণ শিওরি করিয়া শোয়ানই ব্যবস্থা। পূর্ব্ব কি পশ্চিম হইয়া শয়ন করিলে স্বাস্থ্যের বিলক্ষণ হানি হইবার সম্ভাবনা। বারামের সময় আবার এই নিয়মের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলা আবশ্যক।

য—

ভানুসিংহের কবিতা।

রাগিণী মল্লার।—

বাদর বরখন, নীরদ গরজন,
দামিনী চমকন ঘোর,
উপেখই কৈছে, (১) আও তু কুঞ্জে
নিতি নিতি মাধব মোর!
(২) ঐছন কুঞ্জে, ন আসিও তুহু,
মিনতি করত অভাগী,
মাধব কাহেতু পাওব দুখরে,
দুখিনী হমার লাগি?
ঘন ঘন চপলা, চমকয় যব পঁহু, (৩)
বজর নাদ যব হোয়,
তুঁহুক বাত তব, সমরই (৪) মাধব
ডর অতি লাগত মোর!
গাত্র-বসন তব, ভীঁখত (৫) মাধব,
ঘন ঘন বরখত মেহ,
ক্ষুদ্র বালি (৬) হম, হমকো লাগয়
কাহে উপেখবি দেহ?
কত জ্বালা দুখ, সহনি শ্যাম তুঁহু,
হমার পীরিত লাগি,
সহলিরে গঞ্জন, দেশ বিদেশে
ভইলিরে কলঙ্কভাগী!
যাও যাও পহু, মথুরানগরে
মিটবে সব সুখ আশ।
জনম জনম তুঁহু, সিংহাসনপরি
করহ সুখে পহু বাস।
দূরদেশ রহি, লোক মুখে হম
শুনইব তুঝ যশ গান,
দূরদেশ রহি, মহিমা শুনি তব
ধন্য মানইব প্রাণ!
সভয়ে কাঁপবে কত শত রাজা
শুনই তোঁহারই নাম।
(১) পেখই তোঁহারে কত শত মানুষ,
সম্ভ্রমে করবে প্রণাম।
তব্ পহু কাছে, হমারই লাগয়
ছোড়ই মথুরা ধাম,
গোপ সাথ অব বাস করো তুঁহু,
করহ কলঙ্কিত নাম।
(২) বিসরো মাধব গোপিনী জনকো,
বিসরো ময়কো শ্যাম,
বিসরো মাধব, প্রেমলীলা সব,
সুখ-বৃন্দাবন ধাম।
যাক প্রাণ মম, শ্যাম তোঁহারই
বিরহক বিখময় (৩) বাণে;
তবহুঁ একঙ্কিত, তব নামে পহু
সঁপইব কোন পরাণে?
কহত ভানু অব, প্রেমসিন্ধু পহু,
মাধব হমার বালা,
তোঁহার লাগয়, প্রেমক লাগয়
সব কছু সহবে জ্বালা!

(১) কৈছে—কিরূপে (২) ঐছন—ঐরূপ
(৩) পহু—প্রভু (৪) সমরই—স্মরণ করিয়া
(৫) ভীঁখত—ভিজিছে (৬) বালি—বালিকা

(১) পেখই—দেখিয়া (২) বিসরো—বিস্মৃত হও
(৩) বিখময়—বিষময়

বঙ্গসাহিত্য।

গতবারে আমরা বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস প্রভৃতি বঙ্গীয় আদি কবি-কুলের মাহাত্ম্যই কীর্ত্তন করিয়াছি। আমাদের মত সমর্থন করিবার জন্য আমরা এবার তাঁহাদের মধ্যে প্রধান চারিটি কবির ঈষৎ উদ্ঘাটিত ভাণ্ডার হইতে চারিটি কবিতা পাঠক-সমাজে উপহার দিতেছি—

রাগিণী—কামোদ।

সজনি! ভাল করি পেখিল না ভেল।
মেঘ মাল সঞে, তড়িত লতা জনু,
হৃদয়ে শেল দেই গেল।
আধ আচর খসি, আধ বদনে হাসি,
আধহি নয়না তরঙ্গ,
আধ উরজ হেরি, আধ আচর ভরি,
তব ধরি দগধে অনঙ্গ।
একে তনু গোরা, কনক কটোরা,
অতনুকা চলা উপাম,
মরি মরি দহে মন, জনু বুঝি ঐছন,
ফাঁস পসারল কাম॥
দশন মুকতা পাঁতি, অধর মিলায়ত,
মৃদুমৃদু কহতহিঁ ভাষা,
বিদ্যাপতি কহ, অতয়ে সে দুঃখ রহ,
হেরি না পুরল আশা॥

রাগিণী—তুড়ি।

সোই কে বা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদনে ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নামে, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম পরতাপে যার, ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার, নয়ানে দেখিয়া গো,
যুবতি ধরম কৈছে রয়।
পাশরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাসে; কুলবতী কুল নাশে,
আপনার যৌবন যাচয়।

রাগিণী—ভূপালী।

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।
তহি অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল?।
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস সুরধুনী পার।
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরমে জরি যাত।
দশ দিশ দামিনি দহই বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন ভার।
ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ।
গোবিন্দ দাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার।

রাগিণী—ধানসী।

সুখের লাগিয়া, এ ঘর বান্ধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে,
সকলি গরল ভেল।
সখি হে কি মোর করমে লিখি।
শীতল বলিয়া, ও চান্দ সেবিনু,
রবির কিরণ দেখি।
নিচল ছাড়িয়া, উচল উঠিতে,
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমি চাহিতে, দারিদ্র্য বেঢ়ল,
মাণিক হারানু হেলে।
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু,
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাসে কহে, কানুর পিরিতি,
মরণ অধিক শেল।

রাগিণী—তুড়ি।

কি পেখিনু যমুনার তীরে।
কালিয়া বরণ এক, মানুষ আকার গো,
বিকাইনু তার আঁখির ঠারে।
নিতি নিতি আসি যাই, হেন কভু দেখি নাই,
কি খেনে দেখিনু আজ তারে।
গুরুয়া গরব কুল, নাশাইল কুলবতী,
কলঙ্ক চলিয়া আগে ফিরে।
ভুরুর কামান জিনি, ভুরুর ভঙ্গিমা গো,
হিয়ুলে বেড়িয়া দুটি আঁখি।
কালিয়া নয়ান বাণ, মরমে হানিল গো,
কালময় আমি সব দেখি।
চিকণ কালার রূপে, আকুল করিল গো,
ধরণে না যায় মোর হিয়া।
কত চান্দ নিঙ্গাড়িয়া, মুখানি মাজিল গো,
যদু কহে কত সুধা দিয়া।

এইখানেই আমরা উপহার শেষ করিলাম, কেন না চৈতন্যদেবের সাময়িক কবিদের গগনভেদী সংকীর্তন-শব্দে আমরা এতদূর অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছি যে, পাঠকের সহিত যতক্ষণ আমরা সেই সমারোহ-ক্ষেত্রে না পৌঁছিতেছি ততক্ষণ যেন আমাদের নির্জীব ভাব তিরোহিত হইতেছে না। কোথায় বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের ঘুমন্ত স্বপ্নলহরী, আর কোথায় চৈতন্য-সহচরদের জাগ্রত উদ্দীপনাময় কীর্তন-কোলাহল! কোথায় প্রেমের রোমাঞ্চকর আবেশ প্রমোদ, আর কোথায় ভক্তির উচ্ছ্বাসময় কাব্য-কলাপ! বসন্তকালের সায়ংকালে একটি মহাপ্রান্তরে বিচরণ করিতেছি,—মলয় পবনের মৃদুল হিল্লোলে শরীর মন যেন ঢলিয়া পড়িতেছে, কোকিল পাপীয়ার সুর-লহরীতে হৃদয় যেন মোহে অভিভূত হইতেছে, এমন সময় সহসা গ্রামে আসিয়া উপনীত,—গ্রামে আজ বারোয়ারী পূজার মহাধুম, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই যেন অদ্ভুত উৎসবে, অদ্ভুত উৎসাহে, অদ্ভুত উল্লাসে উন্মত্ত হইয়া জীবনের প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম তরঙ্গকে পর্ব্বতাকারে পরিণত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে! আমরা সেই স্বপ্নের উপচ্ছায়ারূপ প্রান্তর ছাড়াইয়া এখন নবদ্বীপে আসিয়া পৌঁছিয়াছি; উৎসবময়, উৎসাহময়, কোলাহলময় নবদ্বীপে আসিয়া পৌঁছিয়াছি,—চৈতন্য দেবের মহিমা-ক্ষেত্রের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, আমরাও সংক্রা-

মত্ত উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া পড়িয়াছি।

আমরা এখন বঙ্গদেশের যে সময়ে আসিয়া পড়িয়াছি, এরূপ সময় বঙ্গদেশে আর কখনই উদয় হয় নাই। যীশুখ্রীষ্ট জন্মাইবার ১৬০০ বৎসর পরে চৈতন্যদেবের প্রাদুর্ভাবে ধর্ম্মসংস্করণ-স্রোতে দিগ্‌বিদিক আলোড়িত হইয়া উঠিল, এবং তাঁহার সহচরেরা তদীয় ধর্ম্মমত প্রচার করিবার জন্য সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা গ্রন্থে দেশ ছাইয়া ফেলিল। "ঐ সময়েই তর্কেশ্বরী রঘুনাথ শিরোমণি দুর্ব্বিগাহ ধীষণা-শক্তি সহকারে ন্যায়শাস্ত্রের নূতন রূপ পন্থা আবিষ্কৃত করেন, এবং ঐ সময়েই স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাপাণ্ডিত্য সহকারে তৎকাল-প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থাসকল বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়া অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব-নামক অভিনব প্রকার স্মৃতিসংগ্রহ প্রচার করেন।" ইহাও একটি চমৎকার ব্যাপার যে, যে সময়ে বঙ্গদেশে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়,সেই সময়েই ইউরোপে লুথরের আবির্ভাব। এবং যে সময়ে ইউরোপও ধর্ম্মবিপ্লবে আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে বঙ্গদেশও ধর্ম্মবিপ্লবে তোলপাড় হইতেছিল। উভয় ধর্ম্মবিপ্লবের গতিও এক প্রকার,ওদিকে লুথর খ্রীস্টধর্ম্ম হইতে কেথলিকদিগের আড়ম্বরময় ক্রিয়াকাণ্ড সকল ছাঁটিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এদিকে চৈতন্যদেবও বৈষ্ণবধর্ম্মের সারাংশটুকু ছাঁকিয়া লইয়া ও শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার অর্থান্তর করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দেবমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। উভয় স্থানেই আবালবৃদ্ধ বনিতাকে নূতন মতে দীক্ষিত করিবার জন্য ভূরি ভূরি গ্রন্থ প্রচার হইতে লাগিল। বঙ্গদেশে বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা ও প্রচার-প্রণালী স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইল। "তন্মধ্যে রূপ গোস্বামি-প্রণীত রাগময় কোষ, সনাতন গোস্বামি প্রণীত রসময় কলিকা, জীব গোস্বামি-রচিত কড়চাই, বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্য ভাগবত, লোচনকৃত চৈতন্যমঙ্গল ও কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত সমধিক প্রসিদ্ধ।" যদিও এই সময় বাঙ্গলা গ্রন্থ রচনা বহুল হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু এই সময়ের গ্রন্থসমূহ পূর্ব্বতন আদি কবিদের রচনা অপেক্ষা অনেক বিষয়ে নিকৃষ্টতর। বিদ্যাপতি চণ্ডিদাসের রচনার সহিত চৈতন্য দেবের সাময়িক কোন কবির রচনা পাশাপাশি রাখিলেই তাহা অনায়াসে প্রতিপন্ন হইবেক।

রাই জাগো, রাই জাগো, শুকসারী বলে,
কত নিদ্রা যাও কালি, মাণিকের কোলে।
রজনী প্রভাত হইল বলি যে তোমারে।
অরুণ কিরণ দেখি প্রাণ কাঁপে ডরে।
সারী বলে শুক তুমি গগনে উড়ে ডাক'
নব জলধর আনি অরুণেরে ঢাক'॥
বিদ্যাপতি কহে চাঁদ গেল নিজ ঠাঁই।
অরুণ কিরণ হবে উঠি ঘরে যাই

—বিদ্যাপতি।

কাহারে কহিব দুঃখ, কে বুঝে অন্তর,
যাহারে মরম কহি সে বাসয়ে পর
আপনা বলিতে বুঝি নাহিক সংসারে,

এত দিনে বুঝিলাম ভাবিয়া অন্তরে,
মনের মরম কহি দুঃখিবার তরে
দ্বিগুণ আগুণ সেই জ্বালি দেয় মোরে,
এতদিনে বুঝিলাম মনেতে ভাবিয়া,
এতিন ভুবনে নাহি আপনা বলিয়া,
এদেশে না রব একা যাব দূর দেশে,
সেই সে যুকতি কহে দ্বিজ চণ্ডিদাসে॥"

—চণ্ডিদাস।

"প্রভুর সন্ন্যাস শুনি শচী জগন্মাতা,
হেন দুঃখ জন্মিল না জানি আছে কোথা,
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ক্ষণে পৃথিবীতে
নিরবধি ধারা পড়ে না পারে রাখিতে।
বসিয়াছে মহাপ্রভু কমললোচন
কহিতে লাগিল শচী করিয়া ক্রন্দন,
না যাইহ আরে বাপ মায়েরে ছাড়িয়া,
পাপিনী আছে যে সবে তোর মুখ দেখিয়া।"

(বৃন্দাবন দাসকৃত চৈতন্য ভাগবত।)

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নবদ্বীপে অবতরী,
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি,
চৌদ্দশ সাত শাকে জন্মের প্রমাণ,
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হৈলা অন্তর্দ্ধান,"

(কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত চৈতন্য চরিতামৃত।)

কিন্তু চৈতন্য দেবের সাময়িক কবিদের উৎকর্ষ অপকর্ষ যাহাই হউক না কেন, এইটি স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহাদিগকে আদর্শ করিয়া বঙ্গভাষায় কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কবিকঙ্কণের চণ্ডী প্রভৃতি প্রণীত হইয়াছে। তাঁহাদের প্রভাব ভবিষ্যৎ কবিদের কাব্যতে যতদূর লক্ষিত হয় এতদূর আর বিদ্যাপতি বা চণ্ডিদাসের প্রভাব লক্ষিত হয় না। বিদ্যাপতি প্রভৃতি বসন্ত-কোকিলদের তানলয় বসন্তের সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হইয়া গেল, কিন্তু তাহাদের পরবর্ত্তী কবিদের ধরণধারণ অনেক দিন পর্য্যন্ত বঙ্গ কবিদের অনুকরণস্থল হইয়া রহিল!

চ—

সম্পাদকের বৈঠক।

ছিট্‌ওয়ালা সিবিলিয়ান। বটকে একটি সিবিলিয়ান সাহেব ছিলেন, তিনি বিলক্ষণ ছিট্‌ওয়ালা। তিনি একবার গবর্ণমেণ্টে কোন পত্র পাঠাইবার সময় সেই পত্রের যেখানে "আপনার বশম্বদ ভৃত্য" লেখা ছিল তাহার পরে আপনার নাম স্বাক্ষর না করিয়া তথায় আপনার প্রতিমূর্ত্তিটি আঁকিয়া দিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট সেই পত্র পাইয়া অবাক্। কিন্তু লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর হইতে সামান্য সিবিলিয়ান পর্য্যন্ত সকলে ভাই ভাই। উৎকট ভর্ৎসনা ব্যতীত তাঁহার আর কোন দণ্ড হইল না।

বিজলি কাঁথীতে একজন সিবিলিয়ান ছিলেন। তিনি নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা ডারুইনের মত যেমন প্রমাণিত করিয়াছিলেন

এমন আর কেহ নাই। সাহেবটী বিলক্ষণ বৃক্ষপ্রিয় ছিলেন। সর্ব্বদা গাছে বসিয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন। ছিটওয়ালা সাহেবের গল্প করিতে করিতে আমাদিগের একটি ছিটওয়ালা বাঙ্গালীর গল্প মনে পড়িল। কোন ছিটওয়ালা লোক একবার এক জনের বাটীতে অতিথি হইয়াছিলেন। রাত্রিতে গৃহস্থ তাঁহার মশারি খাটাইয়া দিয়াছিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ মশারির ভিতর থাকিয়া হঠাৎ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। তাঁহার সহিত সেই গৃহে যাহারা শয়ন করিয়াছিল, তাহার মধ্যে একজন সেই সময় জাগ্রত ছিল। তিনি লম্ফের শব্দ শুনিয়া এবং অতিথিকে অনেকক্ষণ গৃহ মধ্যে ফিরিয়া আসিতে না দেখিয়া তাঁহার কি হইল দেখিবার জন্য প্রাঙ্গণে আসিলেন, আসিয়া দেখিলেন অতিথি প্রাঙ্গণে নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি অতিথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন কি জন্য তিনি গৃহের বাহিরে আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছেন। অতিথি উত্তর করিলেন একে ভববন্ধন, তাহাতে গৃহবন্ধন, তাহাতে আবার মশারিবন্ধন, ইহা আমার সহ্য হইল না, এই জন্য আমি এখানে আসিয়াছি। সাহেবটীর গৃহবন্ধন বোধ হয় ভাল লাগিত না, এই জন্য তিনি সর্ব্বদা গাছে থাকিতে ভাল বাসিতেন। গাছে থাকিলে যেমন অনাবৃত বায়ু সেবন হইতে পারে, তেমন আর ঘরের ভিতরে থাকিলে হয় না। সাহেব এরূপ বৃক্ষপ্রিয় ছিলেন যে রকে বসিয়া কাছারী পর্য্যন্ত করিতেন ও আমলারা আঁকুসা মারিয়া গাছে নথী তুলিয়া দিত।

বাঁকুড়া জেলায় একজন সিভিলিয়ান সাহেব ছিলেন। ইঁহার ছিট, ছিটমান যন্ত্রের উনপঞ্চাশ সংখ্যার অধিক ছিল। কিন্তু তিনি যে এরূপ গাঢ় ছিটওয়ালা ছিলেন তাহা প্রথমে কেহ অনুভব করিতে পারে নাই। ইনি তথায় জজের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া আইসেন। ইনি বিবাহ করেন নাই। প্রথমে জিলায় আসিয়া থাকিবার জন্য স্বতন্ত্র বাটী ভাড়া না করিয়া এসিস্টেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের বাঙ্গালার বারাণ্ডার কিয়দংশ চাঁচ দিয়া ঘিরিয়া সেই খানে থাকিতেন। এবিষয়ে তাঁহার সিবিলিয়ান ভ্রাতাদিগের নিষেধ বাক্য কিছুই শ্রবণ করিতেন না। প্রথমে লোকে তাঁহার ছিট আছে ইহা অনুভব করিতে পারে নাই, মনে করিত যে অত্যন্ত কৃপণতা বশতঃ এইরূপ করিয়া থাকেন। কিছুদিন পরে তিনি স্বতন্ত্র একটী বাটী ভাড়া করিয়া দুইটী ব্যাঘ্র শাবক ক্রয় করিয়া পুষিলেন। ক্রমে তাহারা এমনি পোষ মানিল যে তিনি তাহাদিগের দ্বারা আপনার গাড়ী টানাইতেন। তখনও লোকে তাঁহার ছিটের অস্তিত্ব অনুভব করিতে সক্ষম হয় নাই। লোকে মনে করিত যে বাহাদুরী দেখাইবার জন্য তিনি এইরূপ করিতেন। কিন্তু তাহার পর এমন এক কাজ করিলেন যাহাতে এক বারে প্রমাণ হইল যে তাঁহার ছিট ছিটমান যন্ত্রের উনপঞ্চাশ সংখ্যা অপেক্ষাও অধিক। তিনি একদিন তাঁহার অধীনস্থ মনসেফের বাসায় গিয়া বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের

অলঙ্কার দেখিতে চাহিলেন। মুন্‌সেফ্ মনে করিলেন যে, সাহেব কৌতূহল বশতঃ তাহা দেখিতে চাহিয়াছেন। তিনি বাটীর ভিতর হইতে আপনার স্ত্রীর অলঙ্কার আনাইয়া দিলেন। সাহেব সেই অলঙ্কার আপনার নিকট কিছুদিন রাখিবার মানস প্রকাশ করিলেন। মুন্সেফ তাহাতে সম্মত হইলেন। পরদিন সাহেব, বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের বেশ ধরিয়া এবং নথ চন্দ্রহারাদি বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের অলঙ্কার পরিয়া কাছারি করিতে আইলেন। এই ঘটনার সংবাদ তৎক্ষণাৎ গবর্ণমেণ্টের নিকট পৌঁছিল, কমিশন বসিল, সাহেবকে পেনসন দিয়া বিদায় করা হইল!

আর একজন ছিটওয়ালা সিবিলিয়ান সাহেব ছিলেন। তাঁহার কাছারির কর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত বিরাগ ছিল। তিনি মেদিনীপুরে তখন এসিসটেণ্ট মাজিস্ট্রেটের কার্য্য করিতেন। একদিন অনেক ক্ষণ কাছারীতে না আসাতে আমলাগণ কাগজ স্বাক্ষর করাইবার জন্য তাঁহার বাটীতে গেল, দেখিল সাহেব তথায় নাই। তাহার পর সাহেবকে তাহারা চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল। দেখিল তিনি অন্য কোন সাহেবের বাটীতে নাই। সহরের প্রান্তে একটী পুরাতন পরিত্যক্ত বাঙ্গালা ছিল, সেখানে তিনি আমলাদিগের হাত এড়াইবার জন্য লুকাইয়া বসিয়া আছেন! এই মহাত্মা একবার জিলার গবর্ণমেণ্ট স্কুলের পরীক্ষকের পদে লোকাল কমিটি দ্বারা নিযুক্ত হওয়াতে তিনি নিয়োগপত্রের লেফাফার উপর এই কথাগুলি লিখিয়া দিয়াছিলেন।

Composition is vexation,
Translation as bad,
The Rule of Three puzzles me,
And Practice drives me mad.

যখন তিনি কলিকাতার অতি নিকট একটী জেলাতে জয়েণ্ট মেজিস্ট্রেটের কার্য্য করিতেন, তখন একদিন প্রাতঃকালে তিনি তাঁহার উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার সেরেস্তাদার সেই সুযোগে অনেক দিনের মুলতুবি কতকগুলি কাগজ তাঁহার স্বাক্ষর জন্য তাঁহার সম্মুখে ধরিল। সাহেব তাহা স্বাক্ষর করিবার জন্য কলমও হস্তে লইলেন। সেরেস্তাদার মনে করিল সাহেব এইবার স্বাক্ষর করিবেন এবং তদ্বিষয়ক হৃষ্টচিত্ত হইল, এমন সময়ে অকস্মাৎ সাহেব সেরেস্তাদারের কানের গোড়ায় আপনার মুখ আনিয়া মহা জোরে টুঁ করিলেন। এই আকস্মিক শব্দ প্রয়োগে সেরেস্তাদারের একপ্রকার ভেবাচাকা লাগিয়া গেল এবং কাগজ, দোয়াত, কলম, সকলই তাঁহার হাত থেকে পড়িয়া গেল। সাহেব সেরেস্তাদার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া যেমন গাম্ভীর্য্যের সহিত কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উদ্যান পরিভ্রমণ করিতেছিলেন সেইরূপ গাম্ভীর্য্যের সহিত পুনরায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন! সাহেব যখন ঐ জেলায় ছিলেন তখন কোন ব্যক্তি একদিন তাঁহার ঘরে গিয়া দেখেন যে, সাহেবের সম্মুখস্থিত টেবিলের উপর যে সকল সরকারী কাগজ

অলঙ্কার দেখিতে চাহিলেন। মুন্সেফ্ মনে করিলেন যে, সাহেব কৌতূহল বশতঃ তাহা দেখিতে চাহিয়াছেন। তিনি বাটীর ভিতর হইতে আপনার স্ত্রীর অলঙ্কার আনাইয়া দিলেন। সাহেব সেই অলঙ্কার আপনার নিকট কিছুদিন রাখিবার মানস প্রকাশ করিলেন। মুন্সেফ তাহাতে সম্মত হইলেন। পরদিন সাহেব, বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের বেশ ধরিয়া এবং নথ চন্দ্রহারাদি বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের অলঙ্কার পরিয়া কাছারি করিতে আইলেন। এই ঘটনার সংবাদ তৎক্ষণাৎ গবর্ণমেণ্টের নিকট পৌঁছিল, কমিশন বসিল, সাহেবকে পেনসন দিয়া বিদায় করা হইল!

আর একজন ছিটওয়ালা সিবিলিয়ান সাহেব ছিলেন। তাঁহার কাছারির কর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত বিরাগ ছিল। তিনি মেদিনীপুরে তখন এসিসটেণ্ট মাজিস্ট্রেটের কার্য্য করিতেন। একদিন অনেক ক্ষণ কাছারীতে না আসাতে আমলাগণ কাগজ স্বাক্ষর করাইবার জন্য তাঁহার বাটীতে গেল, দেখিল সাহেব তথায় নাই। তাহার পর সাহেবকে তাহারা চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল। দেখিল তিনি অন্য কোন সাহেবের বাটীতে নাই। সহরের প্রান্তে একটী পুরাতন পরিত্যক্ত বাঙ্গালা ছিল, সেখানে তিনি আমলাদিগের হাত এড়াইবার জন্য লুকাইয়া বসিয়া আছেন! এই মহাত্মা এক বার জিলার গবর্ণমেণ্ট স্কুলের পরীক্ষকের পদে লোকাল কমিটি দ্বারা নিযুক্ত হওয়াতে তিনি নিয়োগপত্রের লেফাফার উপর এই কথাগুলি লিখিয়া দিয়াছিলেন।

Composition is vexation,
Translation as bad,
The Rule of Three puzzles me,
And Practice drives me mad.

যখন তিনি কলিকাতার অতি নিকট একটী জেলাতে জয়েণ্ট মেজিস্ট্রেটের কার্য্য করিতেন, তখন একদিন প্রাতঃকালে তিনি তাঁহার উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার সেরেস্তাদার সেই সুযোগে অনেক দিনের মুলতুবি কতকগুলি কাগজ তাঁহার স্বাক্ষর জন্য তাঁহার সম্মুখে ধরিল। সাহেব তাহা স্বাক্ষর করিবার জন্য কলমও হস্তে লইলেন। সেরেস্তাদার মনে করিল সাহেব এইবার স্বাক্ষর করিবেন এবং তন্নিবন্ধন হৃষ্টচিত্ত হইল, এমন সময়ে অকস্মাৎ সাহেব সেরেস্তাদারের কানের গোড়ায় আপনার মুখ আনিয়া মহা জোরে টুঁ করিলেন। এই আকস্মিক শব্দ প্রয়োগে সেরেস্তাদারের একপ্রকার ভেবাচাকা লাগিয়া গেল এবং কাগজ, দোয়াত, কলম, সকলই তাঁহার হাত থেকে পড়িয়া গেল। সাহেব সেরেস্তাদার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া যেমন গাম্ভীর্য্যের সহিত কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উদ্যান পরিভ্রমণ করিতেছিলেন সেইরূপ গাম্ভীর্য্যের সহিত পুনরায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন! সাহেব যখন ঐ জেলায় ছিলেন তখন কোন ব্যক্তি একদিন তাঁহার ঘরে গিয়া দেখেন যে, সাহেবের সম্মুখস্থিত টেবিলের উপর যে সকল সরকারী কাগজ

আমাদের কত লভ্য হইতেছে, তাহার বিনিময়ে ভারতবর্ষবাসীদিগকে কি একটু মন খুলিয়া কাঁদিতেও দিব না?"—তাহা হইলে তাঁহাদের কেমন উদারতা প্রকাশ পাইত!

এক জনের স্কন্ধে অন্যের মাথা ঠিক্ লাগে না। ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেন্‌রি, ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্‌সিস্‌কে কোন অসন্তোষকর কথা বলিবার জন্য সর্‌ টমাস্ মুরকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। প্রথম ফ্রান্‌সিস্ অত্যন্ত কোপন-স্বভাব ছিলেন। ঐ প্রকার কোপন স্বভাব রাজাকে নিতান্ত অতুষ্টিকর কথা বলিলে পাছে তাঁহার শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা দেন, সর্‌টমাস্ মুর এরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করাতে অষ্টম হেন্‌রি বলিলেন যে, তোমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিলে লণ্ডনে যত ফরাসিস্ আছে আমি তাহাদের শিরশ্ছেদন করিব—সার টমাস মুর উত্তর করিলেন "মহারাজ এরূপ অনুগ্রহ বাক্য জন্য আমি আপনার নিকট যথেষ্ট বাধিত হইলাম কিন্তু আমার সন্দেহ হইতেছে যে সেই সকল ফরাসিস্‌দের মধ্যে কাহারও মাথা ঠিক্ আমার স্কন্ধে মানান হইবে কি না!"—

রোম-তীর্থযাত্রী। —সম্প্রতি যে সকল রোমান কাথলিক রোম নগরীতে তীর্থযাত্রা করিতে গিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে একটী ফরাসিস স্ত্রী ছিলেন তাহার তীর্থযাত্রার বিবরণ এক ইটালীয় বার্ত্তাবহে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা এই;—স্ত্রীলোকটী অনেক দিন হইতে এক ভয়ানক পদ-রোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছিলেন—এমন কি, প্রধান প্রধান চিকিৎসকেরা পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, ক্ষত পা খানি কাটিয়া ফেলাই তাঁহার জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়। তিনি তাঁহার জনৈক মিত্রের অনুরোধে একটি মাত্র ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার আকাঙ্ক্ষায় রহিলেন, সে ঔষধি পোপের পরিত্যক্ত এক খানি পুরাতন মোজা পরিধান করা। মোজা তাঁহার মিত্রের নিকটে ছিল ও স্ত্রীলোকটি তাহা অব্যর্থ ঔষধ মনে করিয়া তাহার গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে কৃত-নিশ্চয় হইলেন। এই মোজা পরিধান কতক দিন পরে তিনি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন যে তিনি স্বচ্ছন্দে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারেন, তাঁহার পায়ের পীড়ার চিহ্ন মাত্রও নাই। তিনি মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে এই পীড়া হইতে মুক্ত হইলেই রোম যাত্রায় বাহির হইবেন, এই ক্ষণে শীঘ্রই এই ব্রত রক্ষায় তৎপর হইলেন। পোপের সম্মুখে উপনীত হইয়া স্ত্রীলোকটি কৃতজ্ঞভাবে পোপদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন যে আপনার আশীর্ব্বাদে আপনার পরিত্যক্ত মোজা পরিয়া যে ভয়ানক পীড়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি তজ্জন্য আমি কি প্রকারে আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব জানি না। পোপ তাঁহার সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উত্তর করিলেন "তুমি বড়ই ভাগ্যবতী, আমার একটী মোজার গুণে তুমি আরোগ্য লাভ করিলে ও তোমার

রূপান্তর পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইল। আমার দুঃখের কথা কি বলিব—আমি প্রত্যহ দুই বোতল পরিধান করিয়া থাকি তথাপি আমি চলৎ-শক্তি হীন—এমন কি উঠিয়া দাঁড়াইতেও পারি না ও চাকা-যুক্ত চৌকীতে বসিয়া আমাকে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে হয়!

ফিজি দ্বীপবাসী ও ইংরাজি আইন।

ফিজি দ্বীপের অসভ্য লোকদের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আইনের প্রভাব কত দূর ফলোপধায়ী তাহা নিম্ন-লিখিত ঘটনাতে প্রকাশ পাইতেছে। চারি বৎসর পূর্ব্বে ফিজিদ্বীপ পুঞ্জের পশ্চিমস্থিত ওয়াইয়া নামক দ্বীপে রাবুসো ইয়োনি নামে তত্রত্য জনপদের সরদার বাস করিতেন। সেই সময়ে ইংরাজ রাজ্য,ইংরাজি রীতি নীতি, আইন আদালৎ, তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার ফিজি-বাসীদের সহজে বোধগম্য হইবার নহে, ইহা বলা বাহুল্য। রাবুসো এই নূতন নাতা-নি-তু—(রাজ্য প্রণালী) অল্পই বুঝিতেন ও তাহার সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখিয়া দেশের পূর্ব্বকার রীতি অনুসারেই কার্য্য চালাইতেন। ওয়াইয়ার নামা এক যুবক, রমণীগণের অতি প্রিয়পাত্র ছিল। সে যে কেবল অবিবাহিত স্ত্রীলোকের মনো চোর হইয়াই ক্ষান্ত থাকিবে তাহা নহে কিন্তু পরদার-সেবাতেও বিলক্ষণ তৎপর ছিল। ফিজিবাসীগণ ঈর্ষ্যাপরায়ণ বলিয়া প্রখ্যাত। ক্রোধান্ধ স্বামীগণ তাহাদের সরদারের নিকট আসিয়া যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। শ্রেষ্ঠী তাহার বৃদ্ধ মন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যুবকের উপর 'বুটুবাকা' দণ্ড-বিধান সাব্যস্ত করিলেন। ইহা ফিজীয়-দিগের চিরাভ্যস্ত শাসন-প্রণালী। তাহা এই—দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে ধরাশায়ী করিয়া সে যতক্ষণ পর্য্যন্ত অচেতন বা মুমূর্ষু হইয়া পড়ে ততক্ষণ তাহার উপরে সকলে মিলিয়া লম্ফ ঝম্প দিতে ও নৃত্য করিতে থাকে। এই 'বুটুবাকা' দণ্ড বিধিপূর্ব্বক সমাধা হইলে তিন সপ্তাহ পরে যুবকের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইল।

রাবুসো ধৃত হইল ও বিচারের পূর্ব্বে সোমো সোমো নামক স্থানে এক বন্দী-শালায় বন্দীকৃত হইল। রাবুসো ত এ সকল ব্যাপারের কিছুই অর্থ খুঁজিয়া পাইলেন না ও মনে করিলেন—এ বন্ধন-যন্ত্রণা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। একদিন তাঁহার কারারক্ষকদের অনুমতি লইয়া একটু চলিয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। তাহারা তাঁহার সমভিব্যাহারী হইয়া এক বৃক্ষতলে গিয়া সকলে উপবেশন করিল। সরদার ফল পাড়িবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বৃক্ষের উপর আরোহণ করিলেন। সর্ব্বোচ্চ শাখার উপরে চড়িয়া তাঁহার রক্ষকদিগকে বলিয়া উঠিলেন—দেখ আমি বৃক্ষের উপর হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতেছি। বলিলেন তোমার শ্বেতাঙ্গ জজকে গিয়া বল যে আমি এখানকার সরদার। আমার বাপও সরদার ছিলেন। আমাকে চোরের ন্যায় কয়েদী করিয়া রাখিলে এ অপমান আমার সহ্য হয় না। যুবকের দণ্ড উপযুক্তই হই-

যাহে, সে যেমন কর্ম্ম করিয়াছে তাহার ফল ফলিয়াছে। আমি সর্দ্দার, দেশের প্রথা অনুসারে তাহাকে শাসন করিবার অধিকার আমারই—এই বলিয়া তিনি রক্ষ হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন; তাঁহার পৃষ্ঠ দণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল, ও অল্পক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হইল।

প্রাপ্ত গ্রন্থ।

১। বিশ্বদর্শন। প্রতি ঋতুতে প্রকাশ্য, সাময়িক পত্র ও সমালোচনা। শ্রী অমরেন্দ্র নাথ সোম কর্ত্তৃক সম্পাদিত—প্রথম সংখ্যা, শরৎঋতু। ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত। এই পত্র খানির সূচীপত্র দেখিয়া যতখানি আহ্লাদ হইয়াছিল প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া তত আহ্লাদি না হউক, আমরা ক্ষুণ্ণ হই নাই স্বীকার করিতেছি। 'পতিতা কামিনী' শিরোনামা কবিতাটি দিবা হইয়াছে এবং মণিপুরের বিবরণটি মন্দ হয় নাই। কিন্তু অর্থশূন্য শব্দাড়ম্বরময় 'অদ্ভুত পত্রিকা' ও উন্মত্ত প্রলাপময় 'কলঙ্কসংবাদ' আমাদের ভাল লাগিল না।

২। দুঃখসঙ্গিনী। গীতিকাব্য। ভারত যন্ত্রে শ্রী রামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।

এই পুস্তকখানি সুন্দর হইয়াছে। গ্রন্থকার উচ্চদরের কবি না হউন, তাঁহার ভাবুকতা, লেখার প্রাঞ্জলতা ও পদের লালিত্য প্রশংসনীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে কবিতাখানির অনেক স্থলেই চর্ব্বিত চর্ব্বণ এবং স্থানে স্থানে নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য ভাব ও শব্দের বোরঘটা দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্থল গুলি আমাদের ভাল লাগিয়াছে তাহা স্থানাভাবে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না বলিয়া ক্ষোভ রহিল।

৩। নলিনী ভূষণ নাটক। শ্রীপ্যারীলাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। ষ্টীমহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১ টাকা। এই নাটক খানিতে স্থানে স্থানে যে অমিত্রাক্ষর কবিতা আছে তাহা আমাদের ভাল লাগিল। প্যারীলাল বাবু নাটক লিখিবার চেষ্টা না করিয়া যদি কবিতা লিখেন তাহা হইলে অধিকতর সফলমনোরথ হইবেন আমাদের এই বিশ্বাস। এই নাটকখানিতে ইতর লোকের কথাবার্ত্তাগুলি সুন্দররূপে অনুকরণ করা হইয়াছে। আর একটি সুখের বিষয়, নাটকখানিতে স্বদেশবাৎসল্য জাজ্বল্যমান রহিয়াছে—কিন্তু একস্থলে নলিনী জাফরখাঁকে এক খণ্ড কাচের দ্বারা হত করিতে যাওয়ায় হাস্যজনক হইয়া পড়িয়াছে। কোন বাঙ্গালী-বীরত্বের বিদ্রূপকারী নলিনীর মুখের এইকথা গুলি বসাইতে পারেন—(বোঁটাইয়ার পরিবর্ত্তে) "কাচাইয়া দিব ওই পাষণ্ড যবনে!"

৩। প্রতিমাবিসর্জ্জন। বিয়োগান্ত নাটক। বিপিনবিহারী রায় দ্বারা ভিক্টোরিয়া যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৸৹ আনা মাত্র। ইহাতে এমন কিছুই নাই যাহার সমালোচনা করিয়া গ্রন্থকারকে আমরা পরিতুষ্ট করিতে পারি। অধিক কথা বলিতে গেলে আমরা দোষের ভাগী ও হইব গ্রন্থকার ক্ষোভের ভাগী হইবেন মাত্র।